মাকদিসী সমগ্র

শায়েখ আবু মুহাম্মাদ আসেম আল-মাকদিসী হাফিঃ

মাকদিসী সমগ্র

শায়েখ আবু মুহাম্মাদ আসেম আল-মাকদিসী হাফিঃ

- এখানে যা যা আছে -

শাইখ আবু মহাম্মাদ আল মাকদিসি(হাঃ) এর এক বিশেষ সাক্ষাৎকার (আলরুইয়া চ্যানেলের সাথে)

প্রশ্নকর্তাঃ ভদ্র মহিলা ও মহোদয় গণ। আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি এই বিশেষ সাক্ষাতকারে, আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন সালাফি জিহাদি আন্দোলনের একজন তাত্ত্বিক শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল-মাকদিসি।
শাইখ মুহাম্মাদ, আপনাকে স্বাগতম!
আমি প্রথম প্রশ্নটি করছি চলমান পরিস্থিতি নিয়ে, শহীদ(!) পাইলট "মুয়ায কাসাবেহ" এর সম্পর্কে, আপনি কি এই বিষয়ে মধ্যস্ততার পদক্ষেপ নিয়েছিলেন?
শাইখ আল মাকদিসিঃ সকল প্রশংসা আল্লাহ্* রাব্বুল আলামিনের যিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতের পালন কর্তা। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম), তাঁর বংশধর এবং তাঁর সাহাবিগণের ওপর।
হ্যাঁ। যখনই দাওলা সংগঠনটির হাতে জরডানিয়ান পাইলটের বন্দী হওয়ার খবরটি আমার কাছে এসেছে, তখন থেকেই আমি তাদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা চালিয়েছি, যাতে এর থেকে একটি শরয়ী সুবিধা অর্জন করা যায়; আমি তাদের মধ্য থেকে বিচক্ষণদের বোঝানোর চেষ্টা করি, আদৌ তাদের মধ্যে যদি বিচক্ষণ কেউ থেকে থাকে, যাতে করে জরডানের পাইলটের বিনিময়ে বন্দি সাজিদা রিশাওয়ীকে হস্তান্তর করতে তারা সম্মত হয়। এবং হ্যাঁ। আমি সেজন্যেই তাদের সাথে যোগাযোগ করেছিলাম।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি দাঈশ (আই এস আই এস) এর সাথে এজন্যেই যোগাযোগ করেছিলেন... দাঈশ এই ব্যপারে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল? আদৌ কি তাদের কোন প্রতিক্রিয়া ছিল?
শাইখ আল মাকদিসিঃ তাদের সাথে যোগাযোগের পূর্বে আমি ইয়েমেন এবং সিরিয়া, ইসলামিক মাগরিব (মরোক্কো), এবং পুরো পৃথিবীর পূর্ব এবং পশ্চিমে যত মুজাহিদিন রয়েছেন তাদের মধ্য থেকে বিশেষ কিছু ভাইদের সাথে যোগাযোগের উদ্যোগ নেই। এবং আমি যোগাযোগের চেষ্টা করি কুয়েত ও বাহরাইনের বিশেষ কিছু ভাইদের সাথেও। এবং

আমি তাদের কাছ থেকে এই বিষয়ে সহযোগিতা কামনা করি, এবং তারা আমাকে সাহায্য করেন। আল্লাহ্* তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন এবং আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তারা আমাকে সহোযগিতা করেন চিঠিগুলোর ব্যপারে, যাতে ‘দাওলা’ সংগঠনটির বিচক্ষণ ব্যক্তিদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া যায় যে পাইলটের বিনিময়ে সাজিদাকে মুক্ত করার এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ। ... তারা আমাকে এই বিষয়ে সহায়তা করেন এবং বিভিন্ন ব্যক্তির নাম প্রদান করেও সাহায্য করেন।
তারা আমাকে বিভিন্ন সক্রিয় ব্যক্তির নাম এবং ঠিকানা দিয়ে সাহায্য করেন যা আমার জন্যে বেশ উপকারী বলে প্রমাণিত হয়, এবং আমি ঐগুলোর অনুসরণে তাদের সাথে যোগাযোগ করা শুরু করি। আমি তানজিমুদ্দাওলার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করি। আমি যোগাযোগ করি আবু মুহাম্মাদ আল আদনানির সাথে, বার্তা বিনিময় করি আল বাগদাদির সাথে, শাইখ তুর্কি বানালি এবং অন্যান্য শারিয়া বিশেষজ্ঞদের সাথে... এবং আমি তাদেরকে রাজি করানোর মাধ্যমে এই শর’য়ী সুবিধাটি অর্জন করতে জোর প্রচেষ্টা চালাই।

প্রশ্ন কর্তাঃ দাঈশ এই ব্যপারটিতে কতটুকু গুরুত্ব আরোপ করেছিল? এই সকল প্রচেষ্টা এবং যোগাযোগের ব্যাপারে তাদের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল? তারা কি আপনাকে কোন সাড়া দিয়েছিল? আপনার এবং তাদের মাঝে দৃষ্টান্তমূলক কোন মত বিনিময় হয়েছিল কি?
শাইখ আল মাকদিসিঃ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, আমি ভেবেছিলাম তারা তাদের বোনের মুক্তি এবং এই ধরনের শর’য়ী সুবিধা আর্জনের জন্যে উদগ্রিব হয়ে থাকবে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই ব্যপারে তাদের কোন প্রতিক্রিয়া তো ছিলই না বরং তাদের অবস্থান ছিল এর বিপরীত। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমার পাঠানো অডিও বার্তাগুলোকে আমলে নেয়নি। আর কেউ কেউ এই বিষয়টিকে গুরুত্বই দেয় নি... এর ব্যপ্তি এমনই ছিল যে, তাদের একজন, যে আমার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করছিল সে আমাকে মিথ্যা বলেছিল... তারা পাইলট মুয়ায কে হত্যা করে ফেলেছিল, এবং সে আমাকে মিথ্যা বলেছিল এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে বলেছিল “আমরা আন্তরিক, এবং আমরা চাই ... এবং আমরা আপনার সাথে সত্যনিষ্ঠ ... এবং আপনি দেখবেন আমরা সত্যবাদি।” আর এর পরই এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে সে একজন মিথ্যাবাদী। এবং আল্লাহ্* বলেনঃ
“হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ্*কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।”
এই আয়াতটি জিহাদ এবং মুজাহিদিনদের উল্লেখ করেই নাযিল হয়েছিল। আর জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত কোন ব্যক্তির জন্যে এটা কখনই সমীচীন নয় যে সে মিথ্যাবাদী

হবে।

প্রশ্নকর্তাঃ সেই ‘শহীদ’ পাইলটকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে, এই কাজটির বিষয়ে আপনার মতামত কী? এবং এই কদর্য পদ্ধতিটি অবলম্বনের পেছনে কী কারণ রয়েছে এবং এই দলটির লক্ষ্য কী?
শাইখ আল মাকদিসিঃ তারা অনেক কুপ্রথার প্রচলন ঘটিয়েছে।
প্রথম যে প্রথাটি তারা চালু করেছে এবং যাকে তারা নবি করিম (সাঃ) এর সুন্নাহ হিসেবে দাবি করছে, সেটি হল জবাই করে হত্যা যা তারা সাধারণ মানুষের সামনে বাস্তবায়ন করে।
তারা তাদের প্রতিপক্ষকে জবাই করে হত্যা করে, তারা জবাই করেছে দলনেতাদের এবং সিরিয়ার মুজাহিদিনদের- যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ ভেবে নিয়েছে যে জবাই করে হত্যা ছিল রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সুন্নাহ। এবং তারা এর সপক্ষের দলিল হিসেবে নবি করিম (সাঃ) এর এই হাদিসটিকে ব্যবহার করেঃ “হে কুরাইশ! আমি তোমাদের কাছে এসেছি জবাই সাথে নিয়ে।”
যখন তারা (কুরাইশ) রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কে উপহাস করেছিল তখন তিনি এই শব্দগুলো ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু তারা (দাওলা) রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর আচরণকে সম্পূর্নরূপে উপেক্ষা করল যা তিনি মক্কা বিজয়ের বছরে তাঁর অধিনস্ত কুরাইশদের প্রতি করেছিলেন। তারা ভুলে গেছে তিনি(সাঃ) তাদের প্রতি কী আচরণ করেছিলেন... তিনি কি তাদের শত সহস্র লোকদের বলেননি- “যাও, তোমরা স্বাধীন” এবং এই কারণেই তারা শত্রু থেকে দীনের অনুসারীতে পরিণত হয়।
তারা এই উদাহরণটিকে বিবেচনা করে না... তারা সেই কথাগুলো গ্রহণ করে যা রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছিলেন যখন তাকে উপহাস করা হয়েছিল... এবং তারা জবাইকে একটি প্রথায় পরিণত করেছে... তারা দীন এবং জিহাদের আন্দোলনকে রক্তের রঙে রঞ্জিত করেছে।
তারা এবং তাদের সকলেই, মনে করে যে জবাই এবং হত্যা ছাড়া জিহাদকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু রাসুলুল্লাহ (সাঃ) মুতা’আর যুদ্ধে খালিদ বিন ওয়ালিদের (রা) সৈন্য বহরের জীবন রক্ষা ও নিরাপত্তার লক্ষ্যে যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে আসার বিষয়ে বলেছেনঃ আল্লাহ্* তাকে বিজয় দান করেছেন।” এবং তিনি (সাঃ) এটিকে বিজয় হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্* হুদায়বিয়ার সন্ধি কে “একটি বিজয়” বলে উল্লেখ করেছেন।
“নিশ্চয় আমি আপনার জন্যে এমন একটা বিজয় দান করেছি, যা সুস্পষ্ট।“

অথচ জবাই আর হত্যা ছাড়াও বিজয় এবং অধিগ্রহণ যে সম্ভব তা তারা বুঝতে পারে না। তারা উপলব্ধি করে না যে বৃহত্তর স্বার্থ অর্জনে এই পদ্ধতিগুলো বিজয় এবং এইগুলোও শরয়ী সুবিধা আর এইগুলোও জিহাদেরই অংশ।

এবং এই কারণেই যখন তারা প্রথম জবাই করে হত্যার প্রচলন করে তখন তারা তাদের বিরোধী দলের অসংখ্য ব্যক্তিকে জবাই করল এবং তা টেলিভিশনের পর্দায় প্রচার করতে শুরু করল যতক্ষণ পর্যন্ত না সাধারণ মানুষ আতংকিত হয়ে প্রশ্ন করল, “এটাই কি ইসলাম?”

আর আমাদের বাধ্য করা হল ইসলামের আদর্শ রক্ষা করতে এবং পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতে যে এগুলো দীনের অংশ নয়।

তারা মুজাহিদিনদের জবাই করেছে এবং জবাই করেছে অসংখ্য মানুষ... ফুলের মত যুবকদের...

তারা যাদেরকে হত্যা করেছিল সেই মানুষগুলো কারা এবং কেন তাদেরকে হত্যা করা হল এর প্রকৃত কারণ জনগণের কাছে স্পষ্ট রূপে প্রকাশ করা হয় নি।

জনগণ শুধু দেখতে পায় জবাই করে নৃশংস ভাবে হত্যা এবং তারা (দাওলা) বলে “এরা তো মুরতাদীন”।

মানুষের সামনে কোন বিচার কার্য সম্পাদিত হয় না এমনকি তারা কাউকে অপরাধী সাব্যস্ত হতেও দেখে না, তারা শুধু জবাই করে হত্যাকান্ডই অবলোকন করে।

আর তারা এই কুপ্রথা প্রতিষ্ঠা করে এবং ঠিক এরপরই আমাদেরকে বিস্মিত করে আগুনে পুড়িয়ে শাস্তি দেয়ার প্রথাটি চালু করে... এবং এখন থেকে পুড়িয়ে হত্যা করে মানুষ তাদেরকে অনুসরণ করা শুরু করবে অথচ রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

“আগুনের স্রষ্টা ছাড়া আর কেউ আগুন দ্বারা শাস্তি দেবে না।“

তারা দলিল হিসেবে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা (রঃ) এর একটি বক্তব্যের কিয়দাংশ তুলে ধরে এবং সেই অংশের পূর্বের এবং পরের কথাগুলো ছুড়ে ফেলে দেয়। তারা শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) এর বক্তব্যকে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর হাদিসের ওপর প্রাধান্য দেয়।

এটাই কি সালাফিয়্যা? তারা নিজেদের বলে সালাফি জিহাদি... সালাফি জিহাদিরা এই ধরনের আচরণ থেকে মুক্ত... আগুনে পুড়ানো... রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এই কাজ নিষেধ করেছেন এবং তিনি বলেছেনঃ “আগুনের স্রষ্টা ছাড়া আর কেউ আগুন দ্বারা শাস্তি দেবে না।“ ... এবং তারা কী অর্জন করছে? ... তাদের এই কাজ তাদের কী উপকারে আসছে?

তারা কি ভেবেছিল যে এই পাইলটকে পুড়িয়ে হত্যা করলেই বম্বিং থেমে যাবে এবং যুদ্ধ

বন্ধ হয়ে যাবে?
আমি নিশ্চিত যে জরডানে আমাদের সাথে অবস্থানরত তাদের বিচক্ষণ অনুসারীরা এখন খুব ভালোভাবে জানতে পারবে যে তাদের নির্বোধের ন্যায় এহেন কার্যকলাপ কতটা ক্ষতি করেছে।
আর যখন, সাজিদা আর আল-কারবুলির মৃত্যু দন্ড দেয়া হল বলে জানলাম, আমি বলতে চাই, এর সম্পূর্ণ দায় দায়িত্ব তানজিমুদ্দাওলার ওপরই বর্তায়। কারণ তারা সাজিদার নাম ভাঙ্গিয়ে এবং তাকে মুক্ত করার দাবি জানিয়ে বিভিন্ন চুক্তি করতে চাইছিল অথচ তারা এই ব্যপারে একদমই আন্তরিক ছিল না।
তারা আমার কাছে মিথ্যা বলেছিল এবং মিথ্যা প্রতিজ্ঞা করেছিল অথচ ইতিমধ্যে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে তারা আগেই পাইলটকে হত্যা করে ফেলেছিল।
তোমরা কেন মিথ্যা বল যখন আল্লাহ্* বলেনঃ “হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো।”
তোমরা কেন আমার সাথে যোগাযোগের সময় সততা রক্ষা করলে না?

প্রশ্নকর্তাঃ অনুমতি চাইছি পরবর্তী প্রশ্নের... দাঈশ দাবি করে তারা ইসলামের প্রতিনিধি এবং তারা একটি খিলাফা রাষ্ট্র... এই ব্যপারে সালাফি জিহাদি আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গি কী... তারা কি এটাকে খিলাফা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়?
শাইখ আল মাকদিসিঃ আমরা তাদের সীমা লঙ্ঘন এবং তাদের ভ্রান্তির ব্যপারে বহু বার কথা বলেছি... আমরা শুরুর দিকে তাদেরকে সতর্ক করেছিলাম এবং তাদের প্রতি আমাদের সহানুভূতির মাত্রা এতটাই প্রকট ছিল যে এক পর্যায়ে লোকজন নানা কথা বলতে শুরু করল... তারা মুহাম্মাদের (আমার) ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিলঃ “আপনি তো দাওলার ওকালতি করছেন”... এটি সেই সব ভাইদের কথা যারা তানজিমুদ্দাওলার বিপথগামিতা আর ভ্রান্তির বিষয়ে অবগত ছিল।
এবং আমার কিছু বক্তব্যে আমি নমনীয় ছিলাম কারণ আমি জানি অসংখ্য তরুণ যারা নিজের দেশ ছেড়ে নিদারুন কষ্ট স্বীকার করে সীমানার ওপারে পাড়ি জমিয়েছে... খিলাফা এবং ইসলামিক রাষ্ট্র এই ধরনের শব্দগুলো ব্যবহার করে তাদেরকে প্রতারিত করা হয়েছে... এবং তারা খিলাফা নামধারী যে কোন কিছুতেই যোগদানে বা তার সমর্থনে মরিয়া হয়ে ওঠে।
খিলাফার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে সাধারণ মানুষ, অপেক্ষা করছে জিহাদি আন্দোলনের সন্তানেরা । তারা ব্যকুল হয়ে রয়েছে একটি ইসলামিক রাষ্ট্রের জন্য আর তাই তরুণেরা পৃথিবীর আনাচে কানাচে থেকে এসেও তাদের সাথে যোগদান করছে।

আমি এই অসহায় তরুণদের আন্তরিকতা নিয়ে কোন প্রশ্ন তুলছি না, যারা প্রতারিত হচ্ছে এবং তাদের সাথে যোগদান করছে... কিন্তু যখন তাদেরকে জোর পূর্বক অন্য মুজাহিদ ভাইদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে বাধ্য করা হয়... তখন যারা পালানোর সুযোগ পায় তারা পালিয়ে যায়... এবং তাদের মধ্যে যারা সত্য উদ্ঘাটন করতে সমর্থ হয় তাদেরকে নৃশংস ভাবে হত্যা করা হয়।

আমরা আগেই বলেছি যে এটি খিলাফার প্রকৃত চিত্র নয়।

কারণ খিলাফার প্রকৃত লক্ষ্য হল মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করা।

যখন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) মুয়ায এবং আবু মুসা আল আশারিকে ইয়েমেনে প্রেরণ করলেন, তখন তিনি তাদেরকে কী বলেছিলেন?

তারা ছিলেন দুই জন এবং দুজনের মধ্য থেকে একজনকে দলনেতা নির্বাচন করা অপরিহার্য নয়। দলনেতা নির্বাচন করা আবশ্যক হয় তখনই যখন এর সংখ্যা তিন বা তিনের অধিক হয়... যদিও তাদের জন্য নেতা নির্বাচন করা অপরিহার্য ছিল না তারপরও তিনি তাদের পরামর্শ দিয়েছিলেন নেতৃত্বের সুফল ভোগ করার। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেনঃ “একতাবদ্ধ হয়ে কাজ কর, এবং নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি কোর না, উৎসাহিত করো , নিরুৎসাহিত কোর না।”

রাসুলুল্লাহ(সাঃ) এর উপদেশের দিকে লক্ষ্য করুন... তাদের মধ্যে একজন নেতা নির্বাচন করা তাদের জন্যে আবশ্যক ছিল না। তবুও তিনি (সাঃ) তাদেরকে উপদেশ দিয়েছিলেন যাতে তারা নেতৃত্বের সুফল উপলব্ধি করতে পারে। বস্তুত নেতৃত্বের মাধ্যমে অর্জিত সুফল নেতৃত্ব প্রদানের থেকে গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ নেতৃত্ব দেয়া আবশ্যক নয় যদি না এর মাধ্যমে নেতৃত্বের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জন করা যায়, নেতৃত্বের সুফল বলতে ঐক্যবদ্ধ করা, পরস্পরের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করা নয়; সহজ করা এবং জটিল করা নয়; উৎসাহিত করা, নিরুৎসাহিত করা নয়... হাদিসে এভাবেই বর্ণিত হয়েছে।

এখন এই যে নেতৃত্বের সুফল... যখন আমি দাবি করছি যে আমি খিলাফা অথবা একটি ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছি অথচ এই নেতৃত্বের মাধ্যমে আমি কোন সুফল বয়ে আনছি না। আমি মুসলিম উম্মাহকে বিভক্ত করছি এবং জবাই ও আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করাকে ইসলামের চরিত্র রূপে উপস্থাপন করছি এবং সত্যিকার অর্থে এর দ্বারা কোন সুফল অর্জন করতে পারিনি অথচ আমি চাইছি যে মানুষ আমাকে বায়াহ্* দেক। এবং আমি পূর্ব ও পশ্চিমের মুসলমানদের নেতৃত্বের বিন্যাসকে ভেঙে দিয়েছি এবং আমি চাইছি তারা আমাকে বায়াহ প্রদান করুক অথচ খেলাফার সুফল অর্জনের দিকে আমি ভ্রুক্ষেপও করছি না। যদিও আমি মুসলিম উম্মাহর জন্যে খিলাফার কোন সুফলই বয়ে আনছি না।

আপনি মুসলিমদের নেতৃত্বের বিন্যাসকে ভেঙে দিচ্ছেন এবং দীনের ক্ষতি সাধন করছেন আপনার এই জবাই, এই আগুনে পোড়ানো এবং সর্বোপরি এই ভূমিকার মাধ্যমে।
আমি বিস্মিত!! তাদের মধ্য থেকে একজন আমার সাথে যোগাযোগ করেছিল, সে “আমার শাইখ, আমার শাইখ” বলে আমাকে সম্বধন করছিল এবং বলছিল “আমরা এই ব্যপারে আন্তরিক” অথচ সে আমার সাথে মিথ্যে বলেছিল। তারা পাইলট মুয়াযকে প্রথম সপ্তাহেই হত্যা করে অথচ সে কসম করে বলেছিল যে তারা এ ব্যপারে আন্তরিক কিন্তু তারপরই আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে সে মিথ্যে বলছিল। সুস্পষ্ট মিথ্যে...
তুমি আমাকে “আমার শাইখ” বলে আন্তরিক ভাবে সম্বোধন করলে আর ঠিক তারপরই বললে যে তুমি মিথ্যে বলছিলে জরডান রাষ্ট্রের কাছে। কিন্তু সেটা তো আমি ছিলাম যার সাথে তোমরা যোগাযোগ করছিলে... আমি মুহাম্মাদ। তোমরা তো রাষ্ট্রের সাথে যোগাযোগ করছিলে না... তোমরা যোগাযোগ করছিলে আমার সাথে আর তোমরা আমাকে মিথ্যে বলেছ। আর এরপর আমি প্রচন্ড ধাক্কা খেলাম পাইলটকে পুড়িয়ে হত্যা করার খবরে।... পুড়িয়ে হত্যা?! এটা কি সুন্নাহ? রাসুলুল্লাহ(সাঃ) এটাকে নিষেধ করেছেন। এবং তোমরা শাইখুল ইসলামের ফাতওয়াকে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর ওপর প্রাধান্য দিয়েছ।
আমি তাদেরকে লেখা আমার চিঠিতে উল্লেখ করেছি যে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা (রঃ) বলেছেন লাভ ক্ষতির হিসেব কষা আলেমদের কাজ নয়, বরং একজন আলেম একাধিক লাভের মধ্যে থেকে আসল লাভটি বের করে আনে আর একাধিক ক্ষতির মধ্য থেকে কোনগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হবে তা পরিমাপ করেন ... এবং এটাই একজন সত্যিকার আলেমের কাজ যেমনটা শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেছিলেন।
এটিকে তারা আমলে নেয় নি, তারা শাইখুল ইসলামের বক্তব্যের ততটুকুই গ্রহন করেছে যতটুকু তাদের মনঃপুত হয়েছে। তারা শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যার বক্তব্য থেকে এটাই নিয়েছে যে, আগ্রাসন প্রতিরোধের জন্যে পুড়িয়ে হত্যা করা অনুমদিত... তারা কি সত্যিই আগ্রাসনকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়েছে? ... এই যে তারা মুয়ায আল কাসাবাহ কে পুড়িয়ে হত্যা করল, এটা কি সেই আগ্রাসনকে প্রতিরোধ করতে পেরেছে যা তারা প্রতিরোধ করতে চেয়েছিল?
শত্রুজোট এখন তাদের আক্রমণের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে, জরডানের জনগণ এখন বম্বিং আরও বৃদ্ধি করার জন্যে চাপ প্রয়োগ করছে, কারণ তারা এমন একটা বিষয় দেখছে যা না শারিয়া দিয়ে আর না যুক্তি দিয়ে বিচার করা যায়... এই আগুনে পোড়ানো... কেন তোমরা পুড়িয়ে দিচ্ছ? ... এবং সেই আলেমরা যাদেরকে তোমরা

শাইখ ডাকতে... তোমরা আমাদের প্রত্যাশাকেও পুড়িয়ে ফেলেছ। সাজিদাকে মুক্ত করার আমাদের যে আশা ছিল তোমরা তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছ ... এবং তোমরাই তার মৃত্যুর জন্যে দায়ী।

প্রশ্নকর্তাঃ যদি দায়েশ ইসলামের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে থাকে তাহলে এই দলটির চিন্তাধারা কীসের ওপর নির্ভর করে আছে?
শাইখ আল মাকদিসিঃ দুঃখের বিষয়, তাদের নেতৃত্বের প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে তাদের বেশির ভাগ নেতাই তরুণ এবং তারা ইসলামে নতুন দীক্ষিত হয়েছে। এই তো সেই দিন পর্যন্ত তারা ছিল বাথিস্ট- দায়েশে যারা জ্যেষ্ঠ, কিছু কাল আগেও তারা ছিল বাথিস্ট।
অবশ্য তারা বলবে, “ হে ভাইয়েরা, আল্লাহর তরবারি (খালিদ বিন ওয়ালিদ) রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে ছিলেন এবং তিনি ছিলেন জিহাদের দলনেতাদের মধ্যে অন্যতম। যদিও কিছুকাল আগেও তিনি কুরাইশদের পক্ষেরই যোদ্ধা ছিলেন।”
আমরা বলি, তিনি ইসলামে পুরোপুরি দীক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত এবং তার ইসলাম পরিপূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তিনি আল্লাহর তরবারির মর্যাদা লাভ করেন নি। এবং তার ব্যপারে স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (সাঃ) সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে, তিনি আল্লাহর কোষমুক্ত তরবারি।

এই তো সেই দিন তোমরা ছিলে বাথিস্ট যারা মুসলমানদের ওপর অত্যাচার করছিলে তাদেরকে হত্যা করছিলে আর আজকে তোমরা “খিলাফা রাষ্ট্রের” নেতা বনে গেছ। এটা কেমন খিলাফা??
আর যেমনটা আমি আপনাকে বলছিলাম, খিলাফার মূল লক্ষ্য হল মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করা; পরস্পরে বিভেদ সৃষ্টি করা নয়; সহজকরা এবং জটিল করা নয়; উৎসাহিত করা, নিরুৎসাহিত করা নয়। তারা ঠিক এর উল্টোটা করছে। অতএব এই ব্যপারটি শুধু নামের ব্যপার নয়, এটি বাস্তবিক প্রয়োগের সাথে সম্পৃক্ত।
আমি নিজেকে খিলাফা নাম দিলাম। অথচ এরপর খিলাফা প্রতিষ্ঠার জন্যে নেয়া সব পদক্ষেপকে ধ্বংস করে দিলাম...?
তারা তরুণদের অনুভূতির সাথে খেলা করছে, এ ব্যপারে কোন সন্দেহ নেই যে তরুণেরা তাদের প্রতারণার জালে আটকা পড়ে পৃথিবীর আনাচে কানাচে থেকে এসে তাদের সাথে যোগদান করছে। মুলত এদের কথাই মাথায় রেখে কিছু সময় আমি তাদের উদ্দেশ্যে নমনীয় বক্তব্য রেখেছিলাম এবং আমি বলেছিলাম যে আমি এই প্রতারিত হওয়া তরুণদের ব্যপারেই চিন্তিত।

এই কারণেই আমি বলি যে বাস্তবিক অর্থেই এরা জিহাদের এই আন্দলনকে বিনষ্ট করছে এবং এর ব্যাপক ক্ষতি সাধন করছে। এবং প্রায় প্রতিদিনই তারা আমাদের সামনে নতুন কোন বিদ'আ এনে হাজির করছে। তারা শুরু করেছিল জবাই দিয়ে এবং এখন আগুনে পোড়াচ্ছে।

আমি বলতে চাই যে বাস্তবিক অর্থেই এর সাথে ইসলামের কোন প্রকার সম্পর্ক নেই এবং এর সাথে সালাফি জিহাদি আন্দলোনেরও কোন সম্পর্ক নেই। এদের এই সকল দায় থেকে সালাফি জিহাদিরা মুক্ত।

এবং একজন মুজাহিদের মিথ্যাবাদী হওয়া কখনওই সম্ভব না। এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তারা আমার সাথে মিথ্যা বলেছিল এবং সব কাজ পিছিয়ে দিচ্ছিল আর এই শরয়ী সুবিধাটি নেয়ার ক্ষেত্রে যখন আমি তাদের সাথে যোগাযোগ করছিলাম, তারা আমার সাথে চাতুরতার আশ্রয় নিয়েছিল, তারা এমন ভান করছিল যে তারা এ ব্যাপারে অত্যন্ত আন্তরিক, অথচ আল্লাহর শপথ করে বলছি, তারা মোটেও আন্তরিক ছিল না।

আল্লাহর শপথ! তারা যে সাজিদার ব্যাপারে অবিবেচক ছিল এবং মোটেও আন্তরিক ছিল না তার বিস্তারিত তথ্য আমার কাছে রয়েছে, আমি চাইলেই তা উপস্থাপন করতে পারব। এবং শেষের দিকে, তারা এমন ভান করল যে তারা আন্তরিক অথচ ইতিমধ্যে তারা পাইলটকে হত্যা করে ফেলেছে এবং তারা মিথ্যা বলছিল।

প্রশ্নকর্তাঃ শাইখ মুহাম্মাদ এই সাক্ষাতকার শেষ করার আগে আপনি কি এর সাথে আর কিছু যোগ করতে চান?

শাইখ আল মাকদিসিঃ হ্যাঁ। আমাকে এই সাক্ষাতকারে আমন্ত্রণ জানানোর জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনার আমন্ত্রণ পেয়ে আমি সাথে সাথে তা গ্রহন করেছি কারণ এটা একটি জরডানিয়ান চ্যানেল এবং আমি চাই যে আমার এই কথাগুলো জরডানের সকল জনগণের কাছে পৌছে যাক। এর কারণ, তারা যেই চিত্রটি দেখেছে এবং যে সকল জিনিস তাদের চক্ষু গোচর হয়েছে... এর কারণেই তাদের পক্ষ থেকে বর্তমানে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সুতরাং তারা যেন এটা অনুধাবন করতে পারে যে, তানজিমুদ্দাওলা সালাফি জিহাদিদের প্রতিনিধিত্ব করে না এবং সালাফি জিহাদি আন্দোলন এদের কার্যকলাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

আমি নিশ্চিত করছি যে দুনিয়ার পূর্ব এবং পশ্চিমের মুজাহিদ, ফুকাহা এবং জিহাদের নেতাদের মধ্য থেকে সকল বিজ্ঞজন এই বন্দী বিনিময়ের ব্যাপারে অত্যন্ত আন্তরিক

ছিলেন এবং তারা আমাকে দাওলা সংগঠনটির সাথে যোগাযোগ করতে সহায়তা করেছিল কিন্তু দাওলা সেটি চায় নি। কারণ তারা অনেক আগেই পাইলটকে হত্যা করে ফেলেছিল এবং তারা যখন আমার সাথে যোগাযোগ করছিল তখন মিথ্যে বলছিল।

আর এ কারণেই আমি বলি যে, মানুষ এই দলটি দ্বারা প্রতারিত হচ্ছে এবং এর কারণ হল মুসলমানরা আকাঙ্ক্ষা করে বসে আছে একটি জিনিসের জন্যে যার নাম খিলাফা এবং ইসলামিক রাষ্ট্র। এবং দাওলা এই দুটি মহান পরিভাষা ব্যবহারে খুবই সিদ্ধহস্ত, যা বস্তুত প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরেই গেঁথে রয়েছে। তারা এটিকে ব্যবহার করছে তরুণদের প্রতারিত করতে যা মূলত বিদ্রুপ ছাড়া কিছুই নয়। এবং আমি আমার বক্তব্য শেষ করব একটি উদাহরণ দিয়ে।

যখন অন্ধকার প্রলম্বিত হয়... এবং নিঃসন্দেহে সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানরা এখন অন্ধকারে নিমজ্জিত এবং তাদের শত্রুদের দ্বারা তারা যুলুমে নিষ্পেষিত ...আর এই প্রলম্বিত অন্ধকার তৈরি করছে হতাশা... মানুষ অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করে আছে একটি নতুন ভোরের। এবং যে মানুষটির বসবাস অন্ধকারে সে যে কোন আলোক রশ্মি দেখলে তাকেই ভোরের আলো ভেবে ভুল করে।

এবং রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন যে, ভোর দুই রকম- মিথ্যে ভোর (সুব্*হে কাযিব) এবং সত্য ভোর (সুব্*হে সদিক)। আর মিথ্যে ভোরের সময় সালাত আদায় করা নিষেধ।

আর এই মানুষগুলো মনে করছে যে এরাই সুবহে সাদিক এবং তারা মনে করছে যে তারাই খিলাফা এবং তাই এরা তাদের সাথে যোগদান করছে।

এবং সূক্ষ্ম ভাবে বিবেচনা করলে তারা অনুধাবন করতে পারবে যে বাস্তবিকই এটা ফজরে সদিকান বা সত্য ভোর নয় বরং এটা ফজরে কাযিবান মিথ্যে ভোর,

এবং যারা সঠিক সময় উপনীত হওয়ার আগে কোন লক্ষ্য অর্জনে ব্যতিব্যস্ত হয়, শাস্তি হিসেবে তারা সেই লক্ষ্য হতে বঞ্চিত হয়।

আর আমরা এতটুকুও হতাশ নই এবং আমরা অপেক্ষা করছি সত্যিকারের সেই ভোরের যার আগমন ঘটবে আল্লাহ্* রাব্বুল আলামিনের নির্দেশে। কিন্তু এদের মত একরোখাদের মাধ্যমে নয়। বরং তাদের মাধ্যমে যারা রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর হাদিস সম্পর্কে অবগত এবং যারা এর সম্মান করতে জানে। এবং মানুষের বক্তব্যকে এর ওপরে প্রাধান্য দেয় না।

প্রশ্ন কর্তাঃ শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল মাকদিসি , সালাফি জিহাদি আন্দোলনের তাত্ত্বিক, এই সাক্ষাতকারে অংশগ্রহণ করার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সুত্রঃ Monthly Risalah Shaban 1436 A.H. (jun , 2014)

শাইখ আবু মুহাম্মদ আসিম আল-মাকদিসীর (আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন) লিখা "তাদের চক্ষুকে শীতল করা যারা প্রত্যেক ঘাঁটিস্থলে অবস্থান করছে" সিরিজের প্রথম প্রবন্ধ

"ইবাদত" এর ব্যাপারে নসীহত

(কারাগারের চার দেয়ালের মাঝে বন্দীরত অবস্থায় লিখিত এবং প্রিয় ভাইদের প্রতি স্মরণিকা, উপদেশ ও সমর্থন হিসেবে প্রেরিত)

লেখক: শাইখ আবু মুহাম্মদ আসিম আল-মাকদিসী

ইংরেজি অনুবাদ: আত-তিবইয়ান পাবলিকেশন্স (রবিউল আউয়াল, ১৪২৬)

বাংলা অনুবাদ: বালাকোট মিডিয়া (রবিউল আউয়াল, ১৪৩৫)

"আওরাক মিন দফতর সাজীন" এর ৬ষ্ঠ পত্র হতে গৃহীত

ইমাম ইবনুল কাইয়্যুম (রঃ) এর কিতাব **"আল ওয়াবিল আস সাইয়্যিব"** এবং **"ইগাসাত আল লাহফান"** এর কিছু বক্তব্যের ব্যাখ্যা স্বরূপ রচিত

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ

...মুশরিকদেরকে যেখানে পাও (বধ) হত্যা করো, তাদেরকে গ্রেফতার করো, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং প্রত্যেক ঘাঁটিস্থলে তাদের সন্ধানে অবস্থান করো...[১]

---

[১] সূরা তাওবা, আয়াত: ৫

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য এবং সালাম ও সালাত বর্ষিত হোক রাসূলুল্লাহ, তাঁর পরিবার ও তাঁর সাহাবীগণের প্রতি এবং যারা তাঁদেরকে বন্ধু হিসেবে নিয়েছেন তাদের প্রতি।

আমি আল্লাহ আল আলিয়্যুল কাদীর (মহাভিজাত্যে সমুন্নত, সর্বশক্তিমান) এর কাছে দোয়া করি যেন তিনি আপনাদেরকে তাদের দলভুক্ত করেন যাদের উপর অনুগ্রহ করা হলে তারা কৃতজ্ঞ থাকে, দুঃখ–কষ্টের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হলে যারা ধৈর্যের সাথে সহ্য করে এবং যারা মন্দকাজ করে ফেললে তাওবা করে।

অবশ্যই এই তিনটি বিষয় আল্লাহর বান্দাদের জন্য আনন্দ ও প্রশান্তির চাবিকাঠি এবং এগুলো দুনিয়া ও আখিরাতে সাফল্যের চিহ্নস্বরূপ।

আল্লাহর বান্দারা সব সময় এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে থাকে:

প্রথমত:

আল্লাহর অনুগ্রহসমূহ, যা তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি বর্ষণ করেন।

আর এজন্য বান্দার উপর যা অবধারিত তা হলো "শোকর" (ধন্যবাদপূর্ণতা, কৃতজ্ঞতা, স্বীকৃতি)। এবং এটা তিনটি ভিত্তির উপর স্থাপিত:

১। অন্তর থেকে অনুগ্রহসমূহ স্বীকার করা

২। প্রকাশ্যে এগুলোর ব্যাপারে কথা বলা

৩। যিনি এগুলোর অধিকারী এবং যিনি এগুলো প্রদান করেছেন তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য এগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করা[২]

---

[২] উলামাগণ "হামদ" (আল্লাহর প্রশংসা) ও "শোকর" (আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন) এর মাঝে পার্থক্য উল্লেখ করেছেন, আর তা হলো,

"হামদ" কথার মাধ্যমে হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكٌ فِى ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ وَلِىٌّ مِّنَ ٱلذُّلِّ ۖ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًۢا ﴿١١١﴾

বলো, প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি সন্তান গ্রহণ করেন নি, তাঁর সার্বভৌমত্বে কোনো অংশীদার নেই এবং যিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না, যে কারণে তাঁর অভিভাবকের প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং সম্ভ্রমে তাঁর মহত্ত্ব ঘোষণা করো। (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ১১১)

অন্যদিকে "শোকর" এর ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَعْمَلُونَ لَهُۥ مَا يَشَآءُ مِن مَّحَٰرِيبَ وَتَمَٰثِيلَ وَجِفَانٍ كَٱلْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَٰتٍ ۚ ٱعْمَلُوٓا۟ ءَالَ دَاوُۥدَ شُكْرًا ۚ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِىَ ٱلشَّكُورُ ﴿١٣﴾

হে দাঊদ পরিবার! কৃতজ্ঞতার সাথে তোমরা কাজ করতে থাকো। আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ। (সূরা সাবা, আয়াত: ১৩)

সুতরাং, আল্লাহর (দ্বীনের) জন্যই আল্লাহর দেয়া অনুগ্রহ ও নেয়ামত সমূহকে কাজে লাগানো হলো মহান প্রতিপালকের অনুগ্রহ ও উদারতার প্রতি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করা। আর সেগুলোকে আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে ব্যবহার না করে তার বিপরীতে আল্লাহর অবাধ্যতায় ব্যবহার করা হলো "কুফর" (অকৃতজ্ঞতা, অনুগ্রহসমূহকে অস্বীকার করা)।

আল্লাহ তাআলা সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে বলেন,

قَالَ ٱلَّذِى عِندَهُۥ عِلْمٌ مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ أَنَا۠ ءَاتِيكَ بِهِۦ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ۚ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُۥ قَالَ هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّى لِيَبْلُوَنِىٓ ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ۖ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّى غَنِىٌّ كَرِيمٌ ﴿٤٠﴾

সুলাইমান যখন ওটা সামনে রক্ষিত অবস্থায় দেখলেন তখন তিনি বললেন, "এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে পারেন, আমি কৃতজ্ঞ নাকি অকৃতজ্ঞ; যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে তা করে নিজের কল্যাণের জন্য এবং যে অকৃতজ্ঞ হয়, সে জেনে রাখুক যে, আমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, মহানুভব।" (সূরা নামল, আয়াত: ৪০)

এবং আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে বলেন,

إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٠﴾

شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ ۚ ٱجْتَبَىٰهُ وَهَدَىٰهُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٢١﴾

দ্বিতীয়ত:

দুঃখ-কষ্ট, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর বান্দাকে পরীক্ষা করেন।

এক্ষেত্রে যা আবশ্যক তা হলো "সবর" (ধৈর্য, সহিষ্ণুতা)। আর এটাও তিনটি মূলভিত্তির উপর স্থাপিত:

১। নিজ ভাগ্যে যা লিখা ছিল, তার ব্যাপারে অসন্তুষ্ট না হওয়া

২। অভিযোগ করা থেকে জিহ্বাকে সংযত রাখা

৩। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহর অবাধ্যতায় ব্যবহার না করা

তাই বান্দা যখন এই মূল বিষয়গুলো পালন করবে, তখন দুঃখ-কষ্ট তার জন্য সুমিষ্ট মধুর রূপ নেবে, কঠিন পরীক্ষা তখন রূপ নেবে আশীর্বাদে, আর অপ্রিয় বস্তু হয়ে যাবে প্রিয়।

এটা মনে রাখতে হবে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাকে ধ্বংস করার জন্য তাকে দুঃখ-কষ্টে আপতিত করেন না। বরং, তিনি তাকে এজন্য দুঃখ-কষ্টে আপতিত করেন যাতে তিনি তার "সবর" (ধৈর্য, সহিষ্ণুতা) ও "ইবাদত" (দাসত্ব, আনুগত্য, বন্দেগী) এর পরীক্ষা করতে পারেন।

নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিলেন (একাই) এক উম্মত, (একটি জাতির জীবন্ত প্রতীক) আল্লাহর অনুগত, একনিষ্ঠ এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তিনি ছিলেন আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞ; আল্লাহ তাঁকে মনোনীত করেছিলেন এবং তাঁকে পরিচালিত করেছিলেন সরল পথে। (সূরা নাহল: ১২০, ১২১)

আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও দাসত্ব বরণ করাই হলো শোকর, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

بَلِ ٱللَّهَ فَٱعْبُدْ وَكُن مِّنَ ٱلشَّٰكِرِينَ ﴿٦٦﴾

অতএব তুমি আল্লাহরই ইবাদত করো এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হও। (সূরা যুমার, আয়াত: ৬৬)

এবং আমাদের মহান প্রতিপালকের ওয়াদা,

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِى لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেন, তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক দিবো, আর তোমরা অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর। (সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ৭)

কারণ এটা স্পষ্ট যে, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ বান্দার ইবাদত দুই প্রকারের, দাররা (দুঃখ, দুর্দশা) এর সময় ইবাদত এবং সাররা (সুখ, সমৃদ্ধি) এর সময় ইবাদত।

যেসব বিষয়ে বান্দা অসন্তুষ্ট ও অতৃপ্ত সেখানেও অবশ্যই তাকে আল্লাহর প্রতি ইবাদত (দাসত্ব, আনুগত্য, বন্দেগী) পূর্ণমাত্রায় পালন করতে হবে, ঠিক যেমন তাকে তা পূর্ণ করতে হবে তার সন্তুষ্টি ও স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়ের ক্ষেত্রে।

কিন্তু অধিকাংশ মানুষ শুধুমাত্র সেসব বিষয়েই ইবাদত (দাসত্ব, আনুগত্য, বন্দেগী) পূর্ণ করে থাকে যেসব বিষয়ে তারা সন্তুষ্ট...... কিন্তু প্রকৃত পরীক্ষা হলো সেই সকল বিষয়ে পূর্ণ কৃতজ্ঞতার সাথে ইবাদত (দাসত্ব, আনুগত্য, বন্দেগী) পালন করা যেসব বিষয়ে সে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

প্রচন্ড গরমের সময় ঠান্ডা পানি দিয়ে ওযু করা - এটা ইবাদত,

এবং আপনার সুন্দরী স্ত্রীর সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রাখা - এটা ইবাদত,

এবং তার প্রয়োজন পূরণে খরচ করাও ইবাদত।

অপরদিকে... প্রচন্ড ঠান্ডার সময় ঠান্ডা পানি দিয়ে ওযু করা – সেটা ইবাদত,

এবং যখন নিজের নফসের আকাঙ্ক্ষা মনকে এমন নারীর প্রতি প্রলুব্ধ করে যে নারী তার জন্য বৈধ নয়, তখন – অবশ্যই মানুষের ভয়ে নয়, বরং আল্লাহকে ভয় করে – এমন কাজকে পরিত্যাগ করা, সেটা ইবাদত।

এবং নিজের অভাব ও দারিদ্রের সময় দরিদ্রকে দান করা – সেটা ইবাদত।

কিন্তু এই দুই ধরনের ইবাদতের মধ্যে পার্থক্য অনেক ব্যাপক। আর সেক্ষেত্রে, বান্দাদের একে অপরের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয় – আর এর দ্বারা তাদের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে তাদের মর্যাদা স্থির হয়।

আল্লাহর যে বান্দা উভয় অবস্থাতেই (স্বাচ্ছন্দ্য ও অস্বাচ্ছন্দ্য) আল্লাহর অধিকারসমূহ পূর্ণ করে, তবে সেই হলো এমন বান্দা যে আল্লাহর এই বাণীর সত্যতায় উপনীত হয়েছে,

أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ

আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন?...[৩]

আর আল্লাহ তখনই তাঁর বান্দার জন্য সম্পূর্ণরূপে যথেষ্ট হন যখন বান্দা পূর্ণ দাসত্ব, আনুগত্য ও বন্দেগী সহকারে তার রবের দরবারে হাজির হয়; আর বান্দার এই ইবাদত যদি পূর্ণতা লাভ না করে তাহলে আল্লাহর যথেষ্ট হওয়াও অপূর্ণ রয়ে যায়।

সুতরাং, কেউ যদি কল্যাণ লাভ করে তবে সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে; আর কেউ যদি কল্যাণ ব্যতীত অন্য কিছু লাভ করে তবে সে যেন এর জন্য নিজেকেই দোষী সাব্যস্ত করে।

আর এরাই হলো আল্লাহর সেই সকল বান্দা যাদের উপর তাদের শত্রুদের কোনো কর্তৃত্ব বিরাজ করতে পারে না। আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দেন (শয়তানের প্রতি),

إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنٌ

"নিশ্চয়ই আমার বান্দাদের উপর তোমার কোনো ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব থাকবে না..."[৪]

এবং আল্লাহ তাআলা তাঁর দ্বীন, তাঁর হিজ্‌ব (দল), এবং তাঁর আউলিয়াদের (যারা ইল্‌ম বা জ্ঞান এবং আমল বা কর্ম – উভয়ের সমন্বয়ে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে উঠে দাঁড়ায়) কে সাহায্য ও বিজয় প্রদানের অঙ্গীকার করেছেন।

---

[৩] সূরা যুমার, আয়াত: ৩৬

[৪] সূরা হিজর, আয়াত: ৪২

মহামর্যাদাবান আল্লাহ বলেন,

নিশ্চয়ই আমার বাহিনী অবশ্যই হবে বিজয়ী।[৫]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغۡلِبَنَّ أَنَا۠ وَرُسُلِيٓۚ

আল্লাহ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছেন: আমি এবং আমার রাসূল অবশ্যই বিজয়ী হবো।...[৬]

তিনি আরও বলেন,

وَٱلۡعَٰقِبَةُ لِلۡمُتَّقِينَ ١٢٨

...শুভ পরিণাম ও শেষ সাফল্য তো মুত্তাকী (যারা আল্লাহকে ভয় এবং আনুগত্য করে) বান্দাদের জন্যই।[৭]

কিন্তু, বান্দা এই ওয়াদায় তার অংশ পাবে তার ঈমান (আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআত অনুসারে যা হলো কথা এবং আমল বা কাজ) এবং তাকওয়া[৮] (আল্লাহর ভীতি ও তাঁর আনুগত্য) অনুসারে।

---

[৫] সূরা সাফ্‌ফাত, আয়াত: ১৭৩

[৬] সূরা মুজাদালাহ, আয়াত: ২১

[৭] সূরা আরাফ, আয়াত: ১২৮

[৮] মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا ٤

...আর আল্লাহকে যে ভয় করে আল্লাহ তার কাজ-কর্ম তার জন্য সহজ করে দিবেন। (সূরা তালাক, আয়াত: ৪)

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَأَنتُمُ ٱلۡأَعۡلَوۡنَ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ١٣٩

...যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তবে তোমরাই জয়ী হবে।[৯]

সুতরাং, বান্দা যে পরিমাণ ঈমান ধারণ করে সে অনুযায়ী শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে।

আল্লাহ আরও বলেন,

وَلِلَّهِ ٱلۡعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ

...সম্মান, ক্ষমতা ও গৌরব তো শুধুমাত্র আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের জন্যই...[১০]

তাই বান্দা যে পরিমাণ ঈমান অর্জন করে এবং তার সঠিক বাস্তবায়ন (আমলের ক্ষেত্রে) করে, সে অনুযায়ী সে "ইজ্জত" (সম্মান, ক্ষমতা ও গৌরব) লাভ করে।

সুতরাং, যদি সে "ইজ্জত" থেকে বঞ্চিত হয় – তাহলে এটা হলো তার কথা ও কাজে, প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে, ঈমানের সঠিক বাস্তবায়নে গাফলতির ফলাফল।

একইভাবে বান্দার নিরাপত্তা (অথবা ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকা) – এটাও তার ঈমান অনুসারে। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ ٱللَّهَ يُدَٰفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٖ كَفُورٍ ٣٨

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের পক্ষ হতে প্রতিহত করেন (তাদের দুশমন হতে)। তিনি কোনো বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না।"[১১]

---

[৯] সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৩৯

[১০] সূরা মুনাফিকূন, আয়াত: ৮

[১১] সূরা হাজ্জ, আয়াত: ৩৮

অনুরূপভাবে, বান্দার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট হয়ে যাওয়া, এটাও বান্দার ঈমানের স্তর অনুযায়ী নির্ধারিত হয়, আর আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسۡبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٦٤

হে নবী! তোমার জন্যে ও তোমার অনুসারী মুমিনদের জন্যে (সর্বক্ষেত্রে) আল্লাহই যথেষ্ট।[১২]

অর্থাৎ, আল্লাহ তাঁর নবীকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলছেন, আল্লাহই তোমার জন্য এবং তোমার অনুসারীদের জন্য যথেষ্ট, এখানে তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুসারীদের জন্য তিনি যথেষ্ট হওয়া – এটা রাসূলের প্রতি তাদের অনুসরণ এবং আল্লাহর প্রতি তাদের আত্মসমর্পণ ও আনুগত্যের বাস্তবায়নের দ্বারা নিরূপিত হয়। তাই যে এটা (আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য) পরিত্যাগ করে, সে এই আয়াতসমূহের ওয়াদা হতে ততটাই পিছিয়ে থাকবে।

আর এটাই হলো আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মাজহাব যেখানে ঈমানের বৃদ্ধি ও হ্রাস পাওয়া একটি বাস্তবতা। আর এভাবেই, বান্দার প্রতি আল্লাহর "ওয়ালাইয়াহ" (নিরাপত্তা ও সাহায্য) তার ঈমানের অবস্থা অনুযায়ী নির্ধারিত হয়।

মহামর্যাদাবান আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেছেন,

...আর আল্লাহ তাআলা বিশ্বাসীগণের ওয়ালী (রক্ষাকারী, সাহায্যকারী, অভিভাবক)।[১৩]

---

[১২] সূরা আনফাল, আয়াত: ৬৪

[১৩] সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৬৮

এই আয়াতের অর্থ অপর এক আয়াতের দ্বারা আরো স্পষ্ট হয়:

আর আল্লাহ তো মুত্তাকীদের বন্ধু। (সূরা জাসিয়াহ, আয়াত: ১৯)

এবং তিনি আরো বলেন,

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟

আল্লাহই হচ্ছেন মুমিনদের অভিভাবক...[১৪]

সুতরাং যেভাবে বান্দার ঈমান বাড়ে ও কমে – তার ঈমানের সেই অবস্থা অনুযায়ী তার জন্য আল্লাহর নিরাপত্তা এবং তাঁর বিশেষ "মাইয়াহ" (আল্লাহর ইলাহী বৈশিষ্ট্যের গুণে আপন বান্দার "সাথে থাকা" এবং বান্দাকে সাহায্য করা) প্রদান করা হয়।

একইভাবে বিজয় ও পরিপূর্ণ সাহায্য কেবলমাত্র বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ ঈমানের মানুষদের জন্যই প্রযোজ্য। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَٰدُ ﴿٥١﴾

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদের ও মুমিনদের সাহায্য করবো পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দন্ডায়মান হবে সেদিন।[১৫]

এবং তিনি আরও বলেন,

فَأَيَّدْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا۟ ظَٰهِرِينَ ﴿١٤﴾

...পরে আমি মুমিনদেরকে তাদের শত্রুদের মোকাবেলায় শক্তিশালী করলাম; ফলে তারা বিজয়ী হলো।[১৬]

সুতরাং, যার ঈমান হ্রাস পায়, একই অনুপাতে তার জন্য নির্ধারিত বিজয় ও সাহায্যের পরিমাণও হ্রাস পাবে।

---

[১৪] সূরা বাকারাহ, আয়াত: ২৫৭

[১৫] সূরা মুমিন, আয়াত: ৫১

[১৬] সূরা সাফ্‌ফ, আয়াত: ১৪

আর এটা এজন্য যে, যখন কোনো বান্দার উপরে বিপদ আপতিত হয়, হোক তা নিজের জীবনের উপর অথবা তার সম্পদের উপর অথবা শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হওয়া – এটা শুধুমাত্র আল্লাহর আদেশের প্রতি তার অবাধ্যতার কারণেই হয়ে থাকে, হতে পারে সে কোনো ওয়াজিব (বাধ্যতামূলক) পালন করে নি অথবা সে এমন কোনো কিছু করেছে যা হারাম (নিষিদ্ধ)। আর এটাই হলো ঈমানের হ্রাস পাওয়া।

আর কিছু মানুষ নিম্নোক্ত আয়াতটির ব্যাপারে ভুল বুঝেন,

وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَـٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

...এবং কখনোও আল্লাহ মুমিনদের প্রতিপক্ষে কাফেরদেরকে বিজয়ী করবেন না।[১৭]

কিছু মানুষ বলেন যে, আল্লাহ তাআলা আখিরাতে কাফেরদের পরাজিত করবেন; আবার কেউ কেউ বলেন যে, আল্লাহ তাদেরকে পরাজিত করবেন "হুজ্জাহ" (প্রমাণসমূহ) এর ক্ষেত্রে।

কিন্তু গবেষণা ও অনুসন্ধানের পর দেখা যায় যে, এই আয়াতও অন্যান্য আয়াতের মতোই স্পষ্ট; আর তা এই যে, নির্ভেজাল ঈমানের মানুষদেরকে কাফেররা কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না, তাদের উপর বিজয়ীও হতে পারবে না। এবং যদি বান্দাদের ঈমান দুর্বল হয়, তাহলে শত্রুরা সেই বান্দাদের উপর ততটাই কর্তৃত্ব লাভ করতে পারবে যতটা ঈমান বান্দারা হারিয়েছে। এভাবে বান্দা নিজেই আল্লাহর প্রতি তার আনুগত্যের কিছুটা কমতির কারণে শত্রুদের সামনে রাস্তা খুলে দেয়।

সুতরাং, প্রকৃত সত্য হলো এই যে, একজন ঈমানদার বান্দা সত্যিই সম্মানিত, বিজয়ী, সাহায্যপ্রাপ্ত, আল্লাহর অভিভাবকত্ব দ্বারা আচ্ছাদিত, বিপদ ও ক্ষয়-ক্ষতি হতে রক্ষাকৃত হয়, তা সে যেখানেই থাকুক না কেন – এমনকি যদি আল্লাহর শত্রুরা জলে, স্থলে ও আকাশে তার বিরুদ্ধে সমবেত হয় এরপরেও! - কিন্তু শর্ত হলো, এগুলো বান্দার জন্য ততক্ষণই প্রযোজ্য থাকবে যতক্ষণ সে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে ঈমানের সত্য রূপকে প্রতীয়মান করবে এবং ঈমানের দ্বারা যে সকল আমল বা কর্ম বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে সেগুলোর সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন করে যাবে।

---

[১৭] সূরা নিসা, আয়াত: ১৪১

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تَهِنُوا۟ وَلَا تَحْزَنُوا۟ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

আর তোমরা দুর্বল হয়ো না ও বিষণ্ন হয়ো না এবং যদি তোমরা ঈমানদার হও, তবে তোমরাই জয়ী হবে।[১৮]

এবং তিনি আরো বলেন,

وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ ﴿٣٥﴾

...তোমরাই বিজয়ী; আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন (আরশের উপর হতে পর্যবেক্ষণ ও সাহায্য করার দিক দিয়ে), তিনি তোমাদের কর্মফল কখনো বিনষ্ট করবেন না।[১৯]

সুতরাং, এটা হলো এক ওয়াদা যা কেবলমাত্র ঈমান ও সৎকর্মের দ্বারাই পরিপূর্ণ হয়। আর এটা (সৎকর্ম) হলো আল্লাহ তাআলার সৈন্যবাহিনীর[২০] মধ্য হতে একটি সৈন্য যার দ্বারা তিনি তাঁর

---

[১৮] সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৩৯

[১৯] সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ৩৫

[২০] মহামর্যাদাবান আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ

...তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন... (সূরা মুদ্দাস্‌সির, আয়াত: ৩১)

এবং তিনি আরো বলেন,

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ﴿٢﴾
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمْرِهِۦ ۚ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَىْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾

বান্দাদের পাহারা ও প্রতিরক্ষা প্রদান করেন[(২১)] এবং তা থেকে বিন্দুমাত্রও হ্রাস করেন না, তবে যদি তা বাতিল হয়ে যায় - যেমন কাফের ও মুনাফিকেরা তাদের কর্মসমূহকে ধ্বংস করেছে - তখন আর সেই পাহারা ও প্রতিরক্ষা থাকবে না। আর সম্মান, ক্ষমতা ও মর্যাদা শুধুমাত্র আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের জন্যই।

আর যখন আল্লাহর শত্রু, সেই অভিশপ্ত ইবলিশ জানতে পারলো যে, আল্লাহ স্বীয় বান্দাদেরকে তার ফাঁদে পড়তে দেবেন না, এমনকি তাদের উপর ইবলিশের কোনো কর্তৃত্বও দেবেন না, তখন ইবলিশ বললো,

---

...যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার পথ করে দেবেন। আর তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে দান করবেন রিযিক; যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, আল্লাহ তার উদ্দেশ্য পূরণ করবেনই, আল্লাহ সবকিছুর জন্যে স্থির করেছেন নির্দিষ্ট মাত্রা। (সূরা তালাক, আয়াত: ২, ৩)

[(২১)] যেমনটি হাদীসে বর্ণিত আছে, “আল্লাহর অধিকারসমূহ সংরক্ষণ করো (তার আদেশ মান্য করার মাধ্যমে), আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করবেন; আল্লাহর আধিকারসমূহ সংরক্ষণ করো, তুমি তাঁকে তোমার সামনে পাবে (তিনি তোমাকে পথ দেখাবেন)। যখন তুমি চাও, তখন আল্লাহর কাছেই চাও এবং যখন তুমি সাহায্য চাইবে, তখন তা আল্লাহর কাছেই চাইবে। কলম শুকিয়ে গেছে, (লিখার পর) যা হবার তা অবশ্যম্ভাবী। আর যদি সমগ্র মানবজাতি তোমার কোনো উপকার করতে চায় যা আল্লাহ লিখে রাখেন নি, তবে তারা তা করতে পারবে না; আর যদি তারা তোমার কোনো ক্ষতি করতে চায় যা আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রাখেন নি, তবে তারা তা করতে সক্ষম হবে না। আর জেনে রেখো, ধৈর্যের সাথে কোনো কিছু সহ্য করা যা তুমি অপছন্দ করো, সেখানে অনেক কল্যাণ আছে – এবং ‘নাসর’ (বিজয়) আছে ‘সবর’ (ধৈর্য) এর সাথে, ‘ফারাজ’ (স্বস্তি) আছে ‘কারব’ (যন্ত্রণা) এর সাথে, এবং অবশ্যই ‘উসর’ (কষ্ট) এর সাথেই রয়েছে ‘ইউসর’ (স্বস্তি)।” হাদীসটি জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম (১/৪৫৯) এ ইবনে রজব (রঃ) এর দ্বারা “হাসান জাইয়্যিদ” হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে। এবং অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, “...জেনে রাখো, সমস্ত মানুষ যদি তোমার কোনো উপকার করতে চায় তবে আল্লাহ তোমার জন্য যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তা ব্যতীত আর কোনো উপকারই তারা করতে পারবে না। আর যদি সমস্ত মানুষ তোমার কোনো অনিষ্ট করতে চায় তবে আল্লাহ তোমার জন্য যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তা ব্যতীত আর কোনো অনিষ্টই তারা করতে পারবে না। কলম তুলে নেয়া হয়েছে এবং পৃষ্ঠা শুকিয়ে গেছে।” হাদীসটি উল্লেখকৃত হয়েছে সহীহ তিরমিজী (২০৪৩) এ।

..."আপনার ইজ্জতের শপথ! আমি তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করবো, তবে তাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদেরকে নয়।"[২২]

সুতরাং, আল্লাহর নিষ্ঠাবান বান্দাদের উপর তাদের শত্রুদের কোনো আধিপত্য নেই, তা এ কারণে যে, তারা আল্লাহর আশ্রয়ে আছে, তারা আছে তাঁর পাহারা ও নিরাপত্তায়। আর যদি আল্লাহর শত্রুরা অলক্ষিত চোরের মতো কোনো এক বান্দার সন্নিকটে আসে – যেমন একটা চোর অসাবধান ব্যক্তি থেকে চুরি করে – তাহলে এটা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কারণ অবশ্যই প্রত্যেক বান্দাকেই পরীক্ষা করা হবে, আর তার রয়েছে অসাবধানতা, কামনা-বাসনা ও রাগ। আর ইবলিশ এই তিনটি দরজা দিয়েই প্রবেশ করবে। বান্দা যতই চেষ্টা করুক না কেন, সে এই অসাবধানতা, কামনা-বাসনা ও রাগ এড়িয়ে চলতে পারবে না।

অবশ্যই মানবজাতির পিতা আদম (আলাইহিস সালাম) ছিলেন সৃষ্টির মাঝে সবচেয়ে সহ্যশীল এবং সবচেয়ে জ্ঞানী এবং সর্বাপেক্ষা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তারপরও আল্লাহর শত্রু তাঁর (আলাইহিস সালাম) বিরুদ্ধে চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল, যতক্ষণ না তিনি (আলাইহিস সালাম) তাঁর কর্মের মধ্যে হোঁচট খান। তাহলে তাদের ব্যাপারে আপনি কি মনে করেন যাদের কামনা-বাসনা আরও অনেক প্রবল এবং যাদের বুদ্ধিমত্তা - পিতা আদম (আলাইহিস সালাম) এর তুলনায় - সমুদ্রের মাঝে এক বিন্দু পানির ন্যায়?

কিন্তু আল্লাহর শত্রুরা অলক্ষিত চোরের ন্যায় বান্দার অসাবধানতার সুযোগ নিয়ে প্রতারণামূলক পদ্ধতির ব্যবহার করা ব্যতীত কখনোই মুমিনদের প্রলুব্ধ করতে পারে না। আর ইবলিশ যদি তাকে এভাবে হোঁচট খাইয়ে ফেলে দেয়, তাহলে ইবলিশ মনে করে যে, সে তাকে আক্রমণ করে ধ্বংস করতে পেরেছে।

---

[২২] সূরা সোয়াদ, আয়াত: ৮২, ৮৩

কিন্তু আল্লাহর করুণা, তাঁর দয়া, তাঁর ক্ষমা ও তাঁর মার্জনা বান্দাকে পরিত্যাগ করে না, আর যদি আল্লাহ তাঁর বান্দার ভালো চান, তবে তিনি তার জন্য অনুশোচনা ও তাওবার দরজা খুলে দেন এবং তার হৃদয়কে বিনয়ে বিদীর্ণ[২৩] করে দেন, আর তখন সে বুঝবে আল্লাহকে তার কতই না প্রয়োজন, এবং সে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবে, একান্ত আন্তরিকভাবে আশ্রয় কামনা করবে এবং সর্বদা বিনয়ে অবনত হয়ে আল্লাহর কাছে চাইবে, কাকুতি-মিনতি করবে এবং যেকোনো উপায়ে সে প্রত্যেক সৎকর্মের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য কামনা করবে...... আর এভাবে বান্দা এরূপে আগাতে থাকবে যে, এক পর্যায়ে তার সেই কৃত পাপই তাকে আল্লাহর অনুগ্রহের দ্বারে পৌঁছে দিবে। আর সম্ভবতঃ আল্লাহর শত্রুরা বলবে, "হায়! আমার প্রতি ধিক্কার! আমি যদি তাকে ছেড়ে দিতাম এবং তাকে বিপথগামী না করতাম!" আর এটাই হলো তৃতীয় বিষয়।

তৃতীয়ত:

যখন সে পাপকাজ করে ফেলে, সে অনুতপ্ত হয় এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে।

আর এটাই হলো কিছু সলফে সালেহীনদের (আল্লাহ তাঁদের প্রতি রহম করুন) সেই কথার ব্যাখ্যা: "নিশ্চয়ই, আল্লাহর একজন বান্দা হয়তো একটি পাপকাজ করে ফেলে এবং পরবর্তীতে সেটার দ্বারাই সে জান্নাতের বাগিচাসমূহে প্রবেশ করে। অপরদিকে, হতে পারে কোনো বান্দা একটি সৎকাজ করে এবং সেটার দ্বারাই সে পরবর্তীতে জাহান্নামের অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয়।"

কিছু মানুষ তাঁদের (আল্লাহ তাঁদের প্রতি রহম করুন) জিজ্ঞেস করেন, "সেটা কিভাবে?"

তাঁরা (আল্লাহ তাঁদের প্রতি রহম করুন) উত্তর দেন, "কারণ সেই গুনাহের জন্য সেই বান্দার দুই চোখ আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন হতে বিরত হয় না। বরং সে একাকিত্বে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়, ভয়ে ও অনুশোচনায় তার প্রতিপালকের সামনে বিনয়াবনত হয়, লজ্জায় তার মাথা নত হয়ে যায়, তার রবের দরবারে তার অন্তর বিদীর্ণ হয়ে পড়ে...... এভাবে তার পাপকার্য এবং তার এই বিনীত

---

[২৩] সলফে সালেহীনদের (আল্লাহ তাঁদের উপর রহম করুন) অনেকেই বলতেন, "তুমি কত ক্ষুদ্র পরিমাণের অবাধ্য হয়েছো সেদিকে তাকিও না, বরং তুমি যার অবাধ্য হয়েছো তাঁর মহাশক্তিময় রাজকীয় ক্ষমতার দিকে তাকাও।"

অবস্থা তার অন্য বহু সৎকর্মের চেয়ে উত্তম প্রতিদান বয়ে আনে। আর এইসব বিনম্র অবস্থার মধ্য দিয়ে বান্দার অতিক্রম করা তার জন্য বয়ে আনে আনন্দ ও প্রশান্তি এবং সাফল্য...... আর অবশেষে তার এই গুনাহই তার জন্য এভাবে জান্নাতে যাবার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আবার হতে পারে কোনো বান্দা একটি সৎকাজ করলো, অতঃপর সে ঐ কাজটি নিয়ে গর্ববোধ করতে থাকলো এবং নিজের ব্যাপারে অহংকার করা শুরু করলো। এমনকি কাজটি দেখে সে বিস্ময়ে অভিভূত হলো ও তা নিয়ে সীমা অতিক্রম করলো। আর সে বলে বেড়ালো, 'আমি এটা করেছি, সেটা করেছি......', আর এভাবে তার মধ্যে জন্ম নেয় অহংকার, ঔদ্ধত্য এবং নিজেকে নিয়ে মুগ্ধতা। আর সে এটাকে বৃদ্ধি করতে থাকে যতক্ষণ না এটা তার ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।"

এখন যদি আল্লাহ এই "মিসকীন" (নগণ্য বান্দা) এর জন্য ভালো চান, তাহলে তিনি তাকে এমন দুর্ভোগ দিয়ে পরীক্ষা করবেন যার বোঝা সে বইতে পারবে না এবং সে নিজের দৃষ্টিতে নিজেকে হীন মনে করবে। কিন্তু যদি আল্লাহ তার জন্য ভালো ব্যতীত অন্য কিছু নির্ধারণ করেন, তাহলে তিনি তাকে তার নিজ অবস্থানেই ছেড়ে দেন এবং পরিত্যাগ করেন, আর সে নিজেকে নিয়ে গর্বে মত্ত থাকে – আর এটাই হলো সেই পরিত্যাগ যা তার ধ্বংস নিশ্চিত করে।

আর বাস্তবিকই "আরিফীন" ("যারা সতর্ক থাকেন" – কঠোর আত্মনিয়োগী উলামাগণ) ব্যক্তিদের ইজমা হলো, "তাওফীক" (সফলতা) হচ্ছে আল্লাহ কর্তৃক আপনাকে আপনার নিজ হাতে ছেড়ে না দেয়া; আর নিকৃষ্টতম পরিত্যাগ হচ্ছে তিনি (পরম করুণাময়) যখন আপনাকে আপনার হাতেই ছেড়ে দেন।

সুতরাং, আল্লাহ যার কল্যাণ চান তিনি তার জন্য বিনয়ের দরজা খুলে দেন, আর উপহার দেন এমন হৃদয় যা বিনম্র, যা সর্বদা তাঁরই আশ্রয়ের দিকে ফিরে আসে, এবং তাঁর কাছেই ক্ষমা ভিক্ষা করে, এবং সর্বদা তার নিজের দুর্বলতা, নিজের অজ্ঞতা ও সীমালঙ্ঘনের প্রতি সতর্ক থাকে, এবং

তার প্রতিপালকের সীমাহীন নেয়ামতসমূহকে স্মরণ করে এবং সেই সাথে স্মরণ করে তাঁর দয়া, অনুগ্রহ ও করুণার কথা[২৪] এবং সেগুলোর সাক্ষ্য প্রদান করে।

একজন "আরিফ" বান্দা এই দু'টোর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার দিকে অগ্রসর হয়, আর এই দু'টোর উভয়টি ছাড়া কখনোই আল্লাহর দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। আর যখন সে এদের একটি হারায়, তখন তার অবস্থা সেই পাখির সদৃশ হয়ে পড়ে যে তার একটি পাখা হারিয়েছে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (তাঁর উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক) বলেন, "আল্লাহর নেয়ামতসমূহকে পর্যবেক্ষণ (এবং সর্বদা স্মরণ) করার মাধ্যমে এবং নিজের অবাধ্যতা (এবং দুর্বলতা) সমূহের ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করার মাধ্যমে একজন 'আরিফ' বান্দা আল্লাহর দিকে অগ্রসর হয়।"

আর এটাই হলো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সেই বাণীর ব্যাখ্যা যা "সাইয়্যিদ আল ইসতেগফার" (ক্ষমা চাওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা) এ বর্ণিত হয়েছে,

"....আমি আমার প্রতি আপনার সকল নেয়ামতের স্বীকৃতি প্রদান করছি, এবং আমি আমার সকল গুনাহসমূহ আপনার নিকট স্বীকার করছি..."[২৫]

---

[২৪] মহামর্যাদাবান আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿٥٤﴾
فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ﴿٥٥﴾

মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতে ও নহরসমূহে। প্রকৃত সম্মানের আসনে, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর সান্নিধ্যে। (সূরা কামার, আয়াত: ৫৪, ৫৫)

[২৫] পূর্ণ দোয়াটি হাদীসে বর্ণিত আছে, "'সাইয়্যিদ আল ইসতেগফার' হলো, যখন বান্দা বলে, 'হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রতিপালক, তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোনো উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো আর আমি হচ্ছি তোমার বান্দা এবং আমি আমার সাধ্যমতো (তোমার প্রতি) আমার ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতিতে অঙ্গীকারবদ্ধ রয়েছি, আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট হতে তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করি, আমি আমার প্রতি তোমার সকল নেয়ামতের

সুতরাং, এটা হলো আল্লাহর নেয়ামতসমূহের সাক্ষ্য প্রদান এবং নিজের ভুল-ত্রুটি স্বীকার – এ দুয়ের সম্মিলন।

এভাবেই তাঁর নেয়ামতসমূহের সাক্ষ্য দেয়া এবং তাঁকে স্মরণ করার জন্য আবশ্যিক হলো, যিনি এই করুণা ও উদারতা করেছেন তাঁকে ভালোবাসা, তাঁর গুণকীর্তন ও কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করা।

আর নিজের পাপকর্মসমূহ ও কাজের মধ্যে ভুলভ্রান্তি স্বীকার করার জন্য দরকার বিনয়, নম্রতা ও সর্বদা স্বীয় প্রতিপালকের সাহায্য পাবার চেষ্টা করা, এবং প্রত্যেক মুহূর্তে তাঁরই দিকে অনুতাপের সাথে ফিরে যাওয়া; আর সর্বদা নিজেকে এমন মনে করা যেন সে নিজে কিছুই না...... কারণ একজন বান্দা আল্লাহর সবচাইতে নিকটতম যে দরজা দিয়ে তাঁর দিকে প্রবেশ করতে পারে তা হলো দরিদ্রতা ও অভাবগ্রস্ততা। তাই সে আল্লাহর দিকে প্রবেশ করার জন্য কোনো অবস্থা, মর্যাদা অথবা উপায় (ওয়াসীলাহ) দেখতে পায় না; বরং সে কেবলমাত্র দরিদ্রতা ও সম্পূর্ণ বিনম্রতার দরজা দিয়েই আল্লাহর দিকে প্রবেশ করে...... সে প্রবেশ করে অনুগত ভিখারীর ন্যায় যার হৃদয় বিনয়ে পরিপূর্ণ, আর এভাবে নম্রতা তার হৃদয়ের সবচাইতে গভীরতম স্থানে মজবুতভাবে গেঁথে যায় এবং এটা তাকে সর্বদিক থেকে পরিবেষ্টন করে রাখে, এবং সে নিজের পরিপূর্ণ দরিদ্রতা এবং তার অসীম ক্ষমাশীল প্রতিপালকের সাহায্য পাবার জন্য নিজের তীব্র ব্যাকুলতার সাক্ষ্য দেয়...... আর এভাবে সে উপলব্ধি করে যে, এক পলকের জন্যও যদি সে তার প্রতিপালকের আনুগত্য থেকে বিরত থাকে তাহলে সে ধ্বংসের মুখে পতিত হবে এবং তার এমন ক্ষতি হবে যা কখনোই পূরণ হবার নয়।

স্বীকৃতি প্রদান করছি, আর আমি আমার গুনাহ খাতা স্বীকার করছি। অতএব তুমি আমাকে মাফ করে দাও, নিশ্চয়ই তুমি ভিন্ন আর কেহই গুনাহসমূহের মার্জনাকারী নেই।'" রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই দোয়াটি সম্পর্কে বলেন, "যে ব্যক্তি নিশ্চিত বিশ্বাসের সাথে সকালে এই দোয়াটি পড়ে এবং সন্ধ্যার পূর্বে মারা যায়, সে জান্নাতীদের একজন হবে, আর যে ব্যক্তি নিশ্চিত বিশ্বাসের সাথে সন্ধ্যায় এই দোয়াটি পড়ে, সে সকাল আসার পূর্বে মারা গেলে জান্নাতীদের একজন হবে।" হাদীসটি উল্লেখকৃত হয়েছে বুখারী (৬৩০৬), আল বাগায়ী এর শরহ আস সুন্নাহ (৩/১০৯), ইবনে তাইমিয়ার মাজমু আল ফাতওয়া (৮/১১৪, ১১/৩৮৮) এ।

সুতরাং আল্লাহর নৈকট্যের লাভের জন্য পরম ইবাদত (দাসত্ব, আনুগত্য, বন্দেগী)[২৬] এর চেয়ে উত্তম কোনো রাস্তাই নেই। আর এই চিন্তার চেয়ে খারাপ প্রতিবন্ধক এই রাস্তায় আর কিছুই নেই, "আমি অমুক, আমি তমুক, আমি এটা করেছি, সেটা করেছি...... আমি পূর্বে অমুক ছিলাম, তমুক ছিলাম......"

তাই "ইবাদত" দু'টি মূলনীতির উপর স্থাপিত, আর এই দু'টিই তার মূলভিত্তি: পরম ভালোবাসা এবং পরিপূর্ণ বিনয়।

আর এই দু'টি মূলনীতি পূর্বের উল্লেখকৃত দু'টি স্তম্ভমূলের উপর দাঁড়িয়ে থাকে: আল্লাহর করুণা ও উদারতা সমূহ স্বীকার করে নেয়া – আর এটা জন্ম দেবে ভালোবাসার; এবং নিজের দুর্বলতা ও ত্রুটি সমূহ স্বীকার করে নেয়া – যা জন্ম দেয় বিনয়।

আর বান্দা যদি তার প্রতিপালকের দিকে তার যাত্রাপথ এই দু'টি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত করে – তাহলে তার শত্রুরা তার উপর বিজয়ী হতে পারবে না, শুধুমাত্র অপ্রত্যাশিত ধোঁকা ছাড়া...

আর আল্লাহ কত দ্রুতই না তাকে পথ দেখিয়ে ফিরিয়ে আনেন, এবং তাকে রক্ষা করেন, এবং তাঁর করুণার দ্বারা বান্দাকে সংশোধন করেন...

---

[২৬] হাদীসে বর্ণিত আছে,

"একদা ফেরেশতা জিবরীল (আলাইহিস সালাম) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বসলেন। তিনি আকাশের দিকে তাকালেন এবং একজন ফেরেশতাকে দেখতে পেলেন। সুতরাং জিবরীল (আলাইহিস সালাম) তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'এই ফেরেশতার সৃষ্টি হবার পর থেকে আজকের পূর্ব পর্যন্ত তা কখনোই অবতীর্ণ হয় নি।' সুতরাং যখন সেই ফেরেশতা অবতরণ করলেন, তিনি বললেন, 'হে মুহাম্মাদ! আমি আপনার প্রতিপালকের কাছ থেকে প্রেরিত হয়েছি (অনুসন্ধান করতে) যে, আপনি কোনটি হতে চান, একজন নবী ও রাজা নাকি একজন বান্দা ও রাসূল?' জিবরীল (আলাইহিস সালাম) তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'আপনার রবের প্রতি বিনীত হোন, হে মুহাম্মাদ!' আর এভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'না, বরং একজন বান্দা ও রাসূল।'" হাদীসটি উল্লেখকৃত হয়েছে আস সিলসিলাহ আস সহীহাহ্ (১০০২) এবং ইমাম আহমদের মুসনাদ (২/২৩১) এ।

শাইখ আবু মুহাম্মদ আসিম আল-মাকদিসী (আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন) রচিত

একটি মূল্যবান প্রবন্ধ

এই দ্বীনের মূল ভিত্তি হচ্ছে একটি পথপ্রদর্শনকারী কিতাব ও তার পক্ষাবলম্বনকারী একটি তরবারি

লেখক: শাইখ আবু মুহাম্মদ আসিম আল-মাকদিসী

পরিবেশনায়: বালাকোট মিডিয়া

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ وَرُسُلَهُۥ بِٱلْغَيْبِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও তুলাদন্ড, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি নাযিল করেছি লৌহ, যাতে রছে প্রচন্ড রণশক্তি এবং মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ। এটা এই জন্যে যে, আল্লাহ প্রকাশ করে দিবেন কে না দেখে তাঁকে ও তাঁর রাসূলগণকে সাহায্য করে। আল্লাহ মহাশক্তিময়, মহাপরাক্রমশালী।[১]

---

[১] সূরা হাদীদ, আয়াত: ২৫

জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এক হাতে একটি তরবারি ও অপর হাতে একটি কোরআন নিয়ে বলেছিলেন,

أمرنا رسول الله ﷺ أن نضرب بهذا (وأشار إلى السيف) من خرج عن هذا (وأشار إلى المصحف)

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে আদেশ করেছেন এটা দিয়ে আঘাত করতে (তিনি তাঁর হাতের তরবারির দিকে নির্দেশ করলেন), যে কেউই এটার থেকে বিচ্যুত হয়ে যায় (তিনি তাঁর হাতের কোরআনের দিকে নির্দেশ করলেন)।"[২]

আর আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও তুলাদন্ড, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে।...[৩]

তাই রাসূলগণ (আলাইহিমিস সালাম) ও কিতাবসমূহকে প্রেরণের উদ্দেশ্য হলো এই যে, মানবজাতি যেন আল্লাহ ও মানুষের যথাযথ অধিকার ন্যায়ের সাথে সমুন্নত রাখে।[৪]

আর আল্লাহর প্রধান অধিকারসমূহের একটি – যার জন্য তিনি সকল রাসূলগণ (আলাইহিমিস সালাম) ও কিতাবসমূহ প্রেরণ করেছেন – তা হলো এই যে, মানুষেরা যেন তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করে, যা হচ্ছে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একনিষ্ঠভাবে শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা। সকল নবী-রাসূলগণের (আলাইহিমিস সালাম) বার্তা ও আহবান এবং সকল কিতাব ও সহীফাসমূহ - যা প্রাসঙ্গিক নবী-রাসূলদের (আলাইহিমিস সালাম) নবুয়্যাতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁদের উপর নাযিল হয়েছে – সেখানে আল্লাহর এই অধিকারের বিষয়েই কথা এসেছে:

---

[২] মুসনাদে আহমদ

[৩] সূরা হাদীদ, আয়াত: ২৫

[৪] ফাতাওয়া শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (২৬৩/২৮)

- হয় তা হলো, আল্লাহর এই অধিকার আদায় করা ও প্রতিষ্ঠা করার একটি আহবান; অথবা তা হলো, মানুষদেরকে এর দিকে আহবান করা এবং এই পথে ধৈর্য ধারণের একটি আদেশ; অথবা তা হলো, এই অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জিহাদের প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং এই অনুযায়ী ভালোবাসা (ঈমানদারদের প্রতি) ও ঘৃণার (তাওহীদ প্রত্যাখ্যানকারী কাফের, মুশরিক, মুরতাদ লোকদের প্রতি) সম্পর্ক নির্ধারণ।

- অথবা তা হলো, সেই সকল মানুষদের ব্যাপারে সংবাদ প্রদান যারা তাওহীদের বিশ্বাস ধারণ করেছিল, ইসলামের বিজয় ছিনিয়ে এনেছিল এবং তাওহীদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জিহাদ করেছিল; এবং তা হলো, এই ধরনের ঈমানদার মানুষদের জন্য আল্লাহ যে পরম অনুগ্রহ ও জান্নাতের অনন্ত শান্তিময় জীবন নির্ধারণ করেছেন তার সুসংবাদ প্রদান।

- অথবা তা হলো, তাওহীদের সাথে সম্পূর্ণরূপে সাংঘর্ষিক বিষয়সমূহ ও শিরকের সাথে দায়মুক্তি ও শত্রুতার সম্পর্ক তৈরির আহবান, এবং এগুলো ও এগুলোর পক্ষাবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার আহবান, এবং এগুলোর সকল রূপ ও ধরনকে পৃথিবীর বুক থেকে সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলার আহবান।

- অথবা তা হলো, সেই সকল মানুষদের ব্যাপারে সংবাদ প্রদান যারা আল্লাহর এই অধিকারের বিরোধিতা করে এবং যারা তাওহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং যারা এই সকল লোকদের সমর্থন করে; এবং তা হলো, এই সকল লোকদের শেষ পরিণতি যে কতটা হতাশা, লাঞ্ছনা ও পরিতাপময় এবং আল্লাহ এই সকল অপরাধীদের জন্য যে চিরন্তন শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন সেই সংবাদ প্রদান।

আল্লাহর সকল কিতাবসমূহ এবং প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর সকল নবীর (আলাইহিমিস সালাম) বার্তা এই অধিকার প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে।

আর সুউচ্চ যে লক্ষ্যে মানবজাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা হচ্ছে এই মহান উদ্দেশ্য, যার জন্য রাসূলগণ (আলাইহিমিস সালাম) ও কিতাবসমূহ প্রেরিত হয়েছে।

এবং আল্লাহ তাআলা সূরা হাদীদে বলেন,

وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ وَرُسُلَهُۥ بِٱلْغَيْبِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

...আর আমি নাযিল করেছি লৌহ, যাতে রছে প্রচন্ড রণশক্তি এবং মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ। এটা এই জন্যে যে, আল্লাহ প্রকাশ করে দিবেন কে না দেখে তাঁকে ও তাঁর রাসূলগণকে সাহায্য করে। আল্লাহ মহাশক্তিময়, মহাপরাক্রমশালী।[৫]

তাই যে ব্যক্তি এই অধিকার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তদানুযায়ী কর্ম সম্পাদন করে না এবং রাসূলগণ (আলাইহিমিস সালাম) ও আল্লাহর দিকে আহবানকারীদের মুখের উপর তা প্রত্যাখ্যান করে, তাকে সংশোধন করতে হবে তরবারি দিয়ে।

আর এটাই সেই হাদীসের অর্থ যেখানে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “আমাকে কেয়ামতের আগ মুহূর্তে তরবারি সহকারে প্রেরণ করা হয়েছে যাতে কোনো শরীক সাব্যস্ত করা ব্যতীত শুধুমাত্র এক আল্লাহর ইবাদত করা হয় এবং আমার জীবিকার সংস্থান করা হয়েছে আমার বর্শার ছায়াতলে, আর যারা আমার নির্দেশ অমান্য করেছে তারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েছে, এবং যে যাদের অনুকরণ করে সে তাদেরই একজন!”[৬]

---

[৫] সূরা হাদীদ, আয়াত: ২৫

[৬] ইমাম আহমদ

সুতরাং, যে কেউই কিতাব (কোরআন শরীফ) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাকে লৌহ (যুদ্ধাস্ত্র) দ্বারা সংশোধন করা হয়, এবং এ কারণেই এই দ্বীনের মূল ভিত্তি নির্মিত হয়েছিল কোরআন ও তরবারির মাধ্যমে।[৭]

তাই সকল যুগের হক্ আলেমগণ (রহিমাহুমুল্লাহ) আল্লাহর এই অধিকারকেই তাঁদের দাওয়াতের কেন্দ্র ও তাঁদের বক্তব্যের মূল বিষয় বানিয়েছিলেন এবং একেই পরিমাপের মানদন্ড বানিয়েছিলেন এবং এর পরিসরেই পরিভ্রমণ করেছিলেন, এবং এর খাতিরেই বন্দী ও নিহত হয়েছিলেন এবং এর পতাকাতলেই যুদ্ধ করেছিলেন এবং লড়তে লড়তে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছিলেন।

এবং কোরআন ও সুন্নাতের আলোকে দলিল ও যুক্তির সমন্বয়ে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করার মহান দায়িত্ব তাঁদের উপরেই অর্পিত। এবং যে কেউই এর বিরুদ্ধে দাঁড়াবে ও তা প্রত্যাখ্যান করবে সেই তরবারির দ্বারা সংশোধিত হবে!

তাই যারাই এই দ্বীনের সত্যতা সম্পর্কে অবগত – এমনকি দ্বীনের শত্রুরাও, তারা এটা জানে যে, এর ভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ ও জিহাদ, দাওয়াত ও কিতাল, কোরআন ও যুদ্ধাস্ত্র, এবং তারা এটা ভালোভাবেই জানে যে, যদি তারা তা মেনে নিতে প্রত্যাখ্যান করে তবে দ্বীনের ধারালো ভাগ তাদের জন্য নির্ধারিত হবে এবং তা তাদের অপরাধ মিটিয়ে দিবে হোক তা কিছু সময় আগে অথবা পরে। তারা জানে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে ও তাদের অনুরূপদেরকে বধ করার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন, এবং তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইসলামের কঠোরতা নিয়েই অগ্রসর হয়েছিলেন যখন এমনকি তাঁর নিজ আত্মীয়, গোত্র ও মানুষেরাও তাঁর প্রদর্শিত পথ অনুসরণে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল, এবং তিনি তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য তা পূরণের পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন,
“তোমরা কি আমার কথা শুনবে, হে কুরাইশ? তাঁর শপথ যার হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, আমি তোমাদের প্রতি এসেছি জবাই সহকারে।”

---

[৭] আল ফাতাওয়া (২৬৪/২৮)

এবং এরপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা পূরণ করেছিলেন সর্বোত্তম উপায়ে, যখন আল্লাহ ইসলাম ও তার অনুসারীদেরকে তরবারির দ্বারা সম্মানিত করলেন।

এবং আমরা ইনশাআল্লাহ তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করছি এবং তাঁর পথেই অটল আছি, তাঁর সুন্নাতের উপর আমল করছি এবং তাঁর সাথে থেকেই যুদ্ধ করছি।

وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَٰتَلَ مَعَهُۥ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا۟ لِمَآ أَصَابَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا۟ وَمَا ٱسْتَكَانُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٤٦﴾

এবং নবীদের মধ্যে অনেকেই আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করেছেন এবং তাদের সাথে বড় সংখ্যায় যুদ্ধ করেছেন দ্বীনের শিক্ষায় শিক্ষিত জ্ঞানী ব্যক্তিগণ। কিন্তু আল্লাহর রাস্তায় তাদের উপর যা আপতিত হয়েছিল তাতে তারা মনোবল হারান নি, না তারা দুর্বল হয়েছিলেন আর না তারা অধঃপতিত হয়েছিলেন। এবং আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন।[৮]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, “দ্বীনের অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিগণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে থেকে যুদ্ধ করেছেন অথবা নিহত হয়েছেন – এর মানে এই নয় যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শুধুমাত্র তাঁদের সাথেই স্বয়ং থেকে যুদ্ধ করেছেন, বরং যারাই রাসূলের অনুসরণ করেছেন এবং দ্বীন ইসলামের জন্য লড়াই করেছেন তাঁরা বস্তুতঃ তাঁরই (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে থেকে যুদ্ধ করেছেন, এবং এটাই সেই আদর্শ যা সাহাবাগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) বুঝেছিলেন, কারণ তাঁদের অংশগ্রহণকৃত বৃহত্তম যুদ্ধগুলো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মৃত্যুর পরেই সংঘটিত হয়েছিল যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁরা শাম, মিশর, ইরাক, ইয়েমেন, আজাম, রোম, মরক্কো, ও পূর্বাঞ্চলের জমিনকে দ্বীন ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করেছিলেন। এবং এটাই ছিল সেই সময় যখন সাহবাগণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে থেকে নিহত হয়েছিলেন, কারণ তখন যারা যুদ্ধ

---

[৮] সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৪৬

করেছিলেন ও নিহত হয়েছিলেন তাঁরা আম্বিয়াদের (আলাইহিমিস সালাম) দ্বীনের জন্যই লড়াই করেছিলেন এবং এটি বিচারদিবসের আগ পর্যন্ত বিশ্বাসীদের জন্য একটি মহান গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে থেকেই দ্বীন ইসলামের জন্য যুদ্ধ করেছেন যদিও তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গত হয়েছিলেন। এবং তাঁরা এই আয়াতের অধীনে আসেন:

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ

মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং যারা তার সাথে আছেন...[৯]

এবং এই আয়াতের:

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ مَعَكُمْ

আর যারা ঈমান এনেছে পরবর্তী পর্যায়ে এবং ঘর-বাড়ি ছেড়েছে এবং তোমাদের সাথে সম্মিলিত হয়ে জিহাদ করেছে...[১০]

তাই যে ব্যক্তি তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনীত বিধানের আনুগত্য করে চলেছে তার জন্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে থাকার জন্য তাঁকে স্বচক্ষে দেখা বা প্রত্যক্ষ করা কোনো শর্ত নয়।"[১১]

তাই আমরা উচ্চস্বরে আমাদের শত্রুদেরকে আমাদের লক্ষ্য সম্পর্কে জানিয়ে দেই, এবং আমরা তাদেরকে অবহিত করি যে, যদি আমরা তা আজ পূরণ করতে অসমর্থ হই তার মানে এই নয় যে, আমরা তা আমাদের চিন্তা-চেতনা থেকে মুছে ফেলেছি, যেহেতু সেটা আমাদের জন্য কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় বা বৈধও নয়, তাই আমরা আল্লাহর কাছে দিন-রাত প্রার্থনা করি এবং সকাল-

---

[৯] সূরা ফাত্হ, আয়াত: ২৯

[১০] সূরা আনফাল, আয়াত: ৭৫

[১১] মাজমু আল ফাতাওয়া

সন্ধ্যায় প্রার্থনা করি যেন আমরা তাদের প্রত্যেকের গর্দান পর্যন্ত পৌঁছাতে পারি যারা তাঁর দ্বীনের দুশমন, এবং আমাদের প্রতিটি কর্ম ও নিঃশ্বাস এই কাজেরই প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এবং তারা সেটা ভালো করেই জানে এবং তারা সেই সকল আলেমদের ভ্রষ্টতার কথাও জানে যারা দুর্ভাগার মতো কোরআন থেকে তরবারিকে মুছে ফেলার ব্যর্থ চেষ্টা করে থাকে, তারা জানে দ্বীনের ব্যাপারে সেসব আলেমদের অজ্ঞতার কথা এবং জানে যে, আল্লাহর হুকুমসমূহ পালনের ব্যাপারে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং দ্বীনের ব্যাপারে তাদের কোনোই বুঝ নেই।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,
“দ্বীন ইসলাম হচ্ছে এমন যেখানে তরবারি কিতাবকে অনুসরণ করবে, তাই যদি কোরআন ও সুন্নাহ এর জ্ঞানের সন্ধান পাওয়া যায় এবং তরবারি তা অনুসরণ করতে থাকে তাহলে ইসলামের হুকুমসমূহ প্রতিষ্ঠিত হবে।”[১২]

এবং তিনি (রহিমাহুল্লাহ) আরও বলেছেন,
“তাই এই দ্বীনের মূল ভিত্তি হচ্ছে একটি পথপ্রদর্শনকারী কিতাব ও তার পক্ষাবলম্বনকারী একটি তরবারি, আর পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারী হিসেবে তোমাদের রবই যথেষ্ট।”

---

[১২] আল ফাতাওয়া (৩৯৩/২০)

শাইখ আবু মুহাম্মদ আসিম আল-মাকদিসী (আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন) রচিত "জিহাদ থেকে প্রাপ্ত সুফলসমূহ" রিসালাহ এর অংশবিশেষ

দ্বীনের স্বার্থে কি ধরনের কাজ করা উচিত? নিছক হালাল নাকি সর্বোত্তম হালাল? নিছক শরীয়তসম্মত নাকি সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত?

লেখক: আবু মুহাম্মদ আসিম আল-মাকদিসী

পরিবেশনায়: বালাকোট মিডিয়া

নিঃসন্দেহে, এই কোরআন পথ দেখায় সেই দিকে, যা সর্বাধিক সরল এবং সঠিক...[১]

---

[১] সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ৯

কারাগারে এক সাথী একবার আমাকে বললো যে, বেসামরিক এক আমেরিকান ব্যক্তিকে কিছু মুজাহিদীন হত্যা করে সেটি টেলিভিশন ও ইন্টারনেটে প্রচার করে দিয়েছে, যাতে পুরো বিশ্ববাসী তা দেখতে পায়। কিন্তু এর ফলে নিজেদেরকে মানবাধিকারের রক্ষক বলে দাবি করে আসা আমেরিকানরা আবু গারিব কারাগারে কি নৃশংস পাশবিকতা করে আসছে, তার উপর থেকে সকলের দৃষ্টি সরে গিয়ে পড়ে মুজাহিদীন ভাইদের এই অপারেশনের ওপর! আর তখন সেটা "গরম খবর" এ পরিণত হয়। এ ব্যাপারে আমার মতামত জানতে চাইলো কারাগারের সেই সঙ্গীটি। আমি জবাব দিলাম যে, আমি কখনোই এমন কাজকে সমর্থন করি না। যদিও আমি জানি যে, মুজাহিদীনরা যখন এই কাজটি করেছিল তখন তাদের মনে কেমন ঝড় বয়ে চলছিল। দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য তাদের মনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, ইসলামের শক্তি ও গৌরব পুনরুদ্ধারের প্রতি তাদের সযত্ন প্রচেষ্টা, উম্মাতের দুঃখ-কষ্টে তাদের আহত অন্তর থেকে ঝরে পড়া কান্না, এবং দুর্বল মুসলমানদের উপর শত্রুর বিষাক্ত মরণ থাবার প্রতি তাদের রাগ ও ক্ষোভ আমি উপলব্ধি করতে পারি। এসব কিছুর কারণে তারা এই খবরটি প্রচার করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা যা করেছে তা আমার পছন্দনীয় নয়, আর আমি মনে করি, তারা যদি এই কাজটি না করতো, আর যদি তারা তা প্রচার না করতো! (তাহলেই ভালো হতো!)

যে ব্যক্তি নিজেকে ইসলামী জিহাদী স্কুলের একজন শিক্ষার্থী মনে করে, তার দ্বারা এমন কাজ করা শোভা পায় না যার কারণে তাকে ভৎর্সনার শিকার হতে হবে। বরং তার তো এমন কাজে মনোনিবেশ করা উচিৎ যে কাজের মাধ্যমে জিহাদের পতাকা উত্তোলিত হবে, এবং তার সে সমস্ত কাজ থেকে দূরে থাকা দরকার যার ফলে এই পতাকার রং মলিন বা বিবর্ণ হতে পারে কিংবা যে কাজের ফলে শত্রুরা এর সুযোগ নিয়ে মুজাহিদীনদের উপর অপবাদ আরোপ করে সেই কাজকে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারে।

আমার সঙ্গী বিস্ময়ভরে বলে উঠলো, "আপনি আমাকে বড়ই বিস্মিত করলেন! কেন আপনি এসব কর্মকাণ্ডকে অপছন্দ করছেন! এগুলো কি ইসলামে হালাল নয়?"

আমি উত্তর দিলাম: হে আমার ভাই, আমি যখন বলি যে, আমি কোনো একটি বিষয় অপছন্দ করি, তখন এর জন্য সেই বিষয়টির শরীয়ত বিরোধী হওয়া অথবা বিবাদপূর্ণ হওয়া জরুরি নয়![২] মুসলমানদের মাঝে যে বিষয়ে ঐকমত্য আছে, তার চেয়ে প্রিয় আমার কাছে কিছুই হতে পারে না। কিন্তু জিহাদের ক্ষতি করবে কিংবা এর মর্যাদা হানি করবে এমন সবকিছু রুখে দিতে আমি বদ্ধপরিকর। বিশেষ করে এটি এমন একটি সময় যখন যুদ্ধ কেবল যুদ্ধেক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নেই, বরং মিডিয়াও এখন এ যুদ্ধে এক বিশাল ভূমিকা পালন করছে। সুতরাং ইসলামের দাওয়াত এবং জিহাদের জন্য সবচেয়ে উপকারী এবং যথাযথ পদ্ধতি বেছে নিতেই আমি এই অবস্থান গ্রহণ করেছি।

আমার লেখনী, বক্তৃতা ও ক্লাসে আমি বার বার আপনাকে এবং সবাইকে একটি কথা বলেছি - দায়ীগণ এবং মুজাহিদীনগণ যেভাবে করে চাইছেন, সেভাবে করে কখনোই উম্মাহ ও জিহাদের বিজয় ও উপকার সাধন করা সম্ভব নয়, যতদিন না তারা হালাল-হারামের খাঁচা থেকে বের হয়ে আসেন; আর তার বদলে হালাল বিষয়গুলোর মাঝে কোনটি সর্বাপেক্ষা বেশী উপকারী, কোনটি হালাল হওয়া সত্ত্বেও কৌশলগত দিক থেকে ক্ষতিকর, কোনটি সুবিধাজনক, কোনটি বেশী জোরালো, আর কোনটি সবচাইতে সঠিক, সে হিসেব করা শুরু না করেন।

---

[২] অর্থাৎ, একটি জিনিস কেবলমাত্র শরীয়ত বিরোধী হলেই সেটিকে অপছন্দ করতে হবে, আর সেটি শরীয়তে হালাল হলে সেটিকে অপছন্দ করা তো যাবেই না, বরং সেটি করতে হবে - বিষয়টি এমন নয়! একটি বিষয় ফরয হওয়া ও হালাল হওয়ার মাঝে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, নামাজ সকলেরই পড়তে হবে, কারণ তা পড়া ফরয ও বাধ্যতামূলক, কোনো মুসলমানের এই কথা বলার সুযোগ নেই যে, আমি নামাজ পড়বো না, কারণ আমি তা অপছন্দ করি। কিন্তু, মরুভূমির এক বিশেষ প্রজাতির সরীসৃপ খাওয়া হালাল হওয়া সত্ত্বেও কোনো মুসলমান এরূপ বলতে পারেন যে, আমি সেটা খাবো না, কারণ আমি তা অপছন্দ করি। কারণ সেই বিশেষ প্রজাতির সরীসৃপ খাওয়া হালাল মানেই এই নয় যে, তা খাওয়া আবশ্যক এবং তা অপছন্দ করা সম্পূর্ণ নিষেধ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ

নিঃসন্দেহে, এই কোরআন পথ দেখায় সেই দিকে, যা সর্বাধিক সরল এবং সঠিক...[৩]

আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরো বলেন,

وَٱتَّبِعُوٓا۟ أَحْسَنَ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم

আর তোমাদের রবের কাছ থেকে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ উত্তম বিষয়ের অনুসরণ করো... [৪]

অতএব, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সবচাইতে কল্যাণকর, উপকারী আর উত্তম কাজের অনুসরণ করারই নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥٓ

যারা মনোনিবেশ সহকারে কথা শুনে, অতঃপর যা উত্তম, তার অনুসরণ করে...[৫]

মুসলমান হিসেবে আমাদের তো কেবল কোনটি হালাল, আইনসিদ্ধ আর অনুমোদিত সেটি দেখলেই চলবে না; এগুলো সর্বজন স্বীকৃত, সকলেরই জানা। আর যে সব বিষয় হালাল সেগুলোর দ্বারাই আমাদেরকে দ্বীনের বিজয় আনতে হবে। আল্লাহর হাতে যা (দ্বীনের বিজয়) আছে তা আমরা আল্লাহর অবাধ্য হয়ে কখনোই পাবো না, আর আল্লাহর দ্বীন কোনোদিনও হারাম, কুফর বা শিরকের সাহায্যে বিজয়ী হবে না। দ্বীনের জন্য যারাই কাজ করতে চাইবে তাদের এই মৌলিক

---

[৩] সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ৯

[৪] সূরা যুমার, আয়াত: ৫৫

[৫] সূরা যুমার, আয়াত: ১৮

জ্ঞানটি থাকা চাই। দ্বীনের সাহায্যকারী ও মুজাহিদীনদের কাজের মূলনীতিই হলো হালালের মধ্যে থাকা ও হারাম পরিহার করা। সুতরাং কেবলমাত্র হালাল-হারামের ভিত্তিতে আমাদের প্রশ্ন তোলা উচিৎ নয়, বরঞ্চ যেমনটা আগেও বহুবার বলেছি, আমাদের বিবেচ্য বিষয় হবে, অনুমোদিত একাধিক হালাল পন্থার মাঝে কোনটি জিহাদের জন্য সর্বাপেক্ষা উপকারী, মুসলমানদের জন্য সবচাইতে বেশী কল্যাণকর, এবং শত্রুর সবচেয়ে বেশী ক্ষতিসাধনকারী।

যখন আমরা খাদ্য, পানীয়, জামা-কাপড় বা বিয়ের ব্যাপারে চিন্তা করি, তখন কিন্তু আমরা শুধু অনুমোদিত, শরীয়তসম্মত, আর হালাল - এতটুকু নিয়ে মোটেও খুশি থাকতে পারি না; বরং আমরা সবচেয়ে ভালো খাবার, পানীয়, পোশাক-আশাক, আর সবচেয়ে উত্তম নারীটিকেই নিজেদের জন্য বেছে নেই। কিন্তু যেই না দাওয়াত, জিহাদ বা দ্বীনের ক্ষেত্রে কথা ওঠে, তখন যেন সবকিছুই গ্রহণযোগ্য আর পছন্দনীয় হয়ে দাঁড়ায়; আর তা যদি হয় অনুমোদিত, ইসলামী শরীয়তসম্মত আর হালাল, তাহলে তো কথাই নেই, আরো চমৎকার ব্যাপার!

আচ্ছা, একটি উদাহরণ দেই, যে নারীটি পক্ষাঘাতগ্রস্ত, এক চোখে অন্ধ, আর পঙ্গু তাকে বিয়ে করা কি শরীয়তসম্মত নয়? নিঃসন্দেহে, এটি হালাল এবং শরীয়তসম্মত, তার উপর এমন নারীকে বিয়ে করার মাধ্যমে আপনি পুরস্কৃতও হবেন! তাহলে কেন আপনার অভিলাষ আর প্রাণপণ চেষ্টা থাকে এমন এক নারীকে বেছে নেয়ার যে নীরোগ ও স্বাস্থ্যবতী, শুধু তাই নয়, বরং তাকে হতে হবে সুন্দরী?

আমি একটি সত্য কাহিনী বলি, এ ঘটনাটি শুনে হয়তো এ বিষয়টির রুক্ষতা কিছুটা দূর হবে। আমাদের এক বসনিয়ান ভাই আমাকে জানালেন যে, কিছু আরবীয় তরুণ এক মুজাহিদ ভাইকে একটি ব্যাপারে খুব পীড়াপীড়ি করছে। তাদের সাথে যেন বসনিয়ার এতিম নারীদের বিয়ের ব্যবস্থা করে দেয়া হয় এই ছিল তাদের চাওয়া (উল্লেখ্য, বসনিয়ার নারীদের গায়ের রং ফর্সা হয়)। তাদের ভাষ্য, এতে করে নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। বসনিয়াতে কি পরিমাণ জুলুম-নির্যাতন, হত্যা আর ধর্ষণ চলছে সে কথাও বললো তারা। তারা তাদের অন্তরের গভীরের মমতা আর আগ্রহ ব্যক্ত করে তাদের অনুরোধ রাখার জন্য চাপাচাপি করতে থাকলো। সেই মুজাহিদ ভাই তাদেরকে কথা

দিলেন যে, কয়েকদিন পরে তিনি তাদের প্রস্তাবের জবাব দেবেন। কিন্তু তাদের চাপাচাপি আর থামে না, তো তিনি তাদেরকে বললেন, "আমি তোমাদের প্রস্তাব নিয়ে ভেবেছি, এবং তোমাদের মাঝে উম্মাতের কথা বিবেচনা, এবং নারীদের সম্ভ্রম রক্ষা করার যে মানসিকতা আছে তা আমি যারপরনাই শ্রদ্ধা করি। আমি আফ্রিকার উপমহাদেশের বহু দরিদ্র ও এতিম বোনদের কথা জানি, যেমন: ইথিওপিয়া আর সোমালিয়ার বোনেরা (এসব অঞ্চলের মানুষের গায়ের রং কালো)। আমি সর্বতো চেষ্টা করবো এই বোনগুলির সাথে তোমাদের বিয়ে করিয়ে দিতে যাতে করে তোমরা তাদেরকে নিরাপত্তা দিতে পারো, যেমনটি তোমরা চাও!" এর কিছুক্ষণ আগেই এই তরুণেরা কথা দিয়েছিল যে, তারা তাকে কিছুদিন পরে নিজেদের উত্তর জানাবে। কিন্তু সেই যে তারা গেলো, এই ভাই আর কোনোদিনও তাদের কাছ থেকে এ বিষয়ে কিছু শুনলেন না!

তো কেন তারা প্রস্থান করলো আর কোনোদিন ফিরে আসলো না? তিনি কি তাদেরকে একটি শরীয়তসম্মত, হালাল, উপরন্তু সওয়াব মিলবে এমন একটি প্রস্তাব দেন নি? এটি কি এ কারণে নয় যে, এ বিষয়গুলোতে আমরা নিজেদেরকে কেবল হালাল ও শরীয়তসম্মত জিনিসের মাঝেই সীমিত রাখি না, বরং যেটি আরো বেশী ভালো, সুন্দর ও মনোরম আমরা সেটি খুঁজি?

হে আমার ভাই! যখন আমরা খাদ্য, জামা-কাপড় আর বিয়ে নিয়ে ভাবছি, তখন আমরা সবচাইতে বিশুদ্ধ ও সর্বোৎকৃষ্ট মানের বস্তুগুলিই কেবল গ্রহণ করতে চাই, তাহলে দ্বীন, জিহাদ আর দাওয়াতের ক্ষেত্রে নিচুমানের কোনোকিছু গ্রহণ করা কিভাবে বোধগম্য হতে পারে? আল্লাহ তাআলা উম্মে নিদাল আল-ফিলিস্তিনিয়্যাহ কে রক্ষা করুন! তিনি ইহুদীদের দখলদারিত্ব চলাকালীন সময়ে তার ছেলে মাহমুদকে ফিলিস্তিনে প্রেরণ করেছিলেন। সে বুলেট বর্ষণ ও বোমা বিস্ফোরণ করে ইহুদীদের আস্তানায় ঢুকে পড়তে সক্ষম হয়, শিকারের উপর হামলা চালানোর উদ্দেশ্যে সেখানে সাত ঘণ্টার জন্য লুকিয়ে থাকে। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সে লড়াই করতে থাকে আর হত্যাকাণ্ড চালায়। ছেলে মারা যাবার পর মাকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তার একটি কথা ছিল এমন: "আমি ওকে ইহুদীদের দিকে পাথর খণ্ড ছুড়তে দেই নি, যেন তারা ওকে গুলি করে মেরে না ফেলে, যাতে ও আহত হয়ে না যায়, কেননা তেমনটা হলে ওর কাঁধে যে গুরুদায়িত্ব ছিল সেটা

ও কখনোই করতে পারতো না।” তিনি ছেলেকে বলতেন, “আমি চাই তুমি পাথর ছুড়ে মারার চেয়েও বড় কোনো কাজ করো।” আর তিনি বলেন, “আমার ছয় ছেলে আছে, যাদেরকে আমি আল্লাহর রাহে কোরবানি করতে প্রস্তুত করছি, তবে তা হতে হবে মাহমুদের মতো সম্মানজনক উদ্দেশ্যে...”

কবে আমাদের মুজাহিদীন তরুণরা পরিপক্কতা লাভ করবে এবং নিজেদের চিন্তাধারাকে এভাবে রূপ দিবে? কিংবা আরো মহান কিছু করার পরিকল্পনা করবে? আমাদের মুজাহিদীন ভাইদের শ্রম, সম্পদ আর আত্মত্যাগের তিন-চতুর্থাংশই আজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে - হয় তাদের অদূরদর্শিতার ফলে কিংবা তাদের নেতাদের অদূরদর্শিতার ফলে - যার কারণে দেখতে পাই যে, নিছক হালাল হবার অজুহাতে নিচুমানের কোনো কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে!

কবে আমরা কোনটি সবচাইতে উত্তম, কোনটি উম্মাতের জন্য সর্বাপেক্ষা কল্যাণকর আর কোনটি শত্রুর জন্য সর্বোচ্চ ক্ষতির কারণ, তার ভিত্তিতে আমাদের প্রচেষ্টা ও জিহাদকে পরিচালিত করবো?

কবে আমরা কেবল হালাল ও শরীয়তসম্মত হবার সীমা ছাপিয়ে আরো গভীরে দেখার চেষ্টা করবো? আর তাদের ভেতর থেকে সবচাইতে মহান, সম্মানজনক ও নিখাদ কাজটি বেছে নেবো, যা জিহাদের পতাকাকে সমুচ্চ করবে?

আমার এ কারাসঙ্গীটি কিছু সিনেমা হল আর মদের দোকান বিস্ফোরণের কারণে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত হয়েছে। এই সুদীর্ঘ সময় কারাবন্দী থেকে এবং কারাজীবনে জ্ঞান আহরণের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবার পরেও এখন পর্যন্ত তার চিন্তাধারা পরিপক্কতা লাভ করে নি, সে আগের মতোই রয়ে গেছে। আমি আমার সঙ্গীটির দিকে তাকিয়ে বললাম, তোমার যদি আমার কথা পছন্দ না হয়, আমার কথা যদি মানতে না চাও, তাহলে এক কাজ করো: কাল জেল থেকে ছাড়া পেলে, বের হয়ে আবারো সিনেমা হল আর মদের দোকান উড়িয়ে দিও। ঠিক আছে, তুমি এটাই করো। যেখানে আজকের মুসলমানেরা আরো বড় কিছু পেতে আগ্রহী, তারা বিশ্বের সবচেয়ে দাম্ভিক

পরাশক্তির বিরুদ্ধে লড়ে চলেছে, তাদের চাওয়া হলো একটি ইসলামী রাষ্ট্র, তারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বিশ্ব পরিচালনায় মুসলমানদের অবস্থান সুসংহত করতে এবং দুনিয়ার বুক থেকে কুফরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে। যখন তারা প্রত্যেক সচেতন ব্যক্তি আর মুজাহিদীনদের কাছ থেকে তাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা, শরীরের সবখানি রক্ত ঢেলে দেয়ার আশা করে, তখন তুমি এটাই করো। তুমি এই উচু মানের গন্তব্যে পৌঁছনোর জন্য কোনোকিছুতে অংশগ্রহণ না করে গুনাহগার মুসলমানগণ আর সাধারণ জনতার বিরুদ্ধে তোমার লড়াই অব্যাহত রাখো, সিনেমা হল উড়িয়ে দাও যেখানে জনসাধারণের নিয়মিত যাতায়াত। তোমার এই কাজ তো হালাল, শরীয়তসম্মত এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, তাই না...?! সে বললো, "না, আমি এ কাজ আর কখনো করবো না, কারণ এখন আমি বিষয়টা বুঝতে পেরেছি, আমিও মহৎ কিছুর আশা করি..."

আমি জবাব দিলাম: আমি তোমাকে যা বলেছি, তা যদি তুমি বুঝতে অপারগ হও, তাহলে তোমার জ্ঞান ও বুঝের আরো পরিপক্কতা দরকার। তুমি এখনো এ বিশ্বের চ্যালেঞ্জ, বাস্তবতা এবং উম্মাহ ও দ্বীনের কি প্রয়োজন তা বুঝতে পারো নি।

টেলিভিশন স্ক্রীনের সামনে কিছু আমেরিকান, যাদেরকে বর্তমান বিশ্বের ভাষায় "বেসামরিক" বলা হয়ে থাকে, তাদেরকে হত্যা করা হলো, তারপর ধড় থেকে মাথা আলাদা করে দেয়া হলো, যে কাজকে কিছু আলেম এক প্রকারের অঙ্গবিকৃতি হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন, চিন্তা করে দেখো, এ কাজটি টিভিতে প্রচার করার পর কি পরিমাণ শোরগোলটাই না বেঁধে গেলো?

আল্লাহর শত্রুরা, ভণ্ড আলেমের দল, আমেরিকা আর অত্যাচারী জালেমরা এই ঘটনার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে জিহাদের উপর অপবাদ প্রচারণা শুরু করেছে, মুজাহিদীনদের উপর মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে মুজাহিদীন ও তাদের নেতিবাচক কাজের প্রতি সাধারণ মুসলমানদেরকে, এবং বিশেষ করে ইরাকী মুসলমানদের মনকে একেবারে বিষিয়ে তুলেছে। এ কাজের দিকে বিশ্বের মনোযোগ আকর্ষণ করা এবং টিভিতে ফলাও করে সম্প্রচার করা নিশ্চিতভাবে কোনো উপকার বয়ে আনে নি। আমার বিশ্বাস, যারাই এ কাজটি করেছে, তারা সঠিক সিদ্ধান্ত নেয় নি। যদি কেউ আজকে আল্লাহর শত্রুর মাথা উড়িয়ে দিতে চায়, তাহলে তাকে প্রথমেই আজকের বিশ্বে চলমান যুদ্ধের

গতিপ্রকৃতি, মাধ্যম ও অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে মনোনিবেশ করতে হবে। তাকে বুঝতে হবে, আজকের যুদ্ধ কেবল একটি ছুরির ওপর ভর করে চলছে না, যা দিয়ে সে সেই আমেরিকানের মাথা কেটে ফেলেছিল। জিহাদ বোঝার সামর্থ্য ছুরির আকার ও মাপের ওপর নির্ভর করে না, বরং জিহাদ নির্ভর করে জিহাদের মাধ্যম, মিডিয়া, জনমত, মানুষের সমর্থন এবং সঠিক ধাপ বেছে নেয়ার পরিপক্কতার উপর। কিছু সময় আছে যখন অন্যদের কথা ভেবে কিছু কাজ পরিহার করতে হবে, কখনো বা একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি বিশেষ কাজ করার ব্যাপারে প্রাধান্য দিতে হবে, কখনো আবার নিজেদের কাজ সর্বসমক্ষে প্রচার করতে হবে যদি দেখা যায় এ কাজের পরিষ্কার কার্যকারিতা আছে, এবং এর থেকে কোনো বিবাদ বা বিপরীত প্রতিক্রিয়ার কোনো সুযোগ নেই। যদি তারা এমনটি করতে পারে, তাহলে তাদের নিজেদের মিডিয়া, এমনকি শত্রুর মিডিয়াও তাদের পক্ষ হয়ে কাজ করতে বাধ্য হবে, কেননা তারা তখন মিডিয়াকে সেভাবে পরিচালিত করতে পারবে যেভাবে তারা চায়। শত্রুরা তখন আর তাদের ইচ্ছামত মিডিয়া পরিচালনা করতে পারবে না, কারণ তারা মুজাহিদীনদের কোনো ভুলের সুযোগ নিয়ে নিজেদের নোংরা স্বার্থ হাসিল করবে - এমন কোনো সুযোগ তাদেরকে দেয়া হবে না। ইসলামী জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য, তবে শুধু ইসলামী জ্ঞানের সাহায্যে কেউ এসব লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে না। এই বিষয়গুলো সফলভাবে সম্পাদন করতে হলে বাস্তবতা বুঝতে হবে, শত্রু ও তাদের ষড়যন্ত্রকে বিচক্ষণতার সাথে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। উম্মাতের পরিস্থিতি বিবেচনা করে দেখতে হবে যে, কোনটি এখন সবচাইতে বড় সমস্যা, আর কি এখন উম্মাতের জন্য সবচেয়ে বেশী দরকার।

তুমি যদি আমাকে বলো, "হে শাইখ, আপনি তো আমাদের আশার উপর পর্দা ফেলে দিলেন, বৃহৎ পরিসরকে সঙ্কুচিত করে দিলেন! আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বন্দীদেরকে হত্যা করেছেন, বনু কুরায়যার অধিকাংশ জনগণকে মেরে ফেলেছেন, আর তাঁর কাজই আমাদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ!" আমি তাহলে জবাব দেব, হ্যাঁ, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ই আমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ এতে কোনো সন্দেহ নেই, তবে তোমরা যদি এ আদর্শকে একটু বুঝতে, নিরীক্ষণ করতে, গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে, তাহলে তোমরা মহাসাফল্য অর্জন করতে।

এ কারণেই যে সব উলামা এই মহান আদর্শ নিয়ে ভালোভাবে গবেষণা করেছেন, তারা বলেছেন যে, যুদ্ধবন্দীদের সাথে কি ব্যবস্থা নেয়া হবে তা ইমামের ইচ্ছা, তিনি চাইলে দয়াপরবশ হয়ে তাদের ছেড়ে দিতে পারেন, তাদের থেকে মুক্তিপণ নিতে পারেন, মুসলমান কারাবন্দীদের বিনিময়ে তাদেরকে মুক্তি দিতে পারেন, হত্যা করতে পারেন কিংবা তাদের ধর্ম, ইসলামের সাথে তাদের শত্রুতা কতখানি সেই ভিত্তিতে যা ভালো মনে হয় সেটাই করতে পারেন।

এই উলামাদের মতে, তার প্রতি গৃহীত ব্যবস্থার ভিত্তি হতে হবে "ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য কোনটি সবচেয়ে বেশী কল্যাণকর ও উত্তম" সে কথা বিবেচনা করে। উলামাগণ আমাদেরকে এ ব্যাপারেই নির্দেশ দিচ্ছেন, যেটি সবচেয়ে উপযুক্ত ও কার্যকর তা করতে হবে, আর আমিও এ কথারই পুনরাবৃত্তি করছি। মুজাহিদীনদেরকে আমরা জিহাদের প্রতিটি ক্ষেত্রে সবচেয়ে উত্তম পথ গ্রহণ করার আহবান জানাচ্ছি!

তুমি যদি যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবন নিরীক্ষণ করে দেখো, তাহলে দেখতে পাবে যে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সবার ক্ষেত্রে এক নীতি গ্রহণ করেন নি, কখনো তিনি তাদের উপর দয়া দেখিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন, যেমনটি হয়েছে সুমামা বিন ইসালের ক্ষেত্রে, কখনো তিনি তাদের কাছ থেকে মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন, কখনো বা শিক্ষামূলক নজির স্থাপনের উদ্দেশ্যে তাদের মেরে ফেলেছেন। প্রতিশোধ বা অন্য কোনো কারণেও তিনি যুদ্ধবন্দীদের হত্যা করেছেন, যেমনটা করা হয়েছে উরাইনাহ গোত্রের লোকদের সাথে যারা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল, তারা রাখালদের হত্যা করে তাদের চোখ উপড়ে ফেলতো, তাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাদের উপর একইভাবে প্রতিশোধ নেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাবার গিলাফ ধরে ঝুলে থাকা এক কাফেরকে হত্যার নির্দেশ দেন, আর তার মৃত্যুর খবর মক্কার নেতাদের নিকট পৌঁছে দেয়া হয়, যেন প্রত্যেক ব্যক্তি ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার, কিংবা ইসলাম ও মুসলমানদেরকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করার পরিণতি সম্পর্কে জানতে পারে। কিন্তু এসব উদাহরণের কোথাও এমন দেখা যায় না যে, তিনি যুদ্ধবন্দীদের সকলকে শুধুমাত্র হত্যাই করছেন। বরং যারা

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর দ্বীনের বিরুদ্ধে শত্রুতায় সবচাইতে কঠোর ছিল তাদের প্রতিই সবচেয়ে কঠোর ব্যবস্থা হেকমতের সাথে গ্রহণ করা হয়েছিল।

আবদুল উযযা, বা আব্দুল্লাহ ইবনে খতাল, যাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাবার দেয়াল ধরে ঝুলন্ত থাকা অবস্থায় হত্যা করেন, তারা ছিল এমন এক গোত্রের লোক, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা বিজয়ের দিনেই যাদের রক্ত হালাল বলে ঘোষণা দেন। অন্য সকল কাফেরদের মধ্যে তাদের ব্যাপারেই কেবল এই ঘোষণা দেয়ার কারণ ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি তাদের তীব্র শত্রুতা, প্রচণ্ড বিরোধিতা এবং চরম বিদ্রূপাত্মক আক্রমণ। আব্দুল্লাহ ইবনে খতাল ইসলাম গ্রহণ করার পর, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে একজন আনসারের সাথে একটি অভিযানে প্রেরণ করেছিলেন, লোকটি আনসার ব্যক্তিটিকে হত্যা করে এবং মুরতাদ হয়ে যায়। এই আবদুল্লাহ ইবনে খতাল আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে নিয়ে বিদ্রূপমূলক কথাবার্তা বলতো, মুশরিকদের সামনে তার দু'জন বাদী গায়িকাকে দিয়ে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে কেন্দ্র করে ব্যঙ্গাত্মক গান শোনাতো। তাই বন্দীত্বের সময় নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার একজন গায়িকা সহ তাকে হত্যা করেন। এরূপ আরেকটি উদাহরণ হলো, মুকাইস বিন সাবাবাহ নামের এক লোককে হত্যা করা হয়, যে ইসলাম গ্রহণের পরে মুরতাদ হয়ে যায়, মুসলমানদের হত্যা করে, মুশরিকদেরকে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নামে মিথ্যা অপবাদ রটাতে এবং তাঁর বিরুদ্ধে উগ্রভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করতে সাহায্য করে।

সুতরাং, সেই অপরাধগুলোর কথা গভীরভাবে চিন্তা করে দেখো যেগুলোর জন্য তিনি বন্দীদেরকে মেরে ফেলেছিলেন, আর তার সাথে তুলনা করো মক্কার জনপদের, যাদেরকে তিনি নিরাপত্তা দান করেছিলেন। যাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল সে লোকগুলো ইসলাম ত্যাগ, খুন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ, শত্রুতা এবং অপবাদ রটানোর মতো মারাত্মক সব অপরাধ করেছিল। যেহেতু মক্কা বিজয়ের পর সকল মুশরিক বন্দীদের মধ্য থেকে কেবল এই

লোকগুলোকেই হত্যা করা হয়েছিল, তাই শাইখুল ইসলাম এ থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে অবমাননা করা হলে তাকে হত্যা করা ফরয।

কিন্তু তারপরও, যদি এমন অপরাধী কোনো ব্যক্তি তার গোত্র থেকে পালিয়ে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে, আর তাকে নিরাপত্তা দেয়া হয়, তাহলে তাকে ক্ষমা করে দিতে হবে। হাব্বার বিন আল-আসওয়াদের ক্ষেত্রে এমনটি হয়েছিল; সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কন্যা যায়নাব (রাদিয়াল্লাহু আনহা) কে হিজরতের সময় আক্রমণ করেছিল, সে যায়নাব (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এর উটে আঘাত করতে থাকে, ফলে তিনি একটি পাথরের উপর পড়ে যান। সে সময় তিনি ছিলেন গর্ভবতী, তার গর্ভপাত ঘটে। এছাড়া আরো উদাহরণ আছে। যেমন: ইকরিমাহ বিন আবু জাহল ও কায়নাহ বিন খাতালসহ আরো অনেককে ক্ষমা করে দেয়া হয়।

শুধুমাত্র যে দু'জন যোদ্ধা সৈনিককে বন্দীত্বের সময় হত্যা করা হয় তাদের নাম যথাক্রমে আল-নাদর বিন আল-হারিস, যে কথায় ও কাজে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে অপমান ও তাঁর ক্ষতি করতো, এবং উকবা বিন আবু মুঈত, যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবীদের মারাত্মক ক্ষতি ও নির্যাতন করেই ক্ষান্ত হয় নি, উপরন্তু কোরআন ও নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামে মিথ্যাচার, তাঁর ক্ষতি করা, তাঁকে গলায় কাপড় পেঁচিয়ে হত্যার চেষ্টা, সিজদারত অবস্থায় তাঁর পিঠে উটের নাড়িভুঁড়ি ফেলে দেয়া - এসব জঘন্য কাজ করেছে। তাই আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সব বন্দীর মধ্য থেকে কেবল এ দু'জনকে হত্যা করেন।

বনু কুরাইযার ব্যাপারে ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) এর আল-যাদ গ্রন্থে বলা হয়েছে, ইহুদীদের মাঝে আল্লাহর সাথে কুফরী ও আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিরুদ্ধে শত্রুতায় সবচেয়ে প্রবল ছিল তারা। আর এজন্যই তাদের সাথে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন তা অন্য কোনো ইহুদী গোত্রের সাথে করা হয় নি, যেমন বনু কায়নুকা ও নাযির গোত্র।

সহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন তারা (বনু কুরাইযা গোত্রের ইহুদীরা) নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে চুক্তি ভঙ্গ করে কুরাইশদের কাফেরদেরকে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিরোধিতায় সহায়তা করেছে, আর তাদেরকে গাতাফান গোত্রের সাথে মিলে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সাহায্য করেছে, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের যোদ্ধাদেরকে হত্যা করেছেন, এর আগে নয়। আহযাবের যুদ্ধ সংঘটিত হবার পেছনে একটি কারণ ছিল এই গোত্রের ইহুদীরা। সুতরাং, সব ইহুদী গোত্রের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বনু কুরায়যার সাথে আলাদাভাবে বোঝাপড়া করবেন এটাই স্বাভাবিক। আর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেটাই করেছেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও, তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গভীর প্রজ্ঞা এবং সাহাবীদের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) কথা বিবেচনা করে তিনি নিজে থেকে তাদেরকে হত্যা করার বিধান দেন নি, কেননা আনসারদের মাঝে নতুন ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীরা এতে করে খারাপ ধারণা করতে পারেন। বরং তিনি আউস গোত্রে তাদের যে মিত্রেরা ছিল, এমনকি স্বয়ং বনু কুরাইযা গোত্রের ইহুদীদেরকেই এ রায় দিতে বললেন। আর ইহুদীরা তো সাদ বিন মুআয (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর ঘোষিত যেকোনো রায় মেনে নেয়ার ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল, তাই তিনিই (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এ রায় দিলেন যে, তাদের যোদ্ধাদেরকে হত্যা করতে হবে। নিরীক্ষণ করে আমরা দেখি যে, এমন একটি বর্ণনাও নেই যেখানে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সৈনিক যোদ্ধা ব্যতীত অন্য কাউকে বন্দীত্বের সময় হত্যা করেছেন বা সাম্প্রতিক ভাষায় যাদের "বেসামরিক" ব্যক্তি বলা হয় এমন কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করেছেন। সত্যি বলতে, যোদ্ধাদের মাঝেও তিনি কেবল তাদেরকে হত্যা করেছেন যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুফর, শত্রুতা, যুদ্ধ, অবমাননা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে ছিল সবচাইতে প্রখর। নিঃসন্দেহে, এভাবে একজন মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তির মাধ্যমে এ রায় দেয়ার সিদ্ধান্তটি ছিল অত্যন্ত সুচিন্তিত। শুধুমাত্র হালাল ও অনুমোদিত বিষয়ের সীমা ছাপিয়ে কোনটি ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য সর্বোত্তম এবং কিভাবে আল্লাহর শত্রুদের সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করা যায় তা এখানে বিবেচনা করা হয়েছে। এভাবেই তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইসলাম ও তাঁর সাথে সবচাইতে শত্রুতা পোষণকারী প্রত্যেক শত্রুকে উপযুক্ত শিক্ষা দিলেন; যারা

আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হলেন যেন তারা চুক্তি মানার ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত থাকে, এবং চুক্তির সীমালঙ্ঘন করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও শত্রুতা শুরু না করার ব্যাপারে তাদেরকে বাধ্য করলেন। এছাড়াও এর আরো অনেক কার্যকারিতা ছিল। মধ্যস্থতাকারী সাদ বিন মুআয (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এক্ষেত্রে সবচেয়ে হিংস্র শত্রুর বিরুদ্ধে সবচাইতে তীব্র ও ক্ষতিকর পন্থাটিই বেছে নিয়েছেন, এবং তাদের সাথে অন্যান্য কাফের, এমনকি যোদ্ধাদেরকেও একই কাতারে ফেলেন নি। এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা দরকার, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোনো মৃতদেহকে বিকৃত করেন নি, বরং তা করতে নিষেধ করেছেন। এমনকি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চোখের সামনে যে লোক তাঁর চাচা হামজা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর অঙ্গবিকৃত করছে, সেই মুশরিক লোকের দেহ বিকৃত করা থেকে পর্যন্ত তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেকে বিরত রাখলেন। যদিও অনুরূপ প্রতিশোধ গ্রহণ করা অনুমোদিত, শরীয়তসম্মত, তা সত্ত্বেও তিনি উম্মাহকে শিখিয়েছেন যে, জিহাদ এবং অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উপকারী, উত্তম ও পরিপূর্ণ পদ্ধতি বেছে নিতে হবে, যেমনটি আল্লাহ তাআলা তাঁকে করতে বলেছেন,

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا۟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ

আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করো, তবে ঐ পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, যে পরিমাণ তোমাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়েছিল...[৬]

আল্লাহ তাআলা এরপর তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো উত্তম বিষয়ের দিকে পরিচালিত করে তাঁর বক্তব্যের সমাপ্তি টানেন,

وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّٰبِرِينَ ﴿١٢٦﴾

...কিন্তু যদি তুমি সবর করো, তবে তা সবরকারীদের জন্য আরো উত্তম।[৭]

---

[৬] সূরা নাহল, আয়াত: ১২৬

[৭] সূরা নাহল, আয়াত: ১২৬

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরো বলেন,

وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَاۖ

আর মন্দের প্রতিফল তার অনুরূপ মন্দ...[৮]

তারপর তিনি বলেন,

فَمَنۡ عَفَا وَأَصۡلَحَ فَأَجۡرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِۚ

...কিন্তু যে কেউ ক্ষমা করে আর সদ্ভাব সৃষ্টি করে, তাহলে তার জন্য রয়েছে আল্লাহ্‌র কাছে পুরস্কার...[৯]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞۚ

...জখম সমূহের বিনিময়ে সমান জখম...[১০]

আর তারপর তিনি বলেন,

فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٞ لَّهُۥۚ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٥﴾

...কিন্তু যে (প্রতিশোধ গ্রহণ না করে, দান হিসেবে) ক্ষমা করে দেয়, সেটি তার জন্য হবে প্রায়শ্চিত্য (অর্থাৎ এর দ্বারা তার নিজের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে)...[১১]

---

[৮] সূরা শূরা, আয়াত: ৪০

[৯] সূরা শূরা, আয়াত: ৪০

[১০] সূরা মায়িদা, আয়াত: ৪৫

[১১] সূরা মায়িদা, আয়াত: ৪৫

মুজাহিদীনগণ ও জিহাদের পথে আহবানকারী দায়ীদেরকে এ জিনিসগুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আমি সর্বদা তৎপর হয়ে থাকি; যাতে করে তারা নিজেদের আশা-ভরসা, সংকল্প, প্রচেষ্টা, উদ্যম এবং চিন্তাধারায় এ ব্যাপারগুলোর স্থান দেয়। ইসলামী জিহাদের সুমহান মর্যাদা তাদের মনে রাখতে হবে, উম্মাহ ও দ্বীনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় কোনটি তা বিবেচনা করতে হবে, নিজেদের কাজকে কেবল হালাল ও শরীয়তসম্মত - এটুকুর মাঝে বেঁধে রাখলে চলবে না। বরং তাদেরকে বেছে নিতে হবে মুক্তোর মতো নির্মল কাজগুলোকে, যা উম্মাহ ও জিহাদের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত, কার্যকরী এবং জোরালো। তারা যেন কেবলমাত্র ভাসা-ভাসা ভাবে কোনটি হালাল, শরীয়তসম্মত ও অনুমোদিত সেই বিচারে কাজ না করে, বরং তারা প্রত্যেকটি ব্যাপার খতিয়ে দেখবে, মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করবে, গবেষণা করবে, যাতে তারা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে যে, কোন কাজটি করা একটি বিশেষ সময়ের জন্য সবচাইতে উপকারী, উৎকৃষ্ট, এবং শত্রুর প্রতি সর্বাধিক ক্ষতিকারক।

আমি শুধু এটুকু বলেই শেষ করবো না, বরং আমি আরো বলবো যে, এভাবে সর্বাধিক উপযোগী কাজটি বেছে নেয়া ফরয, যেহেতু মুসলমানদের আজ অসংখ্য দায়িত্ব পূরণ করতে হবে। আর ফরয কাজের মধ্যে অনেক কিছুই পরস্পর বিরোধী।[১২] সুতরাং হতে পারে, খুব বিশাল পরিসরের কিন্তু কম উপযোগী একটি ফরযের বদলে তাদেরকে এমন একটি ফরয কাজের ব্যাপারে প্রাধান্য দিতে হবে যার সুযোগ খুবই সীমিত কিন্তু অধিক উপকারী।[১৩] আমাদের এই জিহাদে আমরা তরুণদেরকে যেকোনো ভাবে, যেকোনো প্রকারে, কিংবা যার-তার নেতৃত্বে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়া ফরয - এমনটা বলতে পারি না। বরং তাদের ওপর ফরয হলো জিহাদের ময়দানে শত্রুর

---

[১২] অর্থাৎ, জিহাদ ফরয। এর ভিত্তিতে শত্রুদের ক্ষতি সাধন ফরয, কিন্তু ক্ষতি সাধনের ধরন বা প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে এক ধরনের ক্ষতি সাধন আরো বড় ধরনের সুফল আনয়নকারী ক্ষতি সাধনের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

[১৩] উদাহরণস্বরূপ, রাস্তায় বিভিন্ন জায়গায় অনেক হারাম পোস্টার আছে যেগুলো দলবদ্ধ ভাবে রাস্তায় নেমে ছিড়ে ফেলা যায়, এ কাজ করার জায়গা ও সুযোগ অনেক বেশী। কিন্তু এর চাইতে অনেক কম সুযোগ মিলে সেই কাফের-মুর্তাদ ব্যক্তিকে হত্যার জন্য, যে কাফের-মুর্তাদ ব্যক্তি সুপরিকল্পিতভাবে এদেশে কুফরী মতবাদ বাস্তবায়নের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

মোকাবেলা করা, উম্মাতের ওপর আপতিত বিপর্যয়, মুসলমানদের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধ এবং মুসলমানদের জান-মাল বৈধ ঘোষণাকারী শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। এই কঠিন বাস্তবতার সাগরে, যখন ইসলাম ও মুসলমানদের বিজয়ের প্রশ্ন আসে, তখন সে কাজই বেছে নেয়া কর্তব্য যা উত্তম, গুরুত্বপূর্ণ এবং অধিকতর শ্রেয়। তাদের বেছে নিতে হবে কলঙ্কবিহীন নির্মল জিহাদের ঝাণ্ডা, খুঁজে নিতে হবে সবচেয়ে বিচক্ষণ নেতৃত্ব। সরকারপুষ্ট আলেমদের বক্তৃতা, মিডিয়ার মিথ্যা প্রচারণা কিংবা অন্তঃসারহীন আবেগ দ্বারা যেন এ মনোনয়ন প্রক্রিয়া প্রভাবিত হয়ে না যায়। বরং, যেমনটি আমি বার বার বলে চলেছি, এই বাছাই করার ভিত্তি হবে, ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে উপকারী, জিহাদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে নিষ্কলঙ্ক, এবং শত্রুর বিরুদ্ধে সবচেয়ে ক্ষতিকর কাজটি বেছে নেয়া।

মুজাহিদীনদের উচিৎ আক্রমণাত্মক জিহাদের উপর আত্মরক্ষামূলক জিহাদ পরিচালনায় অগ্রাধিকার দেয়া, কেননা আক্রমণাত্মক জিহাদ একটি দলগত দায়িত্ব (ফরযে কিফায়া), কিন্তু আত্মরক্ষামূলক জিহাদ একটি ব্যক্তিগত ফরয (ফরযে আইন)। তাই, উলামাগণ আক্রমণাত্মক জিহাদের ক্ষেত্রে অনুমতি নেয়ার শর্ত আরোপ করেছেন, যেমন মা-বাবা বা ঋণদাতার নিকট থেকে অনুমতি নেয়া, তবে আত্মরক্ষামূলক জিহাদের ব্যাপারে এরূপ কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

তাদের জানা উচিৎ যে, মুসলমানদের ভূমিকে আভ্যন্তরীণ হোক কিংবা বাহ্যিক, যেকোনো কাফের বা জালেম শাসকের হাত থেকে মুক্তির জন্য যুদ্ধ করা আত্মরক্ষামূলক জিহাদের অন্তর্ভুক্ত, এভাবে জিহাদের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে ও দ্বীনকে শক্তিশালী করে তোলা তাদের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ। এ ধরনের জিহাদ সেসব সাধারণ হানাহানির চাইতে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য, যেগুলোর দ্বারা কেবল শত্রুকে নিছক আহত করা ছাড়া আর কোনো উপকার সাধিত হয় না, কিংবা কেবলমাত্র বিচ্ছিন্ন কিছু ভালো কাজের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিবাদ সাধিত হয়।

তাদেরকে মুসলমান কারাবন্দীদের মুক্তির জন্য জিহাদ করায় প্রাধান্য দিতে হবে, কেননা আত্মরক্ষামূলক জিহাদ বলতে এমনটিই বোঝানো হয়, এবং তাদের উচিৎ দুর্বল ও মজলুমদের উদ্ধার করার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করা, যেমনটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন,

وَمَا لَكُمۡ لَا تُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلۡمُسۡتَضۡعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلۡوِلۡدَٰنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخۡرِجۡنَا مِنۡ هَٰذِهِ ٱلۡقَرۡيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهۡلُهَا وَٱجۡعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيّٗا وَٱجۡعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ٧٥

আর তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করছো না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, "হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে অত্যাচারী অধিবাসীদের এই নগর থেকে বহির্গত করুন! আর স্বীয় সন্নিধান হতে আমাদের জন্য রক্ষাকারী-বন্ধু নির্ধারণ করে দিন এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দিন।"[১৪]

সহীহ্ বুখারীতে আবু মূসা আল-আশআরী (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত একটি মারফু হাদীসে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "দাস মুক্ত করো..."

এ কারণেই ইমাম নববী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, "যদি শত্রুরা এক বা তার চেয়ে বেশী সংখ্যক মুসলমানকে বন্দী করে, তবে অধিক শক্তিশালী মত হচ্ছে, ধরে নিতে হবে যেন শত্রুরা মুসলমানদের ভূমিতে প্রবেশ করেছে, আর তাদের বিরুদ্ধে সেভাবেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অর্থাৎ আত্মরক্ষামূলক জিহাদ), কেননা একজন মুসলমানের পবিত্রতা, মুসলমানদের ভূমির পবিত্রতার চাইতে অনেক বেশী, সুতরাং কারাবন্দীদের মুক্তির জন্য প্রচেষ্টা করা ফরয।"

কোনটির উপর কোনটিকে প্রাধান্য দেয়া উচিৎ সেটা বোঝা, কঠিন বাস্তবতায় ধৈর্যধারণ, শত্রুদের অনিষ্টের পরিমাণ এবং ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুদের শত্রুতা ও যুদ্ধের তীব্রতার কথা মাথায় রাখলে একজন মুজাহিদের পক্ষে বিভিন্ন ফরয কাজের মধ্যে অগ্রাধিকার নির্ণয় করা সহজ হবে। যার প্রকৃত ফলাফল হলো, সে দলবদ্ধ দায়িত্বের (যেগুলো ফরযে কেফায়া) চাইতে ব্যক্তিগত ফরযের (অর্থাৎ ফরযে আইন) ব্যাপারে অগ্রাধিকার দিবে, আর সে বুঝতে পারবে কোথায়, কখন নীরব থাকা, বা দেরি করা চলবে না। কেননা এসব ক্ষেত্রে বিলম্ব করার অর্থ হচ্ছে মুসলমানদের ওপর বিপর্যয় ডেকে আনা, তাদের রক্ত-মাংস শত্রুর জন্য হালাল হয়ে যাওয়া বা এমন ভয়ানক

[১৪] সূরা নিসা, আয়াত: ৭৫

কোনো পরিণতি। সুতরাং তারা গুরুত্বপূর্ণ কাজে অগ্রাধিকার দিবে, আর কেবলমাত্র তার নিজের উপর কতখানি ফরয সেটুকু নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে না।

আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে দোয়া করি যেন তিনি মুসলমানদের ব্যাপারসমূহের মীমাংসা করে দেন, এবং তিনি যা ভালোবাসেন এবং যে কাজে সন্তুষ্ট হন, তার উপর মুসলমানদের দৃঢ়পদ হবার তাওফীক দান করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা এ কাজ করতে সক্ষম, তিনি সত্য বলেন এবং তিনিই সরলপথে পরিচালিত করেন। একজন ভাই আমার লেখাগুলো পড়ে, তার মাথায় গেঁথে থাকা তথ্যের সাথে মিলিয়ে আমাকে বললো, "হে শাইখ, আপনার কলম চালনায় নরম হোন, এর উপর দয়া দেখান!" যার উত্তরে আমি বলবো, আমি এর উপর দয়া দেখাবো, এমনকি একে প্রসন্ন করে তুলবো, তবে তা করবো মুসলমানদের জিহাদের পক্ষে একে চালানোর মাধ্যমে, আর যা কিছুই জিহাদের সুনাম নষ্ট করতে চাইবে, তা নিয়ে মিথ্যাচার করবে কিংবা জিহাদকে ভুল পথে পরিচালিত করবে তা (তার পক্ষে) লেখা থেকে আমি একে (কলমকে) পবিত্র (মুক্ত) রাখবো।

জিহাদ কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় যে, সে এর উপর বিশেষ অধিকার ফলাবে, যে পথে ইচ্ছা সে পথে জিহাদকে পরিচালিত করবে, এমনটি ভাবলে চলবে না। বরং এতে সকল মুসলমানের অংশ আছে; জিহাদের তত্ত্বাবধান করা এবং জিহাদ কায়েমের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা মুসলমানদের কর্তব্য। আর এ কর্তব্য পালনের জন্য তাদেরকে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে হবে, বিশ্বস্ততার সাথে জিহাদের ব্যাপারে নিজেদের মত প্রকাশ, উপদেশ ও দিকনির্দেশনা দিতে হবে, দোয়া করতে হবে। যাদেরকে জিহাদের আমীর, বা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে গণ্য করা হয়, তাদের দায়িত্ব তো আরো বেশী। তাদের কোনো প্রকার তোষামুদে বা মন ভোলানো কথা ব্যবহার করা উচিৎ নয়, কোনোরূপ বিপথগামিতা, বিকৃতি কিংবা ভুল কাজে সায় দেয়া উচিৎ নয়, এমনকি তাদের সবচেয়ে কাছের কেউও যদি তা বলে থাকে তবুও তা করা ঠিক হবে না। কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে খুশি করার বদলে তাদেরকে অবশ্যই সে কাজে অগ্রাধিকার দিতে হবে যা দ্বীন, জিহাদ এবং মুসলমানদের জন্য সর্বাধিক কল্যাণকর।

আমি তাকে এবং তার মতো সবাইকে এটাই বলি: এ লেখনীর কথাগুলোর উপর প্রতিফলন করো, এই শব্দমালা এক কষ্টের কথা ব্যক্ত করে, যার দ্বারা জিহাদের দিকে আহবানকারী দায়ী ও মুজাহিদীনদের প্রতি আমি আমার সবচাইতে আন্তরিক উপদেশ প্রদান করছি। আমার এ কথাগুলোকে তোমরা "শাইখ কি অমুক বুঝিয়েছেন নাকি তমুক বুঝিয়েছেন" - এই চিন্তার মাঝে সীমিত করে ফেলো না, কেননা তাহলে তোমরা এর প্রকৃত স্বাদ আস্বাদন করতে পারবে না। বরং তোমরা যা চিন্তা করছো, তার চাইতে এই ব্যাপারটি আরো অনেক বিশাল এবং আরো মহান। আমি নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তিত্বকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে চাই না। কেননা তা আমাকে দায়ী ও মুজাহিদীনদের থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে, যাদেরকে আমরা সত্যের ধারক, বাহক ও সচেতন বলে বিবেচনা করি। আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে আমরা অতিরিক্ত প্রশংসা করতে চাই না, ইনশাআল্লাহ। আমার এই উদ্বেগ ও বেদনাভরা বইয়ে আমি তা লিখেছি যা অস্ত্র ও অঢেল সম্পদ দিয়েও অর্জন করা সম্ভব নয়। কেবল আশা যেন তা সকলে বুঝতে পারে। জিহাদকে সর্বাধিক কল্যাণকর পথে পরিচালিত করা এবং আল্লাহর দ্বীনের জন্য সর্বোচ্চ সুফল বয়ে আনার উদ্বেগ থেকে আমি এই কথাগুলো লিখেছি, যেন আমি জিহাদের ক্ষেত্রে কোনোরূপ বিপথগামিতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং ভুলের ব্যাপারে সতর্ক করে দিতে পারি।

إِنۡ أُرِيدُ إِلَّا ٱلۡإِصۡلَٰحَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُۚ وَمَا تَوۡفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِۚ عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُ وَإِلَيۡهِ أُنِيبُ ﴿٨٨﴾

...আমি তো যথাসাধ্য শোধরাতে চাই। আর আল্লাহর সাহায্য বৈ আমার কার্যসাধন (সম্ভব) নয়। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং তাঁরই প্রতি আমার প্রত্যাবর্তন।[১৫]

[১৫] সূরা হূদ, আয়াত: ৮৮

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা, দ্বীন ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালিদাতার উপর

মূল- শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল মাকদিসি হাফিজাহুল্লাহ

অনুবাদ- মুহিব্বুল্লাহ নুমান

জেনে রাখা উচিৎ! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলাকে বা তার দ্বীনকে অথবা রাসূল (সাঃ) কে গালি দেওয়া অত্যন্ত জঘন্য একটি অপরাধ (আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে ও আপনাকে গোমরাহী ও ভ্রষ্টতার পথসমূহ থেকে রক্ষা করুন)। তাওহীদকে অন্তর থেকে গ্রহণকারী ও আল্লাহ তা‘আলার যথাযথ মূল্যায়নকারী বান্দারা এই ধরণের জঘন্য পাপাচারীদেরকে অন্তর থেকে ঘৃণা করে। আমরা ইদানিংকালে দেখতে পাচ্ছি যে, এই অন্যায় কাজটি কুফফার রাষ্ট্রগুলো বাদেও অনেক মুসলিম রাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়েছে। এই সকল রাষ্ট্রে এই জঘন্য পাপাচারটি মহামারীর মত ছড়িয়ে পরার অন্যতম প্রধান কারণ হল তাদের অসার আইনব্যবস্থা। এ সকল রাষ্ট্রের চলমান আইনে রাষ্ট্রপ্রধান ও অন্যান্য নেতাদের বিরুদ্ধে কটূক্তিকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অথচ এই শাসকগোষ্ঠী ও তাদের নেতাদের শাসক, আসমান-জমিনের মালিক আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার বিরুদ্ধে যারা কটূক্তি করে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করে বরং অবজ্ঞার সাথে ছেড়ে দেওয়া হয়। আর তাদের আদালতগুলো প্রহসনের স্থানে পরিণত হয়েছে। এখানে তাদের বিচারকদের কাছে শাসকদের কটূক্তিকারীরা কোন মাফ পায়না। অথচ রবের কটূক্তিকারীরা সহজেই মুক্তি পেয়ে যায়।

আমাদের কথা হচ্ছে এই অবস্থার জন্য এই সকল মুসলিম-অমুসলিম দেশের রাষ্ট্র ও আইনব্যবস্থা দায়ী। আমাদের দাবির স্বপক্ষে আমাদের কাছে প্রমাণও আছে। আমরা দেখতে পাই পূর্বে কোন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান বা নেতাদের বিরুদ্ধে অপমানজনক বা কটূক্তিকারীদের ব্যাপারে শুধু রাষ্ট্রের গোয়েন্দা বিভাগ আর নিরাপত্তা বিভাগই মাথা ঘামাত। অন্য কোন বিভাগ

এই বিষয়কে গুরুত্বই দিত না। আর এখন রাষ্ট্রের প্রত্যেকটা বিভাগ ও কর্মচারী এই ব্যাপারে সোচ্চার। কেউ কটূক্তি করলেই তার আর রক্ষে নেই। অথচ রাষ্ট্রের এই গোয়েন্দা বিভাগ, নিরাপত্তা বিভাগ ও অন্যান্য বিভাগের কর্মচারীদের চোখের সামনেই আল্লাহর শত্রুরা আল্লাহ্ ও তার সত্য দ্বীনকে গালি দিয়ে যাচ্ছে। আর এই সকল রাষ্ট্রপুজারিরা কোন ব্যবস্থা না নিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখছে। তাদের বিচারালয়গুলোতে বিচারকদের সামনেই এই সকল কীটরা আল্লাহ্ ও তার সত্য দ্বীনকে গালি দেওয়ার পরও তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না।

এ ব্যাপারে সকল উলামায়ে কেরাম একমত যে, আল্লাহ্ তা'আলাকে বা তার দ্বীনকে বা তার রাসুলকে (সাঃ) কটূক্তিকারী মুরতাদ। এই অন্যায় কাজ করার সাথে সাথে তার স্ত্রীর সাথে তার বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। এ অবস্থায় যদি সে মারা যায় তাহলে তার সকল আমল বাতিল বলে গণ্য হবে। তাকে মুসলমানদের কবরে দাফন করা যাবে না। তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর অবশ্যই তা একটি নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।

যে কেউ আল্লাহ্ ,তার রাসুল বা তার দ্বীনের ব্যাপারে কটূক্তি করবে সেই মুরতাদ বলে গণ্য হবে। এই ক্ষেত্রে কোন উজর গ্রহণ করা হবে না। চাই সে সত্য মনে করে বলুক বা ঠাট্টা করে বলুক। সে শান্ত অবস্থাই বলুক বা রাগান্বিত অবস্থাই বলুক। সে মুসলিম হোক বা চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম হোক। সে পুরুষ হোক বা মহিলা হোক। সে ইহুদী, খ্রিস্টান বা যুদ্ধবন্দী যাই হোক তার উপর রিদ্দার নিয়ম আপতিত হবে। মোটকথা যে কেউ যে কোন হালতেই

বলুক সে মুরতাদ বলে গণ্য হবে। মুসলমানদের জন্য তার জান ও মাল হালাল বলে গণ্য হবে।

এর দলীলসমূহ অনেক,যার অধিকাংশ শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা রহ. তার কিতাব "আস-সারিমুল মাসলুল আলা শাতেমের রাসূল" তে উল্লেখ করেছেন।

দলিল নং - ১

আল্লাহ্ সুব'হানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন-

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا

"নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে লানত করেন এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন অপমানজনক আযাব"। (সূরা আল-আহযাব-৫৭)

আল্লাহ তা'আলাকে বা তাঁর দ্বীনকে কিংবা তাঁর রাসূল (সাঃ)কে গালিদাতাও এর অন্তর্ভুক্ত।

বুখারী শরীফের হাদীসে রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেন,"কে আছো কা'আব ইবনে আশরাফের জন্য? কেননা সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে"। তখন মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ দাড়িয়ে গেলেন। অতঃপর বললেন যে, " আমি হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আপনি কি চান যে, আমি তাকে হত্যা করি?" তিনি বললেন, " হ্যাঁ"।

অথচ এই কা'আব ছিল চুক্তির কারণে মা'সুমুদ দাম (যার রক্তের নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছিল)। কা'আব থেকে রাসূলকে গালি দেওয়া ও নিন্দা করা প্রকাশ পেলে রাসুল (সাঃ) খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। রাসূল (সাঃ) তার কষ্টের বর্ণনা এভাবে করেছেন যে, "সে আল্লাহ ও তার রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে"। আর একারণেই রাসুল (সাঃ) কা'আব ইবনে আশরাফের রক্ত প্রবাহিত করার বৈধতার ঘোষণা দিয়েছেন নিরাপত্তার চুক্তির আওতাধীন হওয়া সত্বেও।

আর এই ঘটনার মাধ্যমে রাসুল (সাঃ) আমাদেরকে খ্রীস্টান ও তাদের ন্যায় অন্যান্য ধর্মাবলম্বী কাফেরদের মধ্য হতে যারা আমাদের দ্বীন, আমাদের রব কিংবা আমাদের রাসূল (সাঃ) কে নিয়ে গালমন্দ করার দুঃসাহস করে তাদের জন্য শাস্তি কি হবে তা বলে দিয়েছেন। আমরা দেখতে পাই যে, কা'আব বিন আশরাফ চুক্তিবদ্ধ ইহুদী ছিল। সুতরাং এটাতো আরো অধিক উপযোগী হবে যে, আল্লাহ , রাসূল (সাঃ) বা দ্বীনকে গালমন্দকারী খ্রীস্টান বা ইহুদী বা মুশরিককে হত্যা করা হবে। তবে শর্ত হল সে এমন খ্রিস্টান বা ভিন্ন ধর্মের লোক হতে হবে যার মুসলমানদের সাথে কোন চুক্তি নেই। সে মুসলিমদের কোন জিম্মি (জিযিয়া দিয়ে নিরাপত্তা লাভকারী কাফির) হতে পারবে না। এমন অবস্থায় সে উপরোক্ত জঘন্য কাজটি করলে তার জান ও মাল মুসলিমদের জন্য হালাল বলে গণ্য হবে।

আর আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা উপরোক্ত আয়াতে যারা এধরনের কাজ করে তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে অভিসম্পাত করেছেন। এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন অবমাননাকর শাস্তি। বান্দার জন্য এর চাইতে ভয়ংকর আর কি হতে পারে !

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) এর মতে,কাফিররা হচ্ছে আল্লাহর লানত প্রাপ্ত বান্দা। তিনি তার "আস-সারিমুল মাসলুল" বইতে উল্লেখ করেছেন যে, উপরোক্ত আয়াতটি কাফিরদের জন্য প্রযোজ্য হবে। কেননা লা'নত মানে হল আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত করা। আর আল্লাহ তা'আলা যাকে দুনিয়া ও আখেরাতে তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত করেছেন সে নিঃসন্দেহে কাফেরই হবে।

অনুরূপ ভাবে তাকে (অবমাননাকর শাস্তির) হুমকি দেওয়াও তার 'কুফুরির' প্রমাণ বহন করে। কেননা পাপী মুমিনকে আল্লাহ তা'আলা কখনো কখনো ভীতিপ্রদর্শন করেছেন বড় শাস্তি কিংবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির কথা বলে। কিন্তু অবমাননাকর শাস্তি কুরআনে কেবল কাফেরদের ব্যাপারেই উল্লেখিত হয়েছে।

আর আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ

"আর আল্লাহ যাকে অপমানিত করেন কেউ তার সম্মানদাতা নেই "। (সূরা আল-হাজ্জ- ১৮)

এসব কিছুই একথার উপর দালালত করে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে, দ্বীনকে অথবা রাসূল (সাঃ)কে কটূক্তিকারী মুরতাদ।

দলিল নং – ২

আরো একটি দলিল হল আল্লাহ তা'আলার এই এরশাদ,

لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

" তোমরা নবীর আওয়াজের উপর তোমাদের আওয়াজ উঁচু করো না এবং তোমরা নিজেরা পরস্পর যেমন উচ্চস্বরে কথা বল, তাঁর সাথে সেরকম উচ্চস্বরে কথা বলো না। এ আশঙ্কায় যে, তোমাদের সকল আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে অথচ তোমরা উপলব্ধিও করতে পারবে না "।

(সূরা আল-হুজুরাত- ০২)

এই আয়াতের মাঝে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে ভীতিপ্রদর্শন করেছেন নবী (সাঃ) এর আওয়াজের উপর তাদের আওয়াজ উঁচু করার ক্ষেত্রে। আর এই কাজ কখনো কখনো আমল বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার দিকে নিয়ে যায়। আর আমল তখনই নষ্ট হয়ে যায় যখন ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার মত কোন অপরাধ করে থাকে।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ

"যদি আপনি শিরক করেন তাহলে আপনার আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে"। (সূরা আয্-যুমার-৬৫)

এই আয়াতের অর্থ হল, ইবাদতের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন শর্ত বা এধরণের কোন কিছুর কমতির কারণে আমল নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, নবী (সাঃ) এর আওয়াজের উপর কারো আওয়াজ উঁচু করায় তার উপর সেই কুফরির আশঙ্কা করা হচ্ছে যা আমল বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার দিকে নিয়ে যায়। অতএব তার কি অবস্থা হবে যে আল্লাহর দ্বীনকে অথবা আল্লাহর রাসুলকে গালমন্দ করে ? নিঃসন্দেহে এই কাজ সম্পাদনকারীর সকল আমল বাতিল হয়ে যাবে। এবং উপযুক্ত শর্তপূরণ সাপেক্ষে তাকে মুরতাদ সাব্যস্ত করা হবে।

দলিল নং- ৩

আরো একটি দলিল হল, আল্লাহ তা'আলার বাণী-

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ

“আর যদি আপনি তাদেরকে প্রশ্ন করেন, অবশ্যই তারা বলবে, ‘আমরা আলাপচারিতা ও খেল-তামাশা করছিলাম। আপনি বলেন, ‘আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলের সাথে তোমরা বিদ্রুপ করছিলে’? তোমরা ওযর পেশ করো না। তোমরা তোমাদের ঈমানের পর অবশ্যই কুফরী করেছ। যদি আমি তোমাদের থেকে একটি দলকে ক্ষমা করে দেই, তবে অপর দলকে আযাব দেব। কারণ, তারা হচ্ছে অপরাধী”। (সূরা তাওবাঃ ৬৫-৬৬)

এই আয়াতটি এব্যাপারে অকাট্য সুস্পষ্ট বক্তব্য যে, আল্লাহকে, তাঁর দ্বীনের কোন বিষয়কে কিংবা তার রাসূলকে নিয়ে উপহাসকারী ঈমান আনয়নের পরও মুরতাদ হয়ে যাবে।

অতএব কোন ব্যক্তি আল্লাহকে বা তার রাসূল (সাঃ)কে গালি দিলে অথবা দ্বীনের কোন বিষয় নিয়ে কটাক্ষ করলে তাকে তাকফির করার যোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে। এই কটূক্তি সে ইচ্ছাকৃত ভাবে করুক কিংবা হাসি-তামাশা বা ক্রীড়াচ্ছলেই করুক। যেহেতু এই আয়াতগুলো ঐ সকল লোকদের ব্যাপারে অবতীর্ন হয়েছে যারা নবী কারীম (সাঃ) এর সাথে তাবুক যুদ্ধে জিহাদের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল। অতঃপর তাদের (সাহাবীদের) কয়েকজন থেকে তাঁর ক্বারী সাহাবীদের নিয়ে কিছু উপহাস প্রকাশ পেয়েছিল। সুতরাং যখন তাদের ব্যাপারে এই আয়াতগুলো নাযিল হল, তখন তারা নবী কারীম (সাঃ) এর কাছে এই বলে ওযর পেশ করতে লাগল যে, "আমরা তো যাত্রীদল তথা মুসাফিরদের আলোচনার ন্যায় আলোচনা করছিলাম, যেন আমাদের সফরের ক্লান্তি কম অনুভূত হয়"। অর্থাৎ আমরাতো রসিকতা ও খেল-তামাশা করছিলাম যেন এর দ্বারা আমরা সফরের দূরত্ব ও ক্লান্তি দূর করতে পারি। আমরা এর দ্বারা কুফরির ইচ্ছা করিনি কিংবা কুফরি বিশ্বাসও পোষন করিনি। এর উত্তরে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলেননি। অথবা তারা কুফরি করতে চেয়েছিল ও কুফরিতে বিশ্বাস পোষন করেছিলো এমনটাও বলেননি। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা উত্তরে বলেছেন যে-"তোমরা উযর পেশ করো না, তোমরা ঈমান আনয়নের পর কুফরি করেছ"। অর্থাৎ তোমরা ঈমান আনার পর এই কাজের মাধ্যমে কুফরি করেছো। যদিও এই

কুফরি তোমরা ইচ্ছা করে করনি বা তোমরা এই কুফরিতে বিশ্বাসও করতে না তবুও অনিচ্ছাকৃত ভাবে করা এই কাজের মাধ্যমে তোমাদের কুফরি প্রকাশ পেয়েছে।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি সাহাবাদের কয়েকজন থেকে এই আচরণ প্রকাশ পাওয়াই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। অথচ তারা নামায পড়তেন, রোযা রাখতেন এবং আল্লাহর রাসূল (সাঃ)এর সাথে জিহাদে বের হয়েছিলেন।

অতএব মুসলমানের মধ্যে যারা নিজের দ্বীনের নিরাপত্তার প্রতি আগ্রহী তাদের এই সমস্ত বিপদ ও বিপদগ্রস্থলোকদের ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিৎ।

মুসলমানদের মধ্যে কেউ কেউ একথা বলে যে, আমি আল্লাহ্, তার রাসুল ও দ্বীন ইসলামের কোন বিষয়ে কোন খারাপ ধারণা অন্তরে পোষণ করি না। কিন্তু এই ব্যক্তি আবার এমন লোকদের সাথে চলাফেরা করে যারা আল্লাহ্, আল্লাহর রাসুল বা দ্বীন ইসলাম নিয়ে কটূক্তি করে। এই সকল মুসলিমরা এই কটূক্তিকারীদের সাথে উঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া ও হাসি-তামাশা করে বেড়ায়। এই কটূক্তিকারীদের সম্মান করে ও তাদের দেখে খুশি হয়। এটা কখনোই একজন মুসলমানের চরিত্র হতে পারে না বা হওয়া উচিতও না। এই সকল মুসলিমদের উচিত হবে এই সকল কটূক্তিকারীদের কাজে কঠোরভাবে নিষেধ করা। কটূক্তিকারী যখন এই কাজ করবে তখন মুসলিমের চেহারায় তার ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ থাকতে হবে। আর যদি কোন মুসলিম এই ধরণের কটূক্তিকারীদের সাথে একই মজলিসে অবস্থান করার সময়ে কটূক্তিকারী এমন কাজ করে তবে মুসলিম ভাইবোনদের উচিত হবে

সেই মজলিশ ত্যাগ করা। আর না হলে এই মুসলিম ভাই বা বোন এই কুফুরির অংশীদার বলে গণ্য হবেন ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

“ আর তিনি তো কিতাবে তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করা হচ্ছে এবং সেগুলো নিয়ে উপহাস করা হচ্ছে, তাহলে তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা অন্য কথায় নিবিষ্ট হয়, তা না হলে তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ মুনাফিক ও কাফিরদের সকলকে জাহান্নামে একত্রকারী।”

একটিবার এই আয়াতটি নিয়ে ভাবুন ! দেখুন কীভাবে আল্লাহ তা'আলা সেসব মুনাফিকদেরকে ভীতিপ্রদর্শন করেছেন। অথচ তাদের অপরাধ ছিল এটাই যে, কাফেররা যখন তাদের সামনে আল্লাহ্‌, তার রাসুল (সাঃ) ও দ্বীন ইসলামকে নিয়ে কটূক্তি করতো তখন তারা শুধু বসে থেকে শুনতো। তারা কটূক্তিকারীদের থেকে পৃথক হতো না কিংবা তাদের বিরোধিতা করতো না। বরং তারা তাদের সাথে উঠা-বসা করতো, একত্রে খাওয়া-দাওয়া করতো, তাদেরকে সঙ্গী মনে করতো। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এব্যাপারে

ভীতিপ্রদর্শন করছেন যে, যেভাবে তারা এখন আল্লাহর কটূক্তিকারীদের সাথে চলাফেরা করছে সেভাবেই আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে জাহান্নামে একত্র করবেন।

অতএব মুসলমান যেন তার দ্বীনের ব্যাপারে এই সমস্ত নিকৃষ্ট অপরাধ ও অপরাধীদের থেকে সতর্ক থাকে। যারা দিবারাত্রি তাদের সৃষ্টিকর্তাকে, তাদের রিযিকদাতাকে গালমন্দ করে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করার ব্যাপারে মুসলমান যেন সাবধান থাকে। এসকল নিকৃষ্ট অপরাধীরাতো তাদের রবের সাথে এক অসম যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। তারা এমন এক রবের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় নেমেছে যার অসংখ্য বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ নিয়ামত তারা প্রতিনিয়ত গ্রহণ করছে। যাঁর কল্যাণগুলো দিবারাত্রি এই অপরাধীদের উপর অবতরন করছে।

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, তার একত্তবাদের ঘোষণা দেওয়ার, তার পবিত্রতার ঘোষণা দেওয়ার, তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার এবং শরিকবিহীন ভাবে একমাত্র তারই ইবাদত করার। তিনি ছাড়া সকল তাগুত ও উপাস্যকে অস্বীকার করার ও বর্জন করার। ("কিন্তু যালিমরা আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ-নিষেধগুলো নিজেদের কিছু মনগড়া কথা বার্তা দিয়ে পরিবর্তন করে নিয়েছে।")

মুসলিমদের অবস্থা এখন এমন যে, কুফফাররা তাদের উপর জুলুম চালানো সত্ত্বেও তারা উল্লাস ও আনন্দ ফুর্তিতে ডুবে আছে। তারা এই সকল কুফফারদের ইসলাম বিরোধী কাজ দেখে কিছু না বুঝে করতালি দিচ্ছে এবং এই ঘাতকদের অনুসরণ করছে। অথচ এই সকল কাফের শাসকেরা আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে এক নিরন্তর যুদ্ধে নেমেছে। তারা দেশে দেশে

ইসলামী শরিয়াহকে অকার্যকর বানিয়েছে। এরপর এই শরিয়াহ এর পরিবর্তে মানুষের আবিষ্কৃত শাসন ব্যবস্থা মুসলিমদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। এরপরও মুসলিমরা তাদেরকে সমর্থন ও অনুসরণ করে যাচ্ছে। অথচ এর বিনিময়ে কুফফার শাসকেরা তাদেরকে লাঞ্ছনা আর অপদস্ততা ছাড়া আর কিছুই দেইনি। এরা মুসলিমদের দেশের সম্পদগুলো চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। মুসলিমদের নির্যাতনকারী এবং আল্লাহর বিধানকে পরিবর্তনকারী এই কুফফার শাসকদের ক্ষমতার মসনদ ভেঙ্গে ধুলোয় মিশিয়ে যাক।

অতঃপর এই নিকৃষ্ট অপরাধীরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, তাকে গালি দিয়েছে এবং তার দ্বীনকে নিয়ে কটাক্ষ করেছে। আর মুসলিমরা এই অবাধ্য শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে ও সম্মান প্রদর্শন করেছে । আর তাদেরকে সকল কিছুর উর্ধে মনে করে সকাল-সন্ধ্যায় তাদের প্রশংসা করছে। মুসলিমদের এই অবস্থার কারণ হল এই-

"চক্ষু সমূহ দৃষ্টিহীন হয় না কিন্তু বক্ষে অবস্থিত অন্তর সমূহ অন্ধ হয়ে যায়"।

প্রখ্যাত শাইখ আবু মুহাম্মদ আসিম আল-মাকদিসী (আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন) কর্তৃক একটি মূল্যবান আলোচনা

তিনটি মৌলিক মূলনীতি

(একটি জানাজায় শাইখের কৃত একটি আলোচনা, আল্লাহ তাঁর মুক্তি ত্বরান্বিত করুন)

আলোচনায়: শাইখ আবু মুহাম্মদ আসিম আল-মাকদিসী

পরিবেশনায়: বালাকোট মিডিয়া

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَـٰعُ ٱلْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾

সমস্ত জীবই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে এবং নিশ্চয়ই উত্থান দিবসে তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিদান পূর্ণরূপে দেয়া হবে; অতএব যে কেউই অগ্নি হতে বিমুক্ত হয়েছে এবং জান্নাতে প্রবিষ্ট হয়েছে, ফলতঃ নিশ্চয়ই সে সফলকাম; আর পার্থিব জীবন প্রতারণার সম্পদ ছাড়া আর কিছু নয়।[১]

[১] সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৮৫

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি বলেন,

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾

সমস্ত জীবই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে এবং নিশ্চয়ই উত্থান দিবসে তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিদান পূর্ণরূপে দেয়া হবে; অতএব যে কেউই অগ্নি হতে বিমুক্ত হয়েছে এবং জান্নাতে প্রবিষ্ট হয়েছে, ফলতঃ নিশ্চয়ই সে সফলকাম; আর পার্থিব জীবন প্রতারণার সম্পদ ছাড়া আর কিছু নয়।[২]

আর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদের উপর যিনি বলেছেন,

“তিনটি জিনিস মৃত ব্যক্তিকে অনুসরণ করে: তার পরিবারের সদস্যগণ, তার সম্পদসমূহ ও তার কর্মসমূহ। এদের মধ্যে দু’টি ফিরে যায়; এবং একটি তার সাথেই থেকে যায়। মানুষ ও সম্পদ ফিরে যায়; তার কর্মসমূহ তার সাথেই থেকে যায়।”[৩]

সুতরাং আমার ভাইয়েরা, এখানে রয়েছে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের স্মরণচিহ্ন। এটাই সেই স্থান যা আমাদেরকে সৎকাজ করার জন্য এবং আমাদের রবের সাথে সাক্ষাতের দিনটির জন্য প্রস্তুতি নিতে মনে করিয়ে দেয়।

মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের ধাপসমূহের মধ্যে প্রথম ধাপে মৃত ব্যক্তি জিজ্ঞাসিত হয়। তাকে তিনটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। এগুলোকে আমাদের উলামাগণ নাম দিয়েছেন: **তিনটি মৌলিক মূলনীতি**।

সে প্রশ্ন, পরীক্ষা ও নিরীক্ষার সম্মুখীন হবে। সুতরাং প্রকৃত সাঈদ (সুখী) হচ্ছে সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ দৃঢ়তার সাথে সঠিকভাবে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারার সফলতা ও পথনির্দেশ দিয়েছেন।

---

[২] সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৮৫

[৩] সহীহ বুখারী ও মুসলিম

আর দুর্ভাগা সেই ব্যক্তি যাকে এই পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়, কিন্তু সুদৃঢ় ও সঠিক উত্তর দেয়া থেকে তাকে অবরুদ্ধ করা হয়।

জেনে রাখুন আমার ভাইয়েরা, আল্লাহ আপনাদের বরকত দিন, জেনে রাখুন; ঐ পরীক্ষায় উত্তর দেবার ক্ষেত্রে সফলতা ও অবিচলতা মুখস্থ করার উপর নির্ভর করে না। কারণ অনেক কাফেররা এই উত্তর জানে, আর অনেক মুরতাদরাও (দ্বীনত্যাগী) এটা জানে যারা কিনা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি করে।

এমনকি যারা এই দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে চলেছে তাদের অনেকেই এই উত্তরগুলো জানে। এই উত্তরগুলো সঠিকভাবে দেবার ক্ষেত্রে যে সফলতা ও অবিচলতা রয়েছে, এবং যে সকল মানুষেরা সাঈদ (সুখী) তাদের সেই চলার পথটিকে লাভ করার জন্য, আপনাকে এই তিনটির (মূলনীতির) মাঝে জীবন পরিচালনা করতে হবে।

আর এই তিনটি (মূলনীতি) হচ্ছে আপনি আপনার দ্বীন, আপনার নবী ও আপনার রব এর ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবেন। প্রথমে আপনি জিজ্ঞাসিত হবেন, "তোমার রব কে?"

আমরা সকলেই জানি যে আমাদের রব হচ্ছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। আর আমরা সকলেই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবো যদি আমাদেরকে দুনিয়াতে এই প্রশ্নটি করা হয়।

কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কি কবরে একজন ব্যক্তিকে সফলতা দিবেন? যে ব্যক্তি আল্লাহর দেয়া পথনির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করে নি, তাকে কি আল্লাহ এই প্রশ্নটি - যা আমাদের কাছে এখন সহজ মনে হচ্ছে – তার সঠিক উত্তর দেবার তাওফীক দান করবেন?

তাকে কি উত্তর দেবার সফলতা দেয়া হবে, যখন কিনা সে শুনেছিল যে, আল্লাহ তাআলাকে অপমান করা হচ্ছে, আল্লাহর দ্বীনের অমর্যাদা করা হচ্ছে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে, কিন্তু সে এগুলোর প্রতি ভ্রূক্ষেপও করে নি? এবং সে শরীয়ত ও আল্লাহর দ্বীনকে হেফাজত করার জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করে নি?

তাকে কি উত্তর দেবার সফলতা দেয়া হবে, যখন কিনা সে তার জীবন অতিবাহিত করেছে ও মৃত্যুবরণ করেছে, কিন্তু সে আল্লাহর জন্য নামায পড়ে নি, এমনকি একবারও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার উদ্দেশ্যে রুকু বা সিজদা করে নি, এবং আল্লাহর দ্বীনকে অপমান করা হচ্ছে শুনে

ক্রোধে তার মুখের রং কখনো পরিবর্তিত হয় নি, এবং তার হৃদয় বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নি যখন সে দেখেছে দিন রাত্রি আল্লাহর দ্বীনের পবিত্র বিষয়সমূহ লঙ্ঘিত হচ্ছে? তাকে কি সফলতা দেয়া হবে যাতে সে বলতে পারে, "আমার প্রতিপালক হলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা"?

যদি আপনি চান আল্লাহ আপনার পালনকর্তা হয়ে যান, তবে যতটা আপনি রাগান্বিত হন আপনার নিজের জন্য অথবা আপনার পরিবার, সন্তান, স্ত্রী ও বাবা-মা এর জন্য, তার চেয়ে বেশী রাগান্বিত হতে হবে আল্লাহর জন্য। এই মুহূর্তে আমাদের অনেকেই, আমি বলতে চাচ্ছি যে অনেক মানুষই আছেন - আমাদের কেউ এরকম হওয়া থেকে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই - যারা নিজেদের বাবা ও মাকে অপমানিত হতে দেখলে তাদের মুখের রং পরিবর্তিত হয়ে যায়, সে রাগান্বিত হয় এবং দিশেহারা হয়ে পড়ে। কিন্তু সে হয়তো নীরবভাবে পাশ কাটিয়ে চলে যায় যখন সে শুনে আল্লাহর প্রতি অমর্যাদা করা হচ্ছে এবং তাঁর দ্বীনের প্রতি অবমাননা করা হচ্ছে এবং তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি ঠাট্টা-তামাশা করা হচ্ছে।

আমরা ঠিক এমনই একটি যুগে বাস করছি যেখানে আমাদের মহান রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে নিয়ে ঠাট্টা করা হচ্ছে, আর সে কিছুই করছে না। সে তার জীবন খেল-তামাশার মাঝে অতিবাহিত করছে, আর এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা এই তিনটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেবার সফলতা প্রদান করবেন না। তিনটি প্রশ্ন বা তিনটি মৌলিক মূলনীতি।

কে আপনার প্রতিপালক? যদি আপনি চান যে, আল্লাহ আপনার পালনকর্তা হয়ে যান, তাহলে আপনার জীবন হতে হবে আল্লাহর দ্বীনের জন্য এবং আপনার মৃত্যু হতে হবে আল্লাহর দ্বীনের জন্য।

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾
لَا شَرِيكَ لَهُ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾

তুমি বলে দাও: "আমার নামায, আমার সকল ইবাদত (কুরবানী ও হজ্জ), আমার জীবন ও আমার মরণ - সব কিছু সারা জাহানের রব আল্লাহর জন্যে। তাঁর কোনো শরীক নেই, আমি এর জন্য

আদিষ্ট হয়েছি, (অর্থাৎ আমি যেন তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক স্থির না করি।) আর আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমিই হলাম প্রথম।”[৪]

যদি আপনি বলতে চান, “আমার দ্বীন হলো ইসলাম”, তাহলে আপনার জীবন হতে হবে ইসলামের জন্য এবং আপনার মরণ হতে হবে ইসলামের জন্য। আপনার জীবন যেন জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং এরকম মিথ্যা মতবাদসমূহ কিংবা এইসব তাগুতদের (শরীয়তের আইন পরিবর্তনকারী জালেম শাসকবৃন্দ, বাতিল মূর্তি/প্রভূসমূহ ইত্যাদি) জন্য নিয়োজিত না হয়। আপনার জীবন যেন হয় শুধুমাত্র আল্লাহর দ্বীনের জন্য উৎসর্গকৃত, আর তাহলেই আপনাকে সফলতা দেয়া হবে এই উত্তর দেবার: “আমার দ্বীন হলো ইসলাম।”

আপনার জীবন অতিবাহিত হতে হবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দেখানো পথ অনুসারে। আপনি মেনে চলুন তাঁর সুন্নাহ (কথা ও কাজ), মেনে চলুন তাঁর দেখানো পথ, অনুসরণ করুন তাঁর জীবন, তাহলে আপনাকে সফলতা দেয়া হবে এই উত্তর দেবার: “মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হলেন আল্লাহর রাসূল।”

যদি আপনারা চান যে, আল্লাহ যেন আপনাদেরকে এই জায়গায় (অর্থাৎ কবরে) সকল প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেবার তাওফীক দান করেন, হে আমার ভাইয়েরা, তাহলে আপনাদেরকে এই তিনটি মূলনীতির উপর জীবন যাপন করতে হবে।

বিষয়টি উত্তর মুখস্থ করে রাখার মতো সংকীর্ণ নয়; বরং বিষয়টি হলো এগুলোর সত্যতাকে নিজ জীবনে সঞ্চারণ করা এবং দৈনন্দিন জীবনে এগুলোর বাস্তবায়ন করা। আপনার চেহারার বর্ণ পরিবর্তিত হবে এবং আপনি ক্রোধান্বিত হবেন আল্লাহর দ্বীনের জন্য, আপনার ভালোবাসা হবে আল্লাহর জন্য এবং আপনার ঘৃণা হবে আল্লাহর জন্য।

আল্লাহর জন্যই দান করুন এবং আল্লাহর জন্যই বিরত থাকুন, তাঁর জন্য অগ্রসর হোন, তাঁর জন্য অগ্রগামী হোন, পুরো জীবন ও মৃত্যু অতিবাহিত করুন আল্লাহর দ্বীনের জন্য।

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের লক্ষ্য হবে আল্লাহর তাওহীদ (একত্ববাদ)। আপনি এই দ্বীনে প্রবেশ করেন এই বাক্যের সাথে: “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” (আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোনো

---

[৪] সূরা আনআম, আয়াত: ১৬২-১৬৩

উপাস্য নেই), এবং যদি আপনি তাদের দলভুক্ত হতে চান যারা সাঈদ (সুখী), তাহলে আপনার জীবন শেষ করতে হবে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" দিয়ে, যেমনটি হাদীসে এসেছে:

"যার শেষ বাক্য হবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৫]

সুতরাং আল্লাহর তাওহীদ কেবল শুরুতেই নয়, বরং এটা দিয়েই শুরু এবং শেষ। তাওহীদ দিয়েই বান্দার জীবনের শুরু এবং শেষ, আল্লাহর দ্বীন দিয়েই শুরু এবং শেষ, ঐসব আবিষ্কৃত বিষয়সমূহ নয় যেগুলো লোকেরা আজকাল বলে থাকে: "জর্দানই প্রথম", "সিরিয়াই প্রথম", "আরব আমিরাতই প্রথম"[৬] ইত্যাদি। সমস্ত মিথ্যা মতবাদ ও স্লোগানসমূহ যেগুলো জনগণের বুদ্ধিমত্তা নিয়ে ক্রীড়া কৌতুক করে, সেগুলোকে **পরিত্যাগ করুন!**[৭]

---

[৫] আবু দারদা হতে সুনানে নাসাঈ তে বর্ণিত

[৬] লেখক এখানে জাতীয়তাবাদ প্রকৃতির স্লোগানের দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছেন এবং উদাহরণ হিসেবে আরব ভূখন্ডসমূহে চলমান কিছু স্লোগানের স্বরূপ উল্লেখ করেছেন। যেমন, এদিকে আমরা শুনতে পাই "ইস্ট অর ওয়েস্ট, 'অমুক' ইজ দ্যা বেস্ট" কিংবা এই ধরনের অন্য কোনো স্লোগান। বৃহত্তর পরিসর থেকে ক্ষুদ্রতর পরিসর পর্যন্ত বিভিন্ন পরিসরে অজ্ঞ লোকেরা এই ধরনের স্লোগান ব্যবহার করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করে যার মূল যুক্তি হচ্ছে: আমি "অমুক" দল/প্রতিষ্ঠান/এলাকা/দেশ এর লোক তাই "অমুক" দল/প্রতিষ্ঠান/এলাকা/দেশ ই শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ আমাদেরকে এমন জাহেল-অজ্ঞ উক্তি করা থেকে হেফাজত করুন। আমীন। আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্র গ্রন্থে বলেন,

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই... (সূরা হুজুরাত, আয়াত: ১০)

এছাড়াও আল্লাহ পাক বলেন,

إِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُونِ ﴿٩٢﴾

নিশ্চয়ই তোমাদের এই উম্মত হলো এক জাতি এবং আমিই তোমাদের রব, অতএব আমারই ইবাদত করো। (সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৯২)

[৭] সারা পৃথিবীতে আজ মিথ্যা বাতিল স্লোগানের কোনো অভাব নেই। সেই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশও ভন্ডামীপূর্ণ স্লোগান দিয়ে ভরে উঠেছে। "দিন বদলের" স্লোগান থেকে শুরু করে "চেতনার" স্লোগান পর্যন্ত, কিংবা সরাসরি "জয় বাংলা", "বাংলাদেশ জিন্দাবাদ" থেকে শুরু করে জাতীয়তাবাদের পরোক্ষ স্লোগান পর্যন্ত সবই এখন সহজলভ্য। আর একটু মনযোগ দিয়ে তাকালেই দেখা যায় যে, হয় এইসব স্লোগান দিচ্ছে কোনো ভন্ড মিডিয়ার

এইগুলোকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করুন এবং আল্লাহর তাওহীদকে পরিণত করুন প্রথম এবং শেষ বিষয়ে; যদি সত্যিই আপনি এই স্থানে (কবর) নিরাপত্তা ও আনন্দ পেতে চান।

আপনার জীবনকে উৎসর্গ করুন "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর বাণীকে বুলন্দ করার জন্য এবং আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য। এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাহ ও পথনির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করুন। অন্যথায়, আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, এই জীবনের কোনোই মূল্য নেই, যদি আমরা এ সময় আল্লাহর দ্বীনের অমর্যাদা হতে দেখেও নীরব থাকি, এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অবমাননা হচ্ছে জেনেও দূরে বসে থাকি, এবং আমাদের মুখের রং পরিবর্তিত হয় না, এবং আমরা আল্লাহর দ্বীনের জন্য কিছুই করি না।

আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীস আমাদের উপর প্রযোজ্য যখন তিনি বলেছেন,

"শেষ সময় আসবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না একজন লোক অন্য একজনের কবরের পাশ দিয়ে হেঁটে যায়, এবং বলে: 'আহা! তার জায়গায় যদি আমি হতে পারতাম।'"[৮]

আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, জমিনের বাহিরের থেকে ভেতরটাই আজ উত্তম যদি আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অবমাননা করা হচ্ছে জেনেও চুপ করে থাকি, যদি আমরা আল্লাহর কিতাবের বাস্তবায়নে বিলম্ব হচ্ছে জেনেও নীরবতা অবলম্বন করি, এবং যদি আমরা চুপ থাকি যখন আমাদের সামনে আল্লাহর দ্বীনের অবমাননা করা হচ্ছে। আমাদের হতে হবে, হে আমার ভাইয়েরা, এই দ্বীনের প্রকৃত সন্তান।

আমাদেরকে আল্লাহর প্রকৃত বান্দা হতে হবে, আল্লাহর দ্বীনের জন্য আমাদের মুখের রং পরিবর্তিত হতে হবে এবং আমাদের রাগান্বিত হতে হবে এবং যারা আল্লাহকে ভালোবাসে তারা ছাড়া আর

দল, অথবা এর পিছনে রয়েছে কোনো রাজনৈতিক দল অথবা রয়েছে কোনো মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানী (এদের সবই দেশী, শুধু প্রভু বা মালিকানা টা বিদেশী)। এরা সবাই এই সব স্লোগানের দ্বারা মানুষদেরকে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য ব্যবহার করে। এভাবেই এরা জনগণের বুদ্ধিমত্তা নিয়ে ক্রীড়া কৌতুক করে। সবশেষে জনগণের ক্ষতি করে লাভ হয় এদেশের তাগুতগোষ্ঠীর, ভন্ড মিডিয়ার কতিপয় ব্যক্তিবর্গের, কিছু চাটুকারের এবং বিদেশী শয়তানদের।

[৮] সহীহ বুখারী

কেউ যেন আমাদের ঘনিষ্ঠ হতে না পারে। আমরা অপমানিত করবো তাকে, যে আল্লাহর দ্বীনকে ঘৃণা করে এবং আল্লাহর দ্বীনের অবমাননা করে, যদিও সে আমাদের নিকটতম ব্যক্তি হয়ে থাকে।

এই মাইলফলকগুলো আল্লাহর দ্বীনের সর্বশ্রেষ্ঠ মাইলফলক, আমার ভাইয়েরা। "আল ওয়ালা ওয়াল বারা" (আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং ঘৃণা) এর মাইলফলক, ঈমানের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতল।

ঈমানের কিছু হাতল রয়েছে। এর মানে হলো সেই হাতলসমূহ যা মানুষেরা আঁকড়ে ধরে। কিছু মানুষ আছে যারা ঐচ্ছিক বা নফল ইবাদতসমূহ এবং তার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার হাতলগুলো আঁকড়ে ধরে রাখে এবং সর্বাপেক্ষা মূল্যবান হাতলটিকে পরিত্যাগ করে।

এই মূল্যবান হাতল, যা হলো ঈমানের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হাতল, তা হলো আল্লাহর জন্য ভালোবাসা, আল্লাহর জন্য ঘৃণা, তাঁর জন্য বন্ধুত্ব এবং তাঁর জন্য শত্রুতা।

আপনার বন্ধু কারা? কারা আপনার প্রিয়পাত্র? কারা আপনার অভিভাবক? কাদেরকে আপনি নিজের নিকটে আনেন? কাদের সাথে আপনি বন্ধুত্ব করেন? কাদেরকে আপনি সহায়তা করেন? নিজেকে এই প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করুন। নিজের কাছে জবাবদিহি চান।

তাকিয়ে দেখুন কাদেরকে আপনি দান করেন এবং কাদেরকে দান করা থেকে আপনি বিরত থাকেন। কারণ যাদেরকে আপনি দান করেন, আপনার প্রিয়পাত্র, আপনার ঘৃণার পাত্র, আপনার ঘনিষ্ঠ, আর আপনার শত্রু; এসবই নির্ধারণ করতে হবে আল্লাহর জন্য এবং শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য।

আপনার কাছের লোক হবে তারা, যারা এই দ্বীনকে বিজয় দান করে, এবং যারা এই দ্বীনকে ভালোবাসে, এবং যারা এই দ্বীনের অনুসরণ করে। আর আপনার দূরের লোক হবে তারা, যারা এই দ্বীনের শত্রু, যারা এই দ্বীনের বিরুদ্ধে লড়াই করে; এমনকি যদিও এই লোকেরা হয় আপনার পরিবারের নিকটতম সদস্য।

হে আল্লাহর বান্দা, অন্য কোনো মানদন্ডকে স্থান দিও না! পরিবারের মানদন্ড, অন্তরঙ্গতার মানদন্ড, দেশ ও জাতীয়তাবাদের মানদন্ড; এইগুলোকে ঈমান ও দ্বীনের মানদন্ডের উপরে স্থান দিও না। ঈমানের মানদন্ডের উপরে অন্য কোনো মানদন্ডের স্থান নেই।

এবং গভীরভাবে চিন্তা করো, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কথা, যিনি সৃষ্টির মাঝে সবচেয়ে দয়ালু, চিন্তা করো তাঁর পরিস্থিতির কথা। দেখো কিভাবে এই দ্বীন, এই বিশ্বাস একজন ব্যক্তি ও তার পুত্রের মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে, আর এর একটি অন্যতম সর্বোত্তম উদাহরণ হচ্ছেন নূহ (আলাইহিস সালাম)।

যখন আল্লাহ তাঁকে (আলাইহিস সালাম) তাঁর পুত্র সম্পর্কে বলেছিলেন,

قَالَ يَـٰنُوحُ إِنَّهُۥ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۖ إِنَّهُۥ عَمَلٌ غَيْرُ صَـٰلِحٍ ۖ فَلَا تَسْـَٔلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۖ إِنِّىٓ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَـٰهِلِينَ ﴿٤٦﴾

তিনি (আল্লাহ) বললেন: “হে নূহ! এই ব্যক্তি তোমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয়, সে অসৎ কর্মপরায়ণ, অতএব, তুমি আমার কাছে এমন বিষয়ের আবেদন করো না, যে সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান নেই; আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তুমি অজ্ঞ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।”[৯]

তিনটি মৌলিক মূলনীতি, আমাদের উলামাগণ এর এই নাম দিয়েছেন কারণ এটা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ মূলনীতি। আল্লাহর তাওহীদ সুসম্পন্ন করা, এবং এই দ্বীনকে অনুসরণ করা যেভাবে আল্লাহ ভালোবাসেন এবং সন্তুষ্ট থাকেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে অনুসরণ করা, এবং তাঁকে নিজের আদর্শ বানানো; আর এমন অবস্থায় পৌঁছা যে, এগুলোই ছিল তার জীবন ও অন্তরের চাহিদা।

এই তিনটি এমন বিষয় যার উপর বাস্তবিকই আমাদের এই জীবন অতিবাহিত করা উচিৎ, যাতে আল্লাহ আমাদেরকে সফলতা দান করেন, এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন যারা এই স্থানে (কবরে) সাঈদ (সুখী), এবং যাতে আমরা এমন দিনে অনুশোচনা না করি যেদিন অনুশোচনা আমাদের কোনো কাজে আসবে না।

আমি আল্লাহ জাল্লা ওয়া আলা এর কাছে দোয়া করি যাতে তিনি ক্ষমা করেন আমাদের জীবিত ও মৃতদেরকে, যারা অনুপস্থিত তাদেরকে, আমাদের পুরুষ ও মহিলাদেরকে, এবং সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক নবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর সাহাবীগণের উপর।

---

[৯] সূরা হূদ, আয়াত: ৪৬

প্রখ্যাত শাইখ আবু মুহাম্মদ আসিম আল-মাকদিসী (আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন) রচিত

তাগুতকে প্রত্যাখ্যান এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন

লেখক: আবু মুহাম্মদ আসিম আল-মাকদিসী

পরিবেশনায়: বালাকোট মিডিয়া

لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

দ্বীনের মধ্যে কোনো জবরদস্তি নাই। নিশ্চয়ই সঠিক পথ ভুল পথ থেকে পৃথক হয়ে গেছে। সুতরাং, যে তাগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করে, তাহলে সে যেন এমন মজবুত হাতলকে আঁকড়ে ধরলো যা কখনোই ভাঙবে না। এবং আল্লাহ তাআলাই হচ্ছেন সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।[১]

---

[১] সূরা বাকারা, আয়াত: ২৫৬

প্রত্যেকের জানা উচিত যে, আল্লাহ তাআলাই প্রতিটি বস্তু ও প্রতিটি জীবের সৃষ্টিকারী ও পালনকারী পরম সত্তা। নামায, যাকাত বা অন্য যেকোনো ইবাদতের পূর্বে দৃঢ়তম যে বিষয়টির জ্ঞানার্জন ও প্রয়োগের জন্য আল্লাহ তাআলা আদম সন্তানদেরকে আদেশ করেছেন তা হচ্ছে আল্লাহ তাআলার একত্ববাদে ঈমান আনয়ন করা এবং অন্য সকল ইলাহকে (অর্থাৎ তাগুতকে) প্রত্যাখান ও অবিশ্বাস করা। আর এজন্যই আল্লাহ তাআলা জীব সৃষ্টি করেছেন, তাদের মধ্যে নবী-রাসূলদের (আলাইহিমিস সালাম) পাঠিয়েছেন, কিতাব ও সহীফা নাযিল করেছেন এবং জিহাদ ও শাহাদাতের আদেশ দিয়েছেন। এজন্যই রয়েছে পরম করুণাময়ের অনুসারীগণ ও শয়তানের অনুসারীদের মধ্যে চিরশত্রুতা, আর এজন্যই প্রতিষ্ঠিত করা হবে মুসলিম জাতি ও সঠিক খিলাফত ব্যবস্থা।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

এবং আমি মানুষ ও জ্বিন জাতিকে শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।[২]

যার মানে হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহ তাআলারই ইবাদত করতে হবে। তিনি আরো বলেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلطَّٰغُوتَ

এবং নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তারা যেন শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করে এবং তাগুতকে বর্জন করে,...[৩]

আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই (অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কোনো উপাস্য নেই) - এই বিশ্বাসই হচ্ছে ইসলামের মূল বিশ্বাস। এর অনুপস্থিতিতে কোনো দোয়া, কোনো নামায, কোনো রোজা, কোনো যাকাত, কোনো হজ্জ গৃহীত হবে না। এই বিশ্বাস না থাকলে কেউই জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাবে না, কারণ এটিই একমাত্র হাতল যার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা নিশ্চয়তা দিচ্ছেন যা কখনোও ভাঙবার নয়। এই হাতলকে ছাড়া দ্বীনের অন্যান্য হাতল জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাবার জন্য যথেষ্ট হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

---

[২] সূরা যারিয়াত, আয়াত: ৫৬

[৩] সূরা নাহল, আয়াত: ৩৬

لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

দ্বীনের মধ্যে কোনো জবরদস্তি নাই। নিশ্চয়ই সঠিক পথ ভুল পথ থেকে পৃথক হয়ে গেছে। সুতরাং, যে তাগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করে, তাহলে সে যেন এমন মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরলো যা কখনোই ভাঙবে না। এবং আল্লাহ তাআলাই হচ্ছেন সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।[৪]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَنَبُواْ ٱلطَّٰغُوتَ أَن يَعۡبُدُوهَا وَأَنَابُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلۡبُشۡرَىٰۚ فَبَشِّرۡ عِبَادِ ﴿١٧﴾

যারা ইবাদত না করার মাধ্যমে তাগুতকে প্রত্যাখান করে এবং অনুশোচনার সাথে আল্লাহ তাআলার অভিমুখী হয়, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। অতএব, আমার বান্দাদেরকে সুসংবাদের ঘোষণা দাও।[৫]

লক্ষ্য করে দেখুন যে, আল্লাহ তাআলা কিভাবে তাঁর নিজের প্রতি বিশ্বাসের ব্যাপারে কথা বলার পূর্বে তাগুতের প্রতি অবিশ্বাসের কথা বলেছেন; কিভাবে তিনি হ্যাঁ-বাচক উক্তির পূর্বে না-বাচক উক্তি দিয়ে শুরু করেছেন। "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (নেই কোনো ইলাহ, আল্লাহ ছাড়া) এই বাক্যের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাঁর তাওহীদের (একত্ববাদ) নির্দেশ দিচ্ছেন, শক্ত হাতলের সেই মহান মূলনীতির প্রতি নির্দেশ করছেন। অতএব, অন্যান্য তাগুতের প্রতি চরম প্রত্যাখ্যান ছাড়া আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশ্বাসে আন্তরিকতা (অর্থাৎ, নির্ভেজাল ঈমান) আসতে পারে না।

তাগুত হচ্ছে সেই সকল মিথ্যা মাবুদ যার প্রতি প্রত্যেককেই অবিশ্বাস স্থাপন করতে হবে এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে একে প্রত্যাখ্যান করতে হবে, যেন আল্লাহ প্রদত্ত নিরাপত্তার সেই দৃঢ় ও শক্ত হাতলকে আঁকড়ে ধরে থাকা যায়। তাগুত শুধুমাত্র পাথর, মুর্তি, গাছ বা কবর নয় যেগুলোর প্রতি সিজদাবনত হয়ে বা আবাহন জানিয়ে অথবা যেগুলোর নামে শপথ করে ইবাদত করা হয়, বরং এর অর্থ আরো ব্যাপক। আল্লাহর পরিবর্তে ইবাদত করা হয় এবং সে এই ইবাদত গ্রহণ করে –

---

[৪] সূরা বাকারা, আয়াত: ২৫৬

[৫] সূরা যুমার, আয়াত: ১৭

এমন সকল কিছুই তাগুতের অন্তর্ভুক্ত, তা ইবাদত বা আনুগত্য প্রদর্শনের যে কোনো কাজের মাধ্যমেই করা হোক না কেন।

তাগুতের উদ্ভব হয় জুলুম থেকে, যা সংগঠিত হয় সৃষ্টি কর্তৃক সীমালঙ্ঘনের মাধ্যমে। ইবাদতের কাজসমূহের মধ্যে রয়েছে ভক্তি প্রদর্শন, সিজদাবনত হওয়া, আবাহন করা, শপথ করা, জবাই করা ইত্যাদি। কারোও আইনের প্রতি আনুগত্য থাকাও একটি ইবাদত। আল্লাহ তাআলা খ্রীষ্টানদের সম্পর্কে বলেন,

ٱتَّخَذُوٓاْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَـٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ

তারা তাদের পন্ডিত ও ধর্মযাজকদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে রব হিসেবে গ্রহণ করেছিল...[৬]

যদিও তারা তাদের পন্ডিত ও ধর্মযাজকদেরকে সিজদা করতো না, তাদের প্রতি অবনত হতো না, কিন্তু যখন তারা (তাদের পন্ডিত ও ধর্মযাজকেরা) হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করলো তখন তারা তাদের আনুগত্য ও অনুসরণ করেছিল। এটাকেই আল্লাহ তাআলা তাদের ইবাদত হিসেবে উল্লেখ করেছেন, কারণ আইনের আনুগত্য ইবাদতেরই অন্তর্ভুক্ত এবং আইন দেবার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তাআলার। কাজেই, যে কেউ তা করবে সে মুশরিক হয়ে যাবে।

এর একটি প্রমাণ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সময়ের একটি ঘটনা যা একটি মৃত ছাগলকে কেন্দ্র করে পরম করুণাময় আল্লাহর অনুসারীগণ ও শয়তানের অনুসারীদের মধ্যে সংগঠিত হয়।

মুশরিকরা মুসলমানদের বিশ্বাস করাতে চাচ্ছিল যে, যে ছাগল মুসলমানেরা জবাই করে এবং যে ছাগল নিজে নিজেই মারা যায় তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তারা দাবি করছিল যে, যে ছাগল নিজে নিজেই মারা যায় সেটিকে আল্লাহ তাআলা বধ করেছেন। ফলে আল্লাহ তাআলা তাঁর বিধান নাযিল করেন এবং বলেন,

وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾

...এবং যদি তোমরা তাদের আনুগত্য করো (মৃত প্রাণী খাওয়া বৈধ করে নেয়ার মাধ্যমে), তাহলে তোমরা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।[৭]

---

[৬] সূরা তাওবা, আয়াত: ৩১

সুতরাং, যে কেউ নিজেকে আইনপ্রণেতা বা আইনসভার প্রতিনিধি বানায় অথবা অপরকে এই কাজের জন্য নির্বাচন করে, তারা সবাই "তাগুত" এর অন্তর্ভুক্ত – হোক সে শাসক বা শাসিত। কারণ সে আল্লাহর দেয়া সীমা অতিক্রম করেছে। মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহ তাআলার বন্দেগী করার জন্য এবং আল্লাহ মানুষকে তাঁর প্রণীত আইনসমূহ মেনে চলতে আদেশ করেছেন, কিন্তু অনেক মানুষই আল্লাহর আইনকে প্রত্যাখ্যান করে এবং তার সীমা ছাড়িয়ে যায়।

মানুষ নিজেকে আল্লাহর সমান করতে চায়, এবং যে আইন প্রণয়ন হলো একমাত্র আল্লাহর অধিকার সেই অধিকারে সে অংশ নিতে চায় - যা কখনোই অনুমোদিত নয়। যদি কেউ এই সীমা ছাড়িয়ে গিয়ে তা করে ফেলে তবে সে নিজেকে আইনপ্রণয়নকারী "রব" এ পরিণত করে এবং সে তাগুতদের অন্যতম নেতায় পরিণত হবে। তার ইসলাম ও তাওহীদে (একত্ববাদ) বিশ্বাস গ্রহণযোগ্য হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না, সে এই পর্যন্ত যা করেছে তা অবিশ্বাস ও প্রত্যাখ্যান করে এবং এর (তার পূর্বের বিশ্বাসের) অনুসারী ও সাহায্যকারীদের থেকে মুক্ত হবার জন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدۡ أُمِرُوٓاْ أَن يَكۡفُرُواْ بِهِۦ وَيُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمۡ ضَلَٰلَۢا بَعِيدٗا ٦٠

...এবং তারা (বিরোধের ক্ষেত্রে) ফায়সালার জন্য তাগুতের কাছেই যেতে চায় যদিও তারা তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য আদিষ্ট হয়েছে। কিন্তু শয়তান তাদেরকে সুদূর বিপথে নিয়ে যেতে চায়।[৮]

মুজাহিদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, "তাগুত হচ্ছে মানুষের ছদ্মবেশী শয়তান যার কাছে মানুষ বিচার-ফায়সালার জন্য যায় এবং তার আনুগত্য করে।"[৯]

---

[৭] সূরা আনআম, আয়াত: ১২১

[৮] সূরা নিসা, আয়াত: ৬০

[৯] তাফসীর ইবনে কাসীর

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, "...এজন্য যে কেউ পবিত্র গ্রন্থ কোরআনের বিধান ছাড়া ফায়সালা করে সে হচ্ছে তাগুত।"[১০]

ইবনুল কাইয়্যুম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, "এমন প্রত্যেকেই তাগুত যারা সীমা অতিক্রম করে যা হতে পারে ইবাদত, অনুসরণ কিংবা আনুগত্যের ক্ষেত্রে। সুতরাং, যেকোনো মানবগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে তাগুত হচ্ছে সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পরিবর্তে বিচারক হিসাবে মানা হয়, অথবা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত করা হয়, অথবা আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে যাকে অনুসরণ করা হয়, অথবা অজ্ঞতাবশত যার আনুগত্য করা হয় এমন বিষয়ে যেখানে আনুগত্য শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত।" তিনি আরো বলেন, "আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিচার-ফায়সালা করার জন্য যে বিধি-বিধান নিয়ে এসেছেন তা অনুযায়ী যে ব্যক্তি বিচার-ফায়সালা করে না অথবা তার অনুসরণ করে না, সে নিশ্চিতভাবেই একটি তাগুতের অনুসরণ করছে।"[১১]

বর্তমান সময়ে ইবাদতকৃত এমন একটি তাগুত, যার প্রতি ও যার অনুসারীদের প্রতি প্রত্যেক তাওহীদপন্থী মানুষের অবিশ্বাস পোষণ করতে হবে যেন সে আল্লাহ প্রদত্ত সেই দৃঢ়তম মজবুত হাতলটি ধরার মাধ্যমে নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করতে পারে, তা হচ্ছে এই ক্ষণস্থায়ী মানব সৃষ্ট দেব-দেবী যা হলো তথাকথিত আইনপ্রণেতা।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُا۟ شَرَعُوا۟ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ
لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢١﴾

অথবা তাদের কি আল্লাহর সাথে অংশীদার আছে যারা তাদের জন্য একটি দ্বীন নিয়ে এসেছে আল্লাহ যার অনুমতি দেন নি? ফায়সালার ঘোষণা না থাকলে তাদের বিষয়ে তো সিদ্ধান্ত হয়েই যেতো। এবং নিশ্চয়ই জালেমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।[১২]

---

[১০] মাজমূ আল ফাতাওয়া, খন্ড: ২৮, পৃষ্ঠা: ২০১

[১১] ইলাম আল মুওয়াকিঈন, খন্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৫০

[১২] সূরা শূরা, আয়াত: ২১

অনেক মানুষই এসব বিধানদাতাদের গ্রহণ করেছে এবং আইন প্রণয়ন করার বিষয়টিকে তাদের জন্য, তাদের সংসদের জন্য, এবং তাদের আঞ্চলিক, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক শাসন কর্তৃত্বের জন্য একটি অধিকার ও বৈশিষ্ট্য হিসেবে মেনে নিয়েছে। তারা এটা প্রমাণ করেছে তাদের আইন-কানুন এবং সংবিধানের মাধ্যমে, যার বাস্তবতা তাদের জানা রয়েছে।

- কুয়েতী সংবিধানের ৫১ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা আছে: "সংবিধান মোতাবেক, আইন প্রণয়নকারী কর্তৃত্ব পরিচালিত হবে রাজপুত্র ও সংসদীয় পরিষদের মাধ্যমে।"
- জর্দানের সংবিধানের ২৫ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা আছে: "বাদশাহ ও সংসদীয় পরিষদই আইন প্রণয়নের ক্ষমতার অধিকারী।"
- মিশরীয় সংবিধানের ৮৬ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা আছে: "সংসদই হচ্ছে আইন প্রণয়নকারী কর্তৃত্ব।"

অতএব, তারা এমন প্রত্যেক ব্যক্তির রব হয়ে বসে আছে যারা তাদের আনুগত্য ও অনুসরণ করে, অথবা এই কুফরী ও শিরকের ব্যাপারে তাদের সাথে একমত পোষণ করে, ঠিক যেমনটি আল্লাহ তাআলা খ্রীষ্টানদের ব্যাপারে বলেছেন যখন তারা তাদের পন্ডিত ও ধর্মযাজকদের অনুসরণ করেছিল। আজকের এই গণতন্ত্রের অনুসারীরা[১৩] ও প্রয়োগকারীরা[১৪] আরোও বেশী নিকৃষ্ট ও অপবিত্র, কারণ সেই ধর্মযাজকেরা এমনটি করেছিল (অনুচ্ছেদের আলোচ্য কর্ম), কিন্তু তারা তাদের কর্মকে আইন বা বৈধ পদ্ধতি বলে দাবি করতো না, অথবা এসব নিয়ে তারা কোনো সংবিধান বা পুস্তক তৈরি করতো না। এছাড়াও সেই সময়ে কোনো ব্যক্তি তাদের সেসব সিদ্ধান্ত অমান্য বা অগ্রাহ্য করলে তাকে তারা কোনো শাস্তি প্রদান করতো না। তারা তাদের এমন কর্মের সাথে আল্লাহর কিতাবের সামঞ্জস্য তৈরি করার কোনো হীন চেষ্টাও করতো না যেমনটা এই তাগুতগুলো করে থাকে।

---

[১৩] যারা "গণতন্ত্র" নামক মতবাদে বিশ্বাস করে এবং এর অনুসরণ করে।

[১৪] যারা "গণতন্ত্র" নামক মতবাদ বাস্তবায়নে সরাসরি অংশগ্রহণ করে। যেসকল দেশে ইসলামী শরীয়তের বদলে গণতন্ত্রের দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করা হয়, সেসকল দেশের শাসকবর্গ এবং বিচার বিভাগ, আইন বিভাগ ও প্রতিরক্ষা বিভাগে নিয়োজিত গোষ্ঠীগুলো এই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও, যারা গণতন্ত্রের প্রচারণা চালায় তারাও এর অন্তর্ভুক্ত।

যদি আপনি এটা বুঝতে পারেন, তাহলে আপনার জানা উচিৎ যে, ঈমানের এই সর্বাপেক্ষা মজবুত হাতলকে আঁকড়ে ধরতে মহত্তম পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং মানব-সৃষ্ট দেব-দেবীদের প্রতি অবিশ্বাস পোষণ করতে সর্বোচ্চ পদক্ষেপ গ্রহণ করাই হচ্ছে ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া।

উ'বুদিয়্যাহ সংক্রান্ত উপদেশ ও পরামর্শসমূহ

আওরাক্ব মিন দাফতার সাযিন এর ষষ্ঠ পত্র হতে সংগৃহীত

শেইখ আবু মুহাম্মাদ আসিম আল মাক্বদিসী কর্তৃক রচিত

(আল্লাহ্‌ তাঁকে হিফাজত করুন)

কারাগারের কঠোর দেয়াল বেষ্টনীতে রচিত চিঠিটি অত্যন্ত প্রিয় কতিপয় ভাইদের প্রতি সমর্থন এবং অনুস্মারক হিসেবে প্রেরিত হয়েছিল;

ইমাম ইবনে আল ক্বাইয়্যিম রচিত আল-ওয়াবিল আস-সায়্যিব এবং ইগহাথাহ আল-লাহফান পুস্তকদ্বয়ের কিছু উক্তির বর্ণনানুসারে-

প্রশংসা কেবল আল্লাহর জন্য এবং শান্তি ও প্রীতি সম্ভাষণ বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূল ﷺ, তাঁর পরবারবর্গ, তাঁর সাহাবাগণ এবং তাঁর অনুসারী সকলের প্রতি। ওয়া বা'আদঃ

আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি আল-আ'লিয়্যি আল ক্বাদির (যিনি অতি মহিমান্বিত, সমগ্র ক্ষমতার অধিকারী) আল্লাহ্ তা'য়ালা যেন তোমাদেরকে তাদের অন্তর্ভূক্ত করেন, যাদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হলে শুকরিয়া আদায় করে এবং যারা কঠিন পরীক্ষায় আপতিত হলে দৃঢ়ভাবে সবর করে এবং যারা গুণাহতে লিপ্ত হয়ে পড়লে তওবাহ করে--

নিশ্চিতভাবে, এই তিনটি বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে আল্লাহর একজন দাসের জন্য সুখ ও শান্তির পথ এবং এগুলোই হচ্ছে তার সাফল্যের মূলসূত্র এই দুনিয়ায় এবং অবশ্যই আখিরাতেও।

আল্লাহর একজন দাসকে অনবরত এই তিনটি জিনিসের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হতে হয়ঃ

প্রথমতঃ

আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ যা তিনি সর্বদা তাঁর দাসদের উপর বর্ষণ করতে থাকেন। এবং এ কারণে সে বাধ্য থাকে শুক্‌র গুজার হতে (কৃতজ্ঞতা, সন্তুষ্ট, নেয়ামতসমূহের স্বীকৃতি) এবং তা গঠিত হয়েছে তিনটি স্তম্ভের উপরঃ

(১) অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আল্লাহর নেয়ামত সমূহের যথাযথ উপলব্ধি করা।
(২) আল্লাহ্ প্রদত্ত নেয়ামত সম্পর্কে প্রকাশ্যে বলা।
(৩) এ সমস্ত নেয়ামতের সদ্ব্যবহার করা তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য যিনি এগুলোর মালিক যিনি এগুলো প্রদান করেছেন।[১]

---

[১] উলামাগণ হাম্‌দ (আল্লাহর গুণগান করা) এবং শুক্‌র (আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা) এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপন করে উল্লেখ করেছেন- হাম্‌দ করা হয় শব্দগুচ্ছের মাধ্যমে, যেমনটি আল্লাহ্ উল্লেখ করেছে,

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا

"বলুনঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি না কোন সন্তান রাখেন, না তাঁর সার্বভৌমত্বে কোন শরীক আছে এবং যিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না, যে কারণে তাঁর কোন সাহয্যকারীর প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং আপনি স-সম্ভ্রমে তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে থাকুন।"(সূরা বানী ইসরাঈলঃ ১১১),

আর শুকরের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ

"তারা সোলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী দুর্গ, ভাস্কর্য, হাউযসদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং চুল্লির উপর স্থাপিত বিশাল ডেগ নির্মাণ করত। হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতা সহকারে তোমরা কাজ করে যাও। আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পসংখ্যকই কৃতজ্ঞ।"(সূরা সাবাঃ ১৩)

আর এভাবেই, আল্লাহ্‌র পুরস্কার সমূহের সদ্ব্যবহার করা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই যাতে করে আমাদের রব প্রদত্ত পুরস্কার এবং নেয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শিত হয়। এবং সেগুলো রবকে সন্তুষ্ট করার জন্য ব্যবহার না করা এবং রবের অবাধ্য হয়ে তাঁর প্রদত্ত নেয়ামতসমূহ ব্যবহার এটা কুফর (অকৃতজ্ঞতা, আল্লাহর রহমতের প্রতি অস্বীকৃতি)। যেমনটি আল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন,

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ

দ্বিতীয়তঃ

কষ্ট ক্লেশ যা দ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাকে পরীক্ষা করে থাকেন। এবং তাতে আবশ্যক হচ্ছে সাবর (ধৈর্য্য ও সহনশীলতা) এবং এটাও তিনটি স্তম্ভের ভিত্তিতে গঠিতঃ

১. আল্লাহর হুকুম আহকামের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকা, অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম আহকামের প্রতি সর্বদা সন্তুষ্ট থাকা।

২. জিহ্বা কে অভিযোগ করা থেকে বিরত রাখা।

৩. আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে দেহের অঙ্গ প্রত্যেঙ্গকে বিরত রাখা।

অতএব, যখন আল্লাহর দাসেরা এই তিনটি শর্ত পরিপূর্ণ করতে সক্ষম হয়, তখন কষ্ট ক্লেশ মিষ্টতা লাভ করে আর পরীক্ষা রূপান্তরিত হয় বরকতে এবং অপ্রিয়রা তখন পরিণত হয় আল্লাহর প্রিয়পাত্রে...

প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ তাঁর বান্দাকে কষ্টক্লেশে পতিত করেন তাকে বিধ্বস্ত করার জন্য নয়; বরং তিনি তাকে কষ্টে ফেলেন তার সবর এবং উবুদিয়্যাহর (বশ্যতা, দাসত্ব) পরীক্ষা নেবার জন্য।

কেননা, বান্দা আল্লাহকে দু'ধরনের উবুদিয়্যাহ দিতে বাধ্য-"ধাররা (দুঃখ-দুর্দশা বা প্রতিকূল অবস্থার) সময়ে উবুদিয়্যাহ এবং সাররা (সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বা অনুকুল অবস্থার) সময়ে উবুদিয়্যাহ।

আল্লাহর প্রতি বান্দার উবুদিয়্যাহ (বশ্যতা, দাসত্ব) পালন করতে গিয়ে এমন কিছু করতে হয় যা বান্দাকে অসন্তুষ্ট করে, তবুও তাকে তা পালন করতে হবে, ঠিক সেভাবেই যেভাবে সে সন্তুষ্টচিত্তে কিছু পালন করে থাকে।

"কিতাবের জ্ঞান যার ছিল, সে বলল, আপনার দিকে আপনার চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দেব। অতঃপর সুলায়মান যখন তা সামনে রক্ষিত দেখলেন, তখন বললেন এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, না অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে নিজের উপকারের জন্যেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে জানুক যে, আমার পালনকর্তা অভাবমুক্ত কৃপাশীল।" (সূরা আন-নামলঃ ৪০)

এবং আল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন ইব্রাহীম ﷺ সম্বন্ধে,

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

"নিশ্চয় ইবরাহীম ছিলেন এক সম্প্রদায়ের প্রতীক, সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে এক আল্লাহ্রই অনুগত এবং তিনি শিরক কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তিনি তাঁর অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী ছিলেন। আল্লাহ্ তাঁকে মনোনীত করেছিলেন এবং সরল পথে পরিচালিত করেছিলেন।" (সূরা আন-নাহলঃ ১২০-১২১)

এবং শুক্রের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্র কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পন এবং তাঁর দাসত্ব করা, যেমনটি আল্লাহ্ বলেছেন,

بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ

"বরং আল্লাহ্রই এবাদত করুন এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত থাকুন।" (সূরা আয-যুমারঃ ৬৬)

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لازِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

"যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করলেন যে, যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তবে তোমাদেরকে আরও দেব এবং যদি অকৃতজ্ঞ হও তবে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি হবে কঠোর।" (সূরা ইব্রাহীমঃ ৭)

এবং আমাদের রব প্রতিজ্ঞা করেছেন,

এবং অধিকাংশ মানবকূল তাদের জন্য সহজসাধ্য ব্যাপারে অধীনস্থতা পালন করে ... কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে যা করতে তারা অসন্তোষ বোধ করে সেটা পালন করাতেই প্রকৃত দাসত্ব।

যেমন, প্রচন্ড গরমে ঠান্ডা পানি দ্বারা ওযু করাটা উবুদিয়্যাহ।

সুন্দরী স্ত্রীর সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বজায় রাখা- উবুদিয়্যাহ এবং তার প্রয়োজন মেটাতে খরচ করাটাও- উবুদিয়্যাহ।

......আর ঠান্ডা পানি দ্বারা প্রচন্ড শীতে ওযু সমাধা করা, সেটাও উবুদিয়্যাহ বৈকি,

এবং যখন মনের কামনা কোন স্ত্রীলোককে পেতে গভীরভাবে প্রলুব্ধ করে, তখন সেই আকাংক্ষা পরিত্যাগ করা -কোন মানুষের ভয়ে ভীত হয়ে নয়- সেটা উবুদিয়্যাহ।

এবং অভাব অনটন এবং দরিদ্রতার ভয় সত্ত্বেও সাদাকা করাও উবুদিয়্যাহ।

পক্ষান্তরে, উভয় ধরনের উবুদিয়্যাহর মধ্যকার পার্থক্য ব্যাপক। যার ফলে, বান্দারা একে অন্যের চেয়ে স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে এবং তদানুসারেই তারা তাদের রবের চোখে পদমর্যাদা প্রাপ্ত হয়।

এবং উভয়াবস্থায় আল্লাহর যেকোন বান্দা, যদি সে আল্লাহর অধিকার সমূহ সম্পূর্ণ করে তার দুঃসময়ে এবং সুসময়ে তবে এই বান্দাটাই হবে সে যার উল্লেখ আল্লাহ তাঁর বানীতে করেছেন,

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

"আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? অথচ তারা আপনাকে আল্লাহ্র পরিবর্তে অন্যান্য উপাস্যদের ভয় দেখায়। আল্লাহ্ যাকে গোমরাহ করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই।"[২]

এবং পরিপূর্ণ বশ্যতা থেকেই আসে বিশুদ্ধ যথাযোগ্যতা এবং অসম্পূর্ণ বশ্যতা আনে আংশিক যোগ্যতা।

অতএব, যে কেউই মঙ্গলের সন্ধানী, সে যেন আল্লাহর প্রশংসা এবং শুকরে নিজেকে ব্যস্ত রাখে; অপরপক্ষে যে এছাড়া অন্য কিছু সন্ধান করে, তবে তাকে অন্য কাউকে নয় বরং নিজেকেই দোষী-সাব্যস্ত করতে হবে।

এবং এরাই হচ্ছে আল্লাহর প্রকৃত বান্দা- যাদের উপর তাদের শত্রুদের কোনই কর্তৃত্ব নেই। আল্লাহ্ তা'য়ালা ঘোষণা করেছেন (শয়তানের প্রতি),

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ

"যারা আমার বান্দা, তাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই; কিন্তু পথভ্রান্তদের মধ্য থেকে যারা তোমার পথে চলে।"[৩]

এবং আল্লাহ্ নিশ্চয়তা দান করেছেন সহযোগিতা করার এবং বিজয় দান করার তাঁর দ্বীনকে, তাঁর হিজবকে (দল) এবং তাঁর আউলিয়াদের (মিত্রদের, বন্ধুদের) যারা তাঁর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জ্ঞান এবং শ্রম উভয় দ্বারা অগ্রসর হয়। যেমন, আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেছেন,

وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ

---

[২] সূরা আয-যুমারঃ ৩৬

[৩] সূরা আল হিজ্রঃ ৪২

“আর আমার বাহিনীই হয় বিজয়ী।”[৪]

আল্লাহ্ তা'য়ালা আরও বলেছেন,

كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

”আল্লাহ্ লিখে দিয়েছেনঃ আমি এবং আমার রাসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব। নিশ্চয় আল্লাহ্ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।”[৫]

এবং তিনি (সর্বোচ্চ মহিমান্বিত) আরও বলেছেন,

“মূসা বললেন তাঁর কওমকে, আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্য্য ধারণ কর। নিশ্চয়ই এ পৃথিবী আল্লাহ্‌র। তিনি নিজের বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন এবং শেষ কল্যাণ মুত্তাকীদের জন্যই নির্ধারিত রয়েছে।”[৬]

তথাপি, একজন বান্দা তার ভাগের সাফল্য পেয়ে থাকে তার ঈমানের গভীরতা অনুযায়ী (মৌখিক স্বীকৃতি ও তদানুযায়ী আমল আহলে আস-সুন্নাহ্ ওয়াল-জামা'আহ্ অনুযায়ী)

এবং তাক্ওয়া (আল্লাহ্ ভীতি ও তাঁর বাধ্যতা)[৭] আল্লাহ্ (সুমহান) উল্লেখ করেছেন,

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“ আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও, তবে তোমরাই জয়ী হবে।”[৮]

তদানুসারে, একজন বান্দা ঈমানের গভীরতার অনুপাতে অধিকতর উন্নত মর্যাদা লাভ করে।

তিনি আরও বলেছেন,

“তারাই বলেঃ আমরা যদি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করি, তবে সেখান থেকে সবল অবশ্যই দূর্বলকে বহিস্কৃত করবে। শক্তি তো আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ও মুমিনদেরই কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।”[৯]

অতএব, একজন বান্দা ঈমানের অধিকার বলে ইজ্জত (সম্মান, ক্ষমতা এবং মহত্ব) প্রাপ্ত হয় এবং এর স্পষ্টতঃ তা প্রতীয়মান হয় তার আমলভেদে।

---

[৪] সূরা আস সাফ্ফাতঃ ১৭৩

[৫] সূরা মুজাদালাহঃ ২১

[৬] সূরা আল আ'রাফঃ ১২৮

[৭] আল্লাহ্ (পরম মহিমান্বিত) বলেন,

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ্ তার কাজ সহজ করে দেন।”(সূরা আত-তালাকঃ ৪)

[৮] সূরা আলে-ইমরানঃ ১৩৯

[৯] সূরা আল-মুনাফিকুনঃ ৮

সুতরাং, যদি কেউ যথাযথ ইজ্জত প্রাপ্ত না হয়- তবে বুঝতে হবে নিশ্চয়ই সেখানে তার বহির্ভূত এবং আভ্যন্তরীণভাবে ঈমানের করণীয় কিছু ছিল যা সে পরিত্যাগ করেছে এবং এটা তারই ফল, জ্ঞান এবং শ্রম উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ।

অনুরূপভাবে, কোন একজন বান্দার ঈমানের সমানুপাতে তা প্রতিরোধস্বরূপ হয় (অনিষ্টতা দূরীভূত করে)। যেমনঃ আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ

"আল্লাহ্ মুমিনদের থেকে শত্রুদেরকে হটিয়ে দেবেন। আল্লাহ্ কোন বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না।"[১০]

এবং সমানভাবে যোগ্যতার ক্ষেত্রেও, এটা ঈমানের তারতম্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, যেমন আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন,

"হে নবী, আপনার জন্য এবং যেসব মুসলমান আপনার সাথে রয়েছে তাদের সবার জন্য আল্লাহ্ যথেষ্ট।"[১১]

অর্থাৎ আল্লাহ্ই যথেষ্ট তোমার জন্যে এবং তোমার অনুসারীদের জন্যে, তিনিই তোমার এবং তাদের প্রয়োজন সাধনে সক্ষম- রসূল ﷺ এর অনুসরণের, আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পনের এবং তাঁর প্রতি তাদের আজ্ঞানুবর্তিতার আনুপাতিক হারে। অতএব, যে কেউই তা (আত্মসমর্পন এবং বাধ্যতা) পরিত্যাগ করে, তবে তদানুযায়ী সে অভাবগ্রস্থ হবে- এ সমস্ত আয়াতে যার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে।

আর আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আর মাযহাব হচ্ছে ঈমান কখনও বাড়ে, আবার কখনও কমে। ঠিক সেইভাবেই, বান্দার প্রতি আল্লাহ্র সুরক্ষা এবং সাহায্য বান্দার ঈমানের তারতম্যের সাথে আনুপাতিক হারে বাড়ে ও কমে। যেমনঃ মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা উল্লেখ করেছেন,

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ

"সেখানেই যাকারিয়া তাঁর পালনকর্তার নিকট প্রার্থনা করলেন। বললেন, হে, আমার পালনকর্তা! তোমার নিকট থেকে আমাকে পুত-পবিত্র সন্তান দান কর-নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী।"[১২]

এবং তিনি (পরম মহিমান্বিত) আরও বলেছেন,

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ্ তাদের অভিভাবক। তাদেরকে তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর যারা কুফরী করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হলো দোযখের অধিবাসী, চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে।"[১৩]

---

[১০] সূরা আল-হাজ্জঃ ৩৮

[১১] সূরা আল-আনফালঃ ৬৪

[১২] সূরা আলে ইমরানঃ ৬৮ উক্ত আয়াতের অর্থ আরও বেশী পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে সূরা আল-জাসিআহ এর ১৯ নম্বর আয়াতে,

"আর আল্লাহ্ পরহেযগারদের বন্ধু।"

[১৩] সূরা বাকারাঃ ২৫৭

অতএব, যদি বান্দার ঈমান কমে যায় এবং দূর্বল হয়ে পড়ে, তবে আল্লাহর তরফ থেকে তাদের নিরাপত্তা এবং আল্লাহর বিশেষ মা'ইয়্যাহ (ভাবার্থ, আল্লাহ্ সার্বক্ষণিকভাবে তাঁর বান্দার সাথে আছেন; অর্থাৎ তাঁর অলৌকিক সহযোগিতা দ্বারা) নির্ধারিত হয় সেই বান্দার ঈমানের ধাপ অনুযায়ী।

অনুরূপভাবে, বিজয় এবং পরিপূর্ণ সহযোগিতা নির্ধারিত শুধু পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারীদের জন্যে--- যেমনটি আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন,

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ

" আমি সাহায্য করব রসূলগণকে ও মুমিনগণকে পার্থিব জীবনে ও সাক্ষীদের দন্ডায়মান হওয়ার দিবসে।"[১৪]

এবং তিনি (পরম গৌরবান্বিত) আরও বলেছেন,

وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ

" তারা যখন কোন নিদর্শন দেখে তখন বিদ্রূপ করে।"[১৫]

অতএব যে কারোই ঈমানে ক্ষয় ঘটবে, তার বিজয় এবং সাহায্য প্রাপ্তির অংশেও ক্ষয় হবে।

এবং তা এ কারণেই যে, একজন বান্দা চরম দূর্দশাগ্রস্থ হয় তার নিজের ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে অথবা তার সম্পদের ব্যাপারে অথবা শত্রু তাকে খুঁজে ফেরে শুধু তার সীমালংঘন (আল্লাহর হুকুমের বিরূদ্ধে) করার ফলে- হয়তো বা এ কারণে যে সে কোন ওয়াজিব কাজ পরিত্যাগ করেছিল অথবা এ কারণে যে সে এমন কোন কাজ করেছিল যা ছিল হারাম। এবং এটাই হচ্ছে ঈমানের ক্ষয়।

এতদ্বারা বহুসংখ্যক মানুষ ভুল ধারণা পোষণ করে নিম্নলিখিত আয়াতের ব্যাপারেঃ

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

" ... এবং কিছুতেই আল্লাহ্ কাফিরদেরকে মুসলমানদের উপর বিজয় দান করবেন না।"[১৬]

কিছু সংখ্যক লোক বলে যে, আল্লাহ্ কুফ্ফারদেরকে আখিরাতে কখনও বিজয়ী করবেন না; যদিও অন্যেরা বলে যে আল্লাহ্ তাদেরকে বিজয় লাভ করার জন্য কোন হুজ্জাহ (ওযর) পেশ করার সুযোগ দান করবেন না।

কিন্তু গবেষণা এবং অনুসন্ধানের পর- এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এই আয়াতটি অন্যান্য সব আয়াতের মতোই... তা হলো কুফ্ফারদের প্রকৃত ঈমানদারদের উপর জয়লাভ করা বা তাদের ক্ষতিসাধন করার পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। যদি ঈমান দূর্বল হয়ে পড়ে, তবে তাদের শত্রুপক্ষ একধাপ এগিয়ে যায় তাদের থেকে সেই অনুপাতে যা সেই বান্দারা ঈমান হতে বর্জন করেছিল; এতদনুসারে, এরা সেসব বান্দাই যারা তাদের শত্রুদের জন্য পথ তৈরী করে দেয়, আল্লাহর আজ্ঞানুবর্তিতা থেকে কোন অংশ বর্জন করে।

---

[১৪] সূরা আল মু'মিনঃ ৫১

[১৫] সূরা আস-সাফ্ফাতঃ ১৪

[16] সূরা নিসাঃ ১৪১

অতঃপর, একজন মু'মিন প্রকৃতই সম্মানিত হয়, হয় বিজয়ী, সাহায্যপ্রাপ্ত এবং অভাবমুক্ত এবং প্রয়োজন সাধনে হয় সক্ষম, অনিষ্টতা থেকে হয় প্রতিরোধ্য, সে যেখানেই অবস্থান করুক না কেন- এমনকি শত্রুপক্ষ যেখান থেকেই আসুক না কেন স্থলপথ, জলপথ বা আকাশপথ থেকে... যতক্ষণ পর্যন্ত সে ঈমানের সত্যতা এবং আবশ্যকতা পরিপূর্ণভাবে বজায় রাখে, আন্তরিকভাবে এবং বাহ্যিকভাবে, এসবই সে প্রাপ্ত হতে থাকে। আল্লাহ্ (সুমহান) বলেছেন,

وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

" আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে, তোমরাই জয়ী হবে।"[১৭]

এবং তিনি (পরম গৌরবের অধিকারী) বলেছেন,

" অতএব, তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির আহবান জানাইও না, তোমরাই হবে প্রবল। আল্লাহ্ই তোমাদের সাথে আছেন। তিনি কখনও তোমাদের কর্ম হ্রাস করবেন না।"[১৮]

অতএব, এটাই হচ্ছে নিশ্চয়তা এবং এটা শুধু তাদের ঈমান (পরিপূর্ণতা) এবং তাদের ভাল আমলের মাধ্যমেই আসবে- যেটা হচ্ছে স্বক্ষেত্রে একটি সেনাবাহিনী, আল্লাহর সেনাবাহিনীর মধ্য হতে[১৯], যাদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের হেফাযত করেন[২০], এবং যা

---

[১৭] সূরা আলে-ইমরানঃ ১৩৯

[১৮] সূরা মুহাম্মদঃ ৩৫

[১৯] যেমনটি আল্লাহ্ (মহিমান্বিত তিনি) বলেছেন,

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلا مَلائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلا هُوَ وَمَا هِيَ إِلا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ

" আমি জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতাই রেখেছি। আমি কাফেরদেরকে পরীক্ষা করার জন্যেই তার এই সংখ্যা করেছি-যাতে কিতাবীরা দৃঢ়বিশ্বাসী হয়, মুমিনদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং কিতাবীরা ও মুমিনগণ সন্দেহ পোষণ না করে এবং যাতে যাদের অন্তরে রোগ আছে, তারা এবং কাফেররা বলে যে, আল্লাহ্ এর দ্বারা কি বোঝাতে চেয়েছেন। এমনিভাবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে চালান। আপনার পালনকর্তার বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন এটা তো মানুষের জন্যে উপদেশ বৈ নয়।"(সূরা আল-মুদ্দাস্সিরঃ ৩১)

এবং সুরা তালাক্ব:২-৩

[২০] যেমনটি হাদীস শরীফেও উল্লেখ করা হয়েছে,

অতএব যারা আল্লাহর খাঁটি বান্দা, তাদের উপর তাদের শত্রুদের কোনই কতৃত্ব নেই এবং এমনটি এ কারণেই যে তারা থাকে আল্লাহর স্মরণতলে, তাঁর হেফাজতে, তাঁর সুরফা পরিবেষ্টিত হয়ে এবং তাঁর নিরাপদ আশ্রয়ে।

এবং যেমনটি হাদীস শরীফেও উল্লেখ করা হয়েছে,

"তোমার ওপর আল্লাহর হক্ব আদায় কর, আল্লাহ তোমাকে হেফাযত করবেন; তোমার ওপর আল্লাহর হক্ব আদায় কর,তুমি তাঁকে সামনে পাবে(তিনি তোমাকে হিদায়াত করবেন)। কোন কিছু চাইলে আল্লাহর কাছে চাও; কোন সাহায্যের প্রয়োজন হলে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ কর । যা ঘটবার (তা লিপিবদ্ধ) করার পর কলম শুকিয়ে গেছে । যদি সমগ্র সৃষ্টি তোমার কোন কল্যাণ করতে চায়, এমন বিষয়ে যা আল্লাহ তোমার জন্য নির্ধারণ করেননি, তারা তা করতে পারবে না; আবার যদি সমগ্র সৃষ্টি তোমার কোন অকল্যাণ করতে চায়, এমন বিষয়ে যা আল্লাহ তোমার জন্য নির্ধারণ করেননি,তারা তা-ও করতে পারবে না। এবং জেনে রাখ, তুমি যা অপছন্দ কর তাতে ধৈর্য্য ধারণে প্রভূত কল্যাণ আছে-এবং ধৈর্য্যের সাথে বিজয় আর বেদনার সাথে আরাম রয়েছে-আর কষ্টের সাথে রয়েছে মুক্তি।" ইবন রজবের মতে হাসান জাইয়্যিদ,জামী আল উলুম আল হিকাম,(১/৪৫৯)। অন্য বর্ননায়," জেনে রাখ,সমস্ত পৃথিবী যদি তোমার কল্যাণ সাধনে সমবেত হয়,আল্লাহ যা লিখে রেখেছেন,তার চেয়ে বেশি কিছু করতে পারবে না;এবং সমস্ত পৃথিবী যদি তোমার অকল্যাণ সাধনে সমবেত হয়,আল্লাহ যা লিখে রেখেছেন,তার চেয়ে বেশি কিছু করতে পারবে না। কলম তুলে নেয়া হয়েছে আর পৃষ্ঠা শুকিয়ে গেছে।" সহীহ আত্ তিরমিযী(২০৪৩),আল আলবানীর মতে সহীহ,মিসকাত আল মাসাবীহ(৫২৩২),আল ওয়াদি ই,আল জামী আল সহীহ(২/৪৫৮),আল সহীহ আল মুসনাদ(৬৯৯) এবং ইবন হাজর,আল মুওয়াফাকা আল খাবর(১/৩২৮৮)

কখনও হ্রাস পায় না, ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ এর প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে না যায়, পক্ষান্তরে কাফির এবং মুনাফিকেরা তাদের মন্দের আমল থেকে ব্যবচ্ছেদ করে ফেলে... "অথচ সম্মান ও মর্যাদা তো আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মু'মিনদেরই।"

এবং যখন আল্লাহর শত্রু, অভিশপ্ত ইবলিস অবহিত হল যে, আল্লাহ্, তাঁর বান্দাদের তার হাতে সমর্পন করবেন না, না তাকে তাদের উপর কোন কর্তৃত্ব দেবেন- অতঃপর ইবলিস বলল,

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ

"সে বলল, আপনার ক্ষমতার শপথ! আমি তদের সকলকেই পথভ্রষ্ট করবো, তবে তাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাগণ ব্যতিত।"[২১]

এবং

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

"...আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ্ তার জন্যে নিস্কৃতির পথ করে দেবেন। এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ্ তার কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ্ সবকিছুর জন্যে একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন।"[২২]

অতঃপর, যদি আল্লাহ্র শত্রু তাদের মধ্য থেকে কারো গোপনে ক্ষতি সাধন করে- যেমন, অসতর্ক লোকের কাছ থেকে চোর কিছু চুরি করে নিয়ে যায়- তবে সেটা এমন একটি ব্যাপার যা আর এড়ানো সম্ভব না। প্রকৃতপক্ষেই, তখন সেই বান্দা হবে পরীক্ষিত, হবে অসতর্ক, আকাঙ্খিত এবং মানসিক অবস্থা দ্বারা পরীক্ষিত। ইবলিস তার মধ্যে প্রবেশ করবে এই তিনটি দরজা দ্বারা। যেভাবেই হোক না কেন বান্দা চেষ্টা করে, তার পক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠবে না অসতর্কতা, আকাঙ্খা এবং মানসিক অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া।

এবং বাস্তবিকপক্ষে মানবজাতির পিতা হযরত আদম ﷺ- যিনি সহনশীল ছিলেন সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে অন্যতম, অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং স্থির সংকল্প... তথাপি, আল্লাহর শত্রু তার বিপক্ষে থেমে থাকেনি, ততক্ষণ পর্যন্ত না যতক্ষণে সে তার আমলে পদস্থলন করে ত্রুটি করেছিলেন। অতএব, তাদের সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি দাঁড়ালো যাদের উচ্চাকাঙ্খা আরো তীব্র এবং যাদের বুদ্ধিমত্তা তাদের পিতা আদম ﷺ এর বুদ্ধিমত্তার তুলনায় কি রকম? যেন মহাসাগরে এক ফোঁটা পানির মতো।

কিন্তু আল্লাহর শত্রু প্রকৃত ঈমানদারদের কখনও পথভ্রষ্ট করতে পারে না, যদি না সে গোপন প্রতারণার শিকার হয় অসতর্কতার বশবর্তী হয়ে এবং যদি ইবলিস তার পদস্থলন ঘটিয়ে তার পতন ঘটাতে সক্ষম হয়, তখন সে ভাবতে শুরু করে সে তাকে আক্রমণ করতে সক্ষম হয়েছে এবং তাকে ধ্বংস করে ফেলেছে।

কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহ, তাঁর করুণা এবং মার্জনা, আর তাঁর ক্ষমা বিদ্যমন থাকে এসব কিছুর পেছনে; অতঃপর যদি আল্লাহ্ তাঁর বান্দার মঙ্গল চান, তবে তিনি তাঁর বান্দার জন্য উম্মুক্ত করে দেন তওবাহ ও আক্ষেপের দু'আর এবং তার অন্তরকে অবনত করে দেন,[২৩] এবং সে অনুধাবণ করা শুরু করে আল্লাহর রহমতের কতটা প্রয়োজন তার, সে আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করে এবং আন্তরিকভাবে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং সবসময় আল্লাহর কাছে বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাঁর কাছে দো'আ করে এবং

---

[২১] সূরা ছোয়াদঃ ৮২-৮৩

[২২] সূরা আত-তালাকঃ ২-৩

[২৩] সালাফদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ বলতেন, "তোমার অবাধ্যতার ক্ষুদ্রতাকে দেখো না, বরং লক্ষ্য করো যাঁর অবাধ্যতা তুমি করলে তাঁর বিশাল মহত্ব ও মহিমা।"

সম্ভব্য যে কোন পন্থা অবলম্বনে দ্বিধা করে না যা দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়, ভাল আমলের দ্বারা... ততক্ষণ পর্যন্ত যাতে প্রকৃতপক্ষে বান্দার গুনাহ তাকে পরিচালিত করে আল্লাহর ক্ষমা অর্জনের দিকে। সম্ভবতঃ তখন আল্লাহ্‌র শত্রু বলবে, "ধিক্ আমায়! তাকে আমি তার অবস্থায়ই ছেড়ে দিতাম, কেন যে তার পতন ঘটাতে বিরত হলাম না!"এটাই হচ্ছে তৃতীয় বিষয়।

তৃতীয়তঃ

বান্দা যখন কোন গুনাহ করে ফেলে, সে আফসোস শুরু করে এবং সে আল্লাহর মার্জনা ভিক্ষা করতে থাকে।

এটাই হচ্ছে কিছু সালাফদের উক্তির ভাবার্থঃ "নিশ্চয়ই একটি বান্দা হয়তো গুনাহ করে ফেলে, যার কারণে সে বেহেশতের বাগানে প্রবেশ করবে। এবং সে হয়তো বা কোন ভাল কাজ করে, যার কারণে সে প্রবেশ করবে আগুনের লেলিহান শিখায়।" কিছু মানুষ জানতে চাইলো, "সেটা কি করে সম্ভব?" তারা প্রত্যুত্তরে বলল, "সেই গুনাহর কারণে, বান্দার দু'চোখ অশ্রুপাত থামায়নি ভীতগ্রস্থ হয়ে, নিঃসঙ্গে চিন্তিত হয়ে আতংকিত, অনুতপ্ত হয়ে, তার রবের সম্মুখে লজ্জায় নতজানু হয়ে, অনুশোচনায় জর্জরিত হয়ে, ভগ্ন হৃদয়ে তার রবের কাছে হাত জোড় করে... অতএব, তার এই গুনাহ এবং তার এই অবস্থা- তার জন্য অন্যান্য অনেক ইবাদতের চেয়ে উত্তম- তার ফলে এমন পরিস্থিতি অতিক্রম করা, যা ঐ বান্দার জন্য পরবর্তীতে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এবং শান্তি বয়ে আনবে এবং আনবে তার সফলতা... ততক্ষণ পর্যন্ত না যতক্ষণে ঐ গুনাহ বান্দার জন্য বেহেশতের বাগানে প্রবেশের কারণ হয়ে না দাঁড়ায়।

এবং সম্ভবতঃ সে হয়তো কোন ভাল কাজ করল এবং সে অনবরত সে ব্যাপারে সদম্ভে বলে বেড়াতে লাগল এবং নিজের ব্যাপারে গর্ববোধ করতে লাগল এবং এটা দেখে সে মোহাবিষ্ট হতে লাগল, এর বিস্তৃতি ঘটাতে লাগল আর বলতে থাকল, "আমি তো এটি করেছি, সেটা করেছি... এবং সে অহংকারী হয়ে উঠল, হলো দাম্ভিক আর নিজ সম্বন্ধে বিস্ময়াভিভূত হলো এবং তা আরো বর্ধিত করল- যতক্ষণ পর্যন্ত না সেটা তার ধ্বংসের কারণ হল।"

অতএব, আল্লাহ্ যদি এই মিসকিনের (দরিদ্র ব্যক্তি) মঙ্গলের ইচ্ছা করেন, তিনি তাকে পরীক্ষা করবেন কষ্ট-ক্লেশ দ্বারা, যা তার অস্তিত্বকে নাড়িয়ে দেবে, তাকে অপমানে নতজানু করবে, তার নিজের চোখে নিজেকে তুচ্ছ করে দেবে। তথাপি আল্লাহ্ যদি তার মঙ্গল ব্যতীত অন্য কিছু চান, তবে তিনি তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দিবেন, যে আত্ম অহমিকায় বিভোর হয়ে থাকবে- এবং এটাই হচ্ছে সেই পরিবর্জন যা তার ধ্বংসের জন্য অবশ্যম্ভাবী।

এবং প্রকৃতপক্ষে যারা 'ইযমাতে আ'রিফিন' (অর্থাৎ 'তারা যারা সচেতন'- ধর্মভীরু জ্ঞানীজনেরা) তাদের মতৈক্য যে, তওফীক (সফলতা) হলো আল্লাহ তোমাকে তোমার নিজের দায়িত্বে ছেড়ে দেননি এবং পরিবর্জনের সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ধরন হলো তিনি (পরম করুণাময়) তোমাকে তোমার নিজ দায়িত্বে ছেড়ে দিলেন।

অতএব, যার জন্যই আল্লাহ্ মঙ্গল কামনা করেন- তিনি তার জন্য উন্মুক্ত করে দেন বিনয়ের দুয়ার এবং তাকে দান করেন নম্রতায় ভরা এমন এক অন্তর, যাতে অবিরত আল্লার স্মরণ ফিরে আসে এবং তার নিকট কাকুতি-মিনতি করে এবং সর্বদা নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি, নিজ অজ্ঞানতা এবং সীমালংঘনতার প্রতি লক্ষ্য রাখে; এবং সবসময় স্মরণ করে এবং সাক্ষ্য দান করে তার রবের মহৎ নিয়ামতসমূহের এবং তাঁর দয়াশীলতার এবং তাঁর রহমতের ও তাঁর অপার করুণার।[২৪]

আ'রিফেরা আল্লাহর (সুমহান) দিকে এ দু'টি ডানার মাধ্যমে ধাবিত হয় এবং উভয় ডানার একটি ব্যতীত আল্লাহর দিকে চলা সম্ভব না ... যখনই সে দু'টির একটি হারিয়ে ফেলে- তখনই সে পরিণত হয় একটি পাখির ন্যায় যা একটি ডানা হারিয়ে ফেলেছে।

---

[২৪] আল্লাহ্ (সুমহান) উল্লেখ করেছেন,

"মুত্তাকীরা থাকবে স্রোতস্বিনী বিধৌত জান্নাতে, যোগ্য আসনে, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর সান্নিধ্যে।"

শাইখ আল-ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ رحمه الله বলেছেন, "যারা আ'রিফ তারা আল্লাহর দিকে ধাবিত হয়, আল্লাহর নিয়ামতসমূহ অবলোকন করার মাধ্যমে (এবং সর্বদা স্মরণের মাধ্যমে) এবং তাঁর নিজের অবাধ্যতার (এবং ত্রুটি বিচ্যুতি সমূহের) গভীর পর্যালোচনার মাধ্যমে।"

আর এটাই হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর উক্তির ভাবার্থ, "সাইয়্যিদ আল-ইসতিগফার" (সর্ববৃহৎ পন্থা ক্ষমা চাওয়ার) এ অন্তর্ভূক্ত:

"... *আমি কৃতজ্ঞতা ও প্রাপ্তি স্বীকার করি ঐ সমস্ত নিয়ামত এবং রহমতের যা আপনি আমাকে প্রদান করেছেন এবং আমি আপনার কাছে আমার কৃত সমস্ত গুনাহ কবুল করি...।*"[২৫]

অতএব, এটা আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ও সাক্ষ্যদানের এবং নিজের ভুল ও গুনাহ সমূহের স্মরণ করার সমন্বয়।

আর এভাবেই, সাক্ষ্য প্রদান করে এবং স্মরণ করার দরুন বান্দার উপর তাঁর প্রদত্ত অনুগ্রহসমূহ সেই প্রদানকারী সত্তার প্রতি ভালবাসা, প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন অপরিহার্য করে তোলে।

এবং নিজ গুনাহ সমূহ এবং কৃত ত্রুটিসমূহ স্মরণ রবের প্রতি বান্দার নম্রতা, বিনয় এবং সচেতনতা এবং প্রতি মূহুর্তে রবের প্রতি অনুশোচনায় ফিরে আসা অপরিহার্য করে তোলে এবং সে নিজেকে নিঃস্ব ছাড়া কখনও আর কিছুই ভাবতে পারে না... বাস্তবিক পক্ষে, আল্লাহর কাছে প্রবেশের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী দরজা যা দ্বারা বান্দা প্রবেশ করতে পারে,তা হল দরিদ্রতার দরজা। অতএব, সে তার নিজের জন্য খোঁজে না উন্নত অবস্থানস্থল, না কোন পদমর্যাদা, না কোন মাধ্যম (ওয়াসিলাহ্); বরং সে আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করে দরিদ্রতার দরজা দিয়ে এবং সম্পূর্ণ বিনম্রতার সাথে... সে যেন প্রবেশ করে একজন আত্মসমর্পিত ভিক্ষুকের ন্যায় যার হৃদয় বিনয়ে পরিপূর্ণ; ততক্ষণ পূর্ণ থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই বিনয় তার হৃদয় গভীরে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে দৃঢ়তা পায় এবং তা সব দিক থেকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করে দেয় এবং সে চরম দরিদ্রতার মাঝেও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে এবং তার রবের (পরম মার্জনাকারী) প্রচন্ড প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে... এবং (যখন) সে জানতে পায় যে সে যদি তার রবের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এমনকি এক পলকের জন্যেও, সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং এমন ক্ষতিতে পতিত হবে, যা আর কখনও পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে না।

আল্লাহর উ'বুদিয়্যাহ (বশ্যতা, দাসত্ব) ব্যতীত আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের অন্য আর কোন পথ নেই ।[২৬] এবং এর চেয়ে নিকৃষ্টতম চিন্তাভাবনা আর হয় না যেভাবে, "আমি হচ্ছি গিয়ে উমুক...- আর তুমুক... আমি অর্জন করেছি এটা...আর সেটা... আমি ছিলাম এই আর সেই...।"

---

[২৫] সম্পূর্ণ দোয়াটি উক্ত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, "সাইয়্যিদ আল-ইসতিগফার" এ রসূল ﷺ বলেছেন,

"হে আল্লাহ, আপনি আমার রব। আপনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি আপনার গোলাম। আমি আপনার চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি পালনে যথাসাধ্য সচেষ্ট। আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ মেনে নিচ্ছি এবং আমার কৃত গুনাহ সমূহ স্বীকার করছি। তাই আপনার নিকট প্রার্থনা করছি ,আপনি আমার গুনাহ সমূহ মাপ করে দিন, কারণ আপনি ছাড়া গুনাহ মাপ করার কেউ নেই।" রাসুল ﷺ এ দুআ প্রসংগে বলেন, "যে কেউ সকালে এ দুআ পাঠ করবে, সন্ধ্যার পূর্বে তার মৃত্যু হলে সে জান্নাতী আর যে কেউ রাতে এ দুআ পাঠ করবে, সকালের পূর্বে তার মৃত্যু হলে সে জান্নাতী।"

আল বুখারী (৬৩০৬), আল বাগাভীর শারহ আল সুন্নাহ (৩/১০৯), ইবন তাইমিয়্যার মাজমু আল ফাতওয়া (৮/১১৪, ১১/৩৮৮),আল আলবানীর সহীহ আল জামী(২৬১২,৩৬৭৪) ।

[২৬] সহীহ হাদীসে বর্নিত আছে যে,জিবরীল (আ:) রাসুল ﷺ এর সাথে বসে ছিলেন, তিনি ﷺ আকাশে তাকিয়ে একটি ফেরেশতা দেখতে পেলেন ,তখন জিবরীল ؑ বললেন, "সৃষ্টির পর হতে আজকের পূর্বে এই ফেরেশতা কখনো অবতরণ করেনি।" অত:পর অবতরণ শেষে ফেরেশতা বললো,"হে মুহাম্মদ, আমাকে আপনার রব জানতে পাঠিয়েছেন যে, আপনি কি রাজা-নবী, না দাস-রাসুল হতে চান?"

এতদনুসারে, উ'বুদিয়্যাহর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য দু'টি নীতির উপর গঠিত এবং এ দু'টি হচ্ছে এর ভিত্তিঃ বিশুদ্ধ ভালবাসা এবং পরিপূর্ণ বিনম্রতা।

আর এ দু'টি নীতি নির্মিত হয়েছে দু'টি স্তম্ভের উপর যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছিলঃ আল্লাহর নিয়ামতসমূহ এবং অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সাক্ষ্যদান এবং যা পরবর্তীতে তৈরী করবে ভালবাসা; এবং নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং গুনাহকে স্মরণ করা- যা পরবর্তীতে তৈরী করবে বিনম্রতা।

যদি বান্দা তার রবের অভিমুখে যাত্রা এ দু'টি নীতির উপর প্রতিষ্ঠা করে- তবে তার শত্রু কখনই তাকে পরাস্ত করতে পারবে না- যদি না অপ্রত্যাশিত কোন প্রবঞ্চনার শিকার হয়...।

এবং কত দ্রুতই না আল্লাহ্ তাকে নেতৃত্ব দিয়ে ফিরিয়ে আনেন, তাকে রক্ষা করেন এবং তাঁর অপার করুণা দ্বারা তাকে পরিশুদ্ধ করেন ...।

জিবরীল (عليه السلام) বললেন, "হে মুহাম্মদ, আপনার রবের প্রতি বিনম্র হন।" তখন রসূল (ﷺ) বললেন,"না, বরং দাস-রসূল।"

আস সিলসিলাহ আস সহীহাহ (১০০২), মুসনাদ ইমাম আহমাদ (২/২৩১), আল-আলবানীর সহীহ আত্ তারগীব (৩২৮০) ।

" ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه "

الديـمقراطـيّة ديـن

لأبي محمد المقدسي

গণতন্ত্রঃ একটি জীবন ব্যবস্থা *(দ্বীন)*!

আবূ মুহাম্মদ আসিম আল-মাক্দিসী

"আর যে কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করে,

তা কখনও গ্রহণ করা হবে না এবং সে হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।"

সূচী পত্র

অনুবাদকের কথা

“পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু মহান আল্লাহ্‌র তা‘আলার নামে”

আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেছেন-

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“আর যে কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করে, তা কখনও গ্রহণ করা হবে না এবং সে হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।” (সূরা আলি ‘ইমরান ৩ ঃ ৮৫)

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি চিরঞ্জীব, সৃষ্টিকর্তা, একক এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্‌ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নাই। তিনিই সেই সত্ত্বা, যিনি তাঁর নিজের সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করাকে কখনও মাফ করেন না। এবং তিনি কখনও ঐ ব্যক্তির আমল গ্রহণ করেন না যে আল্লাহ্‌ তা‘আলার সাথে অন্য কারও ইবাদত করে। তিনিই একক, তিনি একত্ববাদকে তাঁর বিশ্বাসী বান্দাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বানিয়ে দিয়েছেন। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নেতা এবং আদর্শ হচ্ছেন মুহাম্মদ (সা.), সর্বশেষ নবী ও রাসূল, আল্লাহ্‌ তাঁর উপর, তাঁর পরিবারের উপর, তাঁর সাহাবাদের উপর এবং কেয়ামত পযর্ন্ত যারা তাঁকে অনুসরণ করবে তাঁদের সবার উপর শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন। (আমীন)

অতঃপর, আমি যা বলতে চাই,

আমাদের দ্বীনি ভাই, আবূ মুহাম্মদ আল-মাক্‌দিসীর ‘গণতন্ত্রঃ একটি জীবন ব্যবস্থা *(দ্বীন)*’ নামক আরবীতে লিখিত বইটি পড়ে আরবী ভাষা বোঝে না এমন মুসলিমদের এই মহাবিপর্যয় সর্ম্পকে জানানোর প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করলাম। এই মহাবিপর্যয় মানুষের চিন্তাধারা, তাওহীদের আদর্শ এবং সর্বোপরী ঈমানদারদের দ্বীনি চেতনাকে কুলষিত করেছে।

অনেক অবিশ্বাসী-কাফের মিথ্যা দাবীর মাধ্যমে প্রমাণ করতে চায় যে গণতন্ত্র কোন জীবন ব্যবস্থা (*দ্বীন*) নয়। আমি খুবই আনন্দিত যে, আবূ মুহাম্মদ আল-মাক্‌দিসী এই বাতিল সংবিধান এবং গণতন্ত্রে বিশ্বাসীদের মিথ্যা দাবীকে পরিষ্কারভাবে খন্ডন করে দিয়েছেন। তিনি তার বক্তব্যকে প্রমাণের জন্য কুর’আন এবং সুন্নাহ্‌র সঠিক দলিলের পাশাপাশি বুদ্ধিবৃত্তিক যৌক্তিক প্রমাণপত্র উপস্থাপন করেছেন। এভাবে তিনি এমন একটি প্রবন্ধ লিখেছেন যা অসঙ্গতি ও অসার বক্তব্য বর্জিত এবং সহজে বোধগম্য ।

আমি অনেকদিন ধরেই কাফেরদের নব উদ্ভাবিত গণতন্ত্রের যুক্তি খন্ডন এবং শির্‌কী সংসদীয় পরিষদের বিরূদ্ধে যুক্তি খন্ডনের পূর্ণাঙ্গ দলিল খুঁজছিলাম। এই মহৎ কাজটি আমাদের প্রাণ প্রিয় শাইখ সূচারুরূপে সম্পন্ন করেছেন। আমি এই বইটি পেয়ে ভীষণ আনন্দিত কারণ ‘ত্বাগুত’ ও তাগুতের পৃষ্ঠপোষক, সহযোগী এবং ভন্ড আলেমরা তাদের কুফরী সংবিধান ও সংসদের পক্ষে যে সব মিথ্যা ও প্রতারণাপূর্ণ যুক্তি দাঁড় করায় তাদের সকলের জবাবে কুর’আন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে পূর্ণাঙ্গ দলিল পেশ করা হয়েছে। আমি সমস্ত কিছুই এই মূল্যবান বইতে পেয়েছি। তাই আমি বইটি অনুবাদের সিদ্ধান্ত নিয়েছি যাতে যারা আরবীতে পড়তে পারেন না তারা যেন মিথ্যা থেকে সত্যের পার্থক্য করতে পারেন, পথভ্রষ্টতা থেকে নিজেদের বাচাঁতে পারেন, পথভ্রষ্টতা থেকে বাঁচার নির্দেশনা পান এবং যারা গণতন্ত্রের উপর বিশ্বাস করে তাদের বিরূদ্ধে যেন দলিল পেশ করতে পারেন। আমি আশা করি আল্লাহ্‌ তা‘আলা আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে গ্রহণ করবেন এবং সকল প্রশংসা তাঁর জন্যেই যিনি প্রথম (*আল-আওওয়াল*) এবং শেষ (*আল-আখির*)।

-অনুবাদক

লেখকের কথা

"পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু মহান আল্লাহ্‌র তা'আলার নামে"

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছে আশ্রয় চাই, তাঁরই কাছে ক্ষমা চাই এবং আমরা তাঁর কাছে পানাহ চাই নফসের প্রতারণা হতে এবং আমাদের খারাপ কাজ হতে। আল্লাহ্ যাকে হেদায়েত দেন তাকে কেউ গোমরাহ করতে পারে না, আর আল্লাহ্ যাকে গোমরাহ করেন তাকে কেউ হেদায়েত দিতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা এবং শেষ রাসূল। তিনি আমাদের নেতা এবং তিনি আমাদের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। মহানবী মুহাম্মদ (সা.), তাঁর পরিবার, তাঁর সাহাবাগণ এবং যারা তাঁকে কেয়ামত পর্যন্ত অনুসরণ করবে তাঁদের সকলের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন। (আমীন)

অতঃপর, শির্‌কী শাসন ব্যবস্থার সংসদীয় নির্বাচনের ঠিক পূর্বে এই বইটি লিখার দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়েছিল এবং এটা এমন একটা সময় যখন মানুষ গণতন্ত্রের দ্বারা মোহগ্রস্থ হয়ে আছে। কখনও তারা গণতন্ত্রকে মত প্রকাশের স্বাধীনতা অথবা 'শূরা কাউন্সিল' (পরামর্শসভা) বলে থাকে। আবার কখনও তারা এমন যুক্তি উপস্থাপন করে যেন, আপাত দৃষ্টিতে, গণতন্ত্রকে একটি বৈধ মতবাদ বলে মনে হয়। তারা ইউসুফ (আ.) এর সাথে রাজার শাসনব্যবস্থার ঘটনাকে উদাহরণ হিসেবে পেশ করে। আবার অন্য সময়ে তারা নাজ্জাসীর শাসনব্যবস্থাকে উদাহরণ হিসাবে পেশ করে শুধু তাদের স্বার্থসিদ্ধি ও ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য। তারা সত্যের সাথে মিথ্যার এবং আলোর সাথে অন্ধকারের এবং ইসলামের একত্ববাদের সাথে গণতন্ত্রের শির্‌কী ব্যবস্থার মিশ্রণ ঘটায়। আমরা, আল্লাহ্‌র সাহায্যে, এই সব মিথ্যা যুক্তি খন্ডন করেছি এবং প্রমাণ করেছি যে গণতন্ত্রঃ একটি জীবন ব্যবস্থা (*দ্বীন*); তবে এটি আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা (*দ্বীন*) নয়।

এটি আল্লাহ্ প্রদত্ত একত্ববাদদের *দ্বীন* (জীবন ব্যবস্থা) নয়। সংসদ ভবন হচ্ছে এই শির্‌কের কেন্দ্রস্থল এবং শির্‌কী বিশ্বাসের নিরাপদ আশ্রয়স্থল। আমাদের জীবনে তাওহীদ বাস্তবায়ন করতে হলে এই সমস্ত কিছুকে অবশ্যই বর্জন করতে হবে আর এটাই হচ্ছে বান্দার উপর আল্লাহ্‌র হক। যারা গণতন্ত্রের অনুসারী, আমাদের অবশ্যই তাদেরকে শত্রু হিসেবে গণ্য করা উচিত এবং আমরা অবশ্যই তাদের ঘৃণা করবো এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ অব্যাহত রাখবো এবং তাদেরকে পর্যদস্ত করবো।

গণতন্ত্র একটি সুস্পষ্ট শির্‌কী মতাদর্শ এবং নির্ভেজাল কুফরী যে ব্যাপারে আল্লাহ্ আমাদেরকে তাঁর কিতাবে সতর্ক করেছেন। এবং তাঁর রাসূল (সা.) সারা জীবন এই সব ত্বাগুতের (মিথ্যা উপাস্যদের) বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ছিলেন।

তাই, হে আমার একত্ববাদী ভাইয়েরা, অটল থাক নবীর প্রকৃত অনুসারীরূপে এবং যারা গণতন্ত্র ও এর অনুসারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন তাদের সাহায্যকারী হও। নিজের জীবনকে সাজাও তাদেরকে অনুসরণ করার জন্যে যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিধানকে প্রয়োগ করে থাকে। রাসুল (সা.) এই পথ সর্ম্পকে বলেছেন, *"আমার উম্মাহ্‌র মধ্যে একদল লোক থাকবে যারা আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করতে থাকবে এবং যারা তাদেরকে ত্যাগ করবে অথবা তাদের বিরুদ্ধাচরণ করবে কেউই তাদের ক্ষতি করতে পারবে না যতক্ষণ না পূর্বনির্ধারিত সময় উপস্থিত হয় (কিয়ামত হয়)।"*

আমি আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করি যাতে আল্লাহ্ আমাকে এবং আপনাকে ঐ লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং আল্লাহ্‌র কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যিনি প্রথম (*আল-আওওয়াল*) এবং যিনিই শেষ (*আল-আখির*)।

- আবূ মুহাম্মদ আল-মাক্‌দিসী।

স্বর্গীয় সৃষ্টি, নাযিলকৃত কিতাবসমূহ, ইব্রাহীম (আ.) এর দাওয়াহ্ এবং সবচেয়ে মজবুত হাতল-এগুলোর সূত্রপাত এবং উদ্দেশ্য

প্রত্যেকের জানা উচিত যে, আল্লাহ্ই সমস্ত বস্তু ও প্রাণীর সৃষ্টিকর্তা। আল্লাহ্ আদম সন্তানকে সালাত, যাকাত বা অন্য যে কোন ইবাদত জানার ও পালন করার পূর্বে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টির আদেশ দিয়েছিলেন, তা হচ্ছে - কেবল এক আল্লাহ্র উপর ঈমান আনা এবং তাঁকে ছাড়া যাদের ইবাদত করা হয় তাদের বর্জন করা। এ কারণেই আল্লাহ্ সমস্ত জীব সৃষ্টি করেছেন, নবীদের পাঠিয়েছেন, কিতাব নাযিল করেছেন এবং জিহাদ ও শাহাদাতের আদেশ দিয়েছেন। আর এ কারণেই আর-রহমানের অনুসারী এবং শয়তানের অনুসারীদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হয়েছে এবং এ কারণেই দারুল ইসলাম এবং খিলাফাত প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وما خلقتُ الجن والإنس إلا ليعبدون

"আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এই জন্য যে তারা আমারই ইবাদত করবে" [সূরা আয-যারিয়াত ৫১ঃ ৫৬]

যার অর্থ- আমাদের সৃষ্টি ও অস্তিত্বের <u>একমাত্র</u> উদ্দেশ্যই হচ্ছে আল্লাহ্র ইবাদত করা।

তিনি আরো বলেছেনঃ

ولقد بعثنا في كلِّ أمةٍ رسولاً أنِ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت

"আর নিশ্চয়ই, আমি প্রত্যেক জাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছি এই নির্দেশ দেয়ার জন্য যে, আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুত (অন্য সকল বাতিল ইলাহ) থেকে নিরাপদ থাকো (বর্জন কর)।" [সূরা আন-নাহল ১৬ঃ ৩৬]

"লা ইলাহা ইল্লা আল্লাহ্ - আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নাই"- এই বিশ্বাসই হচ্ছে ইসলামের মূল ভিত্তি। এটা ছাড়া কোন দোয়া, সালাত, সওম, যাকাত, হজ্জ্ব, জিহাদ, অথবা অন্য কোন ইবাদতই আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। এ বাণীতে ঈমান আনা ব্যতীত কেউই নিজেকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাতে পারবে না। কারণ এটাই হচ্ছে একমাত্র হাতল যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ দিয়েছেন তাঁর অনুসারীদের, যা তাদের জান্নাতে নিয়ে যাবে। অন্য কোন হাতল জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাতে সক্ষম নয়। আল্লাহ্ বলেন ঃ

قد تبيَّن الرُّشد مِن الغيِّ فمن يكفر بالطاغوت ويُؤمن بالله فقد استمسك بالعُروة الوُثقى لا انفصام لها....

"নিশ্চয়ই, সঠিক পথ ভ্রান্ত পথ থেকে আলাদা। যে ত্বাগুতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহ্তে বিশ্বাস করবে, সে এমন এক মযবুত হাতল ধরবে যা কখনও ভাঙ্গবে না।" [সূরা বাকারাহ্ ২ঃ ২৫৬]

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন ঃ

والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهمُ البشرى فبشر عباد

"যারা ত্বাগুতকে বর্জন করে তার (ত্বাগুতের) ইবাদত থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে, এবং আল্লাহ্র অভিমুখী হয় (তওবাহ্র মাধ্যমে), তাদের জন্য আছে সু-সংবাদ। অতএব সু-সংবাদ দাও আমার বান্দাদেরকে।" [সূরা আয-যুমার ৩৯ ঃ ১৭]

লক্ষ্য করুন, আল্লাহ্ তাঁর প্রতি ঈমান আনার পূর্বে সকল মিথ্যা উপাস্যদের (বা *ত্বাগুত*-দের) অস্বীকার করার কথা বলেছেন। এই আয়াত আমাদের দেখাচ্ছে, কিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি ঈমান আনার পূর্বে, সমস্ত বাতিল *ইলাহ্*-(উপাস্য)কে পরিত্যাগ করার কথা বলেছেন। (*লা ইলাহা ইল্লা আল্লাহ্* - কোন উপাস্য নেই, আল্লাহ্ ব্যতীত) এই বাণীর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা একত্ববাদের আদেশ দিয়েছেন, যা নির্দেশ করে মজবুত হাতলের সবচেয়ে বড় নীতি

সর্ম্পকে; সুতরাং কেউই সত্যিকার ঈমানদার হতে পারবে না যত পর্যন্ত না সে অন্য সকল বাতিল উপাস্যকে চূড়ান্ত ও পুরোপুরি ভাবে প্রত্যাখ্যান করে।

সেই উপাস্যগুলো, যাদের সাথে কুফরী (বিশ্বাস না করা) করতে হবে এবং যাদের ইবাদত থেকে দূরে থাকতে হবে, সেগুলো কেবল পাথর, মূর্তি, গাছ বা কবর নয় (সিজদা বা দোয়ার মাধ্যমে যাদের ইবাদত করা হয়)- বস্তুত মিথ্যা ইলাহ্‌র আওতা আরও অনেক বেশি! এই উপাস্যগুলোর আওতার মধ্যে পড়ে প্রত্যেক জীব বা জড় যেগুলোর ইবাদত করা হয় আল্লাহ্‌ তা'আলা-কে বাদ দিয়ে এবং তারা এই ইবাদত গ্রহণ করে বা সন্তুষ্ট থাকে।[১]

যখন কোন সৃষ্টি নিজের আত্মার উপর যুলুম করে, তখন সে আল্লাহ্‌র বেঁধে দেয়া সীমা অতিক্রম করে। আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য *ইলাহ*-এর ইবাদত করা এরূপ যুলমের অন্তর্ভুক্ত। এই ইবাদতের মধ্যে আছে সেজদা, মস্তক অবনতকরণ, দোয়া প্রার্থনা, শপথ করা এবং বলি দেওয়া। আইন প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে মান্য করাও এক ধরনের ইবাদত।

আল্লাহ্‌ আহলে কিতাব (ইহুদী ও নাসারা) সম্প্রদায় সর্ম্পকে বলেন,

اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله

"তারা আল্লাহ্‌ ব্যতীত তাদের পন্ডিতগণ ও সংসার-বিরাগীগণকে তাদের আরবাব (প্রভু) রূপে গ্রহণ করেছে ..."[২]।

যদিও তারা তাদের পন্ডিতগণ ও সংসার-বিরাগীগণদের সেজদা করে নাই বা তাদের ধর্ম যাজকদের সামনে মাথা নত করে নাই, কিন্তু তারা হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করা সংক্রান্ত তাদের বিধান মেনে নিয়েছে এবং অনুসরণ করেছে। সেজন্যেই আল্লাহ্‌ তাদের এই কাজকে অর্থাৎ পন্ডিত ও ধর্মযাজকদের প্রভু বা উপাস্যরূপে গ্রহণ করার শামিল বলে গণ্য করেছেন। কারণ বিধানের ক্ষেত্রে আনুগত্য এক ধরনের ইবাদত এবং তা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যে নির্দিষ্ট, যেহেতু আল্লাহ্‌ই একমাত্র স্বত্তা যিনি বিধান দিতে পারেন।

সুতরাং, যে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো আইন বাস্তবায়ন করার প্রচেষ্টা চালায়, সে বস্তুত একজন মুশরিক। প্রমাণ স্বরূপ মুহাম্মদ (সা.)-এর সময়ের ঐ ঘটনাকে উলেখ করা যায়, যখন একটি মরা ছাগল নিয়ে *আর-রাহ্‌মান* (আল্লাহ্‌র) বান্দা ও শয়তানের অনুসারীদের মধ্যে বিবাধ হয়। মুশরিকরা যুক্তি দ্বারা মুসলিমদের বোঝাতে চাচ্ছিল যে, ছাগলটি প্রাকৃতিক ভাবে বা নিজে নিজেই মারা যায়, তার মধ্যে ও মুসলিমদের যবেহ্‌ করা ছাগলের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তারা দাবী করছিল যে, মৃত ছাগলটিকে আল্লাহ্‌ই যবেহ করেছেন। কিন্তু এই ঘটনার প্রেক্ষিতে, আল্লাহ্‌ তাঁর হুকুম জারি করে দিলেন এবং বললেন,

وإن أطعتموهم إنكم لمشركون

"... যদি তোমরা তাদের কথামত চল (আনুগত্য বা অনুসরণ কর) তবে অবশ্যই মুশরিক হবে।" [সূরা আনআম ৬ঃ ১২১]

সুতরাং '*ইলাহ্‌*' বা 'উপাস্য' শব্দটি দ্বারা এমন সব লোকদেরও বোঝায় যারা আল্লাহ্‌র পাশাপাশি নিজেকে বিধানদাতা, আইনপ্রণেতা অথবা সংসদ প্রতিনিধি রূপে স্থান করে নেয় (কারণ এসকল পদে তাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলার নাযিলকৃত বিধানের পরিপন্থী বিধান প্রতিষ্ঠা করার ক্ষমতা দেয়া হয়); আর যারা তাদেরকে এসকল পদে নির্বাচিত করে (ভোট দেয়া বা অন্য কোন রূপে সমর্থন করার মাধ্যমে) তারা হয় মুশরিক- কারণ তারা সীমালংঘন করেছে (অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার পাশে আরেক বিধানদাতা মেনে নেয়ার মাধ্যমে শরীক করেছে)। মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহ্‌র দাস হিসেবে এবং আল্লাহ্‌ তাকে আদেশ করেছেন তাঁর বিধানের কাছে আত্মসমর্পন করার জন্য; কিন্তু

---

[১] এর মধ্যে ফেরেশতা, নবী বা ধার্মিক লোকরা অন্তর্ভুক্ত নয় যাদের ইবাদত মানুষ করছে কিন্তু তারা তাদের ইবাদত করতে বা তাদের *ইলাহ* হিসেবে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে [উদাহরণ স্বরূপ - ঈসা (আঃ)]।

[২] সূরা তওবাহ্‌ ৯ ঃ আয়াত ৩১

কিছু মানুষ তা প্রত্যাখান করেছে এবং নির্ধারিত সীমা লংঘন করেছে। আইনপ্রণেতারা নিজেদেরকে আল্লাহ্র সমকক্ষ বানাতে চায় এবং তারা বিধান প্রণয়নে অংশগ্রহণ করতে চায় যা কারো জন্যে বৈধ নয় শুধুমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া। যদি কেউ, নিজেকে বিধানদাতা হিসেবে অধিষ্ঠিত করার মাধ্যমে, সীমা অতিক্রম করে, তবে সে একজন উপাস্যের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তার ইসলাম এবং তার একত্ববাদ গ্রহণ যোগ্য হবে না, যতক্ষণ না সে যা করেছে তা অস্বীকারপূর্বক বর্জন করবে এবং সেই ভ্রান্ত জীবন ব্যবস্থার কর্মী ও সমর্থনকারীদের থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে জিহাদ করবে; অর্থাৎ যতক্ষণ না সে নিশ্চিতভাবে জানবে যে, গণতন্ত্র একটি ভ্রান্ত মতবাদ এবং এই ব্যবস্থার বিরোধিতা করবে।

আল্লাহ্ বলেন,

يُريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُمِروا أن يكفروا به

"... এবং তারা ত্বাগুতের কাছে বিচার প্রার্থী হতে চায়, যদিও তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।" [সূরা নিসা ৪ ঃ ৬০]

মুজাহিদ (রহ.) বলেন, "*'ত্বাগুত'* (উপাস্য) হচ্ছে মানুষরূপী শয়তান যার কাছে মানুষ বিচার ফয়সালার জন্যে যায় এবং তারা তাকে অনুসরণ করে।"

শায়খুল ইসলাম ইব্ন তাইমিয়্যাহ্ (রহ.) বলেন, "... আর এ কারণেই, যে কুর'আনের নির্দেশিত বিধান ছাড়া বিচার ফয়সাল করে না সে হচ্ছে 'ত্বাগুত'।"[৩]

ইব্ন আল-কাইয়্যিম (রহ.) বলেন, "প্রত্যেক ব্যক্তি, যে তার সীমা অতিক্রম করে, হয় ইবাদত, অনুসরণ অথবা আনুগত্যের মাধ্যমে - সুতরাং কোন মানুষের উপাস্য হয় সেই ব্যক্তি যাকে তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পাশাপাশি বিচারক সাব্যস্ত কর হয়, অথবা আল্লাহ্র পাশাপাশি যার ইবাদত করা হয়, অথবা যার অনুসরণ করা হয় আল্লাহ্কে অগ্রাহ্য করে, অথবা যাকে মান্য করা হয় এমন বিষয়ে যার মাধ্যমে আল্লাহ্কে অমান্য করা হয়"। তিনি আরো বলেন, "আল্লাহ্র রাসূল যে বিধান নিয়ে এসেছেন, যদি কেউ তা দিয়ে বিচার-ফয়সালা না করে বা তার দিকে প্রত্যাবর্তন না করে, সে মূলতঃ অন্য কোন উপাস্যের অনুসরণ করছে।"[৪]

বর্তমান সময়ে যে সব উপাস্যের ইবাদত করা হয়, অর্থাৎ তথাকথিত আইনপ্রণয়নকারী পরিষদের মানুষের তৈরী দেবদেবী, উপাস্য ও তাদের ভ্রান্ত অনুসারীদেরকে প্রত্যেক মুসলিমের অবশ্যই বর্জন করতে হবে, যেন সবচেয়ে মজবুত রজ্জু (ইসলাম বা আল্লাহ্র একত্ববাদ) শক্তভাবে ধারণ করা যায় এবং জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, তা হলো তথা কথিত আইন প্রণয়নকারী পরিষদের মানুষের তৈরী ক্ষণস্থায়ী উপাস্য বা দেব-দেবীগুলোকে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

أمْ لهم شُركاءُ شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمةُ الفصل لقُضِيَ بينهم...

"তাদের কি এমন কতগুলো *ইলাহ্* (উপাস্য) আছে যারা তাদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের, যার অনুমতি আল্লাহ্ দেন নাই ? ফয়সালার ঘোষণা না থাকলে তাদের বিষয়ে তো সিদ্ধান্ত হয়ে যেতো ..." [সূরা আশ-শুরা ৪২ ঃ ২১]

মানুষ এই সব 'আইন প্রণয়নকারী'-দের অনুসরণ করে আসছে এবং বিধান দেয়া বা আইন প্রণয়ন করাকে তাদের, তাদের সংসদের এবং স্থানীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক শাসন ব্যবস্থার অধিকার ও বৈশিষ্ট্য বলে মেনে নিয়েছে। তারা তাদের সংবিধানের মাধ্যমে প্রমাণ করে যে, জনগণই প্রকৃতপক্ষে বিধান দেয়।[৫]

---

[৩] মাজমু আল-ফাতাওয়া ঃ ২৮তম খন্ড, পৃষ্ঠা-২০১।
[৪] ই'লাম আল-মুওয়াকক্বি'ঈন ঃ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৫০
[৫] বাংলাদেশের সংবিধানের মূল ধারা নং ৭(১) ও ৭(২)ঃ
৭(১) প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও

এ কারণেই, আইন প্রণয়নকারীরা তাদের অনুসারীদের *ইলাহ* হয়ে যায়। অনুসারীগণ তাদেরকে এই কুফরী মতবাদ ও শির্কের ব্যাপারে মেনে নিয়েছে যে রূপ আল্লাহ্ খ্রিস্টানদের ব্যাপারে বলেছেন যখন, তারা আনুগত্য করেছিল তাদের ধর্মযাজক ও সন্ন্যসীদের। আজকের গণতন্ত্রের অনুসারীরা ঐসব সংসার বিরাগী ও ধর্মযাজকদের থেকে বেশি নিকৃষ্ট ও অপবিত্র; কারণ যদিও তারা হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করত কিন্তু তারা নিজেদেরকে আইন প্রণয়নকারী বলে দাবী করত না এবং তারা নিজেরা সংবিধান তৈরী করত না। কেউ যদি তাদের কথা গ্রহণ না করত অথবা অনুসরণ না করত তাহলে তারা তাদের শাস্তি প্রদান করত না; আর না তারা তাদের মিথ্যা উপাস্যগুলোর পক্ষে প্রমাণ দেয়ার জন্য আল্লাহ্র কিতাব ব্যবহার করত।

এই বিষয়টি যদি আপনার কাছে স্পষ্ট হয় তবে আপনার জানা উচিত, ইসলামের মজবুত হাতলকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা এবং মানুষের তৈরি উপাস্যকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হলো ইসলামের চূড়া। আর এর দ্বারা আমি *'জিহাদ'*-কে বুঝাতে চাচ্ছি।

জিহাদ করতে হবে ত্বাগুত, তার অনুসারী এবং সাহায্যকারীর বিরুদ্ধে, এই মানব রচিত সংবিধানকে ধ্বংস করার জন্যে এবং চেষ্টা করতে হবে যেন মানুষ এদের ইবাদত থেকে ফিরে আসে এবং একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদতের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। অবশ্যই এই পদক্ষেপের সাথে থাকতে হবে একটি ঘোষণা এবং প্রকাশ্য বক্তব্য, ঠিক যেমনটি নবীগণ করেছিলেন এবং আমারা অবশ্যই তা করব একই পদ্ধতিতে এবং একই পথ অবলম্বন করে - যে পথটি আল্লাহ্ স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন, ইব্রাহীম (আ.) মিল্লাত (আদর্শ) এবং তাঁর দাওয়াহ্কে আমাদের আর্দশ হিসাবে নেয়ার আদেশ প্রদানের মাধ্যমে।

তিনি (আল্লাহ্ তা'আলা) বলেন,

قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا بُرءاؤا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تُؤمنوا بالله وحده

"তোমাদের জন্য ইব্রাহীম ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে[৬] রয়েছে উত্তম আর্দশ। যখন সে তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যার ইবাদত কর তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। আমরা তোমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করি। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হল শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহ্তে ঈমান আনবে'।" [সূরা মুমতাহিনা ৬০ ঃ ৪]

কাজেই এই বক্তব্যের অর্থ স্পষ্ট হয়েছে। ভেবে দেখুন, কিভাবে আল্লাহ্ বিদ্বেষের পূর্বে শত্রুতার কথা দিয়ে শুরু করেছেন। বিদ্বেষের চেয়ে শত্রুতা বেশী গুরুত্বপূর্ণ কারণ একজন ব্যক্তি ত্বাগুতের অনুসারীদেরকে ঘৃণা করতে পারে কিন্তু তাদের শত্রু হিসাবে নাও ভাবতে পারে। তাই কোন ব্যক্তি (মুসলিম হিসেবে) তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তাদের ঘৃণা করবে এবং শত্রু হিসেবে গণ্য করবে। ভেবে দেখুন, কিভাবে আল্লাহ্ মিথ্যা উপাস্যগুলোর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পূর্বে সেগুলোর অনুসারীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন, কারণ দ্বিতীয়টির চেয়ে প্রথমটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অনেক মানুষই পাথর, মূর্তি, দেবতা, সংবিধান, আইন এবং বাতিল জীবন ব্যবস্থার (দ্বীন) প্রত্যাখান করে কিন্তু তারা এই সব উপাস্য ও বাতিল দ্বীনের অনুসারীদের ও সাহায্যকারীদের প্রতাখ্যান করতে অস্বীকার করে।

এই কারণেই, এ ধরনের লোক তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে পারবে না। যদি সে এইসব উপাস্যগুলোর দাসদের প্রত্যাখান করে তবে বুঝা যায় যে, সে তাদের ভ্রান্ত ব্যবস্থা এবং তারা যাদের ইবাদত করে সেগুলাকেও প্রত্যাখান করে। প্রত্যেকের কমপক্ষে অবশ্যই পালনীয় কর্তব্য, যা ছাড়া কেউ নিজেকে (জাহান্নাম হতে) বাঁচাতে পারবে না, তা হলো মিথ্যা উপাস্যগুলো বর্জন করা এবং তাদের শির্কী ও মিথ্যা মতাদর্শনের অনুসারী না হওয়া। আল্লাহ্ বলেন,

---

কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।

[6] قال بعض المفسرين {**الذين معه**}: أتباعه أو الأنبياء الذين على طريقته .

ولقد بعثنا في كلِّ أمةٍ رسولاً أنِ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت

"আল্লাহ্‌র ইবাদত করার ও ত্বাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির কাছেই রাসূল পাঠিয়েছি।" [সূরা নাহল ১৬ ঃ ৩৬]

এবং তিনি আরো বলেন,

واجتنبوا الرجس من الأوثان

"... সুতরাং তোমরা বর্জন কর মূর্তি পূজার অপবিত্রতা এবং দূরে থাক মিথ্যা কথন হতে"। [সূরা হজ্জ ২২ ঃ ৩০]

এবং তিনি ইব্রাহীম (আ.) এর দোয়া সম্পর্কে বলেন,

واجْنُبْنِي وبنيّ أن نعبد الأصنام

"আমাকে ও আমার পুত্রগণকে প্রতিমা পূজা হতে দূরে রেখ।" [সূরা ইব্রাহীম ১৪ ঃ ৩৫]

ত্বাগুতের আনুগত্য, গোলামী ও সমর্থনকে অস্বীকার করার মাধ্যমে যদি কেউ এই পৃথিবীতে ত্বাগুতকে বর্জন না করে, তাহলে আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবে। কোন ভাল আমলই তার কাজে আসবে না এবং এজন্য সে অনুতপ্ত হবে এমন এক সময়ে যখন কোন অনুতাপই কাজে আসবে না। অতঃপর তারা পৃথিবীতে ফিরে আসতে চাইবে এবং তারা বলবে যে তারা ত্বাগুতকে প্রত্যাখান করবে এবং মজবুত হাতলের (ইসলামের বিধান) অনুসরণ করবে এবং এই মহান দ্বীনের (ইসলামী জীবন ব্যবস্থার) অনুসরণ করবে।

আল্লাহ্‌ বলেন,

وقال الذين اتَّبَعوا ▪ إذْ تبرأ الذين اتُّبِعوا من الذين اتَّبعوا ورأوُا العذاب وتقطَّعت بهمُ الأسباب لو أن لنا كرةً فنتبرأ منهم كما تبرءُوا منا كذلك يُريهمُ الله أعمالهم حسراتٍ عليهم وما هم بخارجين من النار

"যখন অনুসৃতগণ অনুসরণকারীদের দ্বায়িত্ব অস্বীকার করবে এবং তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে ও তাদের মধ্যকার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে, আর যারা অনুসরণ করেছিল তারা বলবে, *'হায়! যদি একবার আমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটত তবে আমরাও তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম যেমন তারা আজ আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল।'* এইভাবে আল্লাহ্‌ তাদের কার্যাবলীকে পরিতাপরূপে তাদেরকে দেখিয়ে দিবেন আর তারা কখনও অগ্নি হতে বের হতে পারবে না।" [সূরা বাকারা ২ ঃ ১৬৬-১৬৭]

কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যাবে; এই দুনিয়াতে ফিরবার কোন পথ থাকবে না। তাই যদি আপনি নিরাপত্তা চান এবং আল্লাহ্‌র দয়ার আশা করেন যা আল্লাহ্‌ সৎ কর্মশীল ব্যক্তিদের দিয়ে থাকেন, তাহলে আপনাকে অবশ্যই এইসব *ত্বাওয়াগীত* (ত্বাগুতের বহু বচন)-দের বর্জন করতে হবে। প্রত্যাখ্যান করুন তাদের শির্কী মতাদর্শকে (গণতন্ত্র) এখনই! এই মুহূর্তে!!। কেউ আখেরাতে এদেরকে প্রত্যাখান করতে পারবে না যদি সে দুনিয়াতে এদেরকে প্রত্যাখান না করে। কিন্তু যারা তাদের (ত্বাগুতের) বাতিল জীবন ব্যবস্থাকে সাহায্য করবে এবং তার অনুসরণ করবে, তাদেরকে কেয়ামতের দিন এক আহ্বানকারী বলবে, "সে তারই অনুসরণ করবে যার ইবাদত সে করতো। যে সূর্যের ইবাদত করত, সে সূর্যের অনুসরণ করবে। যে চন্দ্রের ইবাদত করত, সে চন্দ্রের অনুসরণ করবে। যারা মিথ্যা উপাস্যদের ইবাদত করত, তারা তাদের অনুসরণ করবে। কিন্তু যারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছিল তাদেরকে বলা হবে, "তোমরা কিসের জন্য অপেক্ষা করছো?"। তোমরা কেন তাদের অনুসরণ করছো না? এবং তারা উত্তর দিবে, "আমরা আমাদের রবের জন্য অপেক্ষা করছি। আমরা তাদের অনুসরণ করছি না কারণ দুনিয়াতে আমরা তাদের অনুসরণ করিনি, যখন আমাদের টাকা পয়সা ও কর্তৃত্বের খুবই প্রয়োজন ছিল। তাহলে কিভাবে তুমি এখন

আমাদেরকে তাদের অনুসরণ করতে বলছ?[৭]

এ ব্যাপারে আল্লাহ্ আরও বলেছেন ঃ

احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون

(ফিরিশতাদের বলা হবে,) "একত্র কর জালিম ও তাদের সহচরদের এবং তারা যাদের ইবাদত করতো তাদের।" [সূরা সাফফাত ৩৭ ঃ ২২]

এখানে সহচর বলতে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা তাদের পছন্দ করে, তাদের মিথ্যা আদর্শের সমর্থক কিংবা সাহায্যকারী। এরপর আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ .إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ .إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ

তাদের সকলকেই সেই দিন শাস্তির জন্য শরীক করা হবে। অপরাধীদের প্রতি আমি এইরূপই করে থাকি। তাদের নিকট "আল্লাহ্ ব্যতীত কোন *ইলাহ* নাই" বলা হলে তারা অহংকার করতো।" [সূরা সাফফাত ৩৭ ঃ ৩৩-৩৫]

সাবধান হও! একত্ববাদের কালেমাকে প্রত্যাখান কর না ও এড়িয়ে চলো না। এই কালেমা দ্বারা যা বোঝানো হয়েছে তার ব্যাপারে উদাসীন থেকো না। সর্বদা এর জন্য গর্ববোধ কর। এটা হচ্ছে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ। সত্য অনুসরণের ব্যাপারে অবজ্ঞা কর না, ত্বাগুতের সাহায্যকারী হয়ো না। কারণ তাহলে তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। শেষ বিচারের দিন তোমাকে তাদের (যালেমদের) সাথে উঠানো হবে, তাদের (যালেমদের) শাস্তির অংশীদার হতে হবে।

তোমার অবশ্যই জানা উচিত যে, আল্লাহ্ আমাদের এই সত্য দ্বীন দিয়েছেন আর এই দ্বীন তথা জীবন ব্যবস্থা হচ্ছে 'ইসলাম' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র হুকুমের কাছে আত্মসমর্পন করা এবং আল্লাহ্ এই দ্বীনকে তাঁর একাত্ববাদী বান্দাদের জন্য মনোনীত করেছেন। কাজেই যারা এর অনুসরণ করবে, তাদের আমল গ্রহণ যোগ্য হবে, আর যে কেউ অন্য কোন জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, তা প্রত্যাখ্যান করা হবে এবং সে হবে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ্ বলছেন ঃ

ووصى بها إبراهيمُ بنيه ويعقوبُ يا بنيَّ إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمون

"এবং ইব্রাহীম ও ইয়াকুব এই প্রসঙ্গে তাদের পুত্রগণকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, হে পুত্রগণ! আল্লাহ্ই তোমাদের জন্য এই দ্বীনকে মনোনীত করেছেন। সুতরাং আত্মসমর্পনকারী না হয়ে তোমরা কখনও মৃত্যুবরণ কর না।" [সূরা বাকারা ২ ঃ আয়াত ১৩২]

তিনি বলছেন ঃ

إنَّ الدينَ عِندَ الله الإسْلاَم

"নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র (গ্রহণযোগ্য) *দ্বীন*।" [সূরা আল-ইমরান ৩ ঃ ১৯]

এবং তিনি আরও বলছেন ঃ

---

[৭] হাদিসটি সহীহ- বিচার দিবসে বিশ্বাসীদের আল্লাহ্‌র সাক্ষাত পাওয়ার হাদীসটির অংশ বিশেষ।

ومَن يَبتغ غيرَ الإسلام ديناً فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين

"আর যে কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন *দ্বীন* (জীবন ব্যবস্থা) গ্রহণ করতে চায় তা কখনও কবুল করা হবে না এবং আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত।" [সূরা আল-ইমরান ৩ ঃ ৮৫]

'*দ্বীন*' (ধর্ম) শব্দটিকে শুধুমাত্র খ্রিষ্টান, ইহুদী এবং এমন অন্যান্য ধর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা থেকে সতর্ক থাকা উচিৎ, কারণ এতে হতে পারে যে কেউ অন্য কোন বাতিল জীবন ব্যবস্থার অনুসরণ করবে এবং বিপথগামী হবে। '*দ্বীন*' বলতে বোঝায় প্রত্যেক ধর্ম, জীবন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা এবং বিধান যা মানুষ অনুসরণ করে ও মেনে চলে। এই সকল বাতিল জীবন ব্যবস্থা ও মতাদর্শকে আমাদের অবশ্যই বর্জন ও পরিত্যাগ করতে হবে। আমাদের অবশ্যই এগুলোকে অস্বীকার করতে হবে, এর সাহায্যকারী এবং সমর্থকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে এবং শুধুমাত্র একত্ববাদের জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করতে হবে; এই জীবন ব্যবস্থা হচ্ছে ইসলাম। সকল কাফের, যারা ভিন্ন জীবন ব্যবস্থার অনুসারী, তাদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ আমাদেরকে এটাই বলার জন্য হুকুম দিয়েছেন,

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣) وَلا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (٤) وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ(٦)

"বল, 'হে কাফিররা আমি তার ইবাদত করি না যার ইবাদত তোমরা কর এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও, যাঁর ইবাদত আমি করি এবং আমি তার ইবাদতকারী না যার ইবাদত তোমরা করে আসছো। এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও, যাঁর ইবাদত আমি করি। তোমাদের *দ্বীন* তোমাদের, আমার *দ্বীন* আমার।" [সূরা কাফিরূন ১০৯ ঃ ১-৬]

তাই যখন কোন সমাজের মুসলিমদের অবশ্যই উচিৎ নয় কাফেরদের সাথে এমন একটি সমাজ ব্যবস্থার ব্যাপারে ঐক্যমত হওয়া, মিলিত হওয়া অথবা সংগঠিত হওয়া যা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। তারা যদি সমাজ ব্যবস্থার ব্যাপারে একমত হয় তবে তাই তাদের *দ্বীন* (জীবন বিধান) হয়ে যাবে। রাসূল (সা.) বলেছেন ঃ *"(মুসলিমদের থেকে) যে কেউ কোন মুশরিকের সাথে দেখা করে, একসাথে থাকে, বসবাস ও অবস্থান করে (চিরস্থায়ী রূপে) এবং তার (মুশরিক) জীবন পদ্ধতি, তার মত, ইত্যাদির সাথে একমত পোষণ করে এবং তার (মুশরিক) সাথে বসবাস উপভোগ করে, তাহলে সে তাদেরই একজন"*[৮]। এই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে সাম্যবাদ (Communism), **সমাজতন্ত্র** (Socialism), **ইহবাদ (ধর্ম ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে যারা আলাদা ভাবে দেখে) বা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ** (Secularism) **এবং অন্যান্য যত মতবাদ ও রীতিনীতি যা মানুষ নিজে উদ্ভাবন করেছে অতঃপর এসব মতবাদকে নিজের *দ্বীন* (জীবন ব্যবস্থা) হিসেবে মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট।**

এই সব দ্বীনের একটি হচ্ছে 'গণতন্ত্র'। এটা এমন একটি জীবন ব্যবস্থা যা আল্লাহ্র মনোনীত জীবন ব্যবস্থার সাথে সাংঘর্ষিক। এ লেখনীর মাধ্যমে, এই নবোদ্ভাবিত জীবন ব্যবস্থা - যার দ্বারা অনেক লোক মোহাচ্ছন্ন হয়ে আছে, তার কিছু ভুল তুলে ধরা হয়েছে। যদিও তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা নিজের দ্বীনকে ইসলাম বলে দাবী করে (অর্থাৎ তারা দাবী করে যে তারা মুসলিম)। তারা জানে গণতন্ত্র এমন একটি দ্বীন যা ইসলাম থেকে আলাদা এবং তারা এও জানে এটি একটি ভ্রান্ত পথ, এবং এর প্রতিটি দরজায় শয়তান বসে মানুষকে জাহান্নামের দিকে ডাকছে।

ইহা বিশ্বাসীদের জন্যে স্মারকপত্র (মনে করিয়ে দেয়া) এবং

যারা জানে না তাদের জন্যে সতর্কবাণী,

এবং উদ্ধতের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট দলিল।

এবং ইহা আল্লাহ্র নিকট একটি ক্ষমা প্রার্থনা।

---

[৮] আবু দাউদ ঃ কিতাবুল জিহাদ।

গণতন্ত্র একটি নব উদ্ভাবিত দ্বীন, যেখানে এর উদ্ভাবকরা হল মিথ্যা উপাস্য এবং অনুসারীরা হলো তাদের দাস

প্রথমত ঃ আমাদের *গণতন্ত্র* (Democracy) শব্দটির উৎস সর্ম্পকে সচেতন হতে হবে। আমাদের সবার জানা থাকা উচিত যে এটা আরবী শব্দ নয়, এটি একটি গ্রীক শব্দ। দু'টি শব্দের সমন্বয়ে তা গঠিত হয়েছে ঃ 'গণ' (*Demos*) অর্থ জনগণ এবং 'তন্ত্র' (*Cracy*) অর্থ হলো বিধান, কর্তৃত্ব বা আইন। গণতন্ত্রের শাব্দিক অর্থ হলো মানুষের দেয়া বিধান, মানুষের কর্তৃত্ব, বা মানুয়ের তৈরী আইন। গণতন্ত্রের সমর্থকদের মতে, এটিই গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় সম্পদ এবং এ কারণেই তারা এ ব্যবস্থার প্রশংসা করে এবং সমাজ ব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্রকে অনেক উচ্চ মর্যাদা দেয়া হয়। একই সাথে, তা কুফর, শির্ক, এবং মিথ্যা মতবাদের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক; কারণ আপনি জানেন, যে প্রধান কারণে আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যে কারণে কিতাবসমূহ নাযিল করা হয়েছে এবং নবী-রাসূলগণ প্ররণ করা হয়েছে, আর যে ঘোষণা দেয়া আমাদের প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক, তা হলো আল্লাহ্‌র একাত্ববাদের ঘোষণা। প্রতিটি ইবাদত একমাত্র তাঁরই দিকে নিবদ্ধ করা এবং তাঁকে ছাড়া অন্য সকল কিছুর ইবাদত করা হতে দূরে থাকা। বিধানের অর্থাৎ আইন, বিচার বা শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আনুগত্য যা এক ধরনের ইবাদত তা একমাত্র আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য; আর এই আনুগত্য যদি অন্য কাউকে করা হয় তবে মানুষ মুশরিক হয়ে যাবে এবং ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

গণতন্ত্র বলে থাকে আইন জনগণের দ্বারা বা অধিকাংশ লোকের দ্বারা প্রবর্তিত হয় যা গণতন্ত্র পন্থীদের সবচেয়ে বড় দাবী। কিন্তু বর্তমানে আইন প্রবর্তনের অধিকার চলে গেছে বিচারকদের হাতে বা বড় নেতা, বড় ব্যবসায়ী ও ধনীদের হাতে, যারা তাদের টাকা ও মিডিয়ার মাধ্যমে সংসদে স্থান করে নেয় এবং তাদের প্রধান উপাস্যরা (রাজা, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, ইত্যাদি) ক্ষমতা রাখে যে কোন সময় ও যে কোন ভাবে সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার।

সুতরাং, বহু ঈশ্বরবাদের (polytheism**) এক পাশে হচ্ছে গণতন্ত্র এবং অন্য পাশে হলো আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করা যা অনেক কারণেই ইসলামের একত্ববাদের, নবী ও রাসূলদের দ্বীনের বিরোধী। আমরা এ গুলোর কিছু এখানে উলেখ করবো।**

প্রথমতঃ এখানে আইন হচ্ছে মানুষের বা ত্বাগুতের, আল্লাহ্‌র আইন নয়। আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে (সা.) হুকুম দিয়েছেন আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধান অনুসারে বিচার ফয়সালা করার জন্যে এবং মানুষের ইচ্ছা দ্বারা প্রভাবিত না হতে এবং আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা থেকে সরে যেতে যেন প্রলুব্ধ না হন। আল্লাহ্ বলছেন ঃ

وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك

"কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদানুয়ায়ী তাদের বিচার নিষ্পত্তি কর, তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ না কর এবং তাদের সম্বন্ধে সর্তক হও যাতে আল্লাহ্ যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন তারা তার কিছু হতে তোমাকে বিচ্যুত না করে" [সূরা মায়িদা ৫ ঃ ৪৯]**। এটাই ইসলামের একত্ববাদ।**

অথচ গণতন্ত্রে, যা একটি শির্কী জীবন ব্যবস্থা, তার দাসেরা বলে, "তাদের মাঝে বিচার কর যা মানুষের দ্বারা গ্রহীত হয়েছে এবং তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর এবং ওদের ব্যাপারে সতর্ক হও যেন ওরা তোমাদের পথভ্রষ্ট করতে না করে ওদের ইচ্ছা ও বিধানের দিকে।" তারা এ কথাটি বলে থাকে এবং গণতন্ত্রও তাই বলে থাকে। তারা নিজেরাই বিধান দিয়ে থাকে। এটি একটি স্পষ্ট কুফরী, বহু ঈশ্বরবাদ তথা শির্ক, যদি তারা বিধান দেয়ার ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে।

তারা তাদের বক্তব্যকে আকর্ষণীয় করে সাজায়, তাদের কার্যকলাপ আরও নিকৃষ্ট; যদি কেউ তাদের নীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে বা তাদের নীতির সাথে এক মত না পোষণ করে বা বিরোধিতা করে তখন তারা বলে, "তাদের মাঝে ফয়সালা কর যেভাবে সংবিধান এবং তাদের বিশেষ শ্রেণীর লোকেরা চায় এবং ঐসব লোকেদের ঐক্যমত ছাড়া কোন

বিধান, কোন আইন ব্যবহার করা যাবে না।"

দ্বিতীয়ত ঃ তাদের সংবিধানের মতে, আইন বা বিধান দিবে সংসদে নির্বাচিত কতিপয় মানুষ বা ত্বাগুতেরা যারা নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ করছে । এটা তাদের সংবিধানের কথা, যেই সংবিধানকে তারা আল-কুর'আন থেকেও পবিত্র বলে মনে করে থাকে।[৯]

তারা এইসব মানব-রচিত সংবিধান বা আইনকে আল্লাহ্ তা'আলার নাযিলকৃত আল-কুর'আনের দেয়া বিধান বা আইনের উপর প্রাধান্য দেয়। সে জন্যে গণতন্ত্রে কোন শাসন ব্যবস্থা ও বিচার ব্যবস্থা ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে না যদি তা তাদের সংবিধান দ্বারা অনুমোদিত না হয় কারণ তাদের আইনের উৎস হচ্ছে এই সংবিধান। গণতন্ত্রে আল-কুর'আনের আয়াত, রাসূল (সা.) এর সুন্নাহ্ ও তাঁর হাদীসের কোন দাম নেই। এটা তাদের জন্যে সম্ভব নয় যে, আল-কুর'আন ও রাসূল (সা.) এর সুন্নাহ্ অনুসারে কোন আইন প্রণয়ন করবে যদি তা তাদের 'পবিত্র' সংবিধনের সাথে না মিলে। আপনি যদি বিশ্বাস না করেন তাহলে তাদের আইন বিশেষজ্ঞের কাছে জিজ্ঞাস করতে পারেন। আল্লাহ্ বলেছেনঃ

فإنْ تنازعتم في شيءٍ فردّوه إلى الله والرسول إنْ كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسنُ تأويلاً

"... অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কোন ব্যাপারে মতবৈষম্যের সৃষ্টি হয় তবে সেটি আল্লাহ্ ও রাসূল (সা.)-এর দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা প্রকৃতই আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাক। এটি সঠিক কর্মনীতি ও পরিণতির দিক দিয়ে এটিই উত্তম।" [সূরা আন্-নিসা ৪ ঃ ৫৯]

কিন্তু গণতন্ত্র বলে ঃ "*যদি তোমাদের মাঝে কোন বিষয়ে মত বিরোধ দেখা দেয় তবে তা সংবিধান, সংসদ, রাষ্ট্রপ্রধান বা তাদের আইনের কাছে নিয়ে যাও।"*

আল্লাহ্ বলেছেন,

أفٍّ لكم ولما تعبدون من دون ا لله أفلا تعقلون

"অভিশাপ তোমাদের উপর এবং তাদের উপর যাদের তোমরা আল্লাহ্‌র পাশাপাশি ইবাদত কর। তারপরও কি তোমরা বুঝবে না?" [সূরা আম্বিয়া ২১ ঃ ৬৭][১০]

জনসাধারণ যদি আল্লাহ্‌র শরীয়ত গণতন্ত্রের মাধ্যমে বা ক্ষমতাসীন মুশরিকদের আইনসভার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তবে কখনও তারা তা করতে সক্ষম হবে না যদি ত্বাগুতেরা (রাজা, প্রধানমন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট) অনুমতি না দেয়, যদি তাদের সংবিধান অনুমোদন না দেয় - কারণ এটিই গণতন্ত্রের 'পবিত্র' গ্রন্থ। অথবা বলা যায় যে, এটা গণতন্ত্রের বাইবেল বা তাওরাত যা তারা নিজেদের খারাপ ইচ্ছা ও খেয়াল-খুশি দ্বারা কুলষিত করেছে।

তৃতীয়ত ঃ গণতন্ত্র হচ্ছে সেকিউলারিজম[১১]-এর নিকৃষ্ট ফল এবং এর অবৈধ সন্তান, কারণ সেকিউলারিজম হচ্ছে

---

[৯] বাংলাদেশের সংবিধানের মূল ধারা নং ৭(২) ঃ

৭(২) জনগণের অভিপ্রায়ে পরম অভিব্যক্তিকরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্য পূর্ণ হয় তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি আসামঞ্জস্যপূর্ণ ততখানি বাতিল হইবে।

একই কথা বলা হয়েছে ৩য় ভাগের ২৬ ধারায়। এবং সংবিধানের ৫ম ভাগের সংসদ নামক পরিচ্ছেদে সংসদ-প্রতিষ্ঠা নামক ধারায় বলা হয়েছে:

৭(১) 'জাতীয় সংসদ' নামে বাংলাদেশের একটি সংসদ থাকিবে এবং এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদের উপর ন্যস্ত হইবে।

[১০] আল্লাহ্ আল-কুর'আনে বলছেন যে ইব্রাহীম (আঃ) এই কথাটি তাঁর কওমের (জাতি) কাছে বলেছিলেন তাদের দেব-দেবীর অক্ষমতা প্রকাশ করার পর।

[১১] সেকিউলারিজম ঃ সমাজ ও রাজনীতি ধর্মের থেকে আলাদা করা হয় যে মতবাদে তাই সেক্যুলারিজম অর্থাৎ সমাজ ব্যবস্থা, রাষ্ট্র ব্যবস্থার রাজনীতি চলবে তার নিজস্ব নীতি অনুসারে, এতে ধর্মকে আনা যাবে না বা তা হবে ধর্মীয় অনুসাশন মুক্ত।

একটি ভ্রান্ত মতবাদ যার উদ্দেশ্য হচ্ছে শাসন-কতৃত্ব থেকে ধর্মকে আলাদা করা। গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণ বা ত্বাগুতের শাসন; আল্লাহ্‌র শাসন নয় কারণ গণতন্ত্রে আল্লাহ্‌র আদেশ কোন বিবেচ্য বিষয়ই নয়, যতক্ষণ না তা তাদের সংবিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। এভাবে অধিকাংশ জনগণ যা চায়, অধিকন্তু তার থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, এই সমস্ত ত্বাগুতেরা যা চায় তা তাদের সংবিধানের অংশ হয়ে যায়।

সুতরাং সমস্ত জনগণ যদি একসাথে হয়ে ত্বাগুতদের ও গণতন্ত্রের উপাস্যদের বলেঃ "আমরা আল্লাহ্‌র শাসন চাই, আমরা কোন মানুষকে, সাংসদদেরকে এবং শাসকদেরকে বিধানদাতা হতে দিব না। আমরা মুরতাদ, ব্যভিচারী, চোর, মদ্যপায়ীদের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র শাস্তি জারি করতে চাই। আমরা মহিলাদেরকে হিজাব পরতে বাধ্য করতে চাই। আমরা পুরুষ ও মহিলাদেরকে তাদের সতীত্ব রক্ষা করতে বাধ্য করতে চাই। আমরা অনৈতিক অশ্লীলতা, ব্যভিচার, নীতি বহির্ভূত কাজ, সমকামিতা এবং এই ধরনের যত খারাপ কাজ আছে তা প্রতিরোধ করতে চাই।" সে মুহূর্তে, তাদের উপাস্যরা বলবে ঃ "এটা গণতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থার ও '*ব্যক্তি স্বাধীনতা*' নীতির বিরোধী!"

সুতরাং গণতন্ত্রের স্বাধীনতা হচ্ছে ঃ আল্লাহ্‌র মনোনীত দ্বীন ও বিধান থেকে মুক্ত হওয়া এবং তাঁর বেধে দেয়া সীমা লংঙ্ঘন করা।

নৈতিক বিধানগুলো বিধিবদ্ধ করা হয় না এবং প্রত্যেকে যারা তাদের সাথে একমত হবে না অথবা তাদের দেয়া সীমা রেখা মানবে না, তাহলে তাদের শাস্তি দেয়া হবে।[১২]

একারণেই, গণতন্ত্র এমন একটা দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা যা আল্লাহ্‌র দেয়া জীবন ব্যবস্থা থেকে আলাদা। এটা হচ্ছে ত্বাগুতের শাসন, আল্লাহ্‌র শাসন নয়। এটা হচ্ছে অন্য উপাস্যদের আইন; আল্লাহ্‌র আইন নয়, যিনি একক এবং সকল কিছুর নিয়ন্ত্রক। যে কেউ গণতন্ত্রকে গ্রহণ করল, সে এমন আইনের শাসন মেনে নিলো যা মানব-রচিত সংবিধানের অনুসারে লেখা এবং সে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র দেয়া শাসন ব্যবস্থার চেয়ে ঐ শাসন ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দিলো।

সুতরাং, কোন ব্যক্তি আইন প্রণয়ন করুক বা নাই করুক, বহুঈশ্বরবাদীয় নির্বাচনে জয়ী হোক বা নাই হোক, কেউ যদি মুশরিকদের সাথে গণতন্ত্রের নীতির বিষয়ে, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে, বিচার ফয়সালা করার ক্ষেত্রে তাদের সাথে একমত হয় এবং আল্লাহ্‌র কিতাব, বিধান ও কর্তৃত্বের চেয়ে তাদের কিতাব, বিধান ও কর্তৃত্বকে বেশি গুরুত্ব দেয়, তাহলে সে নিজে একজন অবিশ্বাসী রূপে পরিগণিত হবে। একারণেই, গণতন্ত্র অবশ্যই একটি স্পষ্ট ভ্রান্ত পথ; একটি শির্‌কী ব্যবস্থা।

গণতন্ত্রে জনগণ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে এবং প্রতিটি দল বা গোত্র বিভিন্ন উপাস্য থেকে তাদের উপাস্যকে নির্বাচন করে থাকে যে তার খেয়াল ও ইচ্ছা মতো বিধান দিবে কিন্তু তা হতে হবে সংবিধানের নীতি মোতাবেক। কেউ কেউ তাদের উপাস্যদের (বিধান দাতা) নির্বাচিত করে নিজস্ব মতবাদ বা চিন্তাধারা মোতাবেক; সুতরাং প্রত্যেক দলের নিজস্ব উপাস্য থাকে - কখনও গোত্রভিত্তিকভাবে প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হয়, যেন প্রত্যেক গোত্রের একেকজন উপাস্য থাকে। কেউ আবার দাবি করে তারা 'ধার্মিক উপাস্য' নির্বাচিত করে, যার দাড়ি আছে[১৩] অথবা দাড়ি বিহীন উপাস্য বা *ইলাহ* এবং এমন আরও অনেক রকম। আল্লাহ্‌ বলেন ঃ

أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضيَ بينهم
وإن الظالمين لهم عذاب أليم

"তাদের কি এমন কতগুলো *ইলাহ* (উপাস্য) আছে যারা তাদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের, যার অনুমতি আল্লাহ্‌ দেন নাই? ফয়সালার (বিচার দিবসের) ঘোষণা না থাকলে তাদের বিষয়ে তো সিদ্ধান্ত হয়ে যেত। নিশ্চয়ই যালিমদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।" [সূরা আস-শূরা ৪২ ঃ ২১]

[১২] সুতরাং, আপনি যদি আপোষহীনভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চান, তবে আপনি হবেন একজন দেশদ্রোহী ও গণতন্ত্রের শত্রু।
[১৩] দুঃখজনক ব্যাপার, এই বিষয়টি বাংলাদেশ, পাকিস্তান, কুয়েত, জর্ডান, সৌদি আরব, মিশর - এমন অনেক দেশে বিদ্যমান।

এই এম. পি.রা বাস্তবেই অংকিত, খোদাই করে দাঁড় করানো মূর্তিদের মত উপাস্য যাদেরকে তাদের উপাসনালয়ে (সংসদ ভবন বা দলীয় অফিসে) স্থাপন করা হয়। এই সব প্রতিনিধিরা বা সাংসদরা গণতন্ত্র এবং সংসদীয় শাসন ব্যবস্থাকে তাদের দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা রূপে গ্রহণ করে থাকে। তারা সংবিধান অনুসারে দেশ শাসন করে থাকে, আইন দেয় এবং এর পূর্বে তারা তাদের সবচেয়ে বড় উপাস্য, সবচেয়ে বড় মুশরিক থেকে অনুমতি নিয়ে থাকে, যে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয় তা গ্রহণ বা বর্জনের। এই সবচেয়ে বড় উপাস্য হলো রাজপুত্র বা রাজা বা দেশের রাষ্ট্রপতি।

এটাই হচ্ছে গণতন্ত্রের বাস্তবতা এবং এই জীবন ব্যবস্থার প্রকৃত রূপ। এটাই হচ্ছে মুশরিকদের দ্বীন, আল্লাহ্‌র দেয়া দ্বীন নয়, আল্লাহ্‌র রাসূলের (সা.) দ্বীন নয়। এটাই হচ্ছে বহু উপাস্যদের দ্বীন, এক আল্লাহ্‌র দ্বীন নয়। আল্লাহ্ বলেন ঃ

ءَأرباب متفرقون خيرٌ أم الله الواحد القهار ▪ ما تعبدون من دونه إلا أسماءً سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان

"... ভিন্ন ভিন্ন বহু উপাস্য শ্রেয়, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ? তাঁকে ছেড়ে তোমরা কেবল কতকগুলি নামের ইবাদত কর, যেই নামগুলি তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রেখেছ, এইগুলির কোন প্রমাণ আল্লাহ্ পাঠান নাই। ..." [সূরা ইউসুফ ১২ ঃ ৩৯-৪০]

তিনি আরো বলেন ঃ

ءَإلهٌ مع الله ؟؟ تعالى الله عما يشركون

"... আল্লাহ্‌র সহিত অন্য *ইলাহ* আছে কি? ওরা যাকে শরীক করে আল্লাহ্ তা হতে বহু উর্ধ্বে।" [সূরা আন্ নামল ২৭ ঃ ৬৩]

কাজেই আপনাকে বেছে নিতে হবে 'আল্লাহ্ প্রদত্ত দ্বীন, তাঁর বিশুদ্ধ বিধান, তাঁর দীপ্তিময় আলো ও তাঁর *সীরাতুল মুসতাকিম* (সরল পথ)' অথবা 'গণতন্ত্রের দ্বীন এবং এর বহু ঈশ্বরবাদ, কুফরী, এবং এর ভ্রান্ত পথের' মধ্যে যেকোন একটিকে। আপনাকে অবশ্যই এক আল্লাহ্‌র বিধান অথবা মানব রচিত বিধানের মধ্যে থেকে যে কোন একটিকে গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها...

"... সত্য পথ ভ্রান্ত পথ হতে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। যে ত্বাগুতকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহ্‌তে ঈমান আনবে সে এমন এক মযবুত হাতল ধরবে যা কখনও ভাঙ্গবে না।" [সূরা বাকারা ২ ঃ ২৫৬]

আরও বলেন ঃ

وقل الحق من ربّكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين ناراً...

"বল, সত্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে; সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক আর যার ইচ্ছা সত্য প্রত্যাখ্যান করুক।' আমি যালিমদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি অগ্নি ...।" [সূরা কাহ্ফ ১৮ ঃ ২৯]

তিনি আরও বলেন,

أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون ▪ قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط

■ وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرّق بين أحد منهم ونحن له مسلمـون
ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين

"তারা কি চায় আল্লাহ্‌র দ্বীনের পরিবর্তে অন্য দ্বীন? যখন আকাশে ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সমস্তই স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করেছে! আর তাঁর দিকেই তারা প্রত্যাবর্তন করবে। বল, আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি এবং আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরগণের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যা মুসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে প্রদান করা হয়েছে তাতে ঈমান এনেছি। আমরা তাঁদের মধ্যে কোন তারতম্য করি না এবং আমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণকারী। কেউ যদি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চায় তাহলে তা কখনও কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত।" [সূরা আলে ইমরান ৩ ঃ ৮৩-৮৫]

গণতন্ত্রের প্রচারক ও সমর্থকদের ভ্রান্ত ও প্রতারণামূলক কতিপয় যুক্তির খন্ডন

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأُخر مُتشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغٌ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كلٌّ من عند ربِّنا وما يذكر إلا أولو الألباب ■ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب

"তিনিই তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যার কতক আয়াত 'মুহ্কাম' (সুস্পষ্ট), এগুলো কিতাবের মূল; আর অন্যগুলো 'মুতাশাবিহাত' (অস্পষ্ট/ রূপক); যাদের অন্তরে সত্য-লংঘন প্রবণতা রয়েছে শুধু তারাই ফিত্না এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে মুতাশাবিহাতের অনুসরণ করে। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে, আমরা এতে বিশ্বাস করি, সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে আগত; এবং বোধশক্তি সম্পন্নরা ব্যতীত অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না। হে আমাদের রব! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্যলংঘনে প্রবৃত্ত করোনা এবং তোমার নিকট থেকে আমাদিগকে অনুগ্রহ দান কর। তুমিই সব কিছুর দাতা।" [সূরা আলি 'ইমরান ৩ ঃ ৭-৮]

এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ্ আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন যে তাঁর নীতি অনুযায়ী মানুষকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন ঃ

❖ <u>ঐ সমস্ত মানুষ যারা বিজ্ঞ এবং দৃঢ় বিশ্বাসী ঃ</u>

তারা ইহাকে (আল-কুর'আন) গ্রহণ করে এবং এর সব কিছুতে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে। তারা সমন্বয় সাধন করে সাধারণের সাথে অসাধারণের, সসীমের সাথে অসীমের, এবং বিস্তারিতের সাথে সংক্ষিপ্তের। যদি তারা কোন বিষয়ে না জানে তাহলে তারা তা আল্লাহ্ প্রদত্ত সুদৃঢ় মূলনীতির দিকে ফিরে আসে।

❖ <u>ঐ সমস্ত মানুষ যারা পথভ্রষ্ট ও ভুলের মধ্যে আছে ঃ</u>

এইসব মানুষ আল-কুর'আনের যে সব আয়াত অস্পষ্ট তার অনুসরণ করে থাকে। এরা এ কাজ করে ফিত্না ছড়ানোর উদ্দেশ্যে। এরা যা স্পষ্ট ও বোধগম্য তার অনুসরণ করে না। এদের উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো ওরা যারা গণতন্ত্রের পথ বেছে নিয়েছে এবং সংসদ বা আইনসভা প্রতিষ্ঠা করেছে। এর সমথর্করা ভ্রান্ত পথের অনুসরণ করে থাকে এবং এরাই অধিক ভুল করে। ওরা কিছু আয়াত নেয় এবং তা সুস্পষ্ট আয়াত, মূলনীতি ও ব্যাখ্যার সাথে সম্বনয় না করে গ্রহণ করে সত্যের সাথে মিথ্যার; আর আলোর সাথে অন্ধকারের সংমিশ্রণ ঘটানোর জন্যে।

অতঃপর, এখন আমরা ওদের কিছু ভ্রান্ত যুক্তি নিয়ে আলোচনা করব আল্লাহ্র সাহায্যে, যিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, স্রষ্টা, পুনরুত্থানকারী ও অবাধ্য জনগোষ্টিকে পরাভূতকারী, তাদের যুক্তিগুলো খন্ডন করে সেগুলোর জবাব দেয়ার চেষ্টা করবো।

প্রথম অযৌক্তিক অজুহাত ঃ

ইউসুফ (আ.) মিশরের রাজার পক্ষে কাজ করেছিলেন বা তার মন্ত্রী ছিলেন

এই যুক্তিটি ঐসব গোঁড়ামিপূর্ণ লোকেরা দিয়েছিল যাদের গণতন্ত্রের পক্ষে অন্য কোন দলিল ছিল না। তারা বলত ঃ ইউসুফ (আ.) কি ঐ রাজার পক্ষে কাজ করেনি যে আল্লাহ্‌র শরীয়ত অনুযায়ী শাসনকার্য পচিালনা করত না?

সুতরাং, তাদের মতে, কাফির সরকারের সাথে যোগ দেয়া এবং সংসদে বা আইনসভায় যোগ দেয়া এবং এই ধরনের লোকদের ভোট দেয়া বৈধ।[১৪]

তাদের এই যুক্তির জবাবে যা কিছু বলব, তার সব ভাল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এবং সব মন্দ আমার ও শয়তানের পক্ষ থেকে।

প্রথমত ঃ ঐসমস্ত লোকেরা আইন সভায় বা সংসদে যোগদানকে বৈধ করার জন্যে যে যুক্তি দেয় তা অসত্য এবং ভ্রান্ত কারণ এই সংসদ এমন সংবিধানের উপর নির্ভরশীল যা আল্লাহ্‌র দেয়া বিধান বা সংবিধান নয়; অধিকন্তু তা গণতন্ত্রের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত যা মানুষের খেয়াল-খুশি অনুযায়ী কোন কিছুকে *হালাল* (বৈধ) বা *হারাম* (অবৈধ) করে দেয়ার ক্ষমতা রাখে, মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশের কোন পরোয়া করেনা।

আল্লাহ্ বলছেন ঃ

ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين

"কেউ যদি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চায় তবে তা কখনও কবুল করা হবে না এবং সে হবে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।" [সূরা আলি ইমরান ৩ ঃ ৮৫]

সুতরাং, কেউ কি এমন দাবী করতে পারবে যে ইউসুফ (আ.) এমন কোন দ্বীন বা বিধানের অনুসরণ করেছিলেন যা আল্লাহ্ প্রদত্ত নয়? অথবা এমন কোন দ্বীনের অনুসরণ করেছিলেন যা তাঁর একত্ববাদী পূর্বপুরুষদের দ্বীন নয়? অথবা তিনি কি অন্য কোন জীবন ব্যবস্থাকে সম্মান করার জন্যে শপথ নিয়েছিলেন অথবা সেই অনুসারে কি দেশ পরিচালনা বা শাসন করেছেন - যে রূপ, আজ যারা সংসদ দ্বারা বিমোহিত, যেরূপে বর্তমানে তারা শাসন পরিচালনা করছে?

তিনি তাঁর দুর্বলতার সময়ে বলেছিলেন ঃ

إني تركتُ ملّة قومٍ لا يُؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون ■ واتبعتُ ملّة ءاباءي إبراهيم وإسحق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء

"যে সম্প্রদায় আলাহ্‌কে বিশ্বাস করে না ও আখিরাতে অবিশ্বাসী, আমি তাদের মতবাদ বর্জন করছি। আমি আমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, ইসহাক এবং ইয়াকুবের মতবাদের অনুসরণ করি। আল্লাহ্‌র সাথে কোন বস্তুকে শরীক করা আমাদের কাজ নয়। এটা আমাদের ও সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। [সূরা ইউসুফ ১২ ঃ ৩৭-৩৮]

এবং তিনি আরও বলেছিলেন ঃ

يا صاحبيَ السّجن ءأربابٌ مُّتفرقون خيرٌ أم الله الواحد القهار ■ ما تعبدون من دونه إلا أسماءً سمَّيتموها أنتم وءاباؤُكم ما أنزل الله بها من سلطان إنِ الحكمُ إلاالله أمر ألاَّ تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكنَّ أكثر الناس لا يعلمون

[১৪] উদাহরণ স্বরূপ আমাদের দেশের তথাকথিত ইসলামিক দলগুলো, যারা গণতন্ত্রকে ইসলামের একটি অংশ বানিয়ে নাম দিয়েছে - ইসলামী গণতন্ত্র। আমরা তাদের এই কুচক্রান্ত ও পথভ্রষ্টতা থেকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় চাই।

"হে কারা সঙ্গীরা ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয় না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্? তাঁকে ছেড়ে তোমরা কেবল কতগুলো নামের ইবাদত করছো, যেই নাম তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রেখেছো, এইগুলোর কোন প্রমাণ আল্লাহ্ পাঠান নাই। বিধান দেবার অধিকার কেবল আল্লাহ্রই। তিনি আদেশ দিয়েছেন তাঁকে ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত না করতে, এটাই হলো সরল দ্বীন কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এই ব্যাপারে অবগত নয়।" [সূরা ইউসুফ ১২ঃ৩৯-৪০]

কিভাবে এটা সম্ভব যে তিনি যখন শক্তিহীন ছিলেন তখন প্রকাশ্যে এই কথাটি বলেছিলেন আর যখন তিনি ক্ষমতা পেলেন তা গোপন করে ছিলেন বা তার বিপরীত কাজ করেছিলেন? এর জবাব কি দিবে, হে! যারা এই মিথ্যা দাবীতে বিশ্বাসী।

হে রাজনৈতিক নেতারা, আপনি কি জানেন না, যে মন্ত্রণালয় (যেখানে প্রধানমন্ত্রী এবং অন্য মন্ত্রীদের মন্ত্রীপরিষদ রয়েছে) হলো একটি কার্য নির্বাহী কর্তৃপক্ষ (যারা কর্ম সম্পাদনের জন্যে ক্ষমতা প্রাপ্ত) এবং সংসদ হলো একটি আইন প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ (যাদের কাজ আইন প্রণয়ন করা) এবং এই দু'য়ের মাঝে অনেক পার্থক্য রয়েছে? এই দু'য়ের মধ্যে আদৌ কোন তুলনা সম্ভব নয়।

এখন, আপনি অবশ্যই নিশ্চিত যে ইউসুফ (আ.) ঘটনা সংসদে যোগদান করার জন্যে কোন বৈধ যুক্তি হতে পারে না। অধিকন্তু, এই বিষয়টি আরো একটু আলোচনা করা যাক এবং আমরা এটাও বলতে পারি যে, এই ঘটনাকে মন্ত্রণালয়ে যোগদানের জন্যে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না কারণ, সংসদ ও মন্ত্রণালয়ে যোগ দেয়া উভয়ই কুফরীতে লিপ্ত হওয়ার শামিল।

দ্বিতীয়ত ঃ ইউসুফ (আ.) এর কাজের সাথে গণতন্ত্রের সেবকব বাতিল রাষ্ট্রের, মন্ত্রীসভায় অংশগ্রহণকারীদের তুলনা করা যায় না যারা আল্লাহ্র পাশাপাশি বিধান দেয় এবং আল্লাহ্র দ্বীনের অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং তাঁর শত্রুদের সাহায্য করে। এটা বাতিল এবং অযৌক্তিক তুলনা, এর কারণ হচ্ছে ঃ

(১)- যে কেউ ঐ সমস্ত সরকারের মন্ত্রিপরিষদে অংশগ্রহণ করে, যেখানে আল্লাহ্র বিধান বা শরীয়তকে প্রয়োগ করা হয় না, তাদেরকে অবশ্যই মানুষের তৈরী সংবিধানকে গ্রহণ করতে হয় এবং আনুগত্য ও একনিষ্ঠতা প্রর্দশন করতে হয় সেই সব ত্বাগুতের প্রতি যাদের সাথে কুফরী (অস্বীকার) করার আদেশ আল্লাহ্ একেবারে প্রথমেই দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন,

... يُرِيدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُمِروا أن يكفروا به...

"... তারা ত্বাগুতের কাছে বিচার প্রার্থী হতে চায়, যদিও ওদেরকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।" [সূরা নিসা ৪ ঃ ৬০]

তাদেরকে অবশ্যই মন্ত্রিপরিষদে ঢোকার পূর্বেই এই কুফরী সংবিধানকে সমুন্নত রাখার জন্যে সরাসরি শপথ করতে হয় যে রূপ সংসদে অংশ গ্রহণের সময় বলতে হয়।[১৫]

যে এই দাবী করবে যে ইউসুফ (আ.) যিনি ছিলেন বিশ্বাসযোগ্য, মহান এক ব্যক্তির সন্তান, ঐরকম করেছেন

---

[১৫] বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় তফসিল- 'শপথ ও ঘোষণা' অনুচ্ছেদের ২(ক)এ বলা হয়েছেঃ "আমি .... সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ করিতেছি যে, আমি আইন অনুযায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী (বা মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী) পদের কর্তব্য বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব;

- আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব;
- আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধান করিব;
- এবং আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন অনুযায়ী যথাবিহীত আচরণ করিব।"

এবং তৃতীয় তফসিল- 'শপথ ও ঘোষণা' অনুচ্ছেদের ৫-এ বলা হয়েছেঃ "আমি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইয়া সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ করিতেছি যে, আমি যে কর্তব্যভার গ্রহণ করিতে যাইতেছি, তাহা আইন-অনুযায়ী ও বিশ্বস্তার সহিত পালন করিব;

- আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব;

এবং সংসদ সদ্যরূপে আমার কর্তব্য পালনকে ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হইতে দিব না।"

(কুফরী করেছে) যদিও আল্লাহ্ তাঁকে পরিশুদ্ধ করেছিলেন এবং তাঁর সম্পর্কে বলেছেন,

كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين

"আমি তাঁকে মন্দ কর্ম ও অশীলতা হতে বিরত রাখার জন্য এইভাবে নিদর্শন দেখিয়ে ছিলাম। সে তো ছিল আমার বিশুদ্ধ চিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত"[১৬]। ইউসুফ (আ.) সম্পর্কে জেনে বুঝে কেউ মিথ্যা আরোপ করলে সেই ব্যক্তি একজন কাফির হয়ে যাবে, সে হবে নিকৃষ্ট লোকদের একজন এবং সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে।

সে ইবলিসের চেয়েও বেশি নিকৃষ্ট হয়ে যাবে, যখন আল্লাহ্র সম্মতি নিয়ে সে শপথ করে এই বলেছিল,

فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إلا عبادك منهم المخلصين

"আপনার ক্ষমতার শপথ! আমি ওদের সকলকেই পথভ্রষ্ট করব, তবে তাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদের ব্যতীত।" [সূরা সাদ ৩৮ ঃ ৮২-৮৩]

ইউসুফ (আ.) প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার একজন মনোনীত বান্দা ও মানব জাতির একজন মহান নেতা।

(২)- যে এই সমস্ত সরকারের মন্ত্রীসভায় যোগ দেয়, সে সাংবিধানিক ভাবে শপথ গ্রহণ করুক বা না করুক, সে মানুষের তৈরী বিধানের আনুগত্য করতে এবং পরিপূর্ণ ভাবে তা মেনে নিতে বাধ্য। সে তখন ঐ মতবাদের একজন আন্তরিক দাস ও একান্ত বাধ্যগত সেবকে পরিণত হয় যে মতবাদ মিথ্যা, অধর্ম, অন্যায়, নাস্তিকতা এবং কুফরী দ্বারা মিশ্রিত।

ইউসুফ (আ.) যিনি আল্লাহ্র প্রেরিত নবী ছিলেন, তিনি কি সেরূপ হতে পারেন? তার কাজকে কি আমরা কাফিরদের মধ্যে যোগ দানের সাথে তুলনা করব? যে কেউ আল্লাহ্র নবী ইউসুফ (আ.); যিনি আল্লাহ্র নবীর ছেলে ও আল্লাহ্র নবীর দৌহিত্র; তাকে এমন কোন ব্যাপারে অভিযুক্ত করবে যে, তার কার্যক্রম ছিল আজকের এই কুফরী মতবাদ- গণতন্ত্রের দাসদের মত তাহলে সেই ব্যক্তির কুফরী সম্পর্কে আমাদের কোন সন্দেহই থাকবে না এবং সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। সে একজন অবিশ্বাসী হয়ে যাবে কারণ আল্লাহ্ বলেন ঃ "প্রত্যেক জাতির কাছে আমি একজন নবী পাঠিয়ে ছিলাম এই কথা বলার জন্যে, 'আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং সমস্ত ত্বাগুত থেকে দূরে থাক'।"[১৭] এটাই ছিল ইউসুফ (আ.) এবং সমস্ত নবীদের (আ.) সবচেয়ে বড় দায়িত্ব ।

তাহলে, এটা কি আদৌ সম্ভব যে তিনি মানুষকে আল্লাহ্র হুকুমের দিকে ডেকেছেন দু'সময়েই - যখন তিনি ক্ষমতাশীল ছিলেন এবং যখন তিনি দুর্বল ছিলেন; তারপর তিনি আল্লাহ্র হুকুমের বিরোধিতা করে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হলেন অথচ আল্লাহ্ তার ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন তার একজন পরিশুদ্ধ, একনিষ্ঠ বান্দা হিসেবে? কিছু *মুফাস্সিরীন*[১৮] বলেছেন এই আয়াত[১৯] হচ্ছে একটি দলিল যে, ইউসুফ (আ.) রাজার আইন ও নিয়ম-কানুন প্রয়োগ করেননি এবং তাকে তা মানতে বা প্রয়োগ করতে বাধ্য করা হয়নি।

বর্তমানে ত্বাগুতের মন্ত্রীপরিষদ বা তাদের সংসদ কি ঐভাবে পরিচালিত যেভাবে ইউসুফ (আ.)-এর সময় পরিচালিত হত? একজন মন্ত্রী কি ঐভাবে দেশের প্রচলিত আইনের বিরোধী কাজ করতে স্বাধীন? যদি তা না হয়, তাহলে এই দু'য়ের মধ্যে কোন তুলনা চলে না।

(৩)- ইউসুফ (আ.) মন্ত্রীসভায় অংশগ্রহণ করেছিলেন আল্লাহ্র সাহায্যে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض

---

[১৬] সূরা ইউসুফ **১২ ঃ ২৪**

[১৭] সূরা নাহল **১৬ ঃ ৩৬**

[১৮] *মুফাস্সিরীন* ঃ যাঁরা আল-কুর'আনের *তাফসীর* বা ব্যাখ্যা করেন।

[১৯] **...ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك** "রাজার আইনে তাঁর ভাইকে তিনি আটক করতে পারত না ..." [সূরা ইউসুফ **১২ ঃ ৭৬**]

"এইভাবেই ইউসুফকে আমি সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম" [সূরা ইউসুফ ১২ ঃ আয়াত ৫৬]।

সুতরাং, এটাই হচ্ছে আল্লাহ্‌র দেয়া কর্তৃত্ব, কোন ব্যক্তি বা রাজার ক্ষমতা ছিল না তাকে আঘাত করার বা তাকে সেই কর্তৃত্ব থেকে অপসারণ করার, যদিও তিনি রাজা এবং তার বিধান ও বিচার ব্যবস্থার বিরূদ্ধাচরণ করেছিলেন। ইউসুফ (আ.)-কে ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব দেয়া হলেও, কিভাবে এই সব নিকৃষ্ট ও মন্দ লোকগুলোকে, যারা ত্বাগুতের সরকারের বড় বড় পদে আসীন, তাঁর সাথে তুলনা করা যায়, যিনি একমাত্র আল্লাহ্‌রই ইবাদত করতেন?

(৪)- ইউসুফ (আ.) রাজার কাছ থেকে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব নিয়েই মন্ত্রী পরিষদে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ্ বলছেনঃ

فلما كلّمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين

"অতঃপর রাজা যখন তাঁর সাথে কথা বলল, তখন রাজা বলল, 'নিশ্চয়ই, আজ তুমি আমাদের নিকট বিশ্বস্ত হিসাবে মর্যাদার স্থান লাভ করেছ'।" [সূরা ইউসুফ ১২ ঃ ৫৪]।

তাকে কোন প্রকার শর্ত বা সীমাবদ্ধতা ছাড়াই মন্ত্রী পরিষদ পরিচালনা করার জন্যে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল।

وكذلك مكّنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء

"এইভাবেই ইউসুফকে আমি সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম; তিনি সেই দেশে যথা ইচ্ছা স্থান করে নিতে পারতেন"। [সূরা ইফসুফ ১২ ঃ ৫৬]

তার কোন প্রতিপক্ষ ছিল না, কেউ তাকে তার কাজের জন্যে প্রশ্ন করার ছিল না।

এখনকার ত্বাগুতের মন্ত্রীদের কি এমন কোন কিছু আছে যা এক্ষেত্রে তুলনা যোগ্য? যদি মন্ত্রী এমন কিছু করেন যা রাষ্ট্রপ্রধান, রাজা বা রাজপুত্রের দ্বীন বা দেশের সংবিধানের বিরোধী, তাহলে তাকে মন্ত্রণালয় থেকে বরখাস্ত করা হবে। তাদের মতে মন্ত্রী হলেন রাষ্ট্রপ্রধান, রাজা বা রাজপুত্রের ইচ্ছা, তাদের নীতি বা প্রজাতন্ত্রের দাস এবং তাকে তা অবশ্যই মানতে হবে। সে কখনই রাষ্ট্রপ্রধান বা রাজার হুকুমকে অথবা সংবিধানকে অমান্য করতে বা এর অবাধ্য হতে পারবে না, যদিও তা আল্লাহ্‌র হুকুমের এবং তাঁর দ্বীনের (ইসলামের) বিরোধী হয়। যে কেউ বর্তমান অবস্থাকে ইউসুফ (আ.) এর অবস্থার মতই বলে দাবী করবে, সে নিজের অপরিসীম ক্ষতি করবে। সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছে একজন কাফির বলে বিবেচিত হবে এবং ইউসুফ (আ.)-কে আল্লাহ্ যে পরিশুদ্ধ করেছেন তাতে অবিশ্বাসী বলে বিবেচিত হবে।

যেহেতু বর্তমান অবস্থা ইউসুফ (আ.) এর মত নয়, তাই এই দু'য়ের মধ্যে তুলনা করা উচিৎ নয়। সুতরাং ত্বাগুতদেরকে তাদের নির্বোধ কথাবার্তা এবং কূটতর্ক এখানেই ত্যাগ করতে হবে।

তৃতীয়ত ঃ এই মিথ্যা যুক্তিকে খন্ডন করার আরেকটি মারাত্মক অস্ত্র হচ্ছে, যে কোন কোন *মুফাস্সিরীনের* মতে সেই রাজা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর ছাত্র মুজাহীদ (রহ.) তা বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এই প্রমাণই এ ঘটনাকে ব্যবহার করার সকল যুক্তিকে বাতিল করে দেয়। আমরা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস রাখি এবং বিশ্বাস করি যে, তাঁর কোন সৃষ্টির কথা অথবা ব্যাখ্যা, যার কোন দলিল ও প্রমাণ নেই, তার চেয়ে আল্লাহ্‌র কিতাবের আক্ষরিক অর্থের আনুগত্য করা আরও বেশী যথার্থ। ইউসুফ (আ.) সম্পর্কে আল্লাহ্‌র কথাই আমাদের জন্যে সুদৃঢ় প্রমাণ ঃ

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض

"সুতরাং এইভাবেই ইউসুফকে আমি সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করিলাম"। [সূরা ইউসুফ ১২ ঃ ২১]

আল্লাহ্ আল-কুর'আনে অন্য এক জায়গায় এই বিষয়ের সারমর্ম বর্ণনা করেছেন। তিনি ঈমানদারদের অবস্থান বর্ণনা করছেন যখন তাদেরকে তিনি কোন ভূমিতে কর্তৃত্ব দেন ঃ

الذين إن مكّناهم في الأرض أقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور

"আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দিবে ও অসৎকার্যের নিষেধ করবে; আর সকল কাজের পরিণাম আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে"। [সূরা হাজ্জ ২২ ঃ ৪১]

আমাদের এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইউসুফ (আ.) তাদের মধ্যে একজন। শুধু তাই নয় তিনি তাদের মধ্যেও একজন মহান নেতা, যাদেরকে আল্লাহ্‌ পৃথিবীতে ক্ষমতা দিলে তারা সৎকাজের আদেশ করে এবং অসৎ কাজের নিষেধ করে। যারাই ইসলাম সম্পর্কে জানে তাদের কারও কোন সন্দেহ নেই যে ইসলামের সর্বোৎকৃষ্ট বিষয় হল *তাওহীদ* (আল্লাহ্‌র একত্ববাদ), যা ছিল ইউসুফ (আ.)-এর দাওয়াতের মূল বাণী এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ হচ্ছে আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদারীত্ব (শির্‌ক) যেই ব্যাপারে ইউসুফ (আ.) সতর্ক করেছিলেন, ঘৃণা করেছিলেন এবং অংশীদারীত্ববাদের মিথ্যা প্রভুদের ও দেবতাদের আঘাত করেছিলেন। অবশ্যই সুনিশ্চিত নিদর্শন আছে যে, আল্লাহ্‌ যখন ইউসুফ (আ.)-কে ক্ষমতা দান করেছিলেন, তিনি তাঁর পিতৃপুরুষ, ইয়াকুব (আ.) ও ইবরাহিম (আ.)-এর দ্বীনের অনুসরণ করেছিলেন এবং মানুষকে সেদিকে আহ্বান করেছিলেন এবং যারা এই দাওয়াতের বিরুদ্ধাচরণ করত বা অসম্মতি প্রকাশ করত তাদের প্রত্যেককেই আক্রমন করেছিলেন। তিনি আল্লাহ্‌র শরীয়ত পরিত্যাগ করেননি। তিনি আল্লাহ্‌র শরীয়ত বা বিধান প্রতিষ্ঠিত না করার ক্ষেত্রে কাউকে সাহায্য করেননি। তিনি কোন বিধানদাতা (যারা আল্লাহ্‌র আইন বিরোধী বিধান প্রতিষ্ঠা করে) বা কোন ত্বাগুতদের সাহায্য করেননি। তিনি তাদেরকে এরূপ সাহায্য করেননি যে রূপ বর্তমান সময়ের ক্ষমতার দাসে পরিণত হওয়া মানুষেরা করছে।

তিনি তাদের সাথে আইন প্রণয়নে অংশ গ্রহণ করেননি যে রূপ আজকের মোহগ্রস্থ লোকগুলো সংসদে করছে। তিনি তাদের আচার-আচারণ এবং কর্মপন্থা অস্বীকার ও বর্জন করেছিলেন। তিনি তাদের খারাপ কাজগুলোকে পরিবর্তন করেছিলেন। তিনি আল্লাহ্‌র একত্ববাদের দিকে মানুষকে ডেকেছিলেন এবং তাদেরকে আক্রমন করেছিলেন যারা এর বিরোধিতা করেছিল, যেমনটি আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেছেন। যে কেউ এমন বিশ্বাসযোগ্য, সম্মানজনক, মহৎ ব্যক্তিদের সন্তানের নামে এমন কিছু বর্ণনা দেয় যা আল্লাহ্‌র দেয়া বর্ণনা থেকে ভিন্ন, তাহলে সে পবিত্র ইসলাম থেকে বের হয়ে একজন অপবিত্র কাফিরে পরিণত হবে।

এই ব্যাপারে অপর একটি দলিল হচ্ছে আল্লাহ্‌র এই কথার ব্যাখ্যা ঃ

وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين

"রাজা (যখন এই ব্যাপারটি শুনল সে) বলল, 'ইউসুফকে আমার নিকট নিয়ে আসো, আমি তাকে আমার একান্ত সহচর নিযুক্ত করব', যখন সে (রাজা) তাঁর [ইউসুফ (আ.)] সাথে কথা বলল, সে বলল, 'নিশ্চয়ই, আজ তুমি আমাদের নিকট বিশ্বস্ত হিসাবে মর্যাদার স্থান লাভ করেছ'।" [সূরা ইউ্সুফ ১২ ঃ ৫৪]

কেউ কি চিন্তা করতে পারে রাজার সাথে ইউসুফ (আ.) কি বিষয়ে কথা বলেছিলেন; তিনি কি রাজাকে তাকে ভালবাসার জন্যে, তাকে ক্ষমতা দেয়ার জন্যে, তাকে বিশ্বাস করার এবং তার প্রতি আস্থা রাখার ব্যাপারে কথা বলেছিলেন?

তিনি কি মন্ত্রী, আল-আজিজ, এর স্ত্রীর ঘটনার ব্যাপারে কথা বলেছিলেন, যেই ঘটনার সমাপ্তি হয়েছিল সকলের কাছে সত্য প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে? অথবা তিনি কি জাতীয় ঐক্য এবং অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে কথা বলেছিলেন? বা অন্য কোন ব্যাপার নিয়ে?

কেউই এমন দাবী করতে পারবে না যে তার অদৃশ্যের জ্ঞান আছে অথবা কেউ প্রমাণ ছাড়া কোন কথা বলতে পারেন না। যদি সে তা করে, সে একজন মিথ্যাবাদী হয়ে যাবে। কিন্তু এই আয়াত "যখন সে তাঁর সাথে কথা বলেছিল ..." এর ব্যাখ্যা নিম্নক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, "আল্লাহ্‌র ইবাদত করার ও ত্বাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি।" [সূরা নাহল ১৬ ঃ ৩৬]

এবং আল্লাহ্ বলেন,

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركتَ ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين

"তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই এই প্রত্যাদেশ হচ্ছে যে, তুমি আল্লাহ্‌র সাথে শরীক স্থির করলে তোমার সমস্ত আমল নিস্ফল হবে এবং অবশ্যই তুমি ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবে" [সূরা-যুমার ৩৯ ঃ ৬৫]।

এবং তাঁর কথার মাধ্যমে ইউসুফ (আ.)-এর দাওয়াত সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজের বর্ণনা পাওয়া যায়,

"যে সম্প্রদায় আলাহ্‌কে বিশ্বাস করে না এবং আখিরাতে অবিশ্বাসী আমি তাদের মতবাদ বর্জন করেছি। আমি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইস্হাক এবং ইয়াকুবের মতবাদ অনুসরণ করি, কোন বস্তুকে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা আমাদের কাজ নয়।" [সূরা-ইউসুফ ১২ ঃ ৩৭-৩৮] এবং তাঁর বক্তব্য,

"হে কারা সঙ্গীরা ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয় না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্? তাঁকে ছেড়ে তোমরা কেবল কতগুলো নামের ইবাদত করছো, যেই নাম তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রেখেছো, এইগুলোর কোন প্রমাণ আল্লাহ্ পাঠান নাই। বিধান দেবার অধিকার কেবল আল্লাহ্‌রই। তিনি আদেশ দিয়েছেন তাঁকে ব্যাতীত অন্য কারও ইবাদত না করতে, এটাই সরল দ্বীন কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এই ব্যাপারে অবগত নয়"। [সূরা-ইউসুফ ১২ ঃ ৩৯-৪০]

অতএব, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটাই ইউসুফ (আ.)-এর মহান বক্তব্য কারণ, এটি তাঁর মহামূল্যবান জীবন ব্যবস্থা (*দ্বীন*) এবং এটিই তাঁর দাওয়াতের, তাঁর দ্বীন এবং তাঁর পিতৃপুরুষদের দ্বীনের ভিত্তি। যদি তিনি কোন অসৎ কাজের নিষেধ করে থাকেন, তাহলে তার মধ্যে শিরকের চেয়েও অধিক কোন খারাবি হতে পারেনা যা তা এই মূলনীতির (তাওহীদের) বিরোধিতা করে থাকে। যদি এটা সত্য বলে গৃহীত হয় এবং তাঁর প্রতি রাজার উত্তর হচ্ছে, 'নিশ্চয়ই, আজ তুমি আমাদের নিকট বিশ্বস্ত হিসাবে মর্যাদার স্থান লাভ করেছ', তাহলে এটা সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, রাজা তাকে অনুসরণ করেছিল, তার সাথে এক মত হয়েছিল, শির্কী জীবন ব্যবস্থা (*দ্বীন*) পরিত্যাগ করেছিল এবং ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইউসুফ (আ.)-এর দ্বীনের অনুসরণ করেছিল।

ধরে নেই যে, অন্তত রাজা ইউসুফ (আ.) ও তার পিতার তাওহীদ ও দ্বীন যে সঠিক সে ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছিল। সে তাকে বলার স্বাধীনতা, তার দ্বীনের দিকে আহ্বান করার অনুমতি এবং যারা এর বিরোধী তাদের আক্রমন করার অনুমতি দিয়েছিল। এবং রাজা তাকে কোন বাধা দেয়নি এই কাজগুলো করার জন্যে, না তাকে তার দ্বীনের বিপরীত কোন কিছু করার জন্যে আদেশ করেছিল। তাহলে ইউসুফ (আ.)-এর অবস্থা ও আজকে যারা ত্বাগুতের প্রতি মোহগ্রস্থ হয়ে আছে, আর যারা তাদের সাহায্য করছে সংসদে আইন প্রণয়নে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে, তাদের অবস্থার মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে।

চতুর্থত ঃ যদি আপনি উপরোক্ত সব কিছু জানেন, তাহলে আপনি নিশ্চিত যে, ইউসুফ (আ.)-এর মন্ত্রনালয়ে অংশগ্রহণ একত্ববাদের সাথে সাংঘর্ষিক ছিল না এবং ইবরাহীম (আ.)-এর দ্বীনের সাথেও সাংঘর্ষিক ছিল না। কিন্তু বর্তমান সময়ের ত্বাগুতের মন্ত্রনালয়ে অংশগ্রহণ তাওহীদের সাথে সাংঘর্ষিক।

ধরে নেই, রাজা ইসলাম গ্রহণ করেনি এবং কাফেরই ছিল। তারপরও ইউসুফ (আ.)-এর শাসন ভার গ্রহণ করা একটা ছোট বিষয়, এটা প্রধান বিষয় হতে পারে না কারণ এটা হয়তোবা দ্বীনের উদ্দেশ্যের সাথে সাংঘর্ষিক ছিল না। কারণ ইউসুফ (আ.) কোন প্রকার কুফরী বা শিরক করেননি। তিনি কাফেরদের অনুসরণ করেননি অথবা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও বিধান মেনে নেননি। তিনি মানুষকে তাওহীদের দিকে ডেকে ছিলেন। শরীয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ বলছেন ঃ

لكلٍّ جعلنا منكم شِرعةً ومنهاجاً

"আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি শরী'আত ও একটি স্পষ্ট পথ এবং একটি জীবন পদ্ধতি দিয়েছি।" [সূরা মায়িদা ৫ ঃ ৪৮]

এমন কি নবীদের শরীয়াহ ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে কিন্তু তারা সবাই তাওহীদের ক্ষেত্রে এক। রাসূল মুহাম্মদ (সা.) বলেন,

نحن معاشرَ الأنبياء إخوةٌ لعلات ديننا واحد

"আমরা (নবীরা) একে অপরের ভাই যাদের পিতা একজনই কিন্তু মাতা ভিন্ন ভিন্ন, আমাদের দ্বীনও একই।"[২০]

তিনি বুঝিয়েছেন যে তাদের সকলেই তাওহীদের ক্ষেত্রে এক ছিলেন এবং দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে এবং শরীয়ার ক্ষেত্রে ভিন্নতা ছিল। সুতরাং কোন একটা জিনিস আমাদের জন্যে পূর্বের কোন আইন অনুসারে অবৈধ হতে পারে কিন্তু আমাদের শরীয়ায় তা বৈধ হতে পারে যেমন গণীমতের মাল অথবা বিপরীতটাও সত্য হতে পারে অথবা তা পূর্বে জাতিদের জন্যে নিষিদ্ধ ছিল কিন্তু আমাদের জন্যে বৈধ। সুতরাং অতীতের সমস্ত আইনই আমাদের আইন নয়, বিশেষত যখন তা আমাদের শরীয়ার সাথে সাংঘর্ষিক (পরস্পরবিরোধী) হয়।

এরূপ একটি সাংঘর্ষিকতার নিদর্শনস্বরূপ বলা যায়, যা ইউসুফ (আ.)-এর জন্য বৈধ ছিল, তা আমাদের জন্য অবৈধ। ইবন হিব্বান তার বইতে এবং আবূ ইয়ালা এবং আত্-তাবারানীতে বর্ণনা করেন যে রাসূল মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন,

ليأتين عليكم أمراء سفهاء يقربون شرار النّاس، ويُؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك منكم فلا يكونن عريفًا، ولا شرطياً، ولا جابياً، ولاخازناً

"অপরিণতমনস্ক ব্যক্তি শাসক হিসেবে তোমদের কাছে আসবে এবং সবচেয়ে খারাপ কাজটি করবে, খারাপ লোকেরা হবে তার সঙ্গী এবং তারা সালাত বিলম্বে আদায় করবে। তোমাদের মধ্যে যারাই তা অনুধাবন করবে, তারা যেন তাদের উচ্চ পদে আসীন না হয় বা তাদের কর্মচারী না হয় অথবা তাদের সংগ্রহকারী অথবা কোষাধ্যক্ষ না হয়।"

এখানে যা বোঝানো হয়েছে তা হচ্ছে এই শাসক কাফের নয় কিন্তু তারা হবে অসৎ চরিত্রের এবং নির্বোধ।

একজন সতর্ককারী সাধারণত সবচেয়ে বড় অন্যায় এবং গর্হিত কাজ সম্পর্কে সতর্ক করে। তাই, যদি তারা কাফের হতো, তাহলে রাসূল (সা.) তা উলেখ করতেন। কিন্তু তাদের সবচেয়ে খারাপ কাজ যা রাসূল (সা.) এখানে উল্লেখ করেছেন তা হচ্ছে তারা সবচেয়ে খারাপ লোকদেরকে বন্ধু বানাবে এবং সালাতে শৈথিলতা প্রকাশ করবে। এরই কারণে নবী মুহাম্মদ (সা.) আমাদের কাউকে তাদের কোষাধ্যক্ষ বা মন্ত্রী হতে অনুমতি দেননি। সুতরাং যদি আমাদের আইনে অত্যাচারী শাসকের কোষাধ্যক্ষ বা মন্ত্রী হিসেবে কাজ করা নিষিদ্ধ এবং অবৈধ, তবে কিভাবে একজন কাফের রাজা এবং মুশরিক শাসকের মন্ত্রী হিসাবে কাজ করা বৈধ হবে?

قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظٌ عليم

"আমাকে দেশের ধনভান্ডারের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করুন, আমি তো উত্তম রক্ষক, সুবিজ্ঞ।" [সূরা ইউসুফ ১২ ঃ ৫৫]

এটা সত্য এবং সুনিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত যে এটা পূর্ববতী লোকদের দ্বীনের সাথে সংশিষ্ট এবং এটাকে আমাদের আইনে বাতিল করা হয়েছে এবং আল্লাহ্ই ভাল জানেন। এটাই পর্যাপ্ত হওয়া উচিত তার জন্যে যে হেদায়াত চায় কিন্তু যে তার নিজের চিন্তাভাবনা, মানুষের মতামত এবং কথাকে দলিল এবং প্রমাণ থেকে বেশি প্রাধান্য দেয়- সে সুনিশ্চিতভাবে হেদায়াত পাবে না।

ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً...

"আল্লাহ্ যাকে পথ দেখান না তার জন্য আল্লাহ্র নিকট তোমার কিছুই করার নেই।" [সূরা মায়িদা ৫ ঃ ৪১]

---

[২০] বুখারী শরীফ : আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

পরিশেষে, এই অসার, অমূলক যুক্তি সম্পর্কে কথা শেষ করার আগে আমরা কিছু মোহগ্রস্থ ব্যক্তিদের ভ্রান্তি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দিতে চাই যারা শিরক ও কুফরে নিমজ্জিত প্রমানিত হয় তাদের কুফরী মন্ত্রনালয়ে এবং শিরকী সংসদে যোগ দেয়ার মাধ্যমে। তারা ইউসুফ (আ.) এর রাজার মন্ত্রনালয়ে যোগদেয়ার ব্যাপারে শাইখ-উল-ইসলাম ইবন তাইমিয়ার উক্তিকে তাদের যুক্তি ও অজুহাতের সাথে গুলিয়ে ফেলেছে। এটা প্রকৃত পক্ষে মিথ্যার সাথে সত্যের সংমিশ্রণ। এটা শাইখ-এর উপর মিথ্যা অপবাদ এবং তার সম্পর্কে খারাপ বক্তব্য দেয়া ছাড়া কিছুই না। তিনি এই কাহিনী উল্লেখ করে সংসদে অংশগ্রহণ এবং কুফরী করার অথবা আল্লাহ্র বিধান প্রয়োগ না করার দলিল হিসেবে তা ব্যবহার করেননি। না, আমরা বিশ্বাস করি যে, এই মুসলিম শাইখ এবং তার দ্বীন এবং তার কল্‌ব এই খারাপ দাবী থেকে মুক্ত। পরবর্তীকালে ভন্ড লোকেরা ছাড়া আর কেউই তা দাবী করতে পারে না। আমরা এটা বলছি কারণ কোন জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন মুসলমান এই ধরনের বক্তব্য দিতে পারে না।

কাজেই, শাইখের মতো একজন আলেম কিভাবে এটা বলতে পারে, যদিও এ ব্যাপারে তার বক্তব্য পরিষ্কার এবং পুরোপুরিভাবে আপোষহীন। তার সমস্ত বক্তব্যের মূল লক্ষ্য ছিল দু'টি কাজের মধ্যে জঘন্যতমটি প্রতিরোধ করা এবং দু'টি পরস্পর বিরোধী বিষয়ের মধ্যে থেকে যেটা উত্তম বিষয়টি গ্রহণ করা। আপনি জানেন যে, দুনিয়াতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তাওহীদ এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে আল্লাহ্র সাথে অংশীদার স্থাপন বা শিরক করা। 'আল-হিসবা'এ বর্ণিত আছে যে, ইউসুফ (আ.) ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা এবং ভাল কাজে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।[২১]

অর্থাৎ বিবিধ সম্পাদিত কাজের উত্তম তদারকি বা তত্ত্বাবধান করা। ইউসুফ (আ.)-এর কাজের বর্ণনায় তিনি (ইবনে তাইমিয়া) বলেছেন- "তিনি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা এবং ভাল কাজে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি তাদেরকে ঈমানের দিকে ডেকেছেন যতটুকু তারপক্ষে সম্ভব।" তিনি আরো বলেছেন, কিন্তু তার পক্ষে যতটুকু সম্ভব তিনি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা এবং ভাল কাজ সম্পাদন করেছিলেন।"[২২]

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ উল্লেখ করেননি যে, ইউসুফ (আ.) আল্লাহ্র পাশাপাশি বিধান দিয়েছিলেন বা আল্লাহ্র বিধান বাদ দিয়ে অন্য কোন বিধান দ্বারা বিচার কার্য সম্পাদন করেছিলেন বা তিনি গণতন্ত্রের অথবা এমন দ্বীনের (জীবন ব্যবস্থা) অনুসরণ করেছেন যা আল্লাহ্ দ্বীনের সাথে সাংঘর্ষিক। বর্তমানে মোহগ্রস্থ ব্যক্তিরা তার কথার সাথে তাদের কুৎসিত প্রমাণের মিশ্রণ ঘটায় এবং সাধারণ মানুষদেরকে বিপথে নেওয়ার জন্যে মিথ্যা যুক্তি দাঁড় করায়। তারা মিথ্যার সাথে সত্যকে এবং অন্ধকারের সাথে আলোর সংমিশ্রণ ঘটায়।

আমাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে যে দিকে আমাদের ফিরে যেতে হবে তা হল, আল্লাহ্র বাণী এবং তাঁর রাসূল (সা.) যিনি আমাদের নেতা ও পথ প্রদর্শক। আল্লাহ্র রাসূলের (সা.) কথার পর অন্য কারও কথা গ্রহণ করা হতে পারে বা নাও হতে পারে। একারণেই যদি এই কথা শেখ ইবনে তাইমিয়ার হয়ও- তারা যে রূপ দাবী করছে বা তার চেয়েও বড় কোন আলেমেরও হয়, আমরা তা গ্রহণ করবো না যতক্ষণ না তারা প্রমাণ দিতে পারে যে রূপ আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

قُلْ هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين

"বল ঃ যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ পেশ কর।" [সূরা বাকারা ২ ঃ ১১১]

কাজেই এসব ব্যাপারে সতর্ক থাকুন, তাওহীদকে আঁকড়ে থাকুন। মুশরিকদের এবং তাওহীদের শত্রুদের পথভ্রষ্ঠকারী এবং মিথ্যা গুজবে কর্ণপাত করবেন না। তাদের অসঙ্গতিপূর্ণ কূটতর্কে কর্ণপাত করবেন না।

তাই নিজের তওহীদকে শক্ত হাতে ধরে রাখুন। শিরকের অনুসারীদের এবং তাওহীদের শত্রুদের বিপথগামী মিথ্যা প্রচারণার দিকে মনোনিবেশ করবেন না।

আল্লাহ্র দ্বীনের অনুসরণ করে এমন লোকের মতো হয়ে যান, যে সব লোকদের সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে নবী

[২১] মাজমু আল-ফাতাওয়াঃ খন্ড ২৮ঃ পৃষ্ঠা ৬৮

[২২] মাজমু আল-ফাতাওয়াঃ খন্ড ২০ঃ পৃষ্ঠা ৫৬

মুহাম্মদ (সা.) বলেন,

لا يضرّهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتيَ أمرُ الله وهم كذلك

"তারা তাদের দিকে ঝুঁকে পড়বে না যারা দ্বিমত পোষণকরবে এবং তাদেরকে ত্যাগ করবে যতক্ষণ না আল্লাহ্‌র নির্ধারিত দিবস আসে, যে সময় পর্যন্ত তারা ঐ পথেই থাকবে"[২৩] ।

দ্বিতীয় অযৌক্তিক অজুহাত ঃ

যদিও নাজ্জাসী আল্লাহ্‌র শারীআহ্ প্রয়োগ করেনি, তথাপি সে মুসলিম ছিল।

রাজনৈতিক দলগুলো, হোক না তারা ক্ষমতাসীন শাষক গোষ্ঠী বা বিরোধীদল, নাজ্জাসীর ঘটনাকে ব্যবহার করে ত্বাগুতের কার্যাবলীকে বৈধ করার জন্যে। তারা বলে ঃ "নাজ্জাসী ইসলাম গ্রহণের পর তার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ্‌র বিধান প্রয়োগ করেন নাই এবং এরপরও রাসূল (সা.) তাকে আল্লাহ্‌র ন্যায়নিষ্ঠ দাস বলেছেন, তার জন্যে জানাযার সালাত পড়ে ছিলেন এবং সাহাবীদের তাই করতে আদেশ করেছিলেন।" সফলতা আসে একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছ থেকে; এই ব্যাপারে আমাদের কথা হলো ঃ

প্রথমত ঃ

যারা এই প্রতারণামূলক যুক্তিটি দেখান, সবার প্রথমে তাদেরকে যাচাই যোগ্য ও সঠিক দলিল দ্বারা প্রমাণ করতে হবে যে, নাজ্জাসী ইসলাম গ্রহণের পরও আল্লাহ্‌র দেয়া বিধান প্রয়োগ করেননি। আমি তাদের যুক্তিটি বিচার বিশ্লেষণ করার পর যা পেলাম তা হলো, অসত্য বিবৃতি ও ভিত্তিহীন আবিষ্কার যা কিনা সত্যিকারের বা যাচাই যোগ্য কোন দলিল দ্বারা প্রমানিত নয়। আল্লাহ্ বলছেন ঃ

قل هاتوا بُرهانكم إن كنتم صادقين

"বল ঃ যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ পেশ কর।" [সূরা বাকারা ২ ঃ ১১১]

দ্বিতীয়ত ঃ

আমাদের মতে এবং যারা আমাদের বিরোধিতা করেন তাদেরও মতে সত্য হচ্ছে যে, নাজ্জাসী মারা গিয়েছিলেন ইসলামের হুকুম পরিপূর্ণ হওয়ার পূর্বে; তিনি মারা গিয়েছিলেন এই আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে,

اليوم أكملتُ لكم دينكم وأتممتُ عليكم نعمتي ورضيتُ لكمُ الإسلام ديناً...

"আজ তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করিলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করিলাম।" [সূরা মায়িদা ৫ ঃ ৩]

এই আয়াতটি নাযিল হয়েছিল বিদায় হজ্জের সময় কিন্তু নাজ্জাসী মারা গিয়েছিলেন তার পূর্বে যে রূপ হাফিজ ইবনে কাসির (রহ.)এবং অন্য আলেমগণ বর্ণনা করেছেন।[২৪]

সুতরাং সেই সময় তার জন্য কর্তব্য ছিল আল্লাহ্‌র বিধান যতটুকু জানা ছিল ততটুকু অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করা, আনুগত্য করা এবং কার্য সম্পাদন করা। এই ক্ষেত্রে প্রধান বিষয় ছিল আল-কুর'আনের বাণী মানুষের কাছে পৌঁছানো। আল্লাহ্ বলছেন ঃ

وأُوحِيَ إليَّ هذا القرآن لأُنذركم به ومن بلغ..

[২৩] সহীহ মুসলিম।
[২৪] আল বিদায়া আন নিহায়াঃ খন্ড ৩য়, পৃষ্ঠা ২৭৭

"এই কুর'আন আমার নিকট প্রেরিত হয়েছে যেন তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এটা পৌঁছাবে তাদেরকে এর দ্বারা আমি সর্তক করি।" [সূরা আন'আম ৬ ঃ ১৯]

সেই সময় যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এ রকম ছিল না যা আমরা আজকে দেখতে পাচ্ছি। কিছু হুকুম কারও কাছে পৌঁছাতে কয়েক বছর লেগে যেত এবং কোন কোন সময় এমনও হতো যে, রাসূল (সা.) এর কাছে না আসা পর্যন্ত কোন কোন হুকুম জানাও যেত না।

সুতরাং সেই সময় দ্বীন ছিল নতুন এবং আল-কুর'আন তখনও নাযিল হচ্ছিল। সেই কারণেই দ্বীন তখনও পরিপূর্ণ হয়নি। এই ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে যায় বুখারী শরীফের বর্ণনা মতে; আব্দুলাহ ইবনে মাসুদ বলেছিলেন ঃ "আমরা রাসূল (সা.) কে সালাতের মধ্যে সালাম দিতাম এবং তিনি তার উত্তর দিতেন। কিন্তু নাজ্জাসীর কাছ থেকে ফিরে আসার পর আমরা তাকে সালাম দিলাম কিন্তু তিনি সালামের উত্তর দিলেন না। তিনি বললেন ঃ সালাতের একটি উদ্দেশ্য আছে।" যে সমস্ত সাহাবীরা ইথোপিয়ায় ছিল, যা ছিল নাজ্জাসীর পাশে, রাসূল (সা.) এর হুকুমের অনুসরণ করে আসছিল কিন্তু তারা জানতো না যে সালাতের মধ্যে কথা বলা এবং সালাম দেয়া নিষেধ হয়ে গিয়েছিল, যদিও সালাত একটি ফরজ হুকুম এবং রাসূল (সা.) প্রতিদিন দিনে রাতে পাঁচ বার করে সালাতের ইমামতি করেছিলেন। আজ যারা শির্কী মতবাদ গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন তারা কি এমন দাবী করতে পারবেন যে, আল-কুর'আনের, ইসলামের হুকুম তাদের কাছে পৌঁছায়নি? তারা কি ভাবে তাদের এই অবস্থানকে নাজ্জাসীর ঐ অবস্থানের সঙ্গে তুলনা করবেন যখন ইসলাম পরিপূর্ণ ছিল না?

তৃতীয়ত ঃ

এটা জানা কথা যে নাজ্জাসী আল্লাহ্‌র হুকুমের যতটুকু জানতেন ততটুকু প্রয়োগ করতেন, আর যে কেউ এর বিপরীত কথা বলবে, তাকে প্রমাণ ছাড়া কিছুতেই বিশ্বাস করা যাবে না কারণ ইতিহাসের প্রমাণাদি আমাদেরকে জানিয়ে দেয় যে, তিনি সেই সময় আল্লাহ্‌র আইন সম্পর্কে যতটুকু জানতেন, ততটুকু প্রয়োগ করতেন।

(১) সেই সময় তাকে আল্লাহ্‌র যে সব হুকুম মানতে হতো তার একটি হলো ঃ "আল্লাহ্‌র একত্ববাদেকে স্বীকার করা এবং মুহাম্মদ (সা.)-কে আল্লাহ্‌র রাসূল হিসেবে মানা এবং ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ্‌র দাস ও রাসূল বলে বিশ্বাস করা।" তিনি তা করে ছিলেন কিন্তু আপনি কি তা দেখতে পান তাদের প্রমাণে? নাজ্জাসীর যে চিঠিটি তিনি রাসূল (সা.)-কে দিয়েছিলেন তা তারা প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করে থাকে।

ওমর সোলায়মান আল-আসকর তার পুস্তিকা *"The Council's Judgement of the Participation in the Ministry and the parliament"*-পুস্তকে তা উল্লেখ করেছেন।

(২) তার রাসূল (সা.)-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ এবং হিজরত করার জন্যে অঙ্গীকার ঃ পূর্বের চিঠিটিতে সেই বিষয়ের প্রতি ঈঙ্গিত করা হয়েছে, নাজ্জাসী বলেছিলেন ঃ "আমি রাসূলের প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার করছি" এবং তার ছেলে জাফর (রা.) এবং তার সঙ্গীদের কাছে আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছিলেন এবং তিনি জাফর (রা.) এর সাহায্যে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এই চিঠিতে উল্লেখ ছিল যে, নাজ্জসী তার ছেলেকে (আরিয়া বিন আল-আসরাম ইবন আবজার) রাসূল (সা.)-এর কাছে প্রেরণ করেছিলেন। এতে আরও উলেখ ছিল যে, "ও আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) যদি আপনি চান আমি আপনার কাছে চলে আসি, আমি অবশ্যই তা করবো। কারণ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনার কথা সত্য।" তারপরই সে মারা যায় অথবা রাসূল (সা.) সেই সময় চাচ্ছিলেন না যে তিনি তা করুক। এই সমস্ত ব্যাপারগুলো পরিষ্কার নয় এবং এই ঘটনার কোন সঠিক দলিল নেই। সুতরাং এই ধরনের কোন রায় এবং একে একটি দলিল হিসেবে ব্যবহার করা গ্রহণ যোগ্য নয়। অধিকন্তু, তা তাওহীদ ও ইসলামের মূলনীতির বিরোধী হয়ে যাবে।

(৩) রাসূল (সা.) ও তাঁর দ্বীনকে সাহায্য করা এবং তার আনুগত্য করা ঃ নাজ্জাসীর কাছে যারা হিজরত করে গিয়েছিল, তিনি তাদের সাহায্য করেছিলেন এবং তাদেরকে মেহমান হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাদের নিরাপত্তা দিয়েছিলেন। তিনি তাদের পরিত্যাগ করেননি। তিনি তাদেরকে কোরআইশদের হাতেও তুলে দেননি। তিনি ইথোপিয়ান খ্রিষ্টানদের তাদের ক্ষতি করতে দেননি, যদিও ঈসা (আ.) সম্পর্কে তাদের আক্বিদা সঠিক ছিল। আরও

একটি চিঠি ছিল যা নাজ্জাসী রাসূল (সা.) কে প্রেরণ করেছিলেন (ওমর আল-আসকর এই চিঠিটির কথাও উক্ত পুস্তিকাতে উল্লেখ করেছেন) যাতে উল্লেখ ছিল যে তিনি তার ছেলেকে ৬০ জন ইথোপিয়ান লোক সহ রাসূল (সা.) এর কাছে প্রেরণ করে ছিলেন তাকে সাহায্য, তার আনুগত্য এবং তার সঙ্গে কাজ করার জন্যে।

তথাপিও ওমর আল-আসকর সহসা তার উক্ত পুস্তিকাতে বলে যে নাজ্জাসী আল্লাহ্‌র দেয়া বিধান প্রয়োগ করেনি যা কিনা একটা মিথ্যা এবং একজন মুওয়াহীদের উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়া। কিন্তু সত্য হচ্ছে যে, সেই সময় তিনি যতটুকু আল্লাহ্‌র হুকুম জেনেছিলেন ততটুকু প্রয়োগ করেছিলেন। এবং যে এটা ছাড়া অন্য কিছু বলবেন, আমরা তা কখনও বিশ্বাস করবো না যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি সুনিশ্চিত দলিল দিতে পারেন। অন্যথায় সে মিথ্যাবাদী হয়ে যাবে ঃ "বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ পেশ কর।" তিনি (ওমর আল-আসকর) তার দাবীর পক্ষে কোন সুনিশ্চিত দলিল দেননি। কিন্তু তিনি তার প্রমাণের জন্যে কিছু ইতিহাস গ্রন্থের অনুসরণ করেছেন এবং আমরা সকলেই জানি এইসব ইতিহাস গ্রন্থের অবস্থা আর তা নিঃসন্দেহে ঘোলাটে বা অনিশ্চিত তথ্য সম্বলিত।

চতুর্থত ঃ

নাজ্জাসীর অবস্থা এরূপ ছিল যে তিনি যখন দেশের শাসক, তিনি কাফের ছিলেন এবং তারপর ইসলাম গ্রহণ করে তার রাজত্ব চলা কালে। তিনি তার স্বাক্ষর রেখেছিলেন পরিপূর্ণ ভাবে রাসূল (সা.) এর হুকুমের আনুগত্যের মাধ্যমে, যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত ছিল তার পুত্রকে প্রেরণ করা, রাসূল (সা.) এর কাছে কিছু লোকবল প্রেরণ এবং হিজরত করার জন্যে রাসূল (সা.) এর কাছে অনুমতি চাওয়া। রাসূল (সা.)-কে এবং তার দ্বীনকে সাহায্য করার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো তার অনুসারীদের সাহায্য করা। আপাত দৃষ্টিতে তিনি সব ত্যাগ করেছিলেন যা ছিল ইসলাম বিরোধী। তিনি সত্যকে জানার এবং দ্বীনকে শেখার চেষ্টা করেছিলেন মৃত্যু পর্যন্ত যা ঘটেছিল দ্বীনের বিধান পরিপূর্ণ হওয়ার পূর্বে এবং তার কাছে পরিপূর্ণ রূপে পৌঁছানোর পূর্বে। এই ব্যাপারটি রাসূল (সা.) এর বাণী থেকে এবং এ সম্পর্কিত সঠিক বর্ণনা থেকে প্রমাণিত। যারা এ ব্যাপারে একমত নন তাদের প্রত্যেককে আমরা চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি তারা যা বলছেন তা প্রমাণ করার জন্যে সঠিক দলিল দিয়ে কারণ শুধু মাত্র ইতিহাস গ্রন্থ কোন দলিল হতে পারে না।

যে পরিস্থিতির সঙ্গে তারা বর্তমান পরিস্থিতিকে তুলনা করছেন তা সম্পূর্ণ ভুল এবং ভিন্ন। এটা হচ্ছে এমন এক দল লোকের ব্যাখ্যা যারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবী করছে আবার তারা ত্যাগ করছে না যা ইসলামের বিপরীত বা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। তারা ইসলামের ওপর আছে বলে দাবী করছে আবার একই সময়ে তারা ধরে রেখেছে যা ইসলামের বিপরীত এবং এটা নিয়ে তারা গর্বও বোধ করে।

তারা নাজ্জাসী যেভাবে খৃষ্টধর্ম প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, সেভাবে গণতন্ত্রের দ্বীনকে প্রত্যাখ্যান করেনি, বরং, তারা গণতন্ত্রের পক্ষে দেয়া বক্তব্যসমূহ ও প্রচারণায় মোহগ্রস্থ হয়ে মানুষেকেও এই মিথ্যা দ্বীনের প্রতি আহ্বান করছে। তারা নিজেদেরকে 'আলিহা'-তে পরিণত করে, মানুষের জন্য আইন প্রণয়ন করে, যে ব্যাপারে আল্লাহ্‌ কোন দিনও অনুমতি দেননি, তারা মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের সাথে তাদের এই দ্বীনের ব্যাপারে একমত হয়ে তাদের কাজে যোগদান করে, তারা কাফিরদের সাথে তাদের তৈরী সংবিধান অনুসারে দেশ পরিচালনা করছে। তারা এই সংবিধানকে অনুসরণ করছে এবং তাদেরকে ঘৃণা করে যারা এই সংবিধানকে আক্রমন বা প্রত্যাখ্যান করে।

তারা দ্বীন পরিপূর্ণ হওয়ার পরে এবং তাদের কাছে আল-কুর'আনের বাণী এবং রাসূল (সা.) এর সুন্নাহ্‌ পৌঁছানোর পরেও এই সব কিছু করছে ।

আপনি যেই হোন না কেন আমি আপনাকে শপথ করে বলছি, এটা কি ন্যায় সঙ্গত যে এই মিথ্যা, অন্ধকারময়, দুর্গন্ধময় পরিস্থিতিকে এমন একজন মানুষের পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনা করা, যে কিনা ইসলামের সঙ্গে বেশী দিন ধরে পরিচিত নয়, যে কিনা সত্যের সন্ধান করছিলেন এবং সাহায্য করেছিলেন দ্বীনকে তা পরিপূর্ণ হওয়ার এবং তার কাছে পৌঁছানোর পূর্বে? কতই না ব্যবধান এই দুই পরিস্থিতির মানুষগুলোর মধ্যে!

হ্যাঁ, তারা হয়তো বুঝাতে চায় দু'টি পরিস্থিতি একই কিন্তু তা সত্যের মাপকাঠিতে নয়! এই দুই অবস্থা সমান হতে পারে বাতিলের মানদন্ডে, যাদের উপর থেকে আল্লাহ্‌ তাঁর হেদায়েত বোঝার বোধশক্তি উঠিয়ে নিয়েছেন তাদের

ইসলাম বিরোধী গণতন্ত্র নামক দ্বীনে বিশ্বাসের কারণে।

ويلٌ للمطففين . الذين إذا اكتالوا على النَّاس يستوفون . وإذا كالوهم أو وزنوهم يُخسرون . ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون . ليومٍ عظيم.

"দুর্ভোগ তাহাদের জন্যে যাহারা মাপে কম দেয়, যাহারা লোকের নিকট হইতে মাপিয়া লইবার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে এবং যখন তাহাদের জন্যে মাপিয়া অথবা ওজন করিয়া দেয়, তখন কম দেয়। উহারা কি চিন্তা করে না যে, উহারা পুনরুত্থিত হইবে মহাদিবসে?" [সূরা মুতাফফিফীন ৮৩ ঃ ১-৫]

তৃতীয় অযৌক্তিক অজুহাত ঃ

গণতন্ত্রকে বৈধ করার জন্যে তাকে পরামর্শসভা বা শুরা কমিটি নাম দেয়া বা তার সাথে তুলনা করা।

কিছু অজ্ঞ লোক মুওয়াহীদদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র বক্তব্যকে ঃ

وأمرهم شورى بينهم

"... যাহারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে।"[২৫]

এবং রাসূল (সা.) এর কথাকে - وشاورهم في الأمر *"... এবং তারা সকল বিষয়ে পরামর্শ করে"* ব্যবহার করে তাদের ভ্রান্ত দ্বীন গণতন্ত্রের পক্ষে দলিল দেয়ার জন্যে। তারা গণতন্ত্রকে শুরা (তারা বলে যে গণতন্ত্র আর ইসলামিক শুরা বোর্ড একই) বলে অভিহিত করে এই ভ্রান্ত দ্বীনকে ধর্মীয় রংয়ে-রাঙ্গাতে চায় এটাকে বৈধ করার জন্যে।

এই ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য নিচে দেয়া হলো এবং আমরা আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করছি ঃ

প্রথমত ঃ নাম পরিবর্তন করার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ নাম পরিবর্তন করার মাধ্যমে মূল বিষয়টি পরিবর্তিত হয়ে যায় না। কিছু ধর্মীয় দল কাফেরদের এই দ্বীনে বিশ্বাস করে এবং বলে ঃ আমরা গণতন্ত্র বলতে বুঝাতে চাচ্ছি (আমরা যখন এর দিকে আহ্বান করি, উৎসাহ দেই, এর পক্ষে কাজ করি) বাক স্বাধীনতা এবং মানুষকে ইসলামের দিকে ডাকার স্বাধীনতা এবং এই ধরনের আরো অনেক কিছু।

আমরা তাদেরকে বলি ঃ তুমি এর দ্বারা কি বুঝাতে চাচ্ছ বা কি কল্পনা করছো তাতে কিছু যায় আসেনা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, গণতন্ত্র আসলেই কী ত্বাগুতেরা যেটিকে প্রয়োগ করছে এবং তারা যেই মতবাদের দিকে মানুষকে ডাকছে এবং যার নামে নির্বাচন করা হচ্ছে। শাসন ও বিচার ব্যবস্থা যেখানে আপনারা অংশ গ্রহণ করছেন কার দেয়া বিধান অনুসারে চলবে? আপনারা হয়তো মানুষকে প্রতারিত করতে পারবেন কিন্তু কখনই আল্লাহ্‌কে প্রতারিত করতে পারবেন না।

إنّ المنافقين يُخادعون الله وهو خادعهم

"নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহ্‌কে প্রতারিত করতে চায় কিন্তু আল্লাহ্‌ই তাদেরকে প্রতারিত করবেন।" [সূরা নিসা ৪ ঃ ১৪২]

এবং

يُخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون

[২৫] সূরা শূরা ৪২ ঃ ৩৮।

"আল্লাহ্ এবং মুমিনগণকে তারা প্রতারিত করতে চায়। অথচ তারা যে নিজেদেরকে ভিন্ন কাউকেও প্রতারিত করে না, এটি তারা বুঝতে পারে না"। [সূরা-বাকারা ২ ঃ ৯]

সুতরাং কোন জিনিসের নাম পরিবর্তন করে দিলেই ঐ জিনিসের রীতি-নীতির পরিবর্তন হয়ে যায় না। নাম পরিবর্তনরে মাধ্যমে হারাম কখনও হালাল হবে না এবং হালাল কখনও হারাম হয়ে যাবে না। রাসূল (সা.) বলেছেন ঃ

لَيَسْتَحِلَّنَ طائفةٌ مِنْ أُمّتي الخمرَ باسمٍ يُسَمُّونَها إيَّاه

"আমার উম্মতের এক দল লোক মদকে বৈধ করবে একে ভিন্ন একটি নাম দিয়ে।"

আলেম এবং বিচারকগণ যারা ইসলামের তাওহীদকে অপমান বা আক্রমন করে, তাদের প্রত্যেককেই কাফের বলে গণ্য করেন। তারা গণ্য করেন তাদের প্রত্যেকেই কাফের হিসেবে যাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হয়ে যায় যে, তারা কোন শির্কী কাজের নাম বদলে দিয়ে সেই কাজে লিপ্ত হয়; ঠিক তাদের মত যারা এই শির্কী মতবাদ, কুফর তথা গণতন্ত্রকে "শুরা" বলে তা বৈধ করতে চায় এবং মানুষকে এদিকে ডাকে।

দ্বিতীয়ত ঃ মুশরিকদের গণতন্ত্রের সাথে মুওয়াহীদদের পরামর্শকে (শুরা) তুলনা করা এবং শুরা পরিষদ এর সাথে পাপিষ্ঠ, অবাধ্য কাফেরদের পরামর্শ পরিষদ একই রকম বলা একটা নিকৃষ্ট তুলনা। আপনি জানেন যে, সংসদীয় পরিষদ হলো মূর্তি পূজার একটি মন্দিরের ন্যায় এবং শিরক-এর প্রানকেন্দ্র যেখানে থাকে গণতন্ত্রের উপাস্যগুলো এবং তাদের প্রভু ও সহযোগীরা, যারা দেশ শাসন করে তাদের সংবিধান এবং আইন অনুসারে যার অনুমতি আল্লাহ্ তা'আলা দেননি। আল্লাহ্ বলছেন ঃ

"হে কারা সঙ্গীরা ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয় না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্ ? তাঁকে ছেড়ে তোমরা কেবল কতগুলো নামের ইবাদত করছো, যেই নাম তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রেখেছো, এইগুলোর কোন প্রমাণ আল্লাহ্ পাঠান নাই। বিধান দেবার অধিকার কেবল আল্লাহ্রই। তিনি আদেশ দিয়েছেন অন্য কারও ইবাদত না করতে, কেবল তাঁর ব্যতীত, এটাই সরল দ্বীন কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহা আবগত নয়।" [সূরা ইউসুফ ১২ ঃ ৩৯-৪০]

এবং তিনি আরও বলছেন ঃ "তাদের কি অন্য অংশীদার/*ইলাহ* আছে যারা তাদের জন্যে বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের যার অনুমতি আল্লাহ্ দেন নাই?" [সূরা শূরা ৪২ ঃ ২১]

সুতরাং এই তুলনাটি শিরক-এর সঙ্গে তাওহীদের, অবিশ্বাস এর সঙ্গে বিশ্বাস (আল্লাহ্তে) এর তুলনা করার মত। এটা হচ্ছে আল্লাহর ও তার দ্বীনের উপর মিথ্যা আরোপ করা। এটি হচ্ছে সত্যের সাথে মিথ্যার, অন্ধকারের সঙ্গে আলোর সংমিশ্রণ করা। এক জন মুসলিমকে অবশ্যই জানতে হবে যে আল্লাহ্র দেয়া শুরা এর সঙ্গে নোংরা গণতন্ত্রের পার্থক্য হচ্ছে আকাশের সঙ্গে পাতালের যে রূপ পার্থক্য বা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে যে পার্থক্য সে রূপ। শুরা বা পরামর্শ করা হচ্ছে একটি স্বর্গীয় পদ্ধতি বা নিয়ম এবং গণতন্ত্র হচ্ছে মানুষের তৈরী যা দুর্নীতিগ্রস্থ এবং কুরুচীপূর্ণ।

পরামর্শ করা হলো আল্লাহ্র দেয়া একটি বিধান, আল্লাহ্র দ্বীনের অংশ কিন্তু গণতন্ত্র হলো আল্লাহ্র বিধান, আল্লাহ্র দ্বীনের সাথে কুফরী করা, আল্লাহ্র দ্বীনকে অস্বীকার করা। পরামর্শ বা শুরা হবে সেই বিষয়ে যেই বিষয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কোন পূর্ব সিদ্ধান্ত নেই কিন্তু যখনই আমাদের কাছে আল-কুর'আনের আয়াত থাকবে, দলিল বা রায় থাকবে, তখন কোন পরামর্শ হবে না। আল্লাহ্ বলছেন ঃ

وما كان لمؤمنٍ ولا مؤمنةٍ إذا قضى الله ورسولُه أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم

"যখন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দেন, তখন সে বিষয়ে কোন মুমিন পুরুষ বা মুমিন নারীর ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার নেই"। [সূরা আহযাব ৩৩ ঃ ৩৬]

গণতন্ত্রের দুই দিকই ঝুঁকিপূর্ণ। এক দিকে আল্লাহ্র বিধান নিয়ে পরামর্শের কোন সুযোগ নেই। এবং অন্য পাশে গণতন্ত্রে মানুষের বিধান, মানুষের দেয়া আইনকে গুরুত্ব দেয়া হয়। তারা এটা তাদের সংবিধান থেকে পেয়েছে ঃ

জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। গণতন্ত্রে মানুষই সর্বময় কর্তৃত্ব বা ক্ষমতার মালিক। গণতন্ত্র হচ্ছে অধিকাংশ লোকের দেয়া আইন, অধিকাংশ লোকের শাসন, এবং অধিকাংশ লোকের দেয়া দ্বীন। অধিকাংশই নির্ধারণ করে কোনটি হালাল, কোনটি হারাম। এভাবে গণতন্ত্রে মানুষ সৃষ্টিকর্তার স্থানে নিজেকে বসিয়ে দিয়েছে। কিন্তু শুরায়, মানুষ বা অধিকাংশ লোক আল্লাহ্‌র হুকুম, আল্লাহ্‌র রাসূলের হুকুম এবং তারপর মুসলিম নেতার আনুগত্য করতে বাধ্য। এবং নেতা অধিকাংশের মতামত বা রায় গ্রহণ করতে বাধ্য নয়। এমন কি অধিকাংশ লোক নেতার আনুগত্য করতে বাধ্য যদিও নেতা কোন ভুল সিদ্ধান্ত নেয় যতক্ষণ না তা আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা হয়।

গণতন্ত্র এবং এর দিকে আহ্বানকারীরা আল্লাহ্‌র আইনের, আল্লাহ্‌র বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করে। তারা আত্মসমর্পণ করতে নাকচ করে এই বলে যে ঃ আইন হবে অধিকাংশের মতের অনুসারে, ...। এই পৃথিবীতে এই কথা শোনা অনেক ভাল মহান বিচার দিবসে শোনার চেয়ে যে দিন মানুষ তার বিচারের সম্মুখীন হবে, যখন তারা হাউজে কাওসারের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করবে এবং ফেরেশতারা তাদেরকে প্রতিরোধ করবে। বলা হবে "তারা পরিবর্তন করে ছিল", তখন রাসূল (সা.) বলবেন ঃ

سُحقاً سُحقاً لمن بدّل بعدي

"তারা জাহান্নামে, তারা জাহান্নামে, যারা আমার পরে পরিবর্তন সাধন করেছে।"

গণতন্ত্রের উৎপত্তি কুফরী এবং নাস্তিকতার ভূমি থেকে, এটি ইউরোপের কুফরী এবং দুর্নীতির কেন্দ্রস্থলগুলো হতে উদ্ভূত হয়, যেখানে দৈনন্দিন জীবনের রীতি-নীতি ও ধর্ম ছিল আলাদা। এই মতবাদের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছিল এমনই এক পরিবেশের যেখানে এই মতবাদের সমস্ত বিষ ও ত্রুটি বিদ্যমান ছিল। সম্ভবত পশ্চিমা বিশ্বে সেকুলারিজম (ধর্ম থেকে জীবনের আলাদা করার রীতি) চর্চা শুরুর পূর্বে থেকেই গণতন্ত্রের চর্চা ছিল, আর সে কারণেই সমকামিতা, মদ্যপান ও অন্যান্য গর্হিত কাজ সেখানে বৈধ ছিল। তাই যে কেউ এই মতবাদের প্রশংসা করে বা এটিকে 'শুরা'র সাথে এক করে সে অবশ্যই একজন কাফের-অবিশ্বাসী, না হয় মূর্খ এবং নির্বোধ। বর্তমানে এখানেই ঘটেছে দুইটি বিপরীত জিনিসের সংমিশ্রণ। শয়তানের অনুসারীরা যে কাফেরদের মতবাদে মোহগ্রস্থ হয়ে পড়েছে এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু অবাক হয়ে যাই তাদের কথা শুনলে যারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবী করে আবার মানুষকে গণতন্ত্রের প্রতি উৎসাহ দেয় এবং একে বৈধতার রং দিতে চায়।

পূর্বে যখন মানুষ সমাজতন্ত্রের প্রতি মোহগ্রস্থ হয়ে পড়েছিল, তখন কিছু লোক ইসলামি সমাজতন্ত্রের কথা বলা শুরু করেছিল এবং তারও পূর্বে ছিল জাতীয়তাবাদ, আরব জাতীয়তাবাদ এর কথা। আজকাল তাদের অনেকেই গর্ববোধ করছে এবং মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েছে এই সংবিধানের প্রতি... তারা লজ্জাও বোধ করে না ইসলামিক ফুকাহাদের বাদ দিয়ে এই সংবিধানের দাসদের *ফুকাহা* নাম দিতে এবং তাদেরকে এই নামে ডাকতে। তারা একই অভিব্যক্তিগুলো ব্যবহার করে যেরূপ ইসলামিক আইনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় যেমন আইনদাতা, বৈধ, অবৈধ, অনুমোদন যোগ্য, নিষিদ্ধ, এবং তারপরও তারা ভাবে তারা সকলেই সঠিক পথে আছে, তারাই হেদায়েত প্রাপ্ত। কোন শক্তি, কোন ক্ষমতা নেই শুধু মাত্র আল্লাহ্‌র ছাড়া। এটি জ্ঞানী ও বিবেকবানদের হারানো ছাড়া কিছুই নয় এবং সঠিক ও যোগ্য লোকদের বাদ দিয়ে অযোগ্য লোকদেরকে কঠিন কাজের দায়িত্ব অর্পন করা। তারা সমস্ত কিছু অযোগ্য, কুচক্রের অধিকারী লোকদের কাছে দিয়ে দিয়েছে। কি করুনাই করা হয়েছে বিজ্ঞজন ও জ্ঞানীদের প্রতি, দ্বীন এবং এর প্রকৃত আহ্বানকারীদের প্রতি। আমি আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বলছি, এটা খুবই আজব ব্যাপার যে, অনেক মানুষই নিজেকে মুসলিম দাবী করে কিন্তু তারা *'লা ইলাহা ইলালাহ'*-এর অর্থ জানে না। তারা জানে না এর শর্তগুলো কী, এর দাবীগুলো কী। তাদের অনেকই সব সময় এর (আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই) বিরোধিতা করে এবং বর্তমানের শির্কী মতবাদে জড়িয়ে পড়েছে। তারা নিজেদেরকে মুওয়াহীদ এবং এর দিকে মানুষকে আহ্বানকারী বলে দাবী করে।

তাদের অবশ্যই এই কালেমার অর্থ ও এর প্রকৃত দাবী সম্পর্কে জানতে আলেমদের কাছে যেতে হবে, কারণ আল্লাহ্ বনী আদমকে প্রথম যে হুকুমটি দিয়েছেন তা হলো এই কালেমা সম্পর্কে জানা। এই কালেমার শর্তগুলো কী কী এবং কী কী এর সাথে সাংঘর্ষিক তা অজু বা সালাত ভঙ্গের কারণ জানার পূর্বে জানতে হবে কারণ কোন অজু বা

কোন সালাতই কবুল হবে না যদি কারও মধ্যে তাওহীদের বিপরীত কিছু থাকে। যদি তারা উদ্ধত হয় ও সত্য গ্রহণ না করে, তাহলে তারা ক্ষতি গ্রস্থদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে।

ইসলামী আইনবীদ এবং আলেম আহমেদ শাকির (রহ.)-এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দিয়ে আমি শেষ করবো, যিনি ঐ সব কাফেরদের কথার উত্তর দিয়েছেন যারা আল্লাহ্‌র বাণীর বিকৃতি ঘটায় এবং "যাহাদের বিষয়গুলো পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে স্থিরকৃত হয়" এই আয়াতের অপব্যবহারকরে তাঁর নামে মিথ্যার উদ্ভাবন করে গণতন্ত্রকে সাহায্য করে এবং যারা কাফেরদের দ্বীন বাস্তবায়নে সদা তৎপর।

"এবং তারা সকল বিষয়ে পরামর্শ করে" এবং "যাহারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে" এই আয়াতগুলোর ব্যাখ্যায় আহমেদ শাকির উমদাদ-আত-তাফসীর-গ্রন্থে বলেছেন ঃ বর্তমান সময়ে যারা এই দ্বীনকে নিয়ে উপহাস করে- তারা এই আয়াতগুলোর রূপক অর্থে ব্যাখ্যা দেয় ইউরোপীয় সাংবিধানিক পদ্ধতিকে; তারা তাদের মতের বৈধতা প্রমানের জন্য 'গণতান্ত্রিক পদ্ধতি' নাম দিয়ে মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করছে।" এই সব উপহাসকারীরা এই আয়াতগুলিকে আদর্শবাণী বা তাদের শ্লোগান হিসেবে ব্যবহার করছে এবং এভাবে মুসলিম জাতিকে, মানুষকে এবং যারা ইসলামের দিকে ফিরে আসছেন তাদের প্রত্যেককে প্রতারিত করছে। তারা একটি সঠিক বাক্য ব্যবহার করছে কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য খারাপ। তারা বলে ইসলাম পরামর্শের দিকে ডাকে এবং এই ধরনের আরো অনেক কথা।

সত্যিই! ইসলাম পরামর্শের দিকে ডাকে কিন্তু ইসলাম কোন ধরনের পরামর্শের দিকে ডাকে? আল্লাহ্ বলেছেন ঃ "এবং সকল বিষয়ে পরামর্শ কর। এবং যখন তোমরা কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাও, তখন আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর।"। এই আয়াতের অর্থ খুবই পরিষ্কার এবং সুনিশ্চিত। এই আয়াতের কোন ব্যাখ্যা অথবা রূপক ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। এটা রাসূল (সা.)-এর উপর আল্লাহ্‌র একটি হুকুম ছিল এবং তারপর খলিফাদের উপর। অর্থাৎ সাহাবাদের যারা ছিলেন জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান মতামত ব্যক্ত করতেন সেসব বিষয়ের উপর যেসবের ব্যাপারে মতামত বা যুক্তি দেয়া যায়। তারপর তিনি সিদ্ধান্ত নিতেন যেটা তিনি সবচেয়ে সঠিক, সবচেয়ে ভাল, সবচেয়ে উপকারী মনে করতেন কোন বিষয়ের সমাধান করার জন্যে এবং তা কোন দল ইচ্ছা বা মতামতের উপর নির্ভর করত না অথবা কোন সংখ্যা বা সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরু ইত্যাদি সংখ্যানীতির উপর নির্ভর করতো না। যখন তিনি কোন সমস্যার সমাধান করতেন তখন তিনি আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করতেন এবং যা যা করণীয় তা করতেন।

এজন্যে কোন দলিল বা প্রমাণের প্রয়োজন নেই যে, ঐসব মানুষেরা যাদেরকে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) পরামর্শ করার জন্যে হুকুম দিয়েছিলেন তারা ছিলেন আদর্শ খলিফা তার মৃত্যুর পরে, ছিল সবচেয়ে ন্যায়নিষ্ঠ এবং যারা আল্লাহ্‌র বিধান প্রয়োগ করেছিলেন, সালাত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং যাকাত আদায় করেছিলেন। তারা ছিলেন আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধরত মুজাহিদ যাদের সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেছেন ঃ

لِيلني منكم أولو الأحلام والنهى

"আমার পরে তোমাদের মধ্য হতে ভদ্র ও বুদ্ধিমান লোকেরা আসবে।"

তারা নাস্তিক ছিল না, অথবা তারা আল্লাহ্‌র দ্বীন ও হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করেননি। তারা সেই সব অসৎ লোকদের মত ছিলেন না যারা এখনকার সময়ে সমস্ত খারাপ কাজে লিপ্ত । তারা এরূপ ছিলা যে ক্ষমতা দাবী করতেন না অথবা এমন কোন আইন তৈরী করতেন না যা আল্লাহ্‌র আইনের বিরোধী এবং আল্লাহ্‌র আইনকে ধ্বংস করে দেয়। এই সব কাফেরদের স্থান হচ্ছে তলোয়ারের অথবা চাবুকের নিচে, পরামর্শ সভায় নয়। আরেকটি আয়াত আছে সূরা আস-শুরায় যার অর্থ পরিষ্কার ও সুনিশ্চিত ঃ "যারা তাদের প্রভুর হুকুমের আনুগত্য করে এবং তারা তাদের স্বর্গীয় দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করে, তাদের বিষয়গুলো তারা পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করে, তারা ব্যয় করে যা আমি তাদের দিয়েছি।"

চতুর্থ অযৌক্তিক অজুহাত ঃ

রাসূল (সা.) আল-ফুজুল সংগঠনে যোগ দিয়ে ছিলেন।

কিছু বোকা লোক নবুয়্যতের পূর্বে রাসূল (সা.)-এর আল-ফুজুল সংগঠনে যোগ দেয়াকে তাদের শির্কী শাসন ব্যবস্থার সংসদে যোগ দেয়াকে বৈধ করার জন্যে ব্যবহার করতে চায়। এই ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য নিচে দেয়া হলো এবং আমরা আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করছিঃ

যে ব্যক্তি এই প্রতারণামূলক অজুহাত ব্যবহার করতে চায়, হয় তারা বুঝে না আল-ফুজুল সংগঠনটি আসলে কি ছিল এবং সে এমন বিষয়ে কথা বলছে যে বিষয়ে তার জ্ঞান নেই অথবা সে মূল ব্যাপারটা জানে এবং সে সত্যের সঙ্গে মিথ্যার, আলোর সঙ্গে অন্ধকারের এবং শিরক এর সঙ্গে ইসলামের সংমিশ্রণ করতে চাচ্ছে।

ইবনে ইসহাক, ইবনে কাসির, এবং আল-কুরতুবি (রহ.) উল্লেখ করেছেন-আল-ফুজুল সংগঠনটি তখনই গঠন করা হয়েছিল যখন কুরাইশের কিছু গোত্র আব্দুলাহ্ বিন জাদান-এর সম্মানার্থে তার বাড়িতে একত্রিত হয়েছিলেন। তারা সকলে এতে একমত হয়েছিলেন যে যখনই মক্কায় তারা কোন নির্যাতিত লোক দেখবে, তারা তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সাহায্য করবে যতক্ষণ পর্যন্ত অত্যাচারী অত্যাচার বন্ধ না করে। কুরাইশরা তখন এই সংগঠনটির নাম দিল 'আল-ফুজুল' সংগঠন যার অর্থ 'নৈতিক উৎকর্ষতার' একটি সংঘ।

ইবনে কাসির (রহ.) আরও বলেছেন ঃ "আল-ফুজুল সংগঠনটি ছিল আরবদের জানা সবচেয়ে পবিত্র এবং সবচেয়ে সম্মানজনক সংগঠন। প্রথম যে ব্যক্তি এই ব্যাপারে কথা বলেছিলেন এবং এর দিকে আহ্বান করেছিলেন তিনি হলেন আল-যুবাইর বিন আব্দাল-মুত্তালিব। এই সংগঠনটি সংগঠিত হয়ে ছিল যুবাইদ গোত্রের এক লোকের কারণে। সে কিছু ব্যবসায়িক পণ্য নিয়ে মক্কায় এসেছিল। আল-আস ইবনে ওয়ায়িল তাকে আক্রমন করে তার পণ্য সামগ্রী ছিনিয়ে নেয়। তখন আল-যুবাইদী আল-আহ্লাফ গোত্রের কিছু লোককে সাহায্যের জন্যে আহ্বান করে কিন্তু তারা আল-আস বিন ওয়ায়িল-এর বিপক্ষে তাকে সাহায্য করতে অস্বীকার করে এবং আল-যুবাইদীকে অপমান করে। আল-যুবাইদী তার ক্ষতিপূরণের জন্যে পরের দিন সূর্য উদয়ের সময় আবূ-কুবায়স পাহাড়ের কাছে গেলেন যখন কুরাইশরা কাবার প্রাঙ্গনে সভা করছিল। তিনি তাদেরকে সাহায্যের জন্যে আহ্বান করলেন এবং কিছু কবিতা আবৃত্তি করলেন। তখন আল-যুবাইর বিন আব্দাল-মুত্তালিব দাড়িয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ তার জন্যে কি কোন সমতা বিধানকারী নেই?

এর পরই হাশিম, যুহরাহ এবং তাইম ইবনে বিন মুর্রা আব্দুলাহ্ ইবনে জাদ'আনের বাড়িতে একত্রিত হলেন। আবদুলাহ ইবনে জাদ'আন তাদের জন্যে কিছু খাবার তৈরী করলেন। তারপর তারা নিষিদ্ধ মাসে যুলকা'দায় একত্রিত হয়ে আল্লাহ্র নামে শপথ করে এই মর্মে অঙ্গীকারবদ্ধ হন যে, তারা অত্যাচারিতের পক্ষে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করবেন যাতে করে জালিম মজলুমের পাওনা আদায় করতে বাধ্য হয়। যতদিন পর্যন্ত সমুদ্রে ঢেউ উত্থিত হবে, যতদিন পর্যন্ত হেরা ও ছাবীর পর্বতদ্বয় আপন স্থানে স্থির থাকবে, ততদিন পর্যন্ত তাদের এই অঙ্গীকার অব্যাহত থাকবে। আর জীবন যাত্রায় তারা একে অপরের সাহায্য করবে। তারপর তারা আস ইবনে ওয়ায়িল-এর নিকট গিয়ে তার থেকে যুবাইদীর পণ্য উদ্ধার করে তাকে ফেরত দেন। একটি গরীব পর্যায়ের হাদীসে কাসিম ইবনে ছাবিত উল্লেখ করেন, কাছ'আম গোত্রের এক ব্যক্তি হজ্জ কিংবা উমরাহ উপলক্ষে মক্কায় আগমন করে। তার একটি কন্যা তার সঙ্গে ছিল। মেয়েটি ছিল অত্যন্ত রূপসী এবং তার নাম ছিল আল-কাতুল। নাবীহ্ ইব্ন হাজ্জাজ মেয়েটিকে পিতার নিকট হতে অপহরণ করে নিয়ে লুকিয়ে রাখে। ফলে কাছ'আমী লোকটি তার মেয়েকে উদ্ধারের ফরিয়াদ জানায়। তাকে তখন বলা লো, তুমি "হিলফুল ফুজুল" সংগঠনের শরণাপন্ন হও। লোকটি কা'বার নিকটে দাঁড়িয়ে হাঁক দিল, হিলফুল ফুজুলের সদস্যগণ কোথায়? সঙ্গে সঙ্গে হিলফুল ফুজুল-এর কর্মীগণ কোষমুক্ত তরবারি হাতে ছুটে আসে এবং বলে, তোমার সাহায্যকারীরা হাজির; তোমার কি হয়েছে? লোকটি বলল, নাবীয়াহ আমার কন্যাকে ধর্ষন করেছে এবং তাকে জোর করে আটকে রেখেছে। অভিযোগ শুনে তারা লোকটিকে নিয়ে নাবীয়াহ-এর গৃহের দরজায় গিয়ে উপস্থিত হন। নাবীয়াহ বেরিয়ে আসলে তারা বলেন, "মেয়েটিকে নিয়ে আয়। তুই তো জানিস আমরা কারা, কি কাজের শপথ নিয়েছি আমরা!" নাবীয়াহ বলল, "ঠিক আছে, তাই করছি, তবে আমাকে একটি মাত্র রাতের জন্য মেয়েটিকে রাখতে দাও!" তারা উত্তরে বলেছিল- "না কক্ষণো না, একটি উটের দুগ্ধ দোহন করার সময়ের জন্য নয়।" তারপর সেই

মুহূর্তেই নাবীয়াহ মেয়েটিকে ফিরিয়ে দিয়েছিল।"

আল-যুবাইর আল-ফুজুল সম্পর্কে নিম্নের কবিতা লিখেছিলেন ঃ

আল-ফুজুল অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং সংগঠিত

থাকতে দেয়া হবে না কোন অত্যাচারীকে মক্কায়

তারা অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং ঐক্যবদ্ধ এ ব্যাপারে

সুতরাং প্রতিবেশী এবং দুর্বলরা ছিল নিরাপদ তাদের দ্বারা।

এই সংগঠনটি এবং তাদের উদ্দেশ্যকে আজকের মানুষ প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করছে। আল-বায়হাকী এবং আল-হামিদী বর্ণনা করেন যে রাসূল (সা.) বলেছেন ঃ *"আমি আব্দুলাহ ইবনে জাদ'আনের ঘরে আল-ফুজুল এর অঙ্গীকার সভায় উপস্থিত ছিলাম। সেই অঙ্গীকার ভঙ্গকরার বিনিময়ে যদি আমাকে লাল উটও দেয়া হয় তবু আমি তাতে সম্মত হব না। আর ইসলামের আমলেও যদি তার প্রতি আহ্বান করা হতো আমি তাতে সাড়া দিতাম।"* এবং আল-হামিদী আরও যুক্ত করেন, তারা সংগঠিত হয়ে ছিল মানুষকে তার ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দিতে এবং অত্যাচারীর দ্বারা কেউ যেন অত্যাচারিত না হয়- এই মহৎ উদ্দেশ্যে।

এখন আমরা এই সব মানুষদের জিজ্ঞাসা করছি বলুন ঃ "কি মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে আপনাদের এই সংঘে যার জন্য আপনারা যোগদান করেছেন তাদের সাথে যারা আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার স্থাপন করে শয়তানের সংবিধান অনুসারে দেশ শাসন করছে?" এবং আমরা জানি যে এই পরিষদের কার্যক্রম শুরু হয় কুফরী সংবিধানকে, এর আইনকে, এর দাস এবং ত্বাগুতের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে অথচ তারা আল্লাহ্‌র দ্বীন এবং তার অনুসারীদেরকে আক্রমন ও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, এবং তারা আল্লাহ্‌র শত্রুদের, তাদের দ্বীনের সাহায্য ও তাদের দ্বীন অনুসরণ করে যাচ্ছে।

আল-ফুজুল সংগঠনটি কি আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী বা শির্‌ক করেছিল, আল্লাহ্‌র পাশাপাশি অন্য কোন আইন দিয়েছিল এবং আল্লাহ্‌র দ্বীনকে বাদ দিয়ে কি অন্য কোন দ্বীনকে সম্মান দেখিয়েছিল? যদি আপনি হ্যাঁ বলেন তাহলে আপনি দাবী করছেন যে, রাসূল (সা.) কুফরীতে অংশ নিয়েছিলেন, আল্লাহ্‌র বিধানের পাশাপাশি বিধান দিয়েছিলেন, তিনি এমন দ্বীনের অনুসরণ করেছিলেন যা আল্লাহ্‌র দ্বীন নয় এবং যদি ইসলাম আসার পরও তাকে তাতে যোগ দেয়ার জন্যে ডাকা হত তাহলে তিনি যোগ দিতেন! (নাউযুবিলাহ!) যে কেউ যদি এমন দাবী করেন, তাহলে তিনি তার নিজের কুফরী, পথভ্রষ্টতা, নাস্তিকতাকে মানুষ ও জ্বীনদের কাছে প্রকাশ করে দিবেন।

যদি আপনি বলেন ঃ এতে কোন কুফরী ছিল না, না তারা আল্লাহ্‌র পাশাপাশি আইন দিয়ে ছিল অথবা এতে কোন খারাপ ছিল না। এটার কাজ ছিল শুধু মাত্র অত্যাচারিত ও বিপদ গ্রস্থদের সাহায্য করা। তাহলে কি ভাবে আপনি এর সাথে একটা কুফরী, পথভ্রষ্ট, আল্লাহ্‌কে অমান্যকারী পরিষদের তুলনা করেন?

এখন, আমরা আপনাদের একটি স্পষ্ট ও সাবলীল প্রশ্ন করছি এবং আমরা এর উত্তরের মাধ্যমে রাসূল (সা.)-এর সম্পর্কে আপনাদের একটি বিশুদ্ধ, সুস্পষ্ট সাক্ষ্য চাচ্ছি যা হবে লিখিত। প্রশ্নটি হলো ঃ যদি পরিস্থিতি এরূপ হয় যে অত্যাচারিত ও বিপদগ্রস্থ লোকদের সাহায্য করার জন্যে আল-ফুজুল সদস্যদেরকে প্রথমে কুরয়াইশদের দেবতা লাত, উজ্জা ও মানাত-এর নামে এবং কুরাইশের কাফেরদের দ্বীনের, এর মূর্তি, ছবির প্রতি আনুগত্যের শপথ করতে হতো, তাহলে কি রাসূল (সা.) এতে অংশ গ্রহণ করতেন অথবা তিনি কি এর সাথে এক মত হতেন যদি ইসলাম আসার পর তাকে এ ধরনের কাজে ডাকা হত?

যদি তারা বলে ঃ "হ্যাঁ, তিনি রাজি হতেন এবং এতে অংশ নিতেন ... এবং তাই হয়ে ছিল", তাহলে মুসলিম জাতি তার থেকে মুক্ত এবং তিনি তাদের থেকে মুক্ত এবং তিনি তার কুফরকে আল্লাহ্‌র সমস্ত সৃষ্টির সামনে প্রকাশ করে দিলেন। কিন্তু যদি তারা বলে ঃ "না তিনি তা করতেন না", তাহলে আমরা বলি ঃ "এই সব ভ্রান্ত অজুহাত,

অযৌক্তিক চিন্তা ভাবনা এবং মূর্খতাকে ত্যাগ করুন এবং শিক্ষা গ্রহণ করুন যুক্তি কি রূপ হওয়া উচিত।"

পঞ্চম অযৌক্তিক অজুহাত ঃ

তাদের এই যোগদানের পেছনে রয়েছে মহৎ উদ্দেশ্য

তারা বলে এই পরিষদে যোগ দেয়ার পিছনে অনেকগুলো ভালো উদ্দেশ্য আছে। এবং তাদের অনেকেই এমনও দাবী করেন যে পরিষদ ভাল উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, তারা বলে ঃ "এটা হচ্ছে আল্লাহ্‌র দিকে ডাকা, সঠিক কথা বলা।" এবং তারা আরও বলে ঃ "এর মাধ্যমে কিছু খারাপ দূর হয়, আল্লাহ্‌র দিকে ডাকার উপর এবং যারা ডাকছে তাদের উপর চাপ কিছুটা লাঘব হয়।" তারা বলে ঃ "আমরা এই স্থান ও পরিষদ খ্রিষ্টান, কমিউনিষ্ট এবং অন্যদের জন্যে ছেড়ে দিতে পারি না।" এবং কেউ কেউ আরও বাড়িয়ে বলে ঃ "আমরা এ কাজ করছি আলাপ আলোচনা বা পরামর্শের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র বিধান প্রয়োগ করার জন্যে।" এবং তাদের আরো অনেক স্বপ্ন ও ইচ্ছা এই উদ্দেশ্যকে ঘিরে আছে। এর উত্তরে আমাদের বক্তব্য নিম্নে দেয়া হলো এবং আমরা আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করছি।

আমরা প্রথমে জিজ্ঞাসা করতে চাই ঃ "কে তার দাসদের উদ্দেশ্যকে নির্দিষ্ট করে দেন এবং কে তা সম্পূর্ণ রূপে জানেন? আল্লাহ্‌! যিনি সব কিছু জানেন, তিঁনি না আপনি ? যদি আপনারা বলেন ঃ "আমরা জানি ..."। আমরা বলি ঃ "তোমরা তোমাদের দ্বীনে, এবং আমরা আমাদের দ্বীনে, তোমরা যাদের ইবাদত কর আমরা তাদের ইবাদত করি না এবং আমরা যাঁর ইবাদত করি তোমরা তাঁর ইবাদত কর না" কারণ আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন ঃ "এমন কিছু নেই যা আমি লিখে রাখিনি।" এবং এই সব গণতন্ত্র পন্থীদের প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ্‌ বলছেন ঃ

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً

"তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি ..." [সূরা মু'মিনূন ২৩ ঃ ১১৫] তিনি আরও বলেছেন ঃ "তোমরা কি মনে কর যে আমি কোন কারণ ছাড়াই তোমাদের সৃষ্টি করেছে ?"

এটাই আমাদের দ্বীন কিন্তু গণতন্ত্র নামক দ্বীনে, এই শক্তিশালী সুস্পষ্ট আয়াতগুলোকে বিবেচনা করা হয় না কারণ তাদের মতে মানুষ নিজেই নিজের বিধান দাতা। গনতন্ত্র মতবাদে বিশ্বাসীরা বলে ঃ "হ্যাঁ, মানুষকে কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই সৃষ্টি করা হয়েছে। সে যা ইচ্ছা তাই পছন্দ করতে পারে এবং যে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং সে যে কোন বিধান ও দ্বীন ইচ্ছা হলে গ্রহণ করতে পারে বা বর্জন করতে পারে। এটা এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না যে নব উদ্ভাবিত বিধান আল্লাহ্‌র বিধানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তা সংবিধান ও তাদের আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা এবং তার সাথে সাংঘর্ষিক নয়। তোমাদের উপর ও আল্লাহ্‌র পাশাপাশি তোমরা যাদের ইবাদত কর তাদের উপর অভিশাপ।"

যদি তারা বলে ঃ "আল্লাহ্‌ই সীমা রেখা নির্দিষ্ট করে দেন এবং তিনি সব কিছু বিবেচনা করে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেন কারণ তিনি সব কিছুর সৃষ্টি কর্তা এবং তিনি জানেন তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে।"

أفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون

"এবং তিনি জানেন সমস্ত কিছুর রহস্য, তিনি সব কিছু জানেন।" [সূরা আম্বিয়া ২১ ঃ ৬৭]

আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করছি ঃ "আল্লাহ্‌ কিতাবে সবচেয়ে বড় কোন উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন এবং তাঁর রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন ইসলামের দিকে ডাকার জন্যে এবং কোন উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌ কিতাব নাযিল করেছেন এবং হুকুম করেছেন জিহাদের এবং শহীদ হওয়ার জন্যে ? ইসলামিক রাষ্ট্র যে উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে কি ? ওহে, খিলাফার প্রচারকরা ?

যদি তারা গৌন উদ্দেশ্যগুলোর কথা বলে এবং দ্বীনের মূল ভিত্তিকে পরিবর্তন করে ফেলে, আমরা বলি ঃ এই সব পাগলামী, মোহ ছাড়েন এবং দ্বীনের প্রকৃত উৎস সম্পর্কে জানেন। 'লা ইলাহা'র অর্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন

করুন কারণ এই জ্ঞান অর্জন ও এর উপর আমল করা ছাড়া কোন ইবাদত, কোন জিহাদ, কোন শাহাদাতই গ্রহণ যোগ্য হবে না। যদি তারা বলে ঃ "সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য হলো তাওহীদের উপর থাকা এবং ঐসব কিছু থেকে দূরে থাকা যা এর বিপরীত যেমন শির্‌ক।" আমরা বলি ঃ "এটা কি তাহলে যুক্তি সংঙ্গত যে, সবচেয়ে বড় এই উদ্দেশ্যকে ধ্বংস করা এবং ত্বাগুতের দ্বীন গণতন্ত্রকে গ্রহণ করার জন্যে রাজী হওয়া এবং এমন বিধানকে সম্মান করা যা আল্লাহ্‌র বিধান নয় এবং ঐসব বিধান দাতাকে অনুসরণ করা যারা আল্লাহ্‌র পাশাপাশি বিধান দেয়? সুতরাং যদি তা করেন তাহলে আপনি সৃষ্টির সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য হলো তাওহীদ (ত্বাগুতকে অস্বীকার করা এবং আল্লাহ্‌র একাত্ববাদে বিশ্বাস করা), সেই তাওহীদকে ধ্বংস করে দিবেন, কিছু গৌন উদ্দেশ্যের জন্যে।"

কোন্ নীতি, কোন্ বিধান, কোন্ দ্বীন আপনাদের এই পন্থার সাথে একমত হতে পারে, শুধু কাফেরদের দ্বীন-গণতন্ত্র ছাড়া? মুশরিকদের পরিষদে আপনারা কোন দ্বীনের দিকে ডাকছেন, কোন অধিকারের কথা বলছেন যখন আপনারা ইসলামের মূলনীতি এবং এর দিকে আহবানের মূল উৎসকে মাটির নিচে কবর দিয়েছেন ? ইসলামের গৌন ও ক্ষুদ্র বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনার জন্যে এর উৎস এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যকে কি কবর দেয়া উচিৎ? আপনারা ইসলামের ছোট ও গৌন উদ্দেশ্য যেমন ঃ 'মদ নিষিদ্ধ করা, কাদিয়ানীদের কাফের ঘোষণা দেয়ার জন্যে ত্বাগুতের কাছে যাচ্ছেন, যদিও তাদেরকে কাফের হিসেবে ঘোষণা না দিলেও তারা কাফের। ইসলামের মূল উদ্দেশ্য বিসর্জন দিয়ে আপনারা তাদের সাথে কী আলোচনা করছেন? আপনাদের এই বিষয়ে কোন দলিল আছে কি?

যদি আপনি বলেন ঃ "আল্লাহ্ বলেছেন ... , আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) বলেছেন ...", আপনি মিথ্যা বলছেন কারণ গণতন্ত্র নামক দ্বীনে তাঁদের কোন গুরুত্ব নেই, তাদের হুকুমকে তারা মানে না। তাদের নিজেদের সংবিধান অনুসারে যা বলা বা অনুমোদন করা হয়েছে, তারা তারই অনুসরণ করে। যদি বলেন সংবিধানের দ্বিতীয় ধারা অনুসারে ... এবং ধারা (২৪) ..., ধারা (২৫) অনুসারে এবং অন্যান্য কুফরী আইন অনুসারে ... ," তাহলে এর চেয়ে অধিক কুফরী, শির্‌ক ও নাস্তিকতা আর কারও মধ্যে আছে কি? যারা গণতন্ত্রের পথ অবলম্বন করছে এরপরও কি তাদের কোন ভিত্তি বা তাওহীদ আছে?

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً

"তুমি কি তাদেরকে দেখ নাই যারা দাবি করে যে, তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তারা বিশ্বাস করে, অথচ তারা ত্বাগুতের কাছে বিচার ফয়সালার জন্যে যেতে চায়, যদিও তা প্রত্যাখ্যান করার জন্যে তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কিন্তু শয়তান চায় তাদেরকে সঠিক পথ থেকে বহু দূরে নিয়ে যেতে?" [সূরা নিসা ৪ ঃ ৬০]

উত্তর দিন, হে সংশোধনের পথ অবলম্বনকারীগণ, যারা এই শিক্ষা দিচ্ছেন কুফরীর কেন্দ্রস্থলগুলোতে শিরক ও কুফর অবলম্বন না করে কি কোন আইনের বাস্তবায়ন সম্ভব? যেই আল্লাহ্ শরীআতের বাস্তবায়নের জন্য আপনারা যে এত উদ্বিগ্ন, সেই শরীআকে কি আপনারা এই পথে প্রয়োগ করবেন? আপনারা কি জানেন না এটি একটি রুদ্ধ কাফিরদের পথ? শুধু যুক্তির কারণেই যদি ধরে নেই আপনাদের এই কর্মপন্থা সফল হবে, তবুও এটি আল্লাহ্‌র বিধান হবে না; তা হবে মানুষের তৈরী সংবিধানের আইন। তা হবে অধিকাংশ লোকের আইন। তা কখনও আল্লাহ্‌র বিধান হবে না যতক্ষণ না আপনারা আল্লাহ্‌র হুকুম ও বিধানের কাছে আত্ম সমর্পন করবেন এবং যতক্ষণ না আপনারা বিনয়ের সাথে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করবেন। কিন্তু এই আত্ম সমর্পন যখন গণতন্ত্র এবং মানুষের তৈরী সংবিধানের বিধান ও হুকুমের কাছে হবে, তা হবে ত্বাগুতের বিধানের কাছে আত্ম সমর্পন যদিও তা অনেক ব্যাপারে আল্লাহ্‌র হুকুমের সাথে একমত হয়। আল্লাহ্ বলছেন ঃ إن الحكمُ إلا لله "কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌র"। তিনি বলেননি ঃ "বিধান দেয়ার ক্ষমতা মানুষের"। তিনি বলেছেন ঃ وأن احكم بينهم بما أنز ل الله "সুতরাং তাদের মাঝে ফয়সালা কর আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তার দ্বারা"। তিনি বলেননি ঃ "সুতরাং তাদের মাঝে ফয়সালা কর আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তার মধ্যে থেকে যা তোমাদের পছন্দ হয়" অথবা "তাদের মাঝে ফয়সালা কর সংবিধান ও এর আইন দ্বারা"। এটা বলে গণতন্ত্র ও মানুষের তৈরী সংবিধানের গোলামেরা। তুমি কোন পক্ষে ? তুমি কি এখনও তোমার ভ্রান্ত এবং পুরানো

মতবাদের পক্ষে ? তুমি কি তোমার বিবেক খুইয়েছ? তুমি কি দেখ না তোমার আশে পাশে কি ঘটেছে যারা গণতন্ত্রের পথ ধরে ছিল ? আমাদের জন্যে উদাহরণ হয়ে আছে আলজেরিয়া, কুয়েত, মিশর এবং আরও অনেকে। তুমি কি এখনও নিশ্চিত নও যে গণতন্ত্র কাফেরদের খেলা ? গণতন্ত্র কাফেরদের নিখুঁত ভাবে তৈরী একটি হাস্য নাট্য? তুমি কি এখনও নিশ্চিত নও যে, এই পরামর্শ পরিষদ ত্বাগুতের একটি খেলা ? সে যখন চায় তখন তা শুরু করে আবার যখন চায় তা বন্ধ করে দেয়? ত্বাগুতের অনুমতি ছাড়া কোন আইনই বাস্তবায়ন করা যায় না। তবে কেন এই সুনিশ্চিত কুফরের ব্যাপারে এত যুক্তি-অজুহাত? এটা পরিষ্কার হীনমন্যতা। এত কিছুর পরও তাদের বলতে শোনা যায় ঃ "কিভাবে আমরা এই সংসদ কমিউনিষ্ট, খ্রিষ্টান এবং অন্য সব নাস্তিকদের কাছে ছেড়ে দিব ?"। তাহলে যাও তাদের সাথে জাহান্নামে যাও!

আল্লাহ্ বলছেন ঃ

ولا يحزنكَ الذين يُسارعون في الكفر إنَّهم لن يضروا الله شيئاً يُريد الله ألا يجعل لهم حظاً في الآخرة ولهم عذابٌ عظيمٌ

"এবং তাদের দিকে ঝুঁকে যেও না যারা কুফরীর দিকে দৌড়ে যায়। তারা আল্লাহ্র কোন ক্ষতি করতে পারে না এবং আল্লাহ্ পরকালে তাদের কিছুই দেবেন না, এবং তাদের শাস্তি হবে অত্যন্ত কঠোর।" [সূরা আলি 'ইমরান ৩ ঃ ১৭৬]

যদি আপনি এই সব নাস্তিকদের সাথে যোগদেন তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি আপনি তাদের সাথে শিরক-এ অংশ গ্রহণ করাকে উপভোগ করছেন। যদি আপনি চান তাহলে তাদের কুফরী ও শিরক-এ আপনি অংশ নিতে পারেন; তবে জেনে রাখুন, তাদের সাথে এই অংশ গ্রহণ এই পৃথিবীতে শেষ হয়ে যাবে না। এটা আখিরাতেও অটুট থাকবে, যে রূপ আল্লাহ্ সূরা নিসায় বলেছেন। তিনি প্রথমে সর্তক করেছেন এই সব পরিষদে যোগ দেয়ার ব্যাপারে এবং মানুষকে এই সব পরামর্শ পরিষদ এড়িয়ে চলতে আদেশ করেছেন এবং তাদের সাথে বসতে নিষেধ করেছেন। যদি কেউ বসে, সে তাদেরই একজন বলে বিবেচিত হবে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

"কিতাবে তোমাদের প্রতি তিনি তো অবতীর্ণ করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে, আল্লাহ্র আয়াত প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে এবং তাকে বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন যে পর্যন্ত তারা অন্য প্রসংগে লিপ্ত না হবে তোমরা তাদের সাথে বসিও না, অন্যথায় তোমরাও তাদের মত হবে। মুনাফিক এবং কাফির সকলকেই আল্লাহ্ তো জাহান্নামে একত্র করবেন।" [সূরা নিসা ৪ ঃ ১৪০]

- বাংলাদেশের সংবিধানের ধারা ৭-এর ২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ঃ "জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্য হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।"

- তৃতীয় তফসিল-শপথ ও ঘোষণা অনুচ্ছেদের ২(ক)এ বলা হয়েছে "আমি .... সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ করিতেছি যে, আমি আইন অনুযায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী (বা মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী) পদের কর্তব্য বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব;

-আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব;

-আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান করিব;

-এবং আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন অনুযায়ী যথাবিহীত আচরণ করিব।"

● তৃতীয় তফসিল- শপথ ও ঘোষণা অনুচ্ছেদের ৫-এ বলা হয়েছে, "আমি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইয়া সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ করিতেছি যে, আমি যে কর্তব্যভার গ্রহণ করিতে যাইতেছি, তাহা আইন-অনুযায়ী ও বিশ্বস্তার সহিত পালন করিব;

-আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব;

-আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান করিব;

এবং সংসদ সদস্যরূপে আমার কর্তব্য পালনকে ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হইতে দিব না।"

এখানে শুধু আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলের (সা.) সুন্নাহ্‌কে প্রত্যাখ্যান করা হয়নি বরং সংসদ সদস্যরা আল্লাহ্‌র ও রাসূল (সা.)-এর প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্যের পরিবর্তে এই সংবিধানের রক্ষা, সমর্থন এবং একে টিকিয়ে রাখতে শপথ করছেন।

এরপরও কি আপনি নিশ্চিত নন যে, এটা শিরক, এটা পরিষ্কার কুফর? আপনি কি জানেন না এটি আল্লাহ্‌র দ্বীন নয় এবং এটি একত্ববাদের দ্বীন নয় ? তাহলে কেন আপনি তা গ্রহণ করছেন? এটা তাদের জন্যে ছেড়ে দিন, এটাকে পরিত্যাগ করুন এবং একে এড়িয়ে চলুন। এটা যাদের দ্বীন তাদের কাছে ছেড়ে দিন এবং ইব্রাহীম (আ.)-এর দ্বীনের অনুসরণ করুন। ইউসুফ (আ.) তার দুর্বলতার সময়ে, জেলে থাকার সময়ে যে রূপ বলেছেন, আপনিও সে রূপ বলুন ঃ

"যে সম্প্রদায় আল্লাহতে ও আখিরাতে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের মতবাদ বর্জন করছি। আমি আমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, ইসহাক এবং ইয়াকুবের মতবাদের অনুসরণ করি। আল্লাহ্‌র সহিত কোন বস্তুকে শরীক করা আমাদের কাজ নয়। ইহা আমাদের ও সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।" [সূরা ইউসুফ ১২ ঃ ৩৭-৩৮]

হে মানুষেরা! ত্বাগুতকে এবং তার পরামর্শসভাকে বর্জন করুন, তাদেরকে ত্যাগ করুন এবং তাদেরকে অস্বীকার করুন যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের দ্বীনকে (মানুষের তৈরী যে কোন ধরনের জীবন ব্যবস্থা) ছেড়ে ইসলামকে গ্রহণ না করে। এটাই হচ্ছে সুস্পষ্ট পথ, স্বচ্ছ আলোর মত কিন্তু অধিকাংশ লোকই জানে না।

"আল্লাহ্‌র ইবাদত করবার ও ত্বাগুতকে বর্জন করবার নির্দেশ দিবার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। অতঃপর তাদের কতককে আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং কতকের উপর পথভ্রান্তি সাব্যস্ত হয়েছিল" [সূরা নাহল ১৬ ঃ ৩৬]।

আল্লাহ্ আরও বলেন ঃ "হে কারা সঙ্গীরা ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয় না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্ ? তাঁকে ছেড়ে তোমরা কেবল কতগুলো নামের ইবাদত করছো, যেই নাম তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রেখেছো, এইগুলোর কোন প্রমাণ আল্লাহ্ পাঠান নাই। বিধান দেবার অধিকার কেবল আল্লাহ্‌রই। তিনি আদেশ দিয়েছেন অন্য কারও ইবাদত না করতে, কেবল তাঁর ব্যতীত, এটাই সরল দ্বীন কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহা আবগত নয়"। [সূরা ইউসুফ ঃ ৩৯-৪০]

তাদেরকে এড়িয়ে চলুন, তাদেরকে ত্যাগ করুন, তাদের লোকদেরকে এবং তাদের শির্কী মতবাদ ত্যাগ করুন খুব বেশী দেরী হয়ে যাওয়ার পূর্বে অর্থাৎ মহান বিচার দিবস আসার পূর্বেই। আপনার ইচ্ছা, সাধনা, পরিতাপ সেই দিন কোন কাজেই আসবে না। আল্লাহ্ বলছেন ঃ "আর যারা অনুসরণ করেছিল তারা বলবে, 'হায় ! যদি একবার আমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটত তবে আমরাও তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম যেমন তারা আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করল।' এইভাবে আল্লাহ্ তাদের কার্যাবলীকে পরিতাপরূপে তাদেরকে দেখাবেন আর তারা কখনও অগ্নি হতে বের হতে পারবে না"। [সূরা বাকারা ২ ঃ ১৬৭]

এখনই তাদের পরিহার করুন এবং তাদেরকে বলুন ঃ "তোমরা ইব্রাহীম (আ.) দ্বীনের ও নবীদের পথের অনুসরণ কর",

যে রূপ আমরা বলছি ঃ

ওহে, মানুষের তৈরী আইনের দাসেরা ...এবং সংবিধানের দাসেরা ...

ওহে, গণতন্ত্র নামক দ্বীনের সেবকেরা ...

ওহে, আইনদাতারা ...

আমরা তোমাদের এবং তোমাদের দ্বীনকে বর্জন করছি ...

আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করছি

এবং আরও অস্বীকার করছি তোমাদের শির্কী সংবিধানকে

এবং তোমাদের মুশরিকদের পরামর্শসভাকে

এবং তোমাদের সাথে আমাদের শত্রুতা ও ঘৃণা শুরু হলো

চিরদিনের জন্যে যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহ্‌তে ঈমান আন।

সংসদীয় বিষয় ঃ বিবেচনা করুন, চিন্তা করুন ওহে জ্ঞানবান সমঝদার মানুষেরা

“আমি ভাবতে পারতাম না যে আল্লাহ্ তাঁর কিতাব ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর মাধ্যমে যেই শরীয়াহ দিয়েছেন, তার জন্য তাঁর বান্দাদের অনুমোদন প্রয়োজন। কোন প্রকৃত মু'মিন মনে করে না যে, আল্লাহ্ যে বিধান নাযিল করেছেন তাঁর কিতাব ও রাসূল (সা.)-এর মাধ্যমে, তা মানার ক্ষেত্রে তাঁর বান্দার অনুমোদনের প্রয়োজন আছে। কারণ আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِينًا

“আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ বা মু'মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে” [সূরা আহযাব ৩৩ ঃ ৩৬]

فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

“কিন্তু না, তোমার রবের শপথ! তারা মু'মিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার ভার তোমাদের উপর অর্পণ না করে; অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্ত ঃ করণে তা মেনে নেয়।” [সূরা নিসা ৪ ঃ ৬৫]

এবং তিনি আরও বলেছেন ঃ

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ

“তারা কি জানে না যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে তার জন্যে তো আছে জাহান্নামের অগ্নি, যেখানে সে স্থায়ী হবে ? উহাই চরম লাঞ্ছনা।” [সূরা তওবা ৯ ঃ ৬৩]

কিন্তু দেখা যাচ্ছে আল্লাহ্‌র বিধান তার পূর্ণ পবিত্রতা নিয়ে আল-কুর'আনে আজও বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র কতিপয় বান্দারা সংসদের মাধ্যমে একে আইন হিসেবে পাশ করতে চাইছে! আল্লাহ্‌র বান্দার সিদ্ধান্ত যদি আল্লাহ্‌র দেয়া বিধান থেকে ভিন্ন হয়, তাঁর বান্দার সিদ্ধান্তই আইন হয়ে যাবে এবং তা আইন সভা বা সংসদের মাধ্যমে পাশ হয়ে সরকারের কার্যনির্বাহী পরিষদ দ্বারা তা বাস্তবায়িত হবে যদিও তা কুর'আন-সুন্নাহ্‌র বিরোধী। এর প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহ্ মদ নিষিদ্ধ করেছেন কিন্তু সংসদ তা বৈধ করেছে, আল্লাহ্ তাঁর দেয়া সীমানা রক্ষা করতে বলেছেন কিন্তু সংসদ তা ভঙ্গ করেছে। মূল কথা হচ্ছে, সংসদের সিদ্ধান্তই আইন হয়ে যাবে যদিও তা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক।”

أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ

“এখন তো তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক সুস্পষ্ট দলীল, হিদায়াত ও রহমত এসেছে। অতঃপর যে কেউ আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করবে এবং তা হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে? যারা আমার নিদর্শনসমূহ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় সত্যবিমুখতার জন্যে আমি তাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিব।” [সূরা আন'আম ৬ ঃ ১৫৭]

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

"কারও নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মু'মিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে যেদিকে সে ফিরে যায় সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দিব এবং জাহান্নামে তাহাকে দগ্ধ করব, আর উহা কত মন্দ আবাস।" [সূরা নিসা ৪ ঃ ১১৫]

'Bmjvgx MYZ´' - mskq wbimb

mPxcæ

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেনঃ **êhviv g¥bv¥hvM mnKv¥i K_v (fvj Dc¥`k mgn: jv Bjvnv Bj¦vj¦vn- Avj¦vn eÀZxZ ¤Kvb Bjvn bvB, Bmjv¥gi GKZev`, BZÀw`) ć¥b Ges Dnvi g¥aÀ hvnv Dãg (Avj¦vni GKK Bev`Z Kiv, Zvi wbKU ZIev Kiv Ges ZvÐ¥Zi mv¥_ Kdix Kiv, BZÀw`) Zv MnY K¥i, ZvivB nj Avj¦vni cÎ n¥Z ¤n`vqvZ cv÷ Ges gvb¥li g¥aÀ ZvivB nj ¤evakwË m¼Ëb|ë** (সূরা যুমার ৩৯:১৮)

fwgKvt

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। অতঃপর শান্তি বর্ষিত হোক নবী (সাঃ), তাঁর পরিবার বর্গের ও তাঁর সাহাবীদের (রাঃ) এর উপর শেষ দিন পর্যন্ত।

সাম্প্রতিক ইন্টারনেটে পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণের অনুমোদন যোগ্যতা সংক্রান্ত ব্যাপারে বিতর্ক দেখা গেছে আমাদের দ্বীনি ভাইদের মধ্যে।

GQvovI, Avgv¥`i ¤`¥k RvgvZ Bmjvgx ¤_¥K ći- K¥i Pi¥gvbvB, ¤LjvdZ gRwjk, Bmjvgx HKÀ¥RvU, RwgqZmn wewfb 'Bmjwg' msMVb MbZ¥´i gZ wbKċ Kd¥ii w`¥K eēw`b ¤_¥KB wewfb 'Bmjwg' bwZgvjvi AwZiwÜZ eÀvLÀvi gvaÀ¥g Avn·vb K¥i Avm¥Q|

উত্থাপিত বিষয়গুলোর সমাধানের মানসে আমরা সংক্ষিপ্তাকারে কিছু ভুল দাবীর শুদ্ধতা আশা করছি। এছাড়াও উল্লেখিত প্রবন্ধে MYZ´x Bmjvgc´x¥`i কিছু ভুলের এবং এই বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত কিছু সাধারণ বিষয়ের পরিশুদ্ধতার চেষ্টা করব। মুসলিমদের গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিষয়টি তুলে ধরতে কিছু ভূমিকা সম্বলিত পয়েন্ট অবশ্যই তৈরী করা দরকার। প্রবন্ধের ধারাবাহিকতায় আমরা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণের অনুমোদনের বিরুদ্ধে কিছু দলিল ভিত্তিক বির্তকের অবতারণা করব।

MYZ¥´i gvaÀ¥g cv÷ Kdi Ges mÇĒċ wki¥Ki GKwU msw Î÷ chv¥jvPbv

গণতন্ত্রের ইংরেজী শব্দ হল Democracy। Democracy শব্দটি দুটি গ্রীক শব্দ Demos ও Cratus থেকে উদ্ভুত। Demos শব্দের অর্থ হল 'মানুষ/জনগণ' এবং Cratus অর্থ 'পরিচালনা'। Democracy এমন একটা পদ্ধতি যেখানে জনগণ তাদের নিজেদের জন্য আইন তৈরী করে তাদের নিয়োগকৃত স্থানীয় প্রতিনিধিদের দ্বারা। এই কাজটি হয় কোন সভা অথবা সংসদে। এবং এই পদ্ধতি স্থাপন করা হয়েছে ঐ সকল আইন ও নীতিমালা সমূহ বাস্তবায়ন করার জন্য যেখানে সংখ্যা গরিষ্ঠের ইচ্ছার পূর্ণ প্রতিফল ঘটে।

আব্দুল ওয়াহ্হাব আল-কিলালি বলেছেনঃ "সকল প্রকার গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মূলে রয়েছে একটি কাল্পনিক মতবাদ যার কর্তৃত্ব জনগণের উপর আরোপ করে এবং এই কর্তৃত্ব থাকে জনগণের উপরে তার নেতৃত্বে। সংক্ষেপে জনগণের দ্বারা গঠিত সর্বোচ্চ নেতৃত্বের মাধ্যমে তৈরী সমষ্টিই হল গণতন্ত্র"। (*মাওসু'আত আস্-সিয়াসাহঃ* ২য় খন্ড,পৃ:২৫৬)

AZGe MYZ´ Ggb GKUv cïwZ hvi ðviv AvBb cYq¥bi ¤Î¥æ Avjvni msiwÎZ AwÇZ¥K AÇxKvi Kiv nq Ges hv Avjvni H AwaKv¥ii wec¥Î AvPiY Ki¥Z ¤kLvq| Ges GUv gvbI¥K Avjvni cwićï GKwU Bev`Z n¥Z wdwi¥q wki¥Ki iv¥RÀ Abc¥ek Kivq| A¥bK ¤Î¥æ GwU gvbI¥K AvBb cYqbKvixi Ç¥i ¤c¨¥Q ¤`q| A_P GKgvæ AvBb cYqbKvix n¥jb Avjvn ZvÍAvjv|

আল্লাহ্ তা’আলা বলেনঃ **êGes Avjকvn ēKg ¤`b, Zvi ēKg¥K cĈv¥Zwb¥Î cKvix ¤KD ¤bB Ges wZwb `-Z wnmve MnY K¥ib|ë** (সূরা রা‘দ ১৩:৪১)

তিনি আরও বলেনঃ **êI¥`i wK Ggb KZMwj ¤`eZv Av¥Q hvi I¥`i RbÀ weavb w`¥q¥Q Ggb ðx¥bi, hvi AbgwZ Avjকvn ¤`b wb?ë** (সূরা শূরা ৪২:২১)

এই সকল আইন প্রণয়নকারী জনপ্রতিনিধিরা যখন জনগণের জন্য আইন নির্ধারণ করে তা দ্বিধাযুক্ত অবস্থায় অথবা নির্দ্বিধায়ে তারা সেটা মানতে বাধ্য থাকে। এভাবেই সংখ্যা গরিষ্ঠের ইচ্ছাসমূহ প্রতিনিধিত্ব পায় আল্লাহ্ প্রদত্ত আদেশগুলোর উপর।

আল্লাহ্ তা’আলা বলেনঃ **êZwg wK ¤`L bv Zv¥K ¤h Zvi Kvgbv-evmbv¥K Bjvn i¦¥c MnY K¥i? ZeI wK Zwg Zvi Kgweavqk n¥e? Zwg wK g¥b Ki ¤h Iiv AwaKvsk ¤kv¥b I ¤ev¥S? Zviv ¤Zv cćiB gZ; eis Zviv AwaK c_ýċ|ë** (সূরা ফুরকান ২৫:৪৩-৪৪)

অতএব মানবাধিকারের নামে বিভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করে এবং বিচারের ভার সে মিথ্যা উপাস্যের কাছে অর্পন করে, আর তারাই হল ‘*তাওয়াগীত*’ এই অন্যায় অধিকার বাস্তবায়নের অপর নামই হল আল্লাহ্র বিরূদ্ধে বিদ্রোহ করা। যে সব মানুষ অথবা পদ্ধতিগুলো আল্লাহ্র নাযিলকৃত আইনের বিরুদ্ধে শাসন করে আল্লাহ্ তা’আলা তাদেরকেই ‘*তাগুত*’ বলে সাব্যস্ত করেছেন।

আল্লাহ্ তা’আলা বলেনঃ **êAvcwb wK Zv¥`i¥K ¤`¥L¥Qb hviv `vex K¥i ¥h Zviv wekvm K¥i Avcbvi Dci Ges Avcbvi ceeZx¥`i Dci hv bwhj Kiv n¥q¥Q| AZtci Zviv ZvÐ¥Zi Kv¥Q Zv¥`i weev`cY welqÐ¥jv wb¥q ¤h¥Z Pvq, hw`I Zv¥`i¥K Gi(ZvÐ¥Zi mv¥_) Kdix Kivi Av¥`k ¤`qv n¥qwQj…|ë** (সূরা নিসা ৪:৬০)

kvBLj Bmjvg Be¥b ZvBwgqÀvn (int) e¥jbt “আল্লাহ্র ইবাদত বাদ দিয়ে অথবা সত্য পথনির্দেশনা বাদ দিয়ে যে ব্যক্তির উপাসনা বা ইবাদত করা হয়; অথবা ঐ ব্যক্তি যদি আল্লাহ্র বিরুদ্ধে কোন আদেশ দেয় তাহলে সেই হল ‘*তাগুত*’। এই কারণে যারা আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত শাসন করে তারাই হল ‘*তাগুত*’।” (*আল-ফাতওয়া*, খন্ড-২৮, পৃ:২০০)

Bebj KvBwqÀg (int) e¥jbt “<u>আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (সাঃ) শাসন পদ্ধতি ব্যতীত যারা অন্য কোন পদ্ধতিতে শাসন করে তারাই তাগুত। মানুষ আল্লাহ্র পাশাপাশি যাদের ইবাদত করে অথবা মানুষ যে ব্যক্তির ইবাদত করে আল্লাহ্র ইবাদতের মাধ্যম মনে করে এদেরকেও তাগুত বলে বিবেচনা করা যায়।</u>

যদিও এক্ষেত্রে তারা নিশ্চিত নয় যে তারা আল্লাহ্র একক ইবাদত করছে না দ্বৈত ইবাদত করছে। সুতরাং এরাই হল *তাওয়াগীত* (তাগুতের বহু বচন) এবং যদি আপনি এই সকল তাগুতের প্রতি এবং এদের সাথে জনগণের শর্তাবলীর দিকে লক্ষ্য করেন তাহলে এটা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, জনগণ আল্লাহ্র ইবাদত হতে তাগুতের ইবাদতের দিকে, আল্লাহ্র শাসন হতে তাগুতের শাসনের দিকে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য হতে তাগুতের আনুগত্যের দিকে ধাবিত হচ্ছে”। (*’ইলাম আল-মুওয়াক্কি‘ঈন*, খন্ড ২৮, পৃ:৫০)

gnv¼¿` Avj-Awgb Avk-kvbwKwZ (int) e¥jbt ‘এবং কুরআনের এই আয়াতগুলো যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তা দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা’আলা প্রণীত এবং রাসূল (সাঃ) এর মুখ নিঃসৃত আইনের পরিবর্তে শয়তান ও তার সাহায্যকারীদের মুখ নিঃসৃত স্বরচিত আইনের আনুগত্য স্পষ্ট কুফর এবং শির্‌ক। এতে কোন সন্দেহ নেই’। (*আদ্‌ওয়া আল-বাইয়ান*, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ৮২-৮৫)

এখন সত্যিকার অর্থে মুসলমানরা জেনে গেছে গণতন্ত্রের মূল লক্ষ্য কি? এর মূল লক্ষ্য হল অধিকাংশের ইচ্ছার ভিত্তিতে জনসাধারণকে শাসন করা যা আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশের বৈপরিত্যে ঘোষণা করে। এই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যে লুক্কায়িত শির্‌কের ব্যাখ্যা দানের প্রয়োজন অনুভব এই মুহূর্তে আমরা করছি না।[1]

যদি পাঠকগণ শুরু হতে এ পর্যন্ত যে আলোচনা হয়েছে তা নিয়ে পরিতৃপ্ত না হন তাহলে আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করছি গণতন্ত্রের ব্যাপারে ইসলামের রায় সংক্রান্ত মৌলিক বিষয়াদি সমৃদ্ধ কোন প্রবন্ধ অথবা বই পড়ুন। কেননা এই প্রবন্ধে আমাদের লক্ষ্য শুধু মাত্র গণতান্ত্রিক নির্বাচনে যোগদান সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা। আমরা এই প্রবন্ধটিকে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির ব্যাখ্যার সাথে সংমিশ্রন করে জটিলতর করতে চাচ্ছি না।

wbevPb cïwZ Ges ¤fvUvi¥`i Dci Gi c¥qvM

নিশ্চয়ই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি জনগণের নির্বাচনের সাথে সম্পৃক্ততার উপর নির্ভরশীল যার ফলে এটা পরিষ্কার করা যায় কারা কাউন্সিলে অথবা সংসদে এই জনগণের প্রতিনিধিত্ব দান করে। এই নির্বাচন পদ্ধতি আরও প্রয়োজনীয় ক্ষমতাশীল দল, প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী কে হবে তা নির্ধারণ করার জন্য। এই নির্বাচন পদ্ধতিটি জনগণের নেতা পছন্দের উপর গঠিত যারা তাদের পক্ষে আইন প্রণয়ন এবং এর প্রয়োগ করবে।
সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির কোন অস্তিত্বই থাকবে না নির্বাচন ব্যতীত। জনগণ যদি নির্বাচন পদ্ধতিতে অংশ গ্রহণ না করে তাহলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। যেহেতু কেউ কোন প্রার্থীর পক্ষে ভোট দিবে না তাই নির্বাচিত কোন সাংসদ পাওয়া যাবে না যারা জনগণের পক্ষে আইন প্রণয়ন করবে অথবা সরকারের নীতিমালার বাস্তবায়ন করবে।

---

[১] এমনকি “ভোটের পক্ষে ও বিপক্ষে” শীর্ষক বইয়ের লেখক নূন্যতম এই সত্য স্বীকার করেছেন যে, একটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যোগদান করা অবশ্যই অননুমোদনযোগ্য। তার বইয়ের প্রথম ধাপে তিনি বলেছেন যে, “বর্তমান আধুনিক সময়ের অবস্থা ইসলাম থেকে অনেক দূরে। প্রকৃত পক্ষে আইন প্রণয়নের অধিকার কেবলমাত্র আল্লাহ্ রব্বুল ’আলামীনের নিকট যিনি পবিত্র, মহান এবং সর্বোচ্চ। তাই কেউ যদি এমন কোন শাসন ব্যবস্থার মধ্যে প্রবেশ করতে চায় প্রকৃত পক্ষে যার ভিত্তি মানব রচিত অথবা আল্লাহ্ তা’আলা প্রণীত শরীয়াহ্‌র সাথে সাংঘর্ষিক অথবা যা ইসলামিক শরীয়াহ্‌কে বাতিল বলে ঘোষণা করে, তাহলে এ ব্যাপারে অধিকাংশ মুসলিম আলেমরা একমত যে সেই শাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অননুমোদন যোগ্য।

Avûj Iqvnnve Avj-wKjvjx e¥jbt “তাই বুঝা যাচ্ছে যে, জনগণ যাদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে তারা তাদের জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রাখে। বরং তারা এমন সব সাংসদের হাতে কর্তৃত্ব দান করে যাদেরকে তারা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাদের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করে। (*মাওসুআত আস-সিয়াসাহ*, ২য় খন্ড, পৃ:৭৫৭)

kvqL Ave ewmi gÇdv nwjgvn e¥jbt ‘প্রথমতঃ যে নীতির উপর গণতন্ত্র স্থাপিত তা হল জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। এই ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা, সাধারণ জনগণের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন, যে প্রতিনিধিরা আইন তৈরী ও প্রণয়নের কাজ করবে।

অন্য কথায় গণতন্ত্রে যে আইন প্রণয়নকারী এবং যার আনুগত্য করা হয় আসলে সে আল্লাহ্ নয় বরং একজন সাধারণ মানুষ। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, আইন প্রণয়ন ও বৈধ-অবৈধ নির্ধারনের ক্ষেত্রে যার ইবাদত অথবা আনুগত্য করা হয় সেও একজন জনগণ, একজন মানুষ, একজন সৃষ্টি, সে মহান আল ল্লাহ্ নয়। এটাই হল কুফর, শির্ক এবং পথভ্রষ্টতার মূল অস্তিত্ব এবং দ্বীনের মৌলিক বিষয় সমূহ ও তাওহীদের সাথে সাংঘর্ষিক।

এভাবেই দুর্বল এবং অজ্ঞ লোকেরা শাসন-কর্তৃত্ব ও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র একক ইলাহিয়্যাতে (একনিষ্ঠ ইবাদতে) শরীক করে।’ (*হুকুম আল ইসলাম ফী আদ্-দিমুক্রাতিয়্যাহ আত-তা’দ্দুদিয়্যাহ আল-হিযবিয়্যাহ*, পৃ:২৮)

সুতরাং সত্য হল এটাই যে, সকল সংসদ সদস্য যারা সবাই অধিকাংশ জনগণের ইচ্ছায় নির্বাচিত এবং যারা আইন প্রণয়নের জায়গায় বসে আছে তারা তাদের এই আল্লাহদ্রোহী কাজগুলো তখনি করতে পারে যখন জনগণ তাদেরকে ঐ অবস্থানে বসতে সাহায্য করে। এখন যদি আমরা বলি যে, আল্লাহ্র পাশাপাশি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ঐ সাংসদরা কুফর এবং শির্ক করছে তাহলে যারা তাদেরকে এই কাজের জন্য নির্বাচিত করছে তাদেরকে আমরা কি বলব? এমনকি তারা এটাও জানছে যে, এই প্রার্থীরাই মানব রচিত আইনের পুনর্গঠন করবে তাদের নির্বাচনের মাধ্যমে।

kvBL Avûj Kvw`i Be¥b Avûj AvwRR e¥jbt ‘তাদের নিজেদের জন্য জনসাধারণের মধ্যে যারা ভোট দেয় তাদেরকে (সাংসদ), তারা অনুসরণ করছে কেননা ভোটাররা বস্তুতঃ তাদের পক্ষে শির্কের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করছে। কারণ এই প্রতিনিধিরাই আল্লাহ্র পাশাপাশি আইন-প্রণয়নের কাজ হাত দেয় এবং এভাবেই ভোটাররা সংসদ সদস্যদেরকে শির্কের বাস্তবায়নের অধিকার দেয় এবং তাদেরকে আল্লাহ্র পাশাপাশি আইন প্রণয়নকারী প্রভু হিসাবে গ্রহণ করে। আল্লাহ্ তা’আলা বলেনঃ

êwdwikZvMY¥K I bexMY¥K ie wnmv¥e MnY Ki¥Z ¤m ¤Zvgv¥`i wb¥`k w`¥Z cv¥i bv| ¤Zvgv¥`i gmwjg nIqvi ci wK ¤m ¤Zvgv¥`i¥K Kdixi wb¥`k w`¥e?ë (সূরা আলি ‘ইমরান ৩:৮০)

এই আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, যদি কেউ ফিরিশতা ও নবীগণকে ‘রব’ হিসেবে গ্রহণ করে তবে সে কাফির। তাহলে যারা সংসদ সদস্যদেরকে ‘রব’ হিসাবে গ্রহণ করেছে তাদের অবস্থা কি? এই ভাবে আল্লাহ্ তা’আলা আরও বলেনঃ

êZwg ej, ¤n wKZvexMY G¥mv ¤m K_vq hv Avgv¥`i I ¤Zvgv¥`i g¥aÀ GKB, ¤hb Avgiv Avjøvn eÀZxZ AbÀ Kvi I Bev`Z bv Kwi, ¤Kvb wKQ¥KB Zvi kixK bv Kwi, Ges Avgv¥`i ¥KD KvD¥K I Avjøvn eÀZxZ ìieí wnmv¥e MnY bv Kwi|ë (সূরা আলি 'ইমরান ৩:৬৪)

অতএব, মানুষকে আল্লাহ্‌র পাশাপাশি রব সরূপে গ্রহণ করা হল কুফরী এবং বেঈমানী এবং এই কুফরীই হল সংসদ সদস্যদেরকে ভোট দেওয়ার মাধ্যমে জনগণ এই কুফরী ও শির্‌কে লিপ্ত হচ্ছে। (*আল-জামি ফী তালাব আল-ইলম আশ-শারীফ*, ১/১৫১-১৫২)

আবার কেউ যদি নিজে সরাসরি কুফরীর সাথে জড়িত না থাকে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কুফরীর পক্ষপাতিত্ব করে তাহলে নিম্মোক্ত নীতিমালার মধ্যে পরিগণিত হবে যে, 'কুফরীর সমর্থন দেওয়াও কুফরী'। কেননা যে ব্যক্তি জেনে শুনে মানুষকে কুফর অথবা শির্‌ক করতে সাহায্য অথবা সক্ষম করে ঐ একই রায় তার ক্ষেত্রেও যে রায় প্রযোজ্য ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে যে নিজে শির্‌ক অথবা কুফর করলো। রায়টা আসলে আমার নিজের নয় আমরা যদি নিচের আয়াতটি দেখি তাহলে পরিষ্কার হবে যে আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং এই রায় দিয়েছেন।

êwKZv¥e ¤Zvgv¥`i cwZ wZwb ¤Zv AeZxb K¥i¥Qb ¤h, hLb ¤Zvgiv ćb¥e, Avjøvni AvqvZ cZÀvLÀvZ n¥®Q Ges G¥K we`-c Kiv n¥®Q, ZLb ¤h ch´ Zviv AbÀ cms¥Õ wj÷ bv nq ¤Zvgiv Zv¥`i mv¥_ em¥e bv, AbÀ_vq ¤Zvgiv I Zv¥`i gZ n¥q hv¥e| gbwdK I Kwdi mKj¥KB Avjøvn Rvnvbv¥g GKwæZ Ki¥eb|ë (সূরা নিসা ৪:১৪০)

এবং **Avk-kvIKvbx (int) e¥jb,** 'তাঁর ভাষ্য- নিশ্চয়ই এক্ষেত্রে **ìAvcwb Zv¥`i gZB n¥ebí** - অন্য কথায়- আপনি যদি কাজটি করেন অথবা প্রতিরোধ না করেন তাহলে কুফরীর ক্ষেত্রে আপনি তাদের সমপর্যায়ের।' (*ফাত্‌হ আল-ক্বাদির*, ১ম খন্ড, পৃ:৫২৭)

kvqL mjvBgvb Be¥b Avûjvn Be¥b gnv¼` Be¥b Avûj Iqvnnve (int) e¥jbt "উক্ত আয়াতটির অর্থ একেবারে যেভাবে বলা হয়েছে ঠিক তাই। আয়াতটি দ্বারা বুঝানো হচ্ছে যে, যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র আয়াতগুলো শুনে বিশ্বাস না করে অথবা আয়াতগুলো নিয়ে মজা করে/ ঠাট্টা বিদ্রুপ করে এবং কেউ যদি জোর-জবরদস্তি ছাড়াই এ সকল লোকদের সাথে বসে যারা আল্লাহ্‌র আয়াতকে অস্বীকার করেছে অথবা তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করছে এবং তাদেরকে প্রতিরোধ না করে অথবা তাদেরকে ত্যাগ না করে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তাদের আলোচ্য বিষয় পরিবর্তন করছে তাহলে সেও তাদের মত একজন কাফির। এমন কি সে যদি তাদের কাজে অংশ গ্রহণ নাও করে কেননা তার নীরব সম্মতি প্রমাণ করে কুফরীর প্রতি তার সমর্থন। কুফরীর প্রতি মৌন সমর্থন থাকাও কুফরী।

এই আয়াত এবং এই ধরনের যে আয়াতগুলো আছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আলেমগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, কেউ যদি কোন পাপ কর্মে সন্তুষ্ট থাকে তাহলে যে পাপ কাজটি করেছে সে তার মতই বিবেচিত হবে যদিও একথা বলে যে সে মনে মনে পাপ কাজটিকে ঘৃণা করে। তবুও এটা

গ্রহণযোগ্য না। কেননা বিচার সাধারণত করা হয় বাহ্যিক প্রকাশ ভঙ্গির উপর ভিত্তি করে। কেননা অন্তরের আভ্যন্তরিণ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা কেবল মাত্র আল্লাহ্‌র কাজ। তাই বাহ্যত যার মধ্যে কুফরী প্রতীয়মান হবে সেই কাফির বলে বিবেচিত হবে।" (*মাজমুআ'ত আত-তাওহীদ*, পৃ:৪৮)

অতএব, যে সুস্পষ্টভাবে উপস্থিত থাকে কুফরী সংগঠিত হওয়ার স্থানে এবং ঐ স্থান ত্যাগ করে না অথবা ঐ স্থানে কোন প্রতিরোধের ব্যবস্থাও গ্রহণ করে না তার ক্ষেত্রে ঐ একই রায় যে রায় কুফরীকর্তার ক্ষেত্রে।

যারা শির্‌ক ও কুফরকে সাহায্য করে অর্থাৎ সক্রিয় থেকে কাউকে নির্বাচিত করে যাতে তারা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করতে পারে, তাদের ক্ষেত্রে কি বা বলা যায়। মনে রাখতে হবে যে, এই ভোট দান পদ্ধতি হচ্ছে প্রত্যেকটি সংসদ সদস্যকে শির্‌ক এবং কুফরী করতে দেয়ার একমাত্র উপায় কারণ ভোটার কর্তৃক নির্বাচনীয় সমর্থন ব্যতীত তারা ঐ বিশেষ স্থানে সমাসীন হতে পারে না।

আমরা যদি একবারের জন্যেও ভোটারদের কার্যকলাপ এবং যখন কোন সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয় তার কার্যকলাপকে একত্রিত করি তাহলে তাদের উভয়ের দ্বারা কৃত কুফর বা শির্‌কের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। যারা আল্লাহ্‌র পাশাপাশি অন্য কাউকে 'রব' বানায় বৈধ ও অবৈধ করার ব্যাপারে, বিধান দাতা হিসেবে এবং যারা সূর্য ও চন্দ্রকে আল্লাহ্‌র পাশাপাশি জীবনী শক্তি ও খাদ্য/ রিযিক দানকারী হিসেবে রব বানায় তাদের মধ্যে পার্থক্য কতটুকু? আল্লাহ্‌র কসম! তাদের উভয়ের ক্ষেত্রে একই রায় প্রযোজ্য।

MYZw´K wbevP¥bi c¥Î ¤hvM`vb ms Ív´ mskqÐ¥jvi eÀvcv¥i dqmvjvt

যারা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে যোগদান করাকে অনুমোদন দেয় সত্যিকার অর্থে তারা পথভ্রষ্টতার বিভিন্ন স্তরে রয়েছে। এদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে যে, অনিবার্যভাবে শাসন ব্যবস্থা হিসাবে গণতন্ত্র একমাত্র গ্রহণযোগ্য পথ তারা পথভ্রষ্টতার চরম পর্যায়ে রয়েছে। আর কতক রয়েছে যারা ভুল ধারণা ও সন্দেহ বশতঃ গণতান্ত্রিক নির্বাচনে যোগদানকে বৈধ মনে করে। দ্বিতীয় পর্যায়ের লোকদের উক্ত ভ্রান্ত ধারণাগুলো নিম্নে ধারাবাহিক ভাবে খন্ডন করা হলঃ

1/ wgk¥ii ZrKvjxb ivRmfvq GKRb g´x wn¥m¥e BDmd (Avt)-Gi ¤hvM`vb ms Ív´ ýv´ avi Yv

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ **êivRv ewjj BDmd¥K Avgvi Kv¥Q jBqv AvBm; Avwg Zvnv¥K Avgvi GKv´ mnPi wbhË Kwie| AZtci ivRv hLb Zvnvi mwnZ K_v ewjj, ZLb ivRv ewjj, AvR Zwg ¤Zv Avgv¥`i wbKU ghv`vkxj wekvm fvRb nB¥j| BDmd ewjj, ìAvgv¥K ¤`¥ki ab fvóv¥ii Dci KZZ c`vb Ki-b; Avwg ¤Zv Dãg I mweÙ iÎK|í GBfv¥e BDmd¥K Avwg ¤mB ¤`¥k cwZwČZ Kwijvg ¤h ¤mB ¤`¥k h_v B®Qv AeÇvb Kwi¥Z cwiZ| Avwg hvnv¥K B®Qv Zvnv i cwZ `qv Kwi| Avwg mrKg civqb¥`i cwZdj bċ Kwi bv|ë** (সূরা ইউসুফ ১২:৫৪-৫৬)

তাই যারা ইউসুফ (আঃ)-এর উদাহরণ দিতে গিয়ে এই আয়াতটি প্রদর্শন করে দলিল হিসাবে তারা বলতে চায় যেহেতু ইউসুফ (আঃ) একজন অমুসলিম রাজার রাজ্যে মন্ত্রী পরিষদে যোগ দিতে পারেন তাহলে কেন আমাদের পক্ষ হয়ে একজন প্রার্থী সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হবে-এটা গ্রহণযোগ্য হবে না?

যারা এই আয়াতগুলোকে তাদের পক্ষে দলিল হিসাবে ব্যবহার করে তারা হয়তো ভুলে গেছে কারাগারে ইউসুফ (আঃ) তাঁর দুই সাথীকে কি বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেনঃ

êweavb w`evi AwaKvi ¤Kejgvæ Avj¸vn ZvíAvjvi| wZwb Av¥`k w`¥q¥Qb- wZwb eÀZxZ AbÀ Kvil Bev`Z bv Kivi RbÀ| BnvB kvkZ ðxb wK´ AwaKvsk ¤jvK Bnv m¼Ë¥K AeMZ b¥n|ë (সূরা ইউসুফ ১২:৪০)

তাহলে আমরা কিভাবে বলব যে, ইউসুফ (আঃ) ঐ রকম একটা সরকার ব্যবস্থাকে সাহায্য করেছিলেন অথবা তাদের সাথে আপোষ করেছিলেন যারা মানব রচিত আইন প্রণয়ন করেছিল যখন তিনিই অন্যদেরকে এই বিধান/ আইন প্রণয়নের ব্যাপারে আল্লাহ্ সম্পর্কে সতর্ক করছিলেন এই বলে যেঃ **êweavb ¤`evi AwaKvi ¤Kejgvæ Avj¸vniB|ë**

c_gZt যারা এই (১২:৫৪-৫৬) আয়াতগুলোকে উদাহরণ স্বরূপ ব্যবহার করে, দলিলের অভাবে তাদের দাবীকে প্রমাণ করার জন্য যে, তৎকালীন সরকার ব্যবস্থায় প্রচলিত ইউসুফ (আঃ)-এর শরীআহ্ সম্মত নয় এবং এই উদাহরণের দ্বারা আর কিছুই নির্দেশ করার নেই। বরং এই আয়াতগুলো দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, তৎকালীন রাজা আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পনের দিকে পা বারিয়ে ছিলেন।

Be¥b Rvixi AvZ-Zvevix eYbv K¥ib ¤h, gRwn` (int) e¥jbt "ইউসুফ (আঃ)-এর সময় যেই রাজা ছিলেন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন"। (*জামি আল-বাইয়ান আত-তাওয়ীল আই আল-কুরআন*, ৯/২১৭)

Avj-evNvex e¥jbt "মুজাহিদ (রহঃ) ও অন্যান্যরা বলেছেনঃ ইউসুফ (আঃ) তাদেরকে অতিবিনয়ের সাথে ইসলামের দিকে ডাকা থেকে ক্ষান্ত হননি যতক্ষণ পর্যন্ত না রাজা এবং আরও অনেক লোক ইসলামে প্রবেশ করে।"

আরও বর্ণিত আছে যে, ইউসুফ (আঃ) নিজে একজন শাসকও ছিলেন বটে কেননা মন্ত্রী পরিষদের দায়িত্বের পাশাপাশি তাঁর উপর মিশরের শাসন ভারও ন্যস্ত হয়েছিল।

Be¥b Rvixi AvZ-Zvevix, Avm-mçx n¥Z eYbv K¥ibt রাজা, ইউসুফ (আঃ)-কে মিশরের উপর নিযুক্ত করেছিলেন, তিনি কর্তৃপক্ষেও একজন সদস্য ছিলেন এবং তিনি যে কোন কিছু ক্রয়ের ক্ষেত্রে দেখা শোনার দায়িত্ব পালন করতেন এবং ব্যবসা ও অন্যান্য যত বিষয় ছিল তা তদারকি করতেন।

এর প্রমাণ সূরা ইউসুফ, ৫৬ আয়াতের শেষ অংশে পাওয়া যায়ঃ **GB fv¥e Avwg BDmd (Avt)-¥K ¤mB ¤`¥k cwZwČZ Kijvg; ¤h ¤mB ¤`¥k ¥hLv¥b B®Qv AeÇvb Ki¥Z cviZ|**

ê... ¤mB ¤`¥k wZwb ¥hLv¥b B®Qv AeÇvb Ki¥Z cvi¥Zb...ë, এই আয়াতের ব্যাপারে ইবনে জারীর আত-তাবারী, ইবনে যায়েদ(রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, ìমিশরের সকল কর্তৃত্ব ইউসুফের (আঃ) কাছে হস্তান্তর করা হয়ে ছিল এবং যে কোন বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তই ছিল চুরান্ত ।

Avj-KiZex eYbv K¥ib ¤h, ইবনে আব্বাস (রাঃ) ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে বলেন যে, তিনি তাঁর বিছানার উপর বসলেন এবং রাজা তার পরিষদবর্গ এবং স্ত্রীগণসহ তাঁর সাথে পরিচয় পর্বের জন্য তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন এবং মিশরের সকল কর্তৃত্ব তাঁর (আঃ) কাছে হস্তান্তর করা হয় ।”

G m¼Ē¥K Avj-KiZex e¥jbt “যখন রাজা, ইউসুফ (আঃ)-এর উপর দায়িত্ব সমর্পন করলেন তখন তিনি (আঃ) সাধারণ জনগণের উপর উদার প্রকৃতির মনোভাব পোষণ করলেন এবং তাদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের দিকে ডেকেছিলেন যতক্ষন পর্যন্ত না তিনি তাদের মাঝে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন । তাই পুরুষ-মহিলা উভয়ই তাকে ভালোবাসতো ।

এই একই ধরনের কথা পাওয়া যায় আঃ ওয়াহ্হাব, আস-সুদ্দী এবং ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও অন্যান্যদের বর্ণনায় ইউসুফ (আঃ) এর প্রতি রাজার উক্তিতে-যখন রাজা, তার পরিপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তি দেখেছিলেন শাসন কর্তৃত্ব এবং ন্যায় বিচার প্রথা প্রচারের ক্ষেত্রে ।

রাজা বললেন, আমি তোমাকে ক্ষমতা দান করলাম, সুতরাং তোমার যা ইচ্ছা তা তুমি করতে পারো । এবং আমরা তোমার একনিষ্ঠ অনুসারী এবং আমি তোমার আনুগত্য করব এবং আমি তোমার কোন বিষয়ের সহযোগীর চেয়ে বেশী কিছু নই । (*আল-জামী’লি আহকাম আল-কুরআন*, খন্ড ৯/২১৫)

তাই এক্ষেত্রে যদি এইরকম কোন সম্ভাবনা থাকে যে, ঐ রাজা ইসলামে প্রবেশ করেছিল তাহলে উপরোক্ত আয়াতগুলোকে (১২:৫৪-৫৬) দলিল হিসাবে ব্যবহার করাটা প্রশ্নের সম্মুক্ষীণ হবে এবং ভুল হবে । কেননা ইসলামের একটা নীতি হল, ” যদি কোন সম্ভবনা/ সন্দেহ দেখা দেয় তাহলে তাকে দলিল হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না ।

আরও বলা যেতে পারে যে, অধিকাংশ উসুলের ক্ষেত্রে আমাদের পূর্বের শরীয়াহ আমাদের শরীআহ হিসেবে বিবেচিত যদি না তা আমাদের শরীয়াহর সাথে সাংঘর্ষিক হয় ।

তাই কেউ যদি কল্পনার বশীভূত হয়ে শুধুমাত্র তর্কের খাতিরে বলে যে, ইউসুফ (আঃ) তাঁর উপর প্রদত্ত শরীআহ মানেননি তাহলে তাকে বলতে হবে যে, ইউসুফ (আঃ) যদি এখন বেঁচে থাকতেন তাহলে তাকে মুহাম্মদ (সাঃ) এর শরীআহ মানতে হতো ।

2/ bxwZgvjv t `B cKv¥ii Lviv¥ci g¥aÀ A¥cÎvKZ Kg Lvi¥ci cÎ Aej¼b Kivi bxwZ

গণতান্ত্রিক নির্বাচনের সমর্থকরা ইসলামের এই নীতিকে দুইভাবে ব্যবহার করে থাকেঃ

ক) যে প্রার্থীর আদর্শ অপেক্ষাকৃত কম ইসলাম বিরোধী তাকে ভোট দেয়ার মানে হলো কম খারাপের পক্ষ নেয়া ।

খ) অন্য দিকে, কাউকে যদি ভোট না দেয়া হয় তাহলে বেশী খারাপ প্রার্থীটি নির্বাচিত হতে পারে এই আশংকায় কম খারাপকে ভোট দেয়া ।

আসলে ইসলামের বেশীরভাগ নীতি নিয়ে এভাবেই মানুষ মানুষকে বিভ্রান্ত করে। তারা সঠিক নীতিটি সুন্দরভাবে উল্লেখ করে কিন্তু এর প্রয়োগ করে ভুল অথবা এমন ক্ষেত্রে এটি প্রয়োগ করতে চায় যেখানে ঐ নীতি খাঁটে না ।

বিশেষ করে এই নীতিটির ক্ষেত্রে তাদের ভুল হলো, তারা এর প্রয়োগ বোঝেনি। শুধুমাত্র সেখানেই এটি প্রয়োগ করা যাবে যেখানে, দুটি পথের একটি গ্রহণ না করে উপায় নেই। কিন্তু যদি এগুলো থেকে বেঁচে থাকার উপায় থাকে অর্থাৎ দুটি পথের একটি গ্রহণ করতে যদি বাধ্য করা না হয়- তাহলে সেখানে এই নীতি প্রযোজ্য নয় ।

অর্থাৎ কাউকে যদি দুটি হারামের একটি গ্রহণে বাধ্য করা হয় তা হলে সে কম গুনাহের কাজটি করতে পারে। কিন্তু এমন ক্ষেত্রে নয়- যেখানে কেউ বাধ্য করছে না সেই ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়। ভোটের ক্ষেত্রে এই প্রয়োগকে এভাবে দেখা যায়ঃ কোন এক ব্যক্তি একজন মুসলিম ভাইকে মদ খাওয়ার দাওয়াত দিল। সেখানে একটি মদে থাকবে ৫০% এলকোহল এবং অন্য একটি মদে ২৫% এলকোহল। সুতরাং সে দাওয়াত গ্রহণ করে ২৫% এলকোহলের মদটি পান করল ।

<u>গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে আমাদের কেউ বাধ্য করছে না; তাই কম খারাপকে সমর্থনের নামে একটি শির্ক করা কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আমরা ভোট না দিলে যে ক্ষতি হবে তার তুলনায় এই শির্ক (আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে আইন তৈরীর অধিকার দেয়া) অনেক অনেক বেশী ক্ষতিকর। এটা হবে ২৫% এলকোহল বাদ দিয়ে ৫০% এলকোহল গ্রহণ করার মতো ।</u>

3/ bxwZgvjvt ÎwZ AeÙv K¥i mweav MnY Kiv

এই নীতি বা উসুলটিও পূর্বেও নীতির মতোই। এই নীতির দোহাই দিয়ে যারা গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে জায়েয করতে চায় তাদের ভাষ্য হলো, এমন একজন ইসলামপন্থী নেতাকে নির্বাচিত করলে, যার কর্মপন্থা মুসলিমদের জন্য অন্য নেতাদের থেকে তুলনামূলক কম ক্ষতিকর এবং একটি ইসলাম বিরোধী শক্তিকে পরাজিত করলে যতটা লাভ হবে তা এই হারামের ক্ষতির তুলনায় অনেক বেশী ।

প্রথমেই বলতে হয়, গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা হলো শির্ক। সুতরাং এর সুবিধা আলোচনা করে একে উৎসাহিত করা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ্‌র তাওহীদকে উপেক্ষা ও অমান্য করে তার কাছ থেকে সুবিধা আদায় করাকে কি করে সমর্থন করা যায় ।

kvqL Ave ewki gÇvdv nwjgvn, Aci GK Av¥j¥gi (Wt mvdvi Avj nvIqvjx iwPZ êAn open letter to George W Bush”) eB¥qi mgv¥jvPbv Ki¥Z wM¥q e¥j¥Qb
যেঃ উক্ত শেইখ (হাওয়ালী)

আমেরিকার মুসলিমদেরকে, বুশকে ভোট দেয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করতে চেয়েছেন। শেইখ হালিমাহ লিখেছেন, " আমার বক্তব্য হলোঃ এ শেখের কথাগুলো নানা কারণে বানোয়াট ও বর্জনীয়। তাদের ক্ষেত্রে আমেরিকার মুসলিমদের ভোট দানে উৎসাহিত করা সম্পূর্ণরূপে ভুল।

গণতন্ত্র- যা আমেরিকাতে পূর্ণরূপে বিদ্যমান, তাতে একমাত্র আক্বীদা ও শরীয়াতের বিভ্রান্তির দ্বারাই অংশগ্রহণ করা সম্ভব, এবং ফলাফল কখনোই প্রশংসা লাভ করতে পারে না ; আর এর থেকে যতই সুবিধা লাভ করা যাক না কেন- তা কখনোই অজুহাত হতে পারে না। আর এক্ষেত্রে এটা কিভাবে স স্তব হয় যেখানে এটি শরীয়াহ ও এর নীতির বিরুদ্ধে। আর এ ব্যাপারটি আমরা আমাদের বিভিন্ন প্রচেষ্টায় পরিষ্কার করার চেষ্টা করেছি। (ওয়াকাফাত মা আশ শাইল সাফার, পৃ:১৮)

আর যদি গণতান্ত্রিক নির্বাচনে সত্যিকার অর্থেই কোন সুবিধা থেকে থাকে তাহলে- তার পরেও এটি হালাল হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

êZviv AvcbvK g` I Rqv m¼ËK wR¥Ùm K¥i| Avcwb ejbt G `¥qi g¥aÀ i¥q¥Q gnvcvc, Z¥e gvb¥li RbÀ DcKvil Av¥Q, wK´ Gi cvc DcKv¥ii ¤P¥q A¥bK ¤ekx|ë (সূরা বাকারা ২:২১৯)

সেই সাথে আল্লাহ্ (সুবঃ) আরো বলেছেনঃ

ê¥n Cgvb`viMY! g`, Rqv, cwZgv Ges fvMÀ wbYvqK ki Gme ¤bvsiv Acweæ, kqZv¥bi KvR Qvov Avi wKQ bq| mZivs ¤Zvgiv Gme ¤_¥K ¤e¥P _vK hv¥Z ¤Zvgiv mdjKvg n¥Z cvi|ë (সূরা মা'য়িদা ৫:৯০)

Be¥b Kwmi (int) c_¥gvË Avqv¥Zi Zvdmx¥i e¥j¥Qb, "এসবের লাভগুলো সবই ইহলৌকিক। যেমন, এর ফলে শরীরের কিছু উপকার হয়, খাদ্য হযম হয়, মেধাশক্তি বৃদ্ধি পায়, একপ্রকারের আনন্দ লাভ হয়, ইত্যাদি। অনুরূপভাবে এর ব্যবসায়ে লাভের সম্ভাবনা আছে। একইভাবে জুয়া খেলাতেও বিজয়ের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এগুলোর উপকারের তুলনায় ক্ষতি বা অপকারই বেশী। কেননা, এর দ্বারা জ্ঞান লোপ পাওয়ার সাথে সাথে দ্বীনও ধ্বংস হয়ে থাকে।" আর একারণেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ **ê...wK´ Gi cvc DcKv¥ii ¤P¥q A¥bK ¤ekx|ë** (সূরা বাকারা ২:২১৯)

একইভাবে গণতান্ত্রিক নির্বাচনেরও কিছু সুবিধা বা লাভ থাকতে পারে, কিন্তু এতে অংশ নেয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে মানুষকে আইনদাতা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করায় নিজ দ্বীনের জন্য যেকোন লাভের চাইতে অনেক অনেক গুন বেশী ক্ষতিকর।

<u>আর একথা আমরা স্পষ্টভাবে বলতে পারি যে, মদ খাওয়া বা জুয়া খেলার চাইতে অনেক বেশী বড় গুনাহ হলো শিরক আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করা এবং এর পরিণতিও অনেক ভয়াবহ।</u>

4/ bxwZgvjv t Avgjmgn m¨evcix wbqÀ¨Zi Dci wbfikxj

“আমরা তো এটা মুসলিমদেরকে যুলুম নির্যাতন থেকে রক্ষা করার জন্য করছি; যাতে মুসলিমদের সুবিধা হয়”- এভাবেই অনেকে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশ নেয়ার পক্ষে অজুহাত দাঁড় করায়। তারা বলতে চান যেহেতু, একটি সৎ উদ্দেশ্যে, ভালো নিয়্যতে এ কাজটি করা হচ্ছে তাই এতে কোন সমস্যা নেই- এটি বরং প্রশংসনীয়।

আসলে এই মারাত্মক ভুলটি তারা শুধু এখানেই করছে তা নয়। এই হাদীসটির অপব্যবহার আরো অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে। এজন্য আমরা এব্যাপারে বিশদ আলোচনা তুলে ধরছি, ইন্‌শাআল্লাহ্।

প্রথম কথাটি হলো, উত্তম নিয়্যত থাকলেই গুনাহ উত্তম আমল বা সাওয়াবের কাজ হয়ে যায় না। **Ave nvwg` Avj MvÖvjx (int) e¨jbt** “গুনাহ, এগুলোর প্রকৃতি কখনো নিয়্যতের দ্বারা পরিবর্তন হয়ে যায় না। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর হাদীস (প্রত্যেক আমলই নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল) থেকে অজ্ঞ বা জাহিল লোকেরা এভাবেই সাধারণ অর্থে ভুল বুঝ নেয়, তারা মনে করে যে, নিয়্যতের দ্বারা একটি গুনাহ ইবাদতে পরিণত হয়। যেমন, কোন ব্যক্তি যদি অন্যের মনকে খুশী করার জন্য কারো গীবত করে, অথবা ঐ ব্যক্তি যে অন্যের টাকায় অভাবীদের আহার করায়, অথবা কেউ যদি হারামের পয়সায় স্কুল, মসজিদ বা সৈন্যদের ক্যাম্প তৈরী করে দেয় উত্তম নিয়্যতে, তখন তাদের গুনাহ ইবাদতে পরিণত হয়!

এসবই জাহেলীয়াত বা মূর্খতা, এই সীমালংঘনের ও অপরাধের উপর এর নিয়্যতের কোন প্রভাব নেই। বরং ভালো উদ্দেশ্য খারাপ কাজ করার এই নিয়্যত শরীয়তবিরোধী– যা আরেকটি অন্যায়। সুতরাং সে যদি সচেতন থাকে (ভুল পথের ব্যাপারে) তাহলে, যেন শরীয়াতের উপর অটল থাকে। কিন্তু সে যদি এ ব্যাপারে অজ্ঞ থাকে তাহলে তার উপর অজ্ঞতার গুনাহ বর্তাবে, কারণ জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ। তাছাড়া, শরীয়াত যেখানে ভালো কাজের (নিয়্যতের বিশুদ্ধতা) ব্যাপারেই এমন (সতর্ক), সেখানে খারাপ কাজ কিভাবে ভালোতে পরিণত হয়? এটাতো অসম্ভব। সত্যিকার অর্থে, যে জিনিসগুলো অন্তরে এমন ধারণার জন্ম দেয় তা হচ্ছে অন্তরের গোপন খেয়াল খুশী বা কামনা-বাসনা... ।”

এরপর তিনি আরো বলেছেনঃ “এর দ্বারা যা বোঝানো হচ্ছে তা হলো কেউ যদি অজ্ঞতাবশতঃ ভাল নিয়্যতে খারাপ কাজ করে তাহলে তার কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না, যদি না সে দ্বীনে নতুন হয় এবং ঐ ইলম অর্জনের সময় না পায়। আল্লাহ্ তা’আলা বলেনঃ **êAZGe ¤Zvgiv Ùvbx¨`i¨K wR¨Ùm Ki, hw` ¤Zvgiv bv Rvb|ë** (সূরা নাহ্ল ১৬:৪৩)

Bgvg MvÖvjx (int) Avil e¨j¨Qbt “সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এই বাণীঃ “*প্রত্যেক আমলই তার নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল*”– তিনটি জিনিসের (ইবাদত, গুনাহ ও মুবাহ) মধ্য শুধুমাত্র আনুগত্য ও মুবাহাত (অনুমতি প্রাপ্ত আমল)-এর মধ্যে সীমিত, গুনাহের জন্য নয়। এটা এই কারণে যে, আনুগত্য গুনাহ-তে পরিণত হয় (খারাপ) নিয়্যতের দ্বারা। বিপরীত দিকে, একটি খারাপ কাজকে কখনোই নিয়্যতের দ্বারা আনুগত্যে পরিণত করা যায় না। হ্যাঁ, নিয়্যতের একটি প্রভাব এ ক্ষেত্রে (গুনাহের ক্ষেত্রে) আছে; তা হলো খারাপ কাজের সাথে যদি (আরও) খারাপ নিয়্যত যুক্ত

করা হয় এবং এটা তার বোঝা বৃদ্ধি করে আর পরিণতি হয় চূড়ান্ত খারাপ– যা আমরা 'কিতাবুত তাওবা'-তে উল্লেখ করেছি।"(*ইলাহইয়া উলুমুদ্দীন*, ৪/৩৮৮-৩৯১)

kvqL আব্দুল কাদির বিন আব্দুল আজিজ, অপর kvqL আব্দুল আজিজ বিন বাজ এর ফাতওয়ার সমালোচনা করেছেন, যেখানে তিনি (বিন বাজ) সংসদ সদস্য হওয়া এবং গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশ নেয়াকে অনুমতি দিয়েছেন। **kvqL Avûj Kw`i web Avûj AwRR e¥jbt** "আমি বলি এই ফাতওয়াটি ভুল। ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) যে উদ্বৃতি আমরা দিয়েছি সেই অনুযায়ী, গুনাহ কখনো নিয়্যতের দ্বারা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তাছাড়া কুফর হচ্ছে সবচেয়ে বড় গুনাহর একটি। আর পার্লামেন্টে অংশ নেয়া হলো কুফর, এটা নিয়্যতের কারণে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এটা এই কারণে যে, পার্লামেন্ট হলো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রয়োগের একটি মাধ্যম। সুতরাং এতে অংশ নেয়া বা ভোট দেয়ার রায় জানতে হলে গণতন্ত্র সম্পর্কিত রায়ও জানতে হবে, আর এই রায়ও নির্ভর করে এর বাস্তবতা জানার উপর।" (*আল-জামি ফী তালাব আল ইলম আশ শারীফ*- ১/১৪৭-১৪৮)

সুতরাং উত্তম নিয়্যত দিয়ে একটি গুনাহকে অনুমোদন দেয়া যাবে না। আর মুসলিমদের যুল্ম থেকে রেহাই দেয়ার নামে কুফর বা শির্ক করাতো কোন ক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। যদি তাই হতো তাহলে আমরা বাইবেল আর মূর্তি বিক্রয় করে অভাবী মুসলিমদেরকে সাহায্য করতাম!

5/ bxwZgvjvt fv¥jv Kv¥Ri Av¥`k ¤`qv Ges gμ` Kv¥Ri wb¥la Kiv

গণতন্ত্রের পক্ষে যারা কথা বলেন তারা এই নীতিটিও ব্যবহার করে থাকেন। যে প্রার্থীর আদর্শ মুসলিমদের জন্য কম ক্ষতিকর বা কিছুটা উপকারী তাকে নির্বাচিত করার সাথে তারা এই নীতিটির তুলনা করেন। কারণ, এতে ভালো প্রার্থীর ভালো কাজে সহায়তা করে মন্দ প্রার্থীকে বাঁধা দেয়া হচ্ছে।

এক্ষেত্রে আমাদের স্পষ্ট বক্তব্য হলো গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণই হলো শির্ক, আর এটাকেই সর্বপ্রথম নিষেধ করতে হবে। গণতন্ত্রের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার পাশে অন্যকে স্থাপন করে আইন রচনার জন্য- যা সুস্পষ্ট শির্ক। যে ব্যক্তি এই বিষয়টি বুঝতে পারে, সে খুব সহজেই বুঝতে পারবে যে উপরোক্ত নীতিটি কতটা ভুলস্থানে ব্যবহার করা হয়েছে। তারা যেভাবে এই নীতিটি ব্যবহার করে, তা একেবারেই উল্টো, এই নীতির সঠিক ব্যবহার বরং তাদেরই বিরুদ্ধে যায়।[2]

ভাল কাজের আদেশ এবং খারাপ কাজের নিষেধ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় শর্ত হলো, এর পন্থাটি শরীয়ত সম্মত হতে হবে। অর্থাৎ, কোন চোরের চুরি বন্ধ করতে তাকে হত্যা করা যাবে না বা কাউকে সুদ দেয়া থেকে বিরত রাখতে তার টাকা ছিনতাই করা যাবে না অথবা কারো পরিবারকে তার অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে পরিবারের মানুষদেরকে অপহরণ করা যাবে না। এই সামান্য

[২] এক শ্রেণীর লেখকরা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণকে বৈধ বলেই ক্ষান্ত হয় না - গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা একজন মুসলমানের জন্য আবশ্যকীয় কর্তব্য বলে মনে করে (নাউযুবিল্লাহ)। শুধু তাই নয়, যারা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে কথা বলেন এবং মানুষদের এটা থেকে বিরত থাকতে বলে তাঁদেরকে এইসব লেখক যালিম বলে আখ্যা দিয়ে থাকে।

বিষয়টি বোঝা মোটেই কঠিন কিছু নয় যদি সে ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করার বিষয়টি বোঝে।

এক্ষেত্রে আরো একটি শর্ত হলো, ঐ মুনকার (খারাপ) নিষেধ করতে গিয়ে যেন আরো বড় মুনকার (ক্ষতি) না হয়ে যায় তা নিশ্চিত করা। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহঃ) বলেনঃ "এবং (ভালো কাজের)আদেশ ও (মন্দকাজের) নিষেধকারীরা যদি জানে যে এর প্রতিফলে ভালোর সাথে সাথে মিশ্রিত হয়ে কিছু মন্দও ঘটবে, তাহলে তাদের জন্য এটি করার অনুমতি নেই যতক্ষণ না তারা এর ফলাফলের (বিশুদ্ধতার) ব্যাপারে নিশ্চিত হয়।

যদি ভালো ফলাফলের প্রাধান্য থাকে, তবে তারা এটি চালিয়ে যাবে। আর যদি মন্দ ফলাফলের প্রাধান্য থাকে, তাহলে তাদের জন্য এটি করা নিষেধ, যদিও এর দ্বারা কিছুটা ভালো (ফলাফল) বিসর্জন দিতে হয়। এক্ষেত্রে এই ভালো কাজের আদেশ করা, যার পরিণতি খারাপ একটি খারাপ বা মুনকারে পরিণত হয় যা আল্লাহ্ ও রাসূলের (সাঃ) অবাধ্যতা বৃদ্ধি করে।"(*আল আমর বিল মারুফি ওয়াল-নাহিয়্যু 'আন আল-মুনকার*, পৃঃ ২১)

Be¥b KvBwqÅg (int) e¥jbt "সুতরাং যদি কারো মন্দ কাজের নিষেধ করা আরো বড় মন্দের দিকে পরিচালিত করে যা আল্লাহ্ (সুবঃ) ও রাসূল (সাঃ) বেশী অপছন্দ করেছেন (প্রথম মন্দের চেয়ে), তাহলে তা নিষেধ করা বৈধ নয়। যদিও আল্লাহ্ (সুবঃ) এটি (প্রথম মন্দ) অপছন্দ করেন এবং এটি যারা করে তাদের অপছন্দ করেন।" (*ই'লাম আল-মুওয়াক্কীন*, খন্ড ৩, পৃঃ ৪)

যারা মন্দ প্রার্থী আর ভালো প্রার্থীর কথা বলে নির্বাচনে অংশ নেয়াকে বৈধ করে; তারা এ মন্দ ঠেকাতে শির্ক বা কুফরীর মতো মূল্য দিতে বলে। দুটি জিনিসকে মেপে দেখুন তো, সমান হয় কিনা। এক্ষেত্রে যদি আমরা ইরাকের মুসলিমদের উপর অত্যাচার কমানোর কথাও চিন্তা করি, তাহলেও কি আমরা শির্ককে বিনিময় হিসাবে ধরতে পারি। আল্লাহ্ বলেছেনঃ **êwdrbv nZÅv A¥cÎv Ði-Zi|ë** (সূরা বাকারা ২:২১৭)

এখানে, ফিৎনা বলতে আল্লাহ্ (সুবঃ) শির্ক ও কুফরীকে বুঝিয়েছেন, যা অধিকাংশ তাফসীরে পাওয়া যায়। **kvqLj Bmjvg Bgvg Be¥b ZvBwgqÅvn (int) e¥j¥Qbt** "যদিও হত্যা করার মাঝে পাপ ও অমঙ্গল রয়েছে তবে কাফিরদের ফিৎনার (কুফরী) মাঝে রয়েছে তার চেয়েও অধিক গুরুতর পাপ এবং অমঙ্গল।"(*আল ফাতওয়া*-২৮/৩৫৫)

kvqL Avj¤ Avj-L`vBi তাঁর "লা ইলাহা ইল্লা আল্লাহ্" - এই সাক্ষ্য দানে আহবান" বইটিতে শেইখ সুলাইমান বিন সাহমান (রহঃ) এর উদ্ধৃতি দিয়ে **e¥j¥Qbt** "আল-ফিৎনাহ হলো কুফর। সুতরাং সমস্ত বেদুঈন ও নগরবাসী যদি যুদ্ধ করে শেষ হয়ে যায় তা অনেক কম গুরুতর ঐ জমীনে একটি তাগুতকে নির্বাচন করার চেয়ে যে এমন আইনে শাসন করে যা ইসলামের শরীয়াহ বিরোধী।"

সুতরাং এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধের অজুহাতে শির্ক করা যাবে না, তাতে অত্যাচার যতই কমে যাবার সম্ভাবনা থাকুক, তাতে কিছুই যায় আসে না। এটা এই জন্যই যে মুসলিমরা অত্যাচারের কারণে যে ক্ষতির শিকার হচ্ছে, তার চেয়ে বড় ক্ষতিগ্রস্ত হবে শির্ক করার মাধ্যমে।

6/ bxwZgvjvt wbZv´ c¥qvR¥b nvivg MnY Kivi AbgwZ

যারা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ হারাম বলে মনে করেন, তারা অজুহাত দেন যে, এখন মুসলমানদের জন্য একটি জরুরী অবস্থা বিরাজ করছে, সুতরাং এমতাবস্থায় হারাম কাজে অংশগ্রহণ করাকে ইসলাম সমর্থন করে। অর্থাৎ যে জিনিসটি হারাম ছিল তা এই প্রেক্ষাপটে বা পরিস্থিতিতে হালাল!

এই নীতির ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করা উচিৎ যা তারা করেননি। কারণ, এ নীতিটি সর্বক্ষেত্রে সার্বজনীনভাবে প্রয়োগ করার মতো নয়। বরং এক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম আছে এবং কিছু বাধ্যবাধকতা বা সীমা আছে যার কারণে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই নীতির ব্যবহার গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রথমতঃ অনেক বিষয় আছে যেগুলোকে 'প্রয়োজন' বা 'জরুরী' বলা যায় না। সতরাং আমাদের সতর্ক হতে হবে যেন আমরা সত্যিকার প্রয়োজন ছাড়া এর নীতির নমনীয়তাকে ব্যবহার না করি। মানুষের 'প্রয়োজন' বা জরুরী অবস্থা ৫ প্রকারের ঃ

(১) দ্বীনের জন্য আবশ্যকীয়

(২) জীবনের জন্য আবশ্যকীয়

(৩) মানসিক সুস্থতার জন্য আবশ্যকীয়

(৪) রক্ত (বংশ) বা সম্মান রক্ষার্তে আবশ্যকীয়

(৫) সম্পদের ক্ষেত্রে আবশ্যকীয়

<u>এই সকল প্রয়োজনীয়তা সমান পর্যায়ের নয়। যেমন, কারো জ্বিনা করা বা কোন মাহ্‌রাম মহিলাকে নিকাহ (বিবাহ) করার অজুহাত কখনো এই হতে পারে না যে, আমার যৌন আকাঙ্খা পূরণ করা আবশ্যকীয় হয়ে পড়েছিল। সুতরাং সকল প্রয়োজনকেই এই নীতির আওতায় ফেলা যাবে না, এক্ষেত্রে একটি সীমারেখা আছে।</u>

দ্বিতীয়ত, শির্‌ক বা কুফরের ক্ষেত্রে এই নীতি কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ শির্‌ক এবং কুফর থেকে নিজেকে রক্ষা করাই সবচেয়ে আবশ্যকীয় ব্যাপার, মানুষের দ্বীন রক্ষা করাটাই তার সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। একটি প্রয়োজন রক্ষা করতে গিয়ে আরো বড় প্রয়োজন বিসর্জন দেয়া কখনোই অনুমোদনযোগ্য নয়।

ćagvæ BKivn (Pov´ ¤Rvi Rei`wÇ)-Gi ¤Î¥æB GwU MnY¥hvMÀ n¥Z cv¥i| Avgiv wkiK I Kdi¥K nvjvj Kivi RbÀ Ggb GKwU bxwZi mvnvhÀ ¤bqvi K_v wKfv¥e fve¥Z cwi?

kvqLj Bmjvg Be¥b ZvBwgqÀvn (int) e¥j¥Qbt "নিশ্চয় যেসব বস্তু হারাম; এর মধ্যে যেসব বস্তু কোন অবস্থাতেই ইসলামের শরীয়াতে অনুমোদন দেয়া হয়নি এবং এ ব্যাপারে স্পষ্ট বর্ণনাও রয়েছে, (সেগুলো) না আবশ্যকীয়তায় আর না এছাড়া অন্য কোন কারণে অনুমোদনযোগ্য, যেমন, শিরক, অবৈধ যৌনাচার এবং আল্লাহ্‌র ব্যাপারে জ্ঞান ছাড়া কথা বলা এবং স্পষ্ট সীমালংঘন। এই চারটি বিষয় হলো সেইগুলো যার সম্পর্কে আল্লাহ্ (সুবঃ) বলেছেনঃ **êejbt Avgvi ie nvivg K¥i¥Qb hveZxq cKvkÀ I AcKvkÀ AkxjZv, cvc KvR, AmsMZ we¥ivaxZv, Avjvni mv¥_ Ggb wKQ kixK Kiv hvi ¤Kvb cgvY wZwb bwhj K¥ibwb Ges Avjvni cwZ Ggb K_v Av¥ivc Kiv hv ¤Zvgiv Rvb bv|ë** (সূরা আরাফ ৭:৩৩)

এই বিষয়গুলো সকল শরীয়াতেই হারাম করা হয়েছে, আর এগুলোর ব্যাপারে সাবধান করতে আল্লাহ্ নবী রাসূলদের পাঠিয়েছেন এবং কোন অবস্থাতেই এগুলো হালাল ছিল না, কঠিন সময়েও নয়। আর এ কারণেই এই আয়াতটি মক্কায় নাযিল হয়।

kvqL আলী আল খুদাইর, kvqL হামাদ বিন আতিকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেনঃ **êwbĈq Avjvn ¤Zvgv¥`i Dci nvivg K¥i¥Qb gZ R´, iË, ćK¥ii gvsm Ges hvi Dci RevB¥qi mgq Avjvni bvg Qvov AbÀ bvg D®PwiZ n¥q¥Q| wK´ ¤h eÀwË Ab¥bÀvcvq n¥q c¥o Ges bvdigvb I mxgvjsNbKvix bv nq Zvi ¤Kvb cvc n¥e bv| wbĈqB Avjvn cig Îgvkxj, Amxg `qvj|ë** (সূরা বাকারা ২:১৭৩)

সুতরাং এখানে 'অনন্যোপায়' অবস্থায় থাকাকে শর্ত করা হয়েছে, যেন এগুলো কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত অন্যায় বা সীমালংঘন থেকে না খায়। এই দুইটি বিষয়ের মধ্যে (প্রয়োজন এবং জোর-জবরদস্তি) পার্থক্য অস্পষ্ট বা গোপন নয়।"

wZwb (Be¥b AwZK) Av¥iv e¥j¥Qbt "এবং অনন্যোপায় ব্যক্তির জন্য মৃত বস্তু খাওয়ার অনুমতির মাঝে কি এমন কিছু আছে যা সেচ্ছায় দ্বীন ত্যাগ করাকে সমর্থন করে?!

G ai¥bi Zjbv wK Ggb bq ¤h, GKRb eÀwË Zvi ¤evb ev gv¥K we¥q Kij, ¤mB bxwZi wfwã¥Z ¤hLv¥b GKRb Çvaxb gvbI¥K GKwU `vmx¥K we¥q Kivi AbgwZ ¤`qv n¥q¥Q hw` eÀwfPv¥i wj÷ nIqvi AvksKv \_v¥K A\_ev Zvi we¥q Kivi ¤hvMÀZv ¤bB (GKRb Çvaxb bvix¥K)?** এই বিভ্রান্তি ছড়ানো মানুষগুলো তাদের চেয়েও বেশী (বাড়াবাড়ি) করছে যারা তুলনা করে- **ê¤ePv¥Kbv ¤Zv m¥`iB g¥Zv|ë (সূরা বাকারা ২:২৭৫)। [হিদায়াত আত-তারিক, পৃঃ১৫১]

kvqL Avjx Avj L`vBi e¥j¥Qbt "আমরা বলিঃ অনন্যোপায় ব্যক্তির জন্য মৃত জীব ভক্ষণের অনুমতির মাঝে কি এমন কিছু আছে যা, শির্‌কের সমাবেশে প্রবেশের অনুমতির দিকে ইঙ্গিত করে, যেখানে ধর্ম নিরপেক্ষ ও তাগুত সরকারের সাথে জোট করা হয় 'দাওয়ার উপকারীতা'র নামে।" (*আল জামু ওয়াত তাজরিদ ফী শারহি কিতাব আত তাওহীদ*, পৃ:১২১)

7/ bxwZgvjvt ¥Rvi Rei`wÇ ev wbcxo¥bi ¤Î¥æ Kdix Îgvi ¤hvMÀ

এর আগের (৬ নং) পয়েন্টে আমরা এব্যাপারে প্রমাণ দিয়েছি যে প্রয়োজনে কুফর বা শির্ক করার কোন অনুমতি নেই। আমরা এখন যে নীতিটি আলোচনা করবো তা হচ্ছে নির্বাচনের পক্ষ অবলম্বনকারীদের শেষ অস্ত্র। তারা যেকোন উপায়ে বলতে চায় যে, এটি একটি ইকরাহ (জোরজবরদস্তি) সংক্রান্ত বিষয়।

হ্যাঁ, আমরাও বলছি যে, যদি কোন ব্যক্তি সত্যিকার অর্থেই জোরজবরদস্তি নিপীড়নের স্বীকার হয়, তাহলে তার জন্য এটি ক্ষমাযোগ্য। কিন্তু, আমরা যেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি এই ক্ষেত্রে ইকরাহর সংজ্ঞা ও শর্তাবলীর সাথে কোন সামঞ্জস্য নেই। প্রথম কথা হলো, এই নীতিমালা সেই ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য নয় যে সেচ্ছায় কোন কাজ করে। এক্ষেত্রে যে তাকে জোর করানো হয়েছে, সেই প্রমাণ থাকতে হবে।

'আলা আদ্-দ্বীন আল-বুখারীর সংজ্ঞা অনুযায়ী জবরদস্তি হলোঃ করো ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে কোন ব্যাপারে ভয় দেখিয়ে কোন কাজ করতে বাধ্য করা হয় যা সে করতেও সক্ষম। তাই অন্য ব্যক্তি সন্ত্রস্ত হয় এবং জবরদস্তির বাস্তবায়নে তার সন্তুষ্টি দূরীভূত হয়।

Wt gnv¼v` web Avûjvn Avj Iqvnvex e¥jb, "এটা সেই প্রকারের যেখানে শুধুমাত্র ঐ নিপীড়িত ব্যক্তিকেই জোর করা হচ্ছে এবং তার আর কোন উপায় বা ক্ষমতা নেই।" (*নাওয়াকিদ আল ঈমান আল ইতিকাদিইয়্যাহ ওয়া যাওয়াবিত আত তাকফির ইনদাস সালাফ*, ২/৭)

সুতরাং, যারা এই যুক্তি দিয়ে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করাকে বৈধ করে তারা কখনোই এই দাবী করতে পারে না যে তাদেরকে এই কাজ করার জন্য বাধ্য করা হয়েছে। কারণ, এখানে মুসলিমদেরকে বলা হয় 'স্বতস্ফুর্তভাবে ভোটে অংশগ্রহণ করুন'।

ìBKivní-Gi k¥Zi eÀvcv¥i Be¥b nvhi (int) e¥jbt êBKivníi 4wU kZ i¥q¥Qt

প্রথমতঃ যে জোর করছে তার ঐ হুমকি বাস্তবায়নের ক্ষমতা রয়েছে সেই সাথে যাকে জোর করা হচ্ছে সে এটি ঠেকাতে এমনকি এর থেকে পালাতেও অক্ষম।

দ্বিতীয়তঃ এ ব্যাপারে তার সুস্পষ্ট ধারণা আছে যে, সে যদি অসম্মতি প্রকাশ করে তাহলে ঐ হুমকি তার ওপর পড়বে।

তৃতীয়তঃ তাকে যে হুমকি দেয়া হচ্ছে তা অতি নিকটে অর্থাৎ যদি বলা হয়, "তুমি যদি এটা না কর, তোমাকে আগামীকাল মারব", তাহলে তাকে নিপীড়িত বলা যাবে না। এক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম রয়েছে, তাহলো যদি নিপীড়নকারী একটি সময় নির্ধারণ করে দেয় যা অতি অল্প এবং সাধারণত সে এই সময় পরিবর্তন করে না।

চতুর্থতঃ যাকে জোর করা হয়েছে তার থেকে এমন কিছু প্রকাশ হবে না যা দ্বারা বোঝা যায় যে সে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করছে। (ফাত্হ আল-বারি, খন্ড ১২, পৃঃ ৩১১)

সুতরাং এই নীতিটি সঠিক যে, সত্যিকার অর্থেই যদি কাউকে বাধ্য করা হয় তবে তার নির্বাচনে অংশগ্রহণ ক্ষমা যোগ্য। তবে আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, তারা যেটাকে এখন ইকরাহ যা জোর-জবরদস্তি বলছেন তা আসলে ইকরাহ-র শর্তাবলী পূর্ণ করে না।

¥Rvi Rei`wÇ ms Ív´ GKwU D¥j LÀ welqt

বর্তমানে ইরাক ও অন্যান্য স্থানে আমাদের ভাই-বোনদের ওপর যে অত্যাচার নিপীড়ন চলছে, তাতে তারা অনেকেই 'ইকরাহ'-এর পরিস্থিতিতে পড়েছেন। অনেক ক্ষেত্রেই তাদের অবস্থা ইকরাহ-র সংজ্ঞা ও শর্তাবলীর আওতায় পড়ে। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহই নেই যে আল্লাহ্‌র শত্রুরা (আল্লাহ্‌ তাদের ধ্বংস করুন) আমাদের ভাইবোনদের নির্যাতন করেছে, ধর্ষণ করেছে, হত্যা করেছে এবং এখনও করছে। এসব অত্যাচারের বিশদ বর্ণনা কেউ পড়লে সে অবশ্যই বলবে যে, তাদেরকে ঐসব অবস্থায় শির্‌ক ও কুফর করতে বাধ্য করলে তাদের কিছুই করার ছিল না।

কিন্তু, বাস্তবতা হলো যে, ইরাকের ঐসব নির্যাতিত ভাইবোনরা নয় বরং সেই সব মানুষ নির্বাচনের দিকে ডাকছে যারা মোটামুটি আরামেই আছেন। আর একারণেই এসব মানুষের ক্ষেত্রে ইকরাহ'র এই নীতি প্রয়োগ করা যায় না। পৃথিবীর এক অংশের মুসলিমদের উপর অত্যাচার হচ্ছে সেটিকে তারা নিজেদের কুফর বা শির্‌কের জন্য অজুহাত করতে পারেন না। এদেরকে কোন অবস্থাতেই নির্বাচনে অংশ নিতে বাধ্য করা হচ্ছে না, আর এ অবস্থাকে নিপীড়ন বলা যাবে না।

MYZw´K wbevP¥b AskMnYKvix¥`i eÀvcv¥i ivqt

যারা এই শির্‌কী কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে তারা যে কুফরীতে লিপ্ত এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কিছু সন্দেহ-সংসয় ও ভুল ধারণার অজুহাতে তাদের এসব কাজ অনুমোদন যোগ্য নয়, যা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। তবে এটাও সমানভাবে নিশ্চিত যে অনেক মুসলমান ব্যাপারটির আসল রূপ পুরোপুরি অনুধাবন না করে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণে সকলের প্রতি আহবান জানায়।

এটা হলো একটি দিক। তা ছাড়াও এটা স্পষ্ট যে তারা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ক্ষতির পরিমান কমিয়ে সমাজে কিছু ভাল আনয়েনের উদ্দেশ্য। যদিও আমরা বলি না যে ভাল নিয়্যতে কোন কাজ করলেই তা শিরক ও কুফরী থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে। আসলে সঠিক ব্যাপার হল শিরক ও কুফরী করার ব্যাপারে অজ্ঞতা তাদের ভাল নিয়্যতের কারণে তাদের কুফরীর বাইরে নিয়ে আসে না।

অতএব, ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে কোন শির্‌ক বা কুফর করলেই সেটা ক্ষমা করা হবে এমন কথা আমরা বলতে পারি না। তবে যেহেতু অনেকেই এই বিশেষ (গণতন্ত্র) বিষয়ে অজ্ঞ আর তাছাড়া বিষয়টি আরও জটিল হয় যখন এটি যায়েয করার লক্ষ্যে আলেমগণ ফিকহের সেই সব নীতির ভিত্তিতে নানান ফাতওয়া দেন, যেগুলো আমরা এই প্রবন্ধে ইতিমধ্যে ব্যাখ্যা করেছি। **mZivs GiKg AeÇvq ¤h KvD¥K ZrÎYvr Kwdi ejvUv evovewo ev DMZv| hZÎY bv Zvi Kv¥Q G welqwU cwiÆvi Z¥j aiv n¥®Q Ges GmKj weýw´ AcmviY Kiv n¥®Q ZZÎY ch´ Avgiv Zv¥K ZvKwdi Ki¥Z cwi bv|**

যারা তড়িঘড়ি করে সকল ভোটদানকারীকে তাকফির করে এবং এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে **Ave gnv¼v` Awmg Avj gvKw`mx e¥jbt** "এর মাঝে কিছু মানুষ আছে, যাদেরকে ডেকে আনা হয় ঐসব ব্যানার বা পোস্টারের সামনে যেখানে লেখা থাকে, **êBmjvgB GKgvæ mgvavbë** (অর্থাৎ ইসলামী দলে ভোট দিন) অথবা এ ধরণেরই কোন শ্লোগান যা দ্বারা মুশরিক শাসকরা জনগনকে বিভ্রান্ত করে থাকে ।

অতঃপর তারা তাদেরকে ভোট দেয় এবং নির্বাচিত করে কারণ তারা ইসলামকে ভালোবাসে এবং শরীয়তের অনুগত থাকতে চায়; তাছাড়া এই শির্কের ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই বা শির্কের গভীরে প্রবেশ করার ঐরূপ ইচ্ছাও তাদের নেই যেরূপ রয়েছে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের যারা ইসলামের বেশ কিছু আইন নিজেদের অধিকারে নিয়ে নেয় ।

সুতরাং যারা সরাসরী আইন প্রণয়নের অধিকার নেয়নি বা কুফর আইনের সম্মানে শপথ বাক্য পাঠ করেনি বা এর কাছে বিচার প্রার্থনা করেনি অথবা কথা ও কাজে এমন কোন কুফর করেনি যা নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ করে থাকে; তাদের (তাকফির করার) ক্ষেত্রে এসকল বিষয়ও বিবেচনা করতে হবে । কারণ, এ কথা সবারই জানা যে একজন ভোটার কখনও সরাসরী এসব কাজ করে না । বরং সে শুধু তার পছন্দের ব্যক্তিকে নির্বাচিত করে ।"

wZwb Avil e¥jbt "আর একারণেই আইন প্রণয়নকারী প্রতিনিধিদের কর্মকান্ডের বাস্তবতা এবং এর মধ্যে যেসব কাজ কুফর এবং তাওহীদ ও ইসলাম বিনষ্টকারী সেগুলো ব্যাখ্যা করে স্পষ্ট করার আগে এমন কাউকে (ভোটার) তাকফির করার জন্য ব্যস্ত হওয়া জায়েয নয় । এর পরও যদি সে ভোট দান করে তবে সে কুফরী করল । সুতরাং ভোটারদের ক্ষেত্রে পার্থক্যসমুহ অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে, সবাই আইনপ্রণেতা তৈরীর উদ্দেশ্যে ভোট দেয় না তাদের (অজ্ঞতার কারণে) অন্য উদ্দেশ্য থাকতে পারে ।

সুতরাং এক্ষেত্রে তার কাছে সত্য প্রকাশ করার আগে তাকে তাকফির করা যাবে না, যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে, যে তার নিয়্যত জানে না তার কাছে, মনে হবে যে, ঐ ব্যক্তি কুফরী কাজে লিপ্ত আছে । কারণ, গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে অনেক ভুল বোঝাবুঝি, অপব্যাখ্যা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে; আর তাছাড়া 'গণতন্ত্র', 'পার্লামেন্ট' গুলো সবই বিদেশী শব্দ, তাই অনেকেই বাস্তবতা না বুঝে এর কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ে । এর উদাহরণ হলো ঐ ব্যক্তির মত যে এমন কিছু কথা মুখ দিয়ে বলেছে যার অর্থ সে নিজেই জানে না ।

সুতরাং যারা গণতন্ত্র ও এতে ভোটদানের দানের ব্যাপারে ইসলামের সিদ্ধান্ত জানে; তাদের একান্ত দায়িত্ব হলো মানুষের কাছে এ বিষয়টি স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরা এবং এ বিষয়ক বিভ্রান্তিসমূহ দূর করা ।

Dcmsnvi t

হে পাঠক! কোন সন্দেহ নাই মুসলিমরা আজ ভয়াবহ অত্যাচারের শিকার হচ্ছে। আজ আমাদেরই ভাই-বোনদের উপর সংঘটিত হয়ে চলছে পৃথিবীর নৃশংসতম নির্যাতন, গণহত্যা; যা দেখে চোখের পানি ঝড়ছে আর হৃদয়ে আগুন জ্বলছে। এই বর্তমান অবস্থা দেখেও যদি কারো অন্তর নাড়া না দেয় তাহলে সে যেন তার ঈমানের ব্যাপারে নিজেকে প্রশ্ন করে আর তার মৃত অন্তরকে পরীক্ষা করে দেখে।

একই সাথে, আমরা আমাদের ভাইবোনদের সাবধান করে দিতে চাই শয়তানের চক্রান্ত থেকে যে সর্বান্তকভাবে আমাদের পথভ্রষ্ট করতে চায়। উত্তম আমলের নামে, ইসলামের প্রতি আমাদের ভালোবাসাকে কৌশলে কাজে লাগিয়ে তারা আমাদের শির্কের মাঝে প্রবেশ করাতে সদাতৎপর। আর একথাও মনে রাখা দরকার যে, সকল রাজনৈতিক কর্মকান্ডই নিষিদ্ধ নয়।

যদি এগুলো শির্ক বা কুফরের আওতায় না পড়ে এবং রাসূলের (সাঃ) সুন্নত অনুযায়ী পালন করা হয় তাহলে কোন বাধা নেই। যেমন, আলোচনা সভা, সমাবেশ, প্রচারণা, ইত্যাদি কিছু রাজনৈতিক কর্মকান্ড যেগুলো শরীয়তের কোন নিষেধ নেই।

পরিশেষে বলতে চাই, আমাদের প্রয়াসটি ছিল সাম্প্রতিক কালে উত্থিত এই বিতর্ককে ঘিরে যা বেশ কিছু লেখকের প্রবন্ধকে ঘিরে বেশ জমে উঠেছে। আমরা শুধু চেয়েছি, গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশ নেয়ার পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করতে এবং তাদের কিছু সংশয়ের জবাব দিতে এবং তাদের যুক্তি তর্কাদীগুলো খÓন করতে।

আমাদের এই প্রয়াসের মাঝে যদি সঠিক কিছু থাকে, তাহলে তা নিশ্চয় আল্লাহ্ (সুবঃ)-এর তরফ থেকে আর এর ভেতর যদি কোন ভুল বা সীমাবদ্ধতা থাকে তাহলে তা আমাদের এবং শয়তানের থেকে, আমরা তার থেকে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাই।

সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উপর, তাঁর পরিবার, তাঁর সাহাবা এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর অনুসারীদের উপর।

আল্লাহ্ ওদের দৃষ্টিতে তোমাদের অল্পসংখ্যক করে দেখালেন

মূল

শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল মাকদিসি (হাফিযাহুল্লাহ্)

অনুবাদ

আল হিকমাহ পাবলিকেশন

সম্পাদনা

মাওলানা ইবরাহীম হুসাইন দাঃ বাঃ

বুদ্ধিমান সেই যে তাঁর দুর্বলতা ঢেকে রাখে, যে সবর করতে জানে যখন তার লোকবল বা সাজ সরঞ্জামে ঘাটতি থাকে। নিঃশব্দে যে শত্রুর দূর্বলতা পর্যবেক্ষণ করে এবং সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা গ্রহন করে যাতে তার পরিকল্পনাগুলো সুরক্ষিত ও নিরাপদ থাকে এবং এতে সে শত্রুর জন্য মোক্ষম সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে পারে। অপরিপক্ক উত্তেজনা ও হুমকি কেবল শত্রুকে নিজের পরিকল্পনা সম্পর্কে সতর্কই করে দেয়, যা তার শত্রুকে প্রস্তুতি গ্রহনের সুযোগ করে দেয়। এর ফলে মুসলিমদের অবস্থা দাঁড়ায় ওই ব্যক্তির মত, যে সময় হবার আগেই তীর চালনা করে কিংবা তীর চালনার আগেই তার শিকারকে সতর্ক করে দেয়।

যে শত্রুকে অতিমাত্রায় হুমকি বা ভয় দেখায় সে আসলে তাঁর শত্রুকে অবমূল্যায়ন করল কারণ হুমকি বা ভয় দেখানোতে শত্রুর কোন ক্ষতি সাধিত হয় না। এবং এই ব্যাপারে প্রান্তিকতা পরিহার করতে না পারলে এগুলো শুধু শত্রুদের মধ্যে তার ভয় ও নিজের কথার মূল্য দুইই কমায়। কেউ যদি বুদ্ধিমানের মত কাজ করতে চায় তার উচিত শত্রুকে বুঝতে না দেয়া যে সে কৌশলী, তা না হলে শত্রু তাঁর বিরুদ্ধে সব সময় সতর্ক থাকবে ফলস্বরুপ সে শত্রুদের মধ্যে দূর্বলদেরই স্পর্শ করতে পারবে না, রাঘব বোয়ালের কথাতো বাদই।

যে যুদ্ধ দূর্বল বা শোষিতদের দ্বারা সংগঠিত হয় তা কখনো সংখ্যা বা সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে হয় না বরং তা হয় শত্রুর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে, তার উদাসীনতা ও বেখেলায়ীপনার সৎব্যবহার করে এবং সঠিক সময়ে বিধ্বংসী হামলা চালিয়ে। কিন্তু কখনো কখনো এই বাস্তবতাগুলো মানুষ উপলব্ধি করে না এবং নিজের পেখম মেলে দিয়ে নিজের সত্যিকার শক্তি থেকে নিজেকে বড় করে জাহির করে। ফলে শত্রুরা তার প্রতি হাজার গুণ বেশি গুরুত্ব দেয় যা অন্যথায় তারা দিত না এবং তারা কেবলমাত্র দক্ষ প্রযুক্তির সাহায্যে পর্যবেক্ষণ ও অনুসরণ করার মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং দুনিয়াব্যাপী তাদের সহযোগী ও দোসরদের সাহায্যও কামনা করে। তাদের ভয়কে

লুকিয়ে রাখার জন্য তারা একে আন্তর্জাতিক ইস্যু হিসেবে তুলে ধরে এবং শেষে তা সার্বজনীন রুপ লাভ করে।

যদি আমাদের এই বন্ধু বিচক্ষণ হত, তবে শত্রুর এহেন বাড়াবাড়িতে সে কখনোই খুশি হতে পারত না কারণ এটা খুবই শিশুসুলভ যে কেউ নিজের উপর আসন্ন নিপীড়ন দেখে আনন্দিত হচ্ছে। একইভাবে এটা নির্বোধের কাজ যে সে তার ব্যাপারে শত্রুর প্রচার করা প্রপাগান্ডা যা তারা সারা বিশ্বের কাছে ফলাও করে প্রচার করেছে তার উপর ভিত্তি করে বসে থাকে এবং সারা দুনিয়ার সব শত্রুকে একসাথে তার বিরুদ্ধে জড়ো হতে দেয় যাতে তারা সঙ্গবদ্ধ হয়ে তাকে নির্মূল করতে পারে। ফলশ্রুতিতে বেচারা তার কল্পনাকে আঁকড়ে ধরে এবং প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে বিস্মৃত হয়। শত্রুর মিথ্যা প্রচারনাকে সে বিশ্বাস করতে শুরু করে এবং শত্রুরা যেভাবে তার ব্যাপারে বর্ণনা করে, সে একই মোতাবেক বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়। তখন সে কিছু আগুনঝরা বিবৃতি প্রদান করে এবং তার কার্যাবলীকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে অতিরঞ্জিত করে যেন আল-কাকা ইবনু আমর রহঃ কিংবা কুতাইবাহ ইবনু মুসলিম রহঃ তার বাহিনী সমেত বাগদাদে অবস্থান করছেন, যার শেষভাগ চীনের প্রাচীর ছাড়িয়ে গেছে! কিন্তু মানুষ শোনা কথায় বিশ্বাসী না বরং চোখের দেখায় বিশ্বাসী এবং শেষপর্যন্ত সেখানে আগুন, ধোঁয়া, বিশৃঙ্খলা ও কালিঝুলি ছাড়া কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। এগুলো তার অনুসারীদেরও বিপদে ফেলে দেয় এবং তারা মনে করে যে, তারা একটি বৈশ্বিক সংকট সৃষ্টি করেছে আর সেভাবে অগ্রসর হয়।

কবি যেন তাদের উদ্দেশ্য করেই বলছেন,

“যখন ময়নাপাখির দল উড়ে যায়,

আমি তাদের বাজপাখি ভেবে ভুল করি”।

এরপর ধুলা মিলিয়ে গেলে আসল অবস্থা দৃষ্টিগোচর হয় যেভাবে বাচ্চারা সাবানের বুদবুদ ওড়ায় আর তা বাড়তে বাড়তে একসময় আকাশে ওঠে যায় কিন্তু সেগুলো বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না, বরং নিমেষেই চুপসে যায়।

এই লোকরা যদি দাওয়াহ্ ও জিহাদের প্রতি সম্মান রাখত, তাহলে তারা চুপ থাকত। বরং তারা এই নীরবতা থেকে সুবিধা গ্রহণ করত এবং একে কাজে লাগিয়ে তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তৎপর হত।

একজন নেতার মান মর্যাদা ও আস্থার প্রতীক হচ্ছে, সে এমন হুমকি প্রদর্শন থেকে বিরত থাকে যা কখনোই বাস্তবায়ন করতে পারবে না। তাই সে কখনো হুমকি প্রদান করলে, সাবানের বুদবুদের ন্যায় মেকি হয় না।

এটা বিজয় ও সফলতার নিদর্শন যে, সে নিজেকে প্রকৃত অবস্থার চেয়ে বড় হিসেবে জাহির করে না। যদি কেউ তার কাজের ব্যাপারে আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান হয় তাহলে সে তার সক্ষমতাকে আড়াল করে এবং এমনভাবে নিজেকে তুলে ধরে যেন সে কিছুই না। ফলে শত্রুরা তার ব্যাপারে উদাসীন হয়, তার ক্ষমতাকে হেয় প্রতিপন্ন করে এবং তার আক্রমণের জন্য অপ্রস্তুত থাকে। বলা হয় যে, "কারো শত্রু যদি তার ব্যাপারে গাফেল থাকে তবে সে তাদের ধোঁকা দিবে, আর যে ধোকায় পতিত হয় সে কখনই নিরাপদ থাকে না।

যখন সে তার শত্রুকে ধরে সে এমনভাবে ধরে যেভাবে শিকারী জন্তু তার শিকারকে ধরে"।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বদর যুদ্ধের আগের অবস্থাকে এভাবে বর্ণনা করেছেন,

আল্লাহ্‌ ওদের দৃষ্টিতে তোমাদের অল্পসংখ্যক করে দেখালেন

وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا

"এবং তিনি তোমাদেরকে তাদের দৃষ্টিতে স্বল্প-সংখ্যক দেখিয়েছিলেন, যাতে যা ঘটার ছিল তা তিনি সম্পন্ন করেন"। {সুরা আনফাল, ৮ : ৪৪}

বদর যুদ্ধ শুরুর পূর্বে আবু জাহেল মুসলিমদের লক্ষ্য করে তাচ্ছিল্যের সুরে বললো, "তাদেরকে (সংখ্যায়) [উটের জাবের] মত মনে হচ্ছে। কাজেই তাদেরকে ভীষণভাবে আক্রমণ করবে এবং দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধবে"।

যখন যুদ্ধের ময়দানে দুই সৈন্যদল পরস্পর মুখোমুখি দাঁড়াল, মুসলিম বাহিনী তাদের শক্তিসামর্থ্য ও দৃঢ়তার পূর্ণ বহিঃপ্রকাশ ঘটাল; শত্রুদের চোখে তারা প্রবল এবং সংখ্যায় প্রচুর হয়ে দেখা দিল।

[উটের জাব- উটের শুষ্ক খড় বা ঘাস জাতীয় খাবার এই উদাহরণ আরব রীতি থেকে এসেছে এর মানে সংখ্যায় কম]

আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ ۚ

"তারা অবিশ্বাসীরা ওদেরকে বিশ্বাসীদেরকে চোখের দেখায় দ্বিগুণ দেখছিল"। {সুরা আল-ইমরান, ৩ : ১৩}

হে আল্লাহ্‌! আমাদের দ্বীনের সঠিক বুঝ দান কর ও বাস্তবতা নিরীক্ষণের অন্তর্দৃষ্টি প্রদান কর এবং আমাদের শত্রুদের ধ্বংস কর।

আত তিবইয়ান পাবলিকেশন "জিহাদের ফসলসমূহ" থেকে অনুদিত।

কাফেলা এগিয়ে চলেছে এবং কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করছে

আবু মুহাম্মদ আল মাকদিসী

যারা আল্লাহর শানে জিহাদকে বেছে নেয়, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের জন্য সফলতা, হিদায়াত, হিকমাত ও তাঁর নিয়ামতের প্রতিশ্রুতি দান করেছেন।

সত্যিকারের মুজাহিদরা তাদের স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির কারণে জ্ঞানী ও বিচক্ষন হয়ে থাকে। তাই কোন বিষয়ে সঠিক উত্তর পেতে হলে প্রত্যেককে মুজাহিদদের কাছে যাওয়া উচিত, কেননা আল্লাহ তাদেরকে জ্ঞান দিয়েছে জিহাদের ফলস্বরূপ।

মুজাহিদকে তার পরিবেশ পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিকতার ব্যাপারে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে হবে, ঠিক যেভাবে সে জিহাদের জ্ঞান অর্জন করেছে। আল্লাহ দেখার ও শোনার ক্ষমতা সাধারণ মানুষের চেয়ে একজন মুজাহিদকে অনেক অনেক বেশি দিয়েছেন।

নিজেদের নেটওয়ার্কের বা সংগঠনের বাইরের কোন আলেমের মুখাপেক্ষী হবার প্রয়োজন মুজাহিদদের নেই। তাদের আলেমগন জিহাদ এবং যুদ্ধের ব্যাপারে সবচেয়ে বিচক্ষন ও পারদর্শী। তাদের এই ক্ষমতা এসেছে জিহাদ এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যেখানে মানুষ জীবনের ভালবাসা ত্যাগ করে আল্লাহর সত্যকে দেখতে আসে। এই চূড়ান্ত অভিজ্ঞতার দ্বারা তারা ভুল করতে পারে না।

একমাত্র মুজাহিদ ইমাম ও শায়খগণই তাদের এই জিহাদের মূল্য বোঝেন; তারা জানেন তাদের (আক্রমনের) লক্ষ্যবস্তুর যথার্থতা।

তাদের ঐসব মানুষের পথনির্দেশনার প্রয়োজন নেই যারা ঘাঁপটি মেরে বসে আছে। তাদের ঐসব মানুষের মতামতের প্রয়োজন নেই যারা তাদের শাসক বা শাসকের পশ্চিমা ও আমেরিকান প্রভুদের পায়ে নতজানু হয়েছে- অথবা তাদের মতামত যারা বিশ্বায়নের সংস্কৃতি (গ্লোবালাইজেশন) আর সন্ত্রাসবিরোধী বুলির কাছে পরাভূত হয়েছে। সেইসমস্ত অনৈতিক, ধর্মনিরপেক্ষ সাংবাদিক আর বুদ্ধিজীবীরা সবাই ভুল, যারা টিভির টক শো আর ধর্মনিরপেক্ষ পত্রিকায় ছাপা কলামের মাধ্যমে আমাদের সাথে কথা বলে।

মুজাহিদরা যখনই জিহাদে কোনো সাহসিকতা দেখায়; তখনই তারা তাদের খোঁড়াযুক্তি দিয়ে তার বিশে¬ষণ ও সমালোচনা শুরু করে, তারা জিহাদকে নিন্দা ও দোষারোপ করে। তারা বলে মুজাহিদরা অজ্ঞ এবং ওদের এই কাজ আমেরিকাকে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাবে। তারা বলে যে, এই জিহাদ ইসরাইলের অপরাধকে ম্লান করে দেবে। তারা বলে যে, মুজাহিদদেরকে জিহাদে টেনে অনা হয় কারণ তাদের ভাসা ভাসা জ্ঞান এবং এতে রহস্যজনক একটি শক্তির প্রভাব রয়েছে যেটা নিয়ন্ত্রিত হয় ইহুদি আন্দোলন এবং অন্যান্য যড়যন্ত্রের দ্বারা।

তোমরা এই দুনিয়াতে থাকতেই তোমরা তোমাদের দীন, সম্মান ও সততা বিক্রি করে দিয়েছো। তোমরা তুচ্ছজ্ঞান করেছো তোমাদের ঈমান এবং জিহাদকে; এর শিক্ষা ও হুকুমের সামনে নির্লজ্জভাবে দাড়িয়ে আছো। তোমরা অনেকেই মুছে ফেলতে যাও কুরআনের ঐ আয়াতগুলো যেগুলো জিহাদের কথাবলে। তোমাদের কী অধিকার আছে জিহাদের লাভলোকসান আলোচনা করার বা এর শহীদ ও বীরদের ব্যাপারে কথা বলার? যে মা তার ছেলে হারানোর ভান করে কাঁদছে তার অশ্রু বেশী নিখাদ নাকি সেই মায়ের অশ্রু যে আসলেই তার সন্তানকে হারিয়েছে।

শোনো পরাজিতের দল, মুজাহিদদের তোমাদের সেই উপদেশের প্রয়োজন নেই যা পরাজিত হয়েছে পশ্চিমাদের মিথ্যা সংস্কৃতির পদতলে। তোমাদের ঐ বিশেষ¬ণও মুজাহিদরা চায় না যা চাপা পড়েছে রাজাকার সরকার আর ওয়াশিংটন, লন্ডন, প্যারিস ও বার্লিনের প্রভুদের বুটের তলে। তোমরা হোয়াইট হাউজ, টেন ডাউনিং স্ট্রীট, এলসি প্যালেসের পক্ষে সাফাই গাচ্ছ- অথচ তোমাদের প্রভুরাই ভিন্ন বক্তব্য দিয়ে বেড়াচ্ছে। তোমরা বলেই যাচ্ছো যে, ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধটা কোন ক্রুসেড নয় বরং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধ,,যেই সন্ত্রাস ইসলামের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে। ধিক্কার তোমাদের ওপর, কাপুষেরা, তোমরা কিছুই জানোনা। ওরা এটাই বলেছে; এটা একটা ক্রমেড এবং ইসলামকে সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী ঘোষণা করা হয়েছে, ঐ শব্দগুলো বার বার ওদের জেনারেলরা উচ্চারণ করেছে, যা মুসলিমদেরকে মূর্তি ও শয়তানের পুজারী হিসাবে অখ্যায়িত করে, ওদের আদালত এবং সংস্থাগুলো দ্বারা হিজাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘেষিত হয়েছে যা নাকি সন্ত্রাসের চিহ্ন ও ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে হুমকিস্বরুপ।

তোমরা কান ও চোখ বন্ধ রাখাটা বেছে নিয়েছো এবং জোর দিয়েছো সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ওপর।

মুজাহিদদের প্রয়োজন নেই তোমাদের মতো হাফ লেডিসদের, তাদের জিহাদ সংক্রান্ত কোনো উপদেশের দরকার নেই ঐসব জ্ঞানীদের কাছে থেকে যারা টাকার কাছে বিক্রি ও পরাজিত হয়েছে। তাদের প্রয়েজন নেই তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করার যে এটা তোমাদের পছন্দমতো হয়েছে কিনা অথবা তাদের জিহাদ তোমাদের চিন্তাধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা। না, তাদের এসবের কোন প্রয়োজন নেই, তাদের সেইসব জ্ঞান ও দুরদৃষ্টি আছে যা তাদের দরকার। ক্ষোভে ফেটে পড়ো তোমরা এবং চালিয়ে যাও মুজাহিদদের বিরুদ্ধে সমালোচনা, তোমরা তাদের প্রত্যয়ে ফাঁটল ধরাতে পারবেনা; তোমদের সমালোচনার বিষদাঁত তাদের জিহাদকে আক্রান্ত করবে না। কিছুই তাদের আক্রান্ত করবে না।

কিন্তু হে উত্তম মুজাহিদরা, ঐসব বাজে লোকদের সবচেয়ে উত্তম জবাব হলো তাদের উপেক্ষা করা এবং জিহাদ চালিয়ে যাওয়া এবং মারতে থাকা এবং যুদ্ধ করতে থাকা প্রত্যেকটি আল্লার শত্রুর বিরুদ্ধে। ওদের মতামতকে উপেক্ষা করো কাফেলা এগিয়ে চলেছে এবং কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করছে, ওরা ঘেউ ঘেউ করেই আনন্দ পায়।

জিহাদ নিয়ে ওদের মাথা ঘামানো নতুন কিছু না। কুরাইশরা (গোত্রের নাম) এটা নবী (সাঃ) এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধেও ব্যবহার করেছে। ওরা মুজাহিদদের নির্বাচিত কর্মকান্ড ও লক্ষ্যবস্তুকে জিহাদের বিরূপ ছবি হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে।

কুরাইশরা মুসলিমদের ভাবমূর্তি নষ্টা করেছিল এবং তারা মুসলিমদেরকে খুন, অর্থ লুন্ঠন এবং অপহরণের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিল এমন মাসে যখন এসবের অনুমতি ছিল না।

মুসলিমরা এসব জানে এবং কখনো অস্বীকার করে না; বেঈমানদের না দরকার আছে মুজাহিদদেরকে শিক্ষা দেওয়ার, আর না মুজাহিদদের দরকার এ সমালোচনায় চিন্তিত হবার যা এখনো বেঈমানরা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে করছে; তা নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করার চেয়েও বেশি বড় একটা অপরাধ। মুসলিমরা সমালোচনা নিয়ে চিন্তিত না, কারণ তারা জানে সমালোচনা তো হওয়া উচিত বেঈমানদেরকে নিয়েই, কারণ ওরা অপরাধ পালিয়ে যাচ্ছে, পরিকল্পনাও করছে। মুজাহিদদের চিন্তিত হওয়া উচিত নয় জিহাদের শত্রুদের সৃষ্ট ঝামেলায়; যারা সমালোচনা করে তাদের জিহাদের কর্মকান্ড ও সময়সূচীর ভাবমূর্তিকে নষ্ট করার জন্য। জিহাদ বন্ধ করার চেষ্টা, মুজাহিদদের কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে আনা যেকোন অভিযোগের চেয়ে অনেক বড় অপরাধ। যদিওবা মুজাহিদরা কোনো ভুল করে তারপরও বেঈমানদের মতামতের কোনো দরকার নেই, কারণ তারা যে কারোও থেকেই ভালো জানে কোনটি সঠিক আর কোন ভুল।

যেভাবে আবু ফিরাস (কবি) বলেছেনঃ

এটা আমাকে অবাক করে কিভাবে পথভ্রষ্ট আমাকে বলার চেষ্টা করে কোনটি সঠিক কোনটি ভুল।

মুজাহিদরা সতর্ক থেকো এবং আল্লাহর শত্রুদের সামনে দুর্বল হয়ে পড়ো না। তোমার জিহাদের ক্ষতি হতে দিও না যখন ওরা তোমাদের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করছে।

যদি তারা বলে যে, তোমরা শিশুদেরকে হত্যা করছো এবং নবী এর বিরুদ্ধাচরণ করেছেন, তাহলে তোমরা বলো; হ্যাঁ। আমরা জানি যে, নবী এর বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। আমরা কখনো শিশুদের লক্ষ্যবস্তু করিনি, যদি আমরা তা কখনো করেও থাকি তবে তার জন্য আমরা অনুতপ্ত হয়েছি, কিন্তু তোমরা ভ্রান্তির মাঝেই আছ এবং ভুল জোর দিয়েই করে যাচ্ছো। ওদেরকে বোলো, আমাদের তোমাদের উপদেশের কোনো প্রয়োজন নেই। তোমরা কিভাবে শিশুদের পক্ষে কথা বলো? তোমরাই তো জিহাদের যাবার অপরাধে তাদের বাবাকে হত্যা করেছ আর তাদেরকে করেছ এতীম। তোমরা আল্লাহর বিশ্বাসের বিরুদ্ধে লড়ছো যখন মুজাহিদরা যুদ্ধ করছে আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে। তোমরা ঈমানকে ধ্বংস করতে চেয়েছ তোমাদের কলুষিত স্কুল সিলেবাস দিয়ে। যা ওদেরকে তোমাদের প্রতি অনুগত্য শিখায়, আর শিখায় ঈমান ও জিহাদের বিরুদ্ধে যাবার শিক্ষা।

যদি ওরা বলে যে, নিউ ইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে তোমাদের কর্মকান্ডের দ্বারা তোমরা আমেরিকাকে সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের নামে তাদের এবং তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অজুহাত দিয়েছো। তাহলে তোমরা ওদেরকে বোলো, আমেরিকা চিরকালই ঐসব দেশের পিছনে লেগে ছিলো? আমরা এসবের কারণ না। আমাদের এই প্রতিঘাতের পূর্ব থেকেই এসব দেশে আমেরিকানরা কোন কারণ ছাড়াই ঘাঁটি গেঁড়েছে এবং এর জন্য তাদেরকে কোন মাসূল দিতে হয়নি, আজ আমরা তাদেরকে মাসূল দেয়াচ্ছি।

যদি ওরা বলে যে, ইসরাইল তোমাদের কর্মকান্ডগুলোকে ব্যবহার করছে ফিলিস্তিনীদের বিরুদ্ধে ওদের সন্ত্রাসবাদ তীব্রতর করার জন্য এবং ধ্বংস করছে বাড়ি, হত্যা করছে শিশু এবং কেটে ফেলছে গাছ। তাহলে ওদেরকে বলো, ইসরাইল তার আগ্রাসনের জন্য কারো ধার ধারে? তারা তো চিরকালই এমন অত্যাচার চালিয়েছে। ইসরাইল হলো সন্ত্রাসীদের লালনকর্তা যার অর্থযোগানদার হচ্ছে তোমাদের ওয়াশিংটনের প্রভুরা। তারা আমাদের অপারেশনের আগেও ঘরবাড়ি ধ্বংস করেছে এবং ইসরাইলের ধ্বংসের পরিমান নিউ ইয়র্কের টাওয়ারের

চেয়ে অনেক আনেক বেশী। তোমাদের এসব যুক্তি দিয়ে তোমরা কাদেরকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করছো?

যদি ওরা বলে যে, ইহুদি এবং আমেরিকানদের উপরে আক্রমনের দ্বারা তোমরা দূর্বল করে ফেলেছো আরব শাসন ব্যবস্থা এবং ক্ষতিগ্রস্থ করছো ওদের অর্থনীতি, ধ্বংস করেছো উন্নয়ন কর্মসূচী, ভয় দিয়ে তাড়িয়েছো বিনিয়োগ ও পর্যটকদেরকে। তাহলে তোমরা বলো যে, হ্যাঁ এবং ঠিক এটাই আমরা চাই। যদি আমরা জানতাম যে ওজোন স্তরের ছিদ্র ওদেরকে দূর্বল করবে, তাহলে আমরা কঠোর পরিশ্রম করতাম এটা বড় করতে। তোমরা নির্বোধ, তোমরা কি মনে করো, আমরা এসব খারাপ আর নষ্ট হয়ে যাওয়া শাসকদের ধ্বংস এবং শেষ করে ফেলা ছাড়া অন্য কোন বিষয় নিয়ে বেশী ব্যস্ত? অর্থনীতি এবং উন্নয়ন আসবে আল্লাহর শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পর।

যদি ওরা বলে যে, ইস্তানবুলে আক্রমনের মাধ্যমে তোমরা তুরস্কের মধ্যমপন্থী মুসলিমদের হতবুদ্ধি করেছো এবং ওদেরকে ঠেলে দিয়েছো আমেরিকান ও ইউরোপিয়ানদের দিকে। তোমরা ওদেরকে বোলো, আমরা তাদেরকে হতবুদ্ধি করতে চাই যারা তাদের নিজেদের ধর্মকে বিক্রি করে, আতাতুর্কের প্রশংসা করে। তারা এই ধর্মনিরপেক্ষতার নামে দীনকে অস্বীকার করে, জিহাদের বদনাম করে এবং সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধের নামে শত্রুদের সাথে হাত মিলায়। সবসময় তুরস্ক কঠোর চেষ্টা চালিয়েছে ইউরোপকে খুশি করতে যাতে তারা ক্রুসেডারদের দলে যোগ দিতে পারে এবং আমেরিকান ও ইহুদীদের সাথে তারা সবসময় ঘনিষ্ট থেকেছে।

যদি ওরা বলে যে, তোমাদের সন্ত্রাসকে ব্যবহার করে আরব শাসনতন্ত্র গুলোর উপর সংস্কার চাপ আসছে। যা নিয়ে যাচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতার দিকে এবং বদলে দিচ্ছে সিলেবাস, বিশ্বায়নের সুবিধার্থে এবং বাড়াচ্ছে ভালবাসা ও ভাতৃত্ব পশ্চিম অবিশ্বসীদের জন্য। তাহলে তোমরা বলো হ্যাঁ, ঐসব শাসনতন্ত্রকে হতুবুদ্ধি করাই আমাদের জিহাদের চূড়ান্ত— লক্ষ্য, আমরা ওদের মিথ্যাকে প্রকাশ করতে চাই এবং ইসলামের পিছনে লুকিয়ে থাকাও শেষ করতে চাই। তারা গোপনে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এবং আবিশ্বসীদের জন্য সবসময় তাদের দরজা খুলে দিয়েছে। তারা পূর্ব ও পশ্চিমের অবিশ্বাসীদের সাথে ঘনিষ্ট হতে এখনো সিলেবাসের সংস্কার চালিয়ে যাচ্ছে। এখন ওরা প্রকাশ্যেই করছে যা এতদিন গোপনে করতো। এবং তারা আমেরিকান প্রভুদেরকে খুশি করতে যুদ্ধ করছে নদার মানুষের বিরুদ্ধে সেই-ঈমান যা জিহাদকে ত্বরানিত

করে। এসব সরকারগুলোকে পরাজিত করা প্রথম ধাপ হচ্ছে ওদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা।

যদি ওরা বলে যে, তোমরাই ঘৃনার আগুন ছড়াতে শুরু করেছো পশ্চিমা এবং মুসলিমদের মধ্যে এবং শুরু করেছো সাংস্কৃতিক যুদ্ধ এবং ওদেরকে সরকারী স্কুলে হিজাব ব্যবহার করা প্রত্যাখান করিয়েছো। তাহলে তোমরা তাদেরকে বলো, হ্যাঁ। এবং মুসলিম ও তার শত্রুদের মধ্যে বন্ধন কেটে ফেলা মুসলিম হিসাবে আমাদের কর্তব্য। স্কুলে হিজাবের ব্যবহার প্রত্যাখান আমাদের মেয়েদের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ যা তাদেরকে কলুষিত সমাজ এবং বাজে শিক্ষাপ্রনালীর নিয়ন্ত্রন থেকে পবিত্র রাখবে।

এটা মুসলিমদেরকে জাগ্রত করবে এবং তাদেরকে সতর্ক করবে ইসলামিক রীতি রেওয়াজের প্রতি ঐসব অবিশ্বসীদের ঘৃণা সম্বন্ধে; যা মুসলিমদের সাহস যোগাতে পারে বিকল্প মুসলিম স্কুল তৈরিতে। হিজাবের বির"দ্ধে যুদ্ধও ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। সাংস্কৃতিক যুদ্ধ শুরু হয়েছে আক্রমনগুলো হওয়ার আরো অনেক আগে থেকে এবং হানটিংটন ও ফুকুয়ামারও আগে । এই যুদ্ধের অস্তিত্ব তখন থেকে যখন থেকে অবিশ্বসী ও মুসলিমদের অস্তিত্ব। সবখানেই মুসলিমদের বিরুদ্ধে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের ক্রুসেড ও হত্যাযজ্ঞ দেখা যায়।

ওদেরকে আরও বলো যে, ওদের সমালোচনা ভুল এবং ভিত্তিহীন এবং তোমাদের প্রভূদের দিয়েই তা ভুল হিসেবে প্রমানিত। ওরা ওদের পরিসংখ্যানের ফল প্রকাশ করেছে, যেখানে দেখা যায় যে, নিউ ইয়র্ক এবং ওয়াশিংটন আক্রমনের পর ইসলামের প্রতি পশ্চিমাদের কৌতুহল বাড়ছে।

আমি শেষ করছি ঐসব পশ্চিমাদের একজনের বিবৃতি দিয়ে। যে বলেছিল যে, মুজাহিদরা বিচক্ষন এবং নিভুর্লভাবে জানে তারা কি করছে। ইংল্যন্ডের ইন্ডিপেনডেন্ট সংবাদপত্রে মধ্যপ্রাচ্য বিশেষজ্ঞ রবার্ট ফিস্কের একটি লেখা ১১/২১/২০০৩ তারিখে প্রকাশ পেয়েছিল। সে বলেছিল যে, "তুরস্কে ব্রিটিশ লক্ষ্যবস্তুগুলোতে আক্রমন হচ্ছে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমেরিকান প্রেসিডেন্টের যোগদানের ফল। সে বলেছিল যে, আমাদেরকে আক্রমনকারীদের মানসিক সক্ষমতার ব্যাপারে পথভ্রষ্ট হওয়া উচিত না; তারা বহির্বিশ্বের ব্যাপারে জ্ঞান রাখতে সক্ষম। তারা নিভুর্লভাবে জানতো তারা কি করছে, যখন তারা বালিতে অস্ট্রেলিয়ানদেরকে আক্রমন করেছিল। তারা জানতো যে, আস্ট্রেলিয়ানরা যুদ্ধের বিপক্ষে এবং অষ্ট্রেলিয়ান প্রধানমন্ত্রীর উপর দোষটা পড়বে এবং ইতালীর ঘটনাও একই রকম। তারা জানতো বুশের ইল্যান্ড সফরের

বিরুদ্ধে বিক্ষোভের কথা। ইংল্যান্ড আক্রমন সহজ ব্যাপার নয় এবং সে কারণেই তুরস্কে ব্রিটিশ লক্ষ্যবস্তুতে তারা আক্রমন চালিয়েছিল। তারা জানতো বুশ ইরাক যুদ্ধের সমর্থন আদায় করতে চায়। এবং সে কারণেই তারা ইরাকে অমেরিকান সশস্ত্রবাহিনীর ঔপর আক্রমন তীব্রতর করেছিল। তারা মনস্থ করেছিল বুশ এবং বে¬য়ারকে (ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী) শারিরিকভাবে সম্ভব না হলেও রাজনৈতিকভাবে ধ্বংস করবে।” এটা হেচ্ছ তোমদের প্রভুদের বিশ্লেষণের একটি নমুনা। যেমনটি আমি আগে বলেছি, মুজাহিদদের দরকার নেই তোমাদের ও তোমাদের প্রভুদের মতামত। তাদের নিজেদের আলেম ব্যক্তিত্ব রয়েছে এবং এক মহান কিতাব তাদেরকে পথ দেখাচ্ছে। তাদের প্রয়োজন নেই মানসিক ভারসাম্যহীন এবং পরাজিতদের দিকনির্দেশনা। আল্লাহ মুজাহিদদের চোখ খুলে দিন এবং তাদেরকে পথ দেখান এবং তাদের শক্রদেরকে তিনি করে দিন অজ্ঞ এবং বোকা। কিভাবে আমরা তাদের মতামত অথবা পরাজিত বিশেষণে কোনোরকম মনোযোগ দিতে পারি?

তাকফিরের শর্ত, প্রতিবন্ধকতা ও কারণ

শাইখ আবু মুহাম্মাদ আসিম আল মাকদিসি হাফিযাহুল্লাহ

আল্লাহ সুবহানাহুতা'লা আমাদের প্রতি এবং আপনার প্রতি রহম করুন! জানা আবশ্যক, এই স্পর্শকাতর শরঈ' হুকুমটির অনেক শর্ত, প্রতিবন্ধক ও কারণ রয়েছে। আপনাকে এগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে, এগুলোর ব্যাপারে সচেতন হতে হবে এবং জানতে হবে।

এর প্রতি লক্ষ্য রাখা, বোঝা ও শেখার ক্ষেত্রে অনেকেই ত্রুটি করেছে। ফলে তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উম্মতের ওপর তাকফিরের তরবারি ও দাঁত এমনভাবে বসিয়ে দিয়েছে, তাতে নেককার, গুনাহগার আর কাফেরের মাঝে কোনো তারতম্য করেনি।

এই স্পর্শকাতর বিষয়টিতে স্পষ্ট দলিলের ওপর থাকার জন্যে আমি এখানে তাকফিরের শর্ত, প্রতিবন্ধক ও কারণসমূহের ব্যাপারে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করছি। আর 'তাকফিরের বিচ্যুতিসমূহ' পরিচ্ছেদে অতিরিক্ত বিবরণ ও উদারহণ আসবে; কারণ সেটাই হলো এর বাস্তব প্রয়োগ ও বিশদ বিবরণের স্থান।

প্রথমত: شروط (শর্তাবলি) :

শরিয়তের পরিভাষায় شرط হলো, যার উপস্থিতি কোনো কিছুর উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিকে আবশ্যক করে না, তবে তার অনুপস্থিতিمشروط (শর্তকৃত বিষয়টি) এর অনুপস্থিতিকে আবশ্যক করে।

অর্থাৎ এভাবে বলি, আমাদের আলোচ্য বিষয়ে শর্ত হচ্ছে যার উপস্থিতির ওপর তাকফিরের হুকুমটির উপস্থিতি নির্ভর করে। ফলে তার উপস্থিতি হুকুমের উপস্থিতিকে আবশ্যক করে না, কিন্তু তার অনুপস্থিতি হুকুমের অনুপস্থিতিকে বা বাতিল হওয়াকে আবশ্যক করে।

উদাহণস্বরূপ, إختيار (স্বাধীনতা) থাকা তাকফিরের একটি শর্ত, যা مانع الإكراه (বলপ্রয়োগ জনিত প্রতিবন্ধকতা) এর বিপরীত। সুতরাং যখন إختيار থাকবে না তখন তাকফিরের বিধানও প্রযোজ্য হবে না। কিন্তু إختيار এর উপস্থিতিই কারও কুফরিতে লিপ্ত হওয়া বা তা গ্রহণ করে নেয়াকে আবশ্যক করে না।

তাকফিরের শর্তাবলি তিনভাগে বিভক্ত :

প্রথম প্রকার: شروط في الفاعل (কর্তার শর্তাবলি) :

১। مكلف তথা প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তিস্ক হওয়া।

২। متعمد قاصد لفعله অর্থাৎ উক্ত কাজের ইচ্ছা থাকা।

৩। مختار له بإرادته অর্থাৎ ইচ্ছায় স্বাধীন হওয়া।

এই প্রকারটির (অর্থাৎ شروط في الفاعل এর) আলোচনা তার বিপরীত موانع তথা প্রতিবন্ধকসমূহের আলোচনায় আসবে। কারণ, موانع হলো شروط এর বিপরীত, যা সামনে আসবে।

দ্বিতীয় প্রকার : شروط في الفعل (কাজের শর্তাবলি), অর্থাৎ যে কাজটি হুকুমের কারণ, তার মধ্যে প্রযোজ্য শর্তাবলি।

এর সবগুলো শর্তের মূলকথা হলো : কাজটি সন্দেহাতীতভাবে কুফরি হওয়া। আর শর্তগুলো হচ্ছে :

১। ব্যক্তির কথা বা কাজটি কুফরের অর্থ বোঝাতে স্পষ্ট হওয়া।

২। উক্ত কথা বা কাজের ফলে যে শরঈ' দলিলটি তাকে কাফের সাব্যস্ত করে, উক্ত দলিলটিও কাফের সাব্যস্ত করতে স্পষ্ট হওয়া।

এই প্রকারটির আলোচনা ও দৃষ্টান্তসমূহ এর শর্তদ্বয়সহ 'তাকফিরের বিচ্যুতিসমূহ' পরিচ্ছেদে মুহতামাল বিষয়সমূহের দ্বারা তাকফির করার আলোচনা প্রসঙ্গে আসবে।

তৃতীয় প্রকার : شروط في إثبات فعل المكلف (ব্যক্তির কাজটি প্রমাণিত হওয়ার জন্য শর্তাবলি)। অর্থাৎ কাজটি বিশুদ্ধ শরঈ' পদ্ধতিতে প্রমাণিত হওয়া; কোনো ধারণা, অনুমান, সন্দেহ বা সংশয় দ্বারা না হওয়া।

আর তা হবে :

১। হয়তো স্বীকারোক্তি দ্বারা।

২। অথবা প্রমাণ, তথা দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা।

'তাকফিরের বিচ্যুতিসমূহ' আলোচনা প্রসঙ্গেও এর আলোচনা আসবে।

দ্বিতীয়ত: موانع (প্রতিবন্ধকসমূহ) :

موانع হলো এমন বাহ্যিক ও সুনির্দিষ্ট গুণ, যার উপস্থিতি হুকুমের অনুপস্থিতিকে আবশ্যক করে অর্থাৎ হুকুমকে বাতিল করে দেয়। তবে এর অনুপস্থিতি হুকুমের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি কোনোটিকেই আবশ্যক করে না। যেমন, বলপ্রয়োগ তাকফিরের একটি প্রতিবন্ধক। সুতরাং তার উপস্থিতি, তথা যদি কাউকে কুফরের ব্যাপারে বলপ্রয়োগ করা হয়, তবে তা কুফরের বিধানটির অনুপস্থিতি বা বাতিল হওয়াকে আবশ্যক করবে। তবে বলপ্রয়োগ না থাকা কোনো হুকুমের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিকে আবশ্যক করে না। অর্থাৎ শরিয়তের আওতাভুক্ত ব্যক্তির

স্বাধীন থাকা বা বলপ্রয়োগাধীন না থাকাই তার কুফরি করা বা না করাকে আবশ্যক করে না; বরং সে কুফরি করতেও পারে, নাও করতে পারে। এ কারণে موانعও শর্তাবলির মতো তিন প্রকার হবে। এগুলো পুরোপুরি শর্তাবলির প্রকারসমূহের বিপরীত :

প্রথম প্রকার : موانع في الفاعل (কর্তার মাঝে প্রতিবন্ধকসমূহ) :

তা হচ্ছে কর্তার এমন عارضي (প্রাসঙ্গিক বা পরিপার্শ্বিক) সমস্যা, যার ফলে কথা ও কাজে তার জবাবদিহিতা থাকে না। এগুলো عوارض الأهلية বা 'যোগ্যতার সমস্যা' বলে পরিচিত। তা দুই প্রকার :

[ক] এমন সমস্যাবলি, যেগুলোকে (سماوية) আসমানি বলা হয়ে থাকে। কারণ তা অর্জনে বান্দার কোনো ভূমিকা থাকে না। যেমন, শিশু হওয়া, পাগল হওয়া, জ্ঞান লোপ পাওয়া, ভুলে যাওয়া ইত্যাদি। অতএব, এ প্রতিবন্ধকসমূহ তার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি থেকে গুনাহ ও শাস্তি উঠিয়ে নেবে। কারণ, এ ব্যাপারে তার ওপর শরিয়তের আদেশই ওঠে গেছে।

তবে বান্দার হকের জন্য তাকে ধরা হবে। যেমন, নষ্ট করে ফেলা জিনিসের মূল্য দিতে হবে, দিয়্যত ওয়াজিব হবে এবং এ ধরনের যে বিধানগুলো আছে, সেগুলো কার্যকর হবে। কারণ, এগুলো হলো প্রাকৃতিক বিধান।

এই প্রতিবন্ধকগুলোর বিপরীত শর্তগুলো হচ্ছে :

১। 'প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া' শর্তটির বিপরীত প্রতিবন্ধক হলো শিশু হওয়া।

২। 'সুস্থ মস্তিষ্ক হওয়া' শর্তটির বিপরীত প্রতিবন্ধক হলো পাগল হওয়া বা জ্ঞান লোপ পাওয়া।

৩। 'ইচ্ছা থাকা' শর্তটির বিপরীত প্রতিবন্ধক হলো ভুলে যাওয়া।

[খ] عوارض مكتسبة (মানবার্জিত প্রতিবন্ধকসমূহ) : যেগুলো অর্জনে বান্দার কিছুটা اختيار বা স্বাধীনতা থাকে। মানবার্জিত প্রতিবন্ধকগুলো হচ্ছে :

(১) الخطأ (ভুল করা) : যেমন মুখ ফসকে বের হয়ে যাওয়া, অর্থাৎ ইচ্ছা না থাকা। ফলে কুফরি কথা বললো, কিন্তু তা তার ইচ্ছায় ছিল না বা কাফের বানিয়ে দেয় এমন কথা বা কাজ সে করতে চায়নি, বরং তার ইচ্ছা ছিল ভিন্ন। এই প্রতিবন্ধকটি বাতিল হয়ে যাবে তার বিপরীত ইচ্ছার শর্তটি পাওয়া গেলে। তার দলিল হলো, আল্লাহ সুবহানাহুতা'লার বাণী –

وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ، ولكن ما تعمدت قلوبكم

"তোমাদের দ্বারা কোনো ভুল হয়ে গেলে সেজন্য তোমাদের কোনো গুনাহ হবে না। কিন্তু তোমরা কোনো কাজ অন্তর দিয়ে জেনে-বুঝে করলে (তাতে তোমাদের গুনাহ হবে)।" (আহযাব-৫০)

ঐ ব্যক্তির ঘটনাও আরেকটি প্রমাণ—এক ব্যক্তি মরুভূমিতে তার সওয়ারি হারিয়ে ফেলে, তারপর যখন তা পায়, তখন আনন্দের আতিশয্যে ভুলবশত বলে ফেলে, 'হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা আমি তোমার মনিব'। ঘটনাটি রাসুল ﷺ বলেছেন।

এই প্রতিবন্ধকটির মতোই আরেকটি হলো, অন্যের কাছ থেকে বর্ণনা করতে কুফরি কথা বলা। যেমন আল্লাহ সুবহানাহুতা'লা তার কিতাবে কাফেরদের যে সমস্ত কথাবার্তা বর্ণনা করেছেন কেউ তা পাঠ করলো। যেহেতু আল্লাহই তার কিতাব তিলাওয়াত করার আদেশ করেছেন তাই তার পাঠকারীকে নিঃসন্দেহে তাকফির করা হবে না; বরং সে সওয়াব পাবে। অনুরূপভাবে সাক্ষী ব্যক্তি, যে কুফরি কথা শুনেছে। তার জন্য উক্ত কথা কাজি বা অন্য কারও কাছে বর্ণনা করা। অনুরূপ কাফেরদের কথাবার্তা বর্ণনা করা, তার বিভ্রান্তি বর্ণনা করার জন্য বা তার জবাব দেওয়ার জন্য। এ সবগুলো জায়েয, বরং ওয়াজিব। এর কারণে তার বক্তাকে কাফের বলা যাবে না। এ কারণেই বলা হয়ে থাকে, কুফর বর্ণনাকারী কাফের নয়। কিন্তু এর ব্যতিক্রম হলো, যারা তাকে ভাল মনে করে ও সমর্থন করে তার প্রচার-প্রসারের উদ্দেশ্যে তা বর্ণনা করে; এটা নিঃসন্দেহে কুফর। আর এ সমস্ত অবস্থা চিহ্নিতকরণে অবস্থার লক্ষণসমূহের ভূমিকা রয়েছে।

কাজী ইয়াজ (রহঃ) বলেন, "কারও এমন কথা অন্যের কাছ থেকে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তার বর্ণনা ভঙ্গি লক্ষ করা হবে। আর বর্ণনা ভঙ্গির অবস্থাভেদে এর হুকুম চার ধরনের হবে: কখনো তা বর্ণনা করা ওয়াজিব হবে, কখনো মানদূব হবে, কখনো মাকরূহ হবে আবার কখনো হারাম হবে।"

(আশ শিফা ২/৯৯৭-১০০৩)

দৃষ্টি আকর্ষণ:

এ আলোচনা থেকে বুঝতে পেরেছেন, 'ইচ্ছা না থাকা' বলে সেই প্রতিবন্ধক বুঝানো হয় না, যেটাকে বর্তমান যামানার অনেক মুরজিয়ারা শর্ত করে থাকে এবং যা তাকফিরের অসম্ভব শর্তের মতো। তারা এর দ্বারা তাগুতগোষ্ঠী, যিন্দীক ও মুরতাদদের পক্ষে অজুহাত দাঁড় করানোর চেষ্টা করে। তারা দাবি করে থাকে, কোনো মানুষ যদি কুফরি কথা বা কাজ

ইচ্ছাকৃতও করে, তথাপি তাকে ততক্ষণ তাকফির করা যাবে না, যতক্ষণ সে এর দ্বারা দ্বীন থেকে বের হওয়া ও কুফরি করার ইচ্ছা না করে। এখানে ‘ইচ্ছা না থাকা’ প্রতিবন্ধকটির দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ভুল করা, যা ইচ্ছার বিপরীত এবং যা তাকফিরের শর্ত। অথবা কারও কুফরি কথা বলা বা কাজ করার ইচ্ছা না থাকা, বরং তার অন্যকিছু উদ্দেশ্য থাকা। যেমন, কুফরি কথা বর্ণনা করলো, অথবা তা থেকে সতর্ক করলো, অথবা অর্থ না বুঝে কুফরি কথা বললো, অথবা এ জাতীয় ভুল করলো, যেমনটা আগে আলোচিত হয়েছে।

পক্ষান্তরে দ্বীন থেকে বের হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করা বা উক্ত কথা বা কাজের মাধ্যমে কুফরি করার ইচ্ছা করা, এটা তো কম লোকই ইচ্ছা করে বা স্পষ্টভাবে বলে। এমনকি ইহুদি ও খৃষ্টানদেরও যদি জিজ্ঞেস করা হয়, তারা যে ঈসাকে আল্লাহর পুত্র বলে, বা ওযায়েরকে আল্লাহর পুত্র বলে, বা এ জাতীয় অন্যান্য কুফরিগুলো করে, এর দ্বারা কি তারা কুফরি করার ইচ্ছা করে? তাহলে তারা তা অস্বীকার করবে এবং এর মাধ্যমে কুফরি করার কথা নাকচ করে দেবে।

যেমন, শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) আস সারিমিল মাসলুল কিতাবে ১৭৭-১৭৮ নং পৃষ্ঠায় বলেন, “মোটকথা, যে কোনো কুফরি কথা বলে, বা কুফরি কাজ করে, এর কারণে তাকে কাফের আখ্যা দেওয়া হবে। যদিও এতে সে কাফের হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা না করে। কেননা কেউই কুফরি করার ইচ্ছা করে না, একমাত্র আল্লাহ ব্যতিক্রম যা চান।”

এখানে সারকথা হলো, ইচ্ছা থাকার শর্ত করা ও ইচ্ছা না থাকাকে প্রতিবন্ধক মনে করার ক্ষেত্র শুধু কুফরি কাজটির ইচ্ছা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ; কাজটির মাধ্যমে আলাদা করে কুফরের ইচ্ছা করা জরুরি নয়।

(২) التأويل (ব্যাখ্যা করা):

এখানে ব্যাখ্যা করা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, শরঈ’ কোনো দলিলকে অনুপযুক্ত জায়গায় প্রয়োগ করা, কোনো ইজতিহাদ তথা অনুসন্ধান ও গবেষণার মাধ্যমে, অথবা শরঈ’ বর্ণনা না বুঝা থেকে সৃষ্ট সংশয়ের কারণে, অথবা শরঈ’ বর্ণনা ভুল বুঝে সেটাকে সঠিক মনে করার কারণে, অথবা যা দলিল নয় তাকে দলিল বোঝার কারণে। যেমন দুর্বল হাদিসকে সহিহ মনে করে তা দিয়ে দলিল পেশ করা। ফলে একজন শরঈ’ দায়িত্বশীল ব্যক্তি কোনো কুফরি কাজে লিপ্ত হয়, কিন্তু সে সেটাকে কুফরি বলে মনে করত না। এর ফলে ‘ইচ্ছা থাকা’ শর্তটি পাওয়া যাবে না। ফলে ব্যাখ্যার এই ভুলটি তাকফিরের জন্য একটি প্রতিবন্ধক হয়ে যাবে।

সুতরাং, যদি তার কাছে প্রমাণ উপস্থাপন করা হয় এবং তার ভুল স্পষ্ট করে দেওয়া হয় এবং এরপরও সে নিজ কর্মে অনড় থাকে, তখন তাকে তাকফির করা হবে।

এর দলিল হলো, এই ধরনের ব্যাখ্যাকে ঐ সব ভুলের অন্তর্ভুক্ত ধরার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন, যেগুলো আল্লাহ সুবহানাহুতা'লা ক্ষমা করে দিয়েছেন, যা পূর্বোক্ত দলিলাদির মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। তাদের ইজমার ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল কুদামা ইবনে মাজউনের ঘটনার প্রেক্ষিতে, যখন তিনি নিম্নোক্ত আয়াত দিয়ে দলিল পেশ করে তার সাথীদের নিয়ে মদ পান করেছিলেন :

ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين

"যারা ইমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তারা পূর্বে যা – কিছু খেয়েছে তার কারণে তাদের কোনোও গুনাহ নেই- যদি তারা আগামীতে তা হতে বেঁচে থাকে, ইমান রাখে ও সৎকর্মে রত থাকে এবং (আগামীতে যেসব জিনিস নিষেধ করা হয় তা থেকে) বেঁচে থাকে ও ঈমানে প্রতিষ্ঠিত থাকে আর তারপরে তাকওয়া ও ইহসান অবলম্বন করে। আল্লাহ ইহসান অবলম্বনকারীদের ভালবাসেন।" (মায়িদাহ: ৯৩)

ঘটনাটি আব্দুর রাজ্জাক তার মুসান্নাফে বর্ণনা করেছেন,

কুদামা (রাঃ)-কে হযরত উমার (রাঃ) বাহরাইনের গভর্নর বানিয়েছিলেন। এরপর যখন তার বিরুদ্ধে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ও অন্যান্যরা সাক্ষ্য দেন এবং তাঁদের সাথে তাঁর স্ত্রীও সাক্ষ্য দেন যে, তিনি মদ পান করেছেন, তখন উমার (রাঃ) তাঁকে ডেকে এনে পদচ্যুত করেন। তারপর তাঁর ওপর হদ প্রয়োগ করতে উদ্যত হলে কুদামা (রাঃ) উল্লেখিত আয়াত দিয়ে দলিল পেশ করেন। তখন উমার (রাঃ) বলেন, তুমি ব্যাখ্যায় ভুল করেছ। তোমার নিতম্ব গর্ত অনুসন্ধানে ভুল করেছে।...

ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) আস সারিমিল মাসলুল কিতাবে বলেন,

"অবশেষে তার সিদ্ধান্ত ও পরামর্শ পরিষদের সিদ্ধান্ত এ ব্যাপারে ঐক্যমত হলো যে, তাঁর ও তাঁর সাথীদের কাছ থেকে তাওবা চাওয়া হবে, যদি তারা একে হারাম বলে স্বীকার করে নেয়, তাহলে তাদের দুররাহ মারা হবে, আর যদি হারাম বলে স্বীকার না করে, তবে তাদের কাফের সাব্যস্ত করা হবে।" (পৃ: ৫০৩)

তারপর উমার (রাঃ) তাঁর ভুলটি বুঝিয়ে দিয়ে বলেন: তুমি যদি আল্লাহকে ভয় করতে, তবে যা তোমার ওপর হারাম করা হয়েছে তা থেকে বেঁচে থাকতে। মদ পান করতে না..। এতে হযরত

কুদামা (রাঃ) পূর্ব মত থেকে ফিরে আসলেন, আর উমার (রাঃ)-ও তাঁকে কাফের সাব্যস্ত করলেন না, বরং তাঁর ওপর মদ পানের শাস্তি প্রয়োগ করেই ক্ষান্ত হলেন। আর এ ব্যাপারে কোনো সাহাবিও তাঁর বিরোধিতা করলেন না।

উলামায়ে কেরাম এই ব্যাপারে স্পষ্ট বিবরণ পেশ করেছেন যে, কোনো শরঈ' দলিল ছাড়া কোনো শব্দকে তার বাহ্যিক অর্থ থেকে ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করা, এটা কোনো বৈধ ব্যাখ্যা নয়। কারণ এভাবে করেই পরবর্তীকালের লোকেরা শরঈ' বিবরণসমূহের ওপর নিজেদের মনগড়া কর্তৃত্ব চর্চা করেছিল, আর বলেছিল, আমরা তো ব্যাখ্যা করছি। মানুষের কাছে সাজিয়ে তোলার জন্য তারা বিকৃতিকে ব্যাখ্যা বলে নাম দিয়েছিল, যাতে মানুষ তা গ্রহণ করে। আর যারা মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য ভ্রান্ত বিষয়কে সাজিয়ে ও প্রলেপ দিয়ে মানুষের সামনে উপস্থাপন করে, তাদের নিন্দা করে আল্লাহ সুবহানাহুতা'লা বলেন,

وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا

"এবং (তারা যেমন আমার নবির সাথে শত্রুতা করেছে) এভাবেই আমি (পূর্ববর্তী) প্রত্যেক নবির জন্য কোনোও না কোনো শত্রুর জন্ম দিয়েছি অর্থাৎ মানব ও জিনদের মধ্য থেকে শয়তান কিসিমের লোকদেরকে, যারা ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে একে অপরকে বড় চমৎকার কথা শেখাত।" (আনআম: ১১২)

(৩) مانع الجهل (অজ্ঞতাজনিত প্রতিবন্ধক): এটা তখনই ওযর বা প্রতিবন্ধক হিসাবে গণ্য হবে যখন তা এমন অজ্ঞতা হবে, যা একজন মুকাল্লাফ (বিধানাবলির আওতাধীন ব্যক্তি) দূর করতে সক্ষম না।

কিন্তু যদি অজ্ঞতা এমন হয় যে, একজন ব্যক্তি তা দূর করতে সক্ষম, কিন্তু সে শৈথিল্য ও বিমুখতাবশত অজ্ঞতা দূর করলো না, তাহলে এটা নিজের অর্জিত অজ্ঞতা, যা ওযর হিসাবে গৃহীত নয়। শরঈ'ভাবে তাকে এ ব্যাপারে জ্ঞাত বলেই ধরা হবে, যদিও বাস্তবে সে জ্ঞাত নয়। কারণ এটাই তো আল্লাহর দ্বীন থেকে বিমুখতা অবলম্বনকারীর অবস্থা, অর্থাৎ যার কাছে ভীতি প্রদর্শনকারী আল্লাহর কিতাব পৌঁছেছে কিন্তু সে তা শেখা ও এর ব্যাপারে চিন্তা করা থেকে বিমুখ থেকেছে। সে-ই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বোঝার ব্যাপারে অবহেলা করেছে, যার জন্য আল্লাহ সুবহানাহুতা'লা সমস্ত সৃষ্টিজীবকে সৃষ্টি করলেন...। আল্লাহ সুবহানাহুতা'লা বলেন,

فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة

"তাদের কী হলো, তারা উপদেশবাণী থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে? যেন তারা বন্য গাধা, যা কোনো সিংহের ভয়ে পলায়ন করছে।" (মুদ্দাস্‌সির: ৪৯-৫১)

আল্লাহ সুবহানাহু অন্যত্র বলেন,

وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ

... বলে দিন, আল্লাহই আমার এবং তোমাদের মধ্যে সাক্ষী। আমার প্রতি ওহীরূপে এই কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যাতে এর মাধ্যমে আমি তোমাদেরও সতর্ক করি এবং যাদের কাছে এই কুরআন পৌঁছবে তাদেরও।” (আনআম: ১৯)

এ কারণেই উলামায়ে কেরাম তাদের শরঈ’ মূলনীতিসমূহের আলোচনায় এ ব্যাপারে স্পষ্ট বিবরণ পেশ করেছেন। যেমন, ইমাম করাফি (মৃত্যু: ৬৮৪ হি:) বলেছেন,

‘যে অজ্ঞতা মুকাল্লাফের (বিধানাবলির আওতাধীন ব্যক্তির) পক্ষে দূর করা সম্ভব, তা অজ্ঞ ব্যক্তির জন্য ওযর হিসাবে গৃহীত হবে না’। (দেখুন, আলফুরুক ৪/২৬৪ পৃষ্ঠা। এছাড়া ২/১৪৯-১৫১ পৃষ্ঠাও দেখুন)

বস্তুত: ঐ সব লোকের ক্ষেত্রেই অজ্ঞতাকে প্রতিবন্ধক হিসাবে ধরা হবে, ওযর বলে গ্রহণ করা হবে, যাদের মাঝে মূল তাওহিদের বিশ্বাস বিদ্যমান; শুধু এমন কিছু মাসআলার ব্যাপারে অস্পষ্টতা রয়েছে, যেগুলো কখনো অস্পষ্ট বা কঠিন হতে পারে, অথবা যেগুলোর সংজ্ঞা ও বিবরণের প্রয়োজন হয়। এ ধরনের মাসআলাসমূহের মধ্যে রয়েছে আল্লাহর নাম ও গুণাবলির মাসআলা। তাওহিদে বিশ্বাস স্থাপনকারী কোনো ব্যক্তি যদি এ ক্ষেত্রে ভুলের স্বীকার হয়, তাহলে তার ওযর গ্রহণ করার ব্যাপারে শরঈ’ দলিল রয়েছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তার কাছে সংজ্ঞা ও বিবরণ উল্লেখ করার মাধ্যমে দলিল স্পষ্ট করা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে তাকফির না করার ব্যাপারেও শরঈ’ দলিল রয়েছে।

নতুন ইসলাম গ্রহণকারী অথবা যে এমন দূর পল্লিতে প্রতিপালিত হয়েছে, যেখানে শরিয়তের বিস্তারিত বিবরণসমূহ পৌঁছা কষ্টকর, তাদের ওযর গ্রহণ করার বিষয়টিও এরই অন্তর্ভুক্ত। যে বিষয়ে তারা জনে না সে বিষয়ে তাদের ওযরও গ্রহণ করা হবে, যদি তারা তাওহিদে বিশ্বাসী হয় এবং বড় শিরক ও সমকক্ষ সাব্যস্ত করা থেকে বিরত থাকে।

(৪) مانع الإكراه (বলপ্রয়োগ-জনিত প্রতিবন্ধক):

এর বিপরীত শর্তটি হলো, مكلف তথা শরঈ’ দায়িত্বশীল ব্যক্তি স্বীয় কর্মে স্বাধীন হওয়া। এই প্রতিবন্ধকটির প্রমাণ মেলে আল্লাহর এই বাণীতে-

من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان

“যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ইমান আনার পর তাঁর কুফরিতে লিপ্ত হয়, অবশ্য সে নয়, যাকে কুফরির জন্য বাধ্য করা হয়েছে, কিন্তু তার অন্তর ঈমানে স্থির রয়েছে।” (নাহল: ১০৬)

উলামায়ে কেরাম বলপ্রয়োগ-জনিত প্রতিবন্ধকটি বিশুদ্ধভাবে সাব্যস্ত হওয়ার জন্য কতগুলো শর্ত উল্লেখ করেছেন,

১। এক বলপ্রয়োগকারী ব্যক্তি যে বিষয়ের হুমকি দিচ্ছে তা বাস্তবিকই কার্যকর করার ক্ষমতা রাখা, আর যাকে বলপ্রয়োগ করা হয়েছে সে তা থেকে আত্মরক্ষা করতে অক্ষম হওয়া, এমনকি পলায়ন করতেও সক্ষম না হওয়া।

২। বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তির প্রবল ধারণা হওয়া যে, সে অমত করলে তার ওপর উক্ত শাস্তিটি কার্যকর করে ফেলবে।

৩। বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তির মাঝে ব্যক্তিগত অবাধ্যতার কোনো নিদর্শন পাওয়া না যাওয়া। উদাহণত: যতটুকু দ্বারা বিপদ দূর করা সম্ভব সে নিজ থেকে তার বেশি কুফরি কথা বললো বা কুফরি কাজ করলো।

উলামায়ে কেরাম এ শর্তও করেছেন যে, কুফরি কথা উচ্চারণের জন্য যে শাস্তির হুমকি দেওয়া হচ্ছে তা এমন হতে হবে, যা সহ্য করার ক্ষমতা মানুষের নেই। উলামায়ে কেরাম এর উদাহরণ দিয়েছেন, যেমন, ভীষণ নির্যাতন করা, অঙ্গ কেটে ফেলা, আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া, হত্যা করা বা এই জাতীয় শাস্তি।

এর কারণ হচ্ছে, যার উসিলায় বলপ্রয়োগকৃতদের ওযর গ্রহণ করা সংক্রান্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে—হযরত আম্মার (রাঃ)—তিনি তখনই কুফরি কথা বলেছিলেন, যখন তার পিতামাতাকে হত্যা করা হয়েছিল, তাঁর পাজর ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল, আল্লাহর পথে ভীষণ শাস্তি দেওয়া হয়েছিল।

তারা আরো শর্ত করেছেন যে, বলপ্রয়োগ অব্যাহতির পর তার ইসলাম প্রকাশ করতে হবে। যদি তখন ইসলাম প্রকাশ করে তাহলে সে ইসলামরে ওপর অটল থাকবে, আর যদি কুফরি প্রকাশ করে তবে যে সময় সে কুফরি কথা উচ্চারণ করেছে সে সময় থেকেই তার ব্যাপারে কুফরের হুকুম দেওয়া হবে। এর সাথে দৃষ্টি আকর্ষণ করা সঙ্গত মনে করছি যে, উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে স্পষ্ট বর্ণনা পেশ করেছেন, যার ব্যাপারে এই প্রমাণ উপস্থিত হবে যে, সে কুফরি কথা উচ্চারণ করেছে, আর তখন সে কাফেরদের কাছে আটকা ছিল, ভয় ও শংকার মাঝে তাদের কাছে বন্দী ছিল, এমন ব্যক্তির ব্যাপারে কুফরের হুকুম আরোপ করা হবে না।

কেননা যতক্ষণ সে তাদের কর্তৃত্বাধীন বন্দী বা আটক ছিল, ততক্ষণ তার ব্যাপারে বলপ্রয়োগের ধারণা করা যায় এবং তখন কাফেররাও তার ওপর যা ইচ্ছা শাস্তি কার্যকর করতে পারত।

আর যদি এই সাক্ষ্য পাওয়া যায় যে, সে তা উচ্চারণ করার সময় নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন ছিল, তাহলে তার ওপর কুফরের হুকুম আরোপ করা হবে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়োজন, উলামায়ে কেরাম যে প্রকার বলপ্রয়োগের ব্যাপারে আলোচনা করেন—বলপ্রয়োগের কারণে কুফরি কথা বলে বা কুফরি কাজ করে আবার পুনরায় ইসলামে ফিরে আসা, যেমনটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে। পক্ষান্তরে কুফরের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা ও তাতে সবসময় বহাল থাকার ব্যাপারে বলপ্রয়োগ করা হলে, সেটাকে উলামায়ে কেরাম ধর্তব্য করেন না এবং তার অমুমোদনও দেন না। তাঁরা এই প্রতিষ্ঠিত থাকার মাঝে আর বলপ্রয়োগের গ্রহণযোগ্য ওযরের স্থানগুলোর মাঝে পার্থক্য করেন।

যেমন, ইমাম আসরাম (রহঃ) আবু আব্দুল্লাহ তথা ইমাম আহমাদ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন,

"তাকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাস করা হলো, যাকে বন্দী করে তার সামনে কুফর পেশ করা হয়েছে, তাতে বাধ্য করা হয়েছে, তার কি ধর্ম ত্যাগ করার অনুমতি আছে? তিনি এটাকে খুব কঠিনভাবে অপছন্দ করলেন। তিনি বললেন, 'আমার কাছে এদের অবস্থা ঐ সমস্ত সাহাবাদের অবস্থার মত মনে হয় না, যাদের ব্যাপারে আয়াত নাযিল হয়েছে। তাদেরকে কুফরি কথা বলতে বাধ্য করা হত, তারপর ছেড়ে দেওয়া হত, তারা যা ইচ্ছা করতে পারতেন। কিন্তু এরা তো তাদেরকে কুফরির ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখতে এবং স্বীয় দ্বীন পরিত্যাগ করতে বাধ্য করছে। এ দুটো এক নয়। কারণ যাদের কুফরি কথা উচ্চারণের জন্য বাধ্য করা হয়, তারপর ছেড়ে দেওয়া হয়, তাদের তো এতে কোনো ক্ষতি নেই। আর এই ব্যক্তি, যে তাদের মাঝে অবস্থানরত, সে তো স্থায়ী কুফরকে গ্রহণ করা, হারামসমূহকে হালাল করা, ফরজ ও ওয়াজিবসমূহকে বর্জন করা এবং অন্যায় ও নিষিদ্ধ কাজসমূহে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে তাদের আহ্বানগুলোকে গ্রহণ করে নিচ্ছে। সে যদি নারী হয়, তাহলে তারা তাকে বিয়ে করবে, তার থেকে তাদের কাফের বাচ্চা জন্ম দেবে। এমনিভাবে পুরুষ হলেও। তাদের বাহ্যিক অবস্থা এটাই যে, তারা প্রকৃত কুফর গ্রহণ করে নিয়েছে এবং সরল দ্বীন থেকে সরে গিয়েছে।' "

(আল-মুগনি, মুরতাদ অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: 'যাকে কুফরি কথা উচ্চারণ করতে বাধ্য করা হয়েছে তার জন্য উত্তম হলো অটল থেকে তা না বলা'...)

দ্বিতীয় প্রকার প্রতিবন্ধকসমূহ: موانع في الفعل

অর্থাৎ, যে কাজের কারণে তাকফির করা হয় উক্ত কাজের মধ্যে প্রতিবন্ধকসমূহঃ

১। কথা বা কাজটি কুফরের অর্থ বুঝাতে স্পষ্ট না হওয়া।

২। উক্ত কথা বা কাজটিকে কুফর প্রমাণ করতে যে শরঈ' দলিলটি পেশ করা হয়েছে সে দলিলটি উক্ত কথা বা কাজটিকে কুফর বোঝাতে অকাট্য না হওয়া।

তাকফিরের বিচ্যুতিসমূহ শিরোনামের অধীনে ষষ্ঠ ও সপ্তম ভুলের মাঝে এ ব্যাপারে আলোচনা আসবে ইন-শা-আল্লাহ।

তৃতীয় প্রকার: موانع في الثبوت (প্রমাণিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকসমূহ):

এটা হচ্ছে প্রতিবন্ধকসমূহের বিচারিক দিক। এক্ষেত্রে যদি তার মাঝে কুফরের অবশ্য ফলাফলগুলো ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পেতে থাকে, যেমন মুসলমানদের রক্ত ও সম্পদ নিজের জন্য বৈধ করে নেয়, তাহলে এ ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া হবে এবং কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

এই প্রতিবন্ধকটি হচ্ছে এমন, অভিযুক্ত ব্যক্তির ওপর কুফরটি শরঈ'ভাবে প্রমাণিত হলো না। অর্থাৎ তার নিজের স্বীকারোক্তি বা ন্যায়পরায়ণ দুজন ব্যক্তির সাক্ষ্য, এর কোনোটাই হলো না। অথবা সাক্ষীদের কেউ পাগল হওয়ার কারণে বা শিশু হওয়ার কারণে বা অন্য কোনো কারণে এ ব্যাপারে অগ্রহণযোগ্য। অথবা এমন হলো যে, সাক্ষী অভিযুক্ত ব্যক্তির শত্রু, অথবা সাক্ষীর ন্যায়পরায়ণতা প্রশ্নবিদ্ধ, আর অভিযুক্ত ব্যক্তিও তার অভিযোগ অস্বীকার করে এবং কসম করে তার কথা প্রত্যাখ্যান করে।

তাকফিরের প্রতিবন্ধকগুলো প্রসঙ্গে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়

(জ্ঞাতব্য : ১) তাকফিরের প্রতিবন্ধকগুলো বর্ণনা করা ওয়াজিব হচ্ছে, مقدورعليه তথা কর্তৃত্বাধীনের ক্ষেত্রে; ممتنع অর্থাৎ প্রতিরোধ বা যুদ্ধ পরিচালনাকারীর ক্ষেত্রে তা ওয়াজিব নয়:

পূর্বোক্ত আলোচনার পর যে বিষয়টি আপনাদেরকে জানতে হবে, তা হচ্ছে এই যে, এই প্রতিবন্ধকগুলো বর্ণনা করা কেবল কর্তৃত্বাধীনের কাছেই ওয়াজিব; প্রতিরোধকারীর কাছে তা বর্ণনা করা ওয়াজিব নয়।

الامتناع তথা প্রতিরোধ করার দুইটি অর্থঃ

১) পূর্ণ শরিয়ত বা আংশিক শরিয়ত পালন করতে অস্বীকার করা।

২) মুসলমানদের ক্ষমতাবলয় থেকে নিজেকে নিরাপদ করে নেওয়া, যাতে মুসলমানরা তাকে আল্লাহর শরিয়তের সম্মুখীন করতে না পারে।

উল্লেখ্য, উভয় প্রকারের মাঝে সমন্বয় আবশ্যক নয়। কখনো হতে পারে, কেউ শরিয়ত পালন করতে অস্বীকার করেছে, কিন্তু সে ইসলামি রাষ্ট্রে মুসলমানদের ক্ষমতাধীন রয়েছে। যেমন,

কোনো একজন ব্যক্তি যাকাত অস্বীকার করলো এবং সে মুসলমানদের ক্ষমতাধীন ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাস করছে। কখনো উভয়টি একসাথেও হতে পারে। যেমন, শরিয়ত পালনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী ব্যক্তি দারুল কুফরের মাধ্যমে আত্মরক্ষা করলো, অথবা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, সেনাবাহিনী বা আইন-কানুনের মাধ্যমে প্রতিরোধ গড়ে তুললো। যার ফলে মুসলমানেরা তাকে আল্লাহর হুকুমের সামনে উপস্থিত করতে এবং তার উপর আল্লাহর শাস্তি বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হচ্ছে না।

মুসলমানদের ক্ষমতাবলয় থেকে নিরাপত্তা অবলম্বনকারী কখনো হাত দ্বারা যুদ্ধ করতে পারে, কখনো বা জবান দ্বারাও যুদ্ধ করতে পারে। (দেখুন আস সারিমুল মাসলুল, পৃ:৩৮৮)

উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে স্পষ্ট বলেছেন যে, মুসলমানদের ক্ষমতা বলয় থেকে নিরাপত্তা ও আত্মরক্ষা অবলম্বনকারী থেকে তওবা চাওয়া ওয়াজিব নয়। সুতরাং যে আগ্রাসী মুসলমানদের দেশসমূহে আক্রমণ করে তা দখল করে নেয় এবং শাসনের চাবিকাঠি হাতে নিয়ে নেয়, তার থেকে তো কিছুতেই তওবা চাওয়া হবে না।

এখানে তওবা চাওয়ার দুটি অর্থ:

১) যার ওপর ধর্ম ত্যাগের বিধান আরোপ করা হয়েছে তার কাছ থেকে তওবা চাওয়া।

২) কারও ওপর ধর্ম ত্যাগের বিধান আরোপের আগে তার কাছে তাকফিরের শর্তাবলি ও তার প্রতিবন্ধকসমূহ বর্ণনা করা। আর এই প্রকারটির ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

(জ্ঞাতব্য: ২) এমন কতগুলো অজুহাত, যেগুলোকে মুরতাদরাসহ অন্যান্যরা ওযর হিসাবে পেশ করে থাকে, অথচ সেগুলো তাকফিরের প্রতিবন্ধক বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত নয়:

১। কারও বেতন-ভাতা বন্ধ করে দেওয়া, চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া, দুনিয়াবি কোনো সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা, দুনিয়ার সামান্য স্বার্থ বন্ধ করে দেওয়া ও এ জাতীয় যেসব বিষয়গুলোর মাধ্যমে হুমকি দেওয়া হয়ে থাকে, তার আশঙ্কা। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন,

ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله

“মানুষের মধ্যে কতক লোক এমন আছে, যারা বলে, আমরা আল্লাহর প্রতি ইমান এনেছি। তারপর যখন আল্লাহর পথে তাদের কোনো কষ্ট-ক্লেশ দেখা দেয়, তখন তারা মানুষের দেওয়া কষ্টকে আল্লাহর আযাব তুল্য গণ্য করে।” (আনকাবুত: ১০)

আল্লাহ সুবহানাহুতা’লা অন্যত্র বলেন,

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين * فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين * ويقول الذين أمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين * يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه

“হে মুমিনগণ! ইয়াহুদি ও খৃষ্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা নিজেরাই একে অন্যের বন্ধু! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদেরকে বন্ধু বানাবে, সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিমদেরকে হিদায়াত দান করেন না।

সুতরাং যাদের অন্তরে (মুনাফেকির) ব্যাধি আছে, তুমি তাদেরকে দেখতে পাচ্ছ যে, তারা অতি দ্রুত তাদের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। তারা বলছে, আমাদের আশঙ্কা হয়, আমরা কোনো মুসিবতের পাকে পড়ে যাব। (কিন্তু) এটা দূরে নয় যে, আল্লাহ মুসলিমদের বিজয় দান করবেন অথবা নিজের পক্ষ হতে অন্য কিছু ঘটাবেন, ফলে তখন তারা নিজেদের অন্তরে যা গোপন রেখেছিল, তজ্জন্য অনুতপ্ত হবে।

এবং (তখন) মুমিনগণ (পরস্পরে) বলবে, এরাই কি তারা, যারা জোরদারভাবে কসম করে বলত যে, তারা অবশ্যই তোমাদের সাথে। তাদের কর্ম নিস্ফল হয়ে গেছে এবং তারা অকৃতকার্য হয়েছে।

হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্য হতে কেউ যদি নিজ দ্বীন থেকে ফিরে যায়...।” (মায়িদাহ: ৫১-৫৪)

সুতরাং এই সব আয়াতসমূহে ঐ সব লোকদের ধর্ম ত্যাগের কথা বলা হয়েছে, যারা শুধু ভয়ের কারণে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছে এবং এ কথাও স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে যে, তাদের সব কর্ম বিনষ্ট হয়ে গেছে। আর এটা একমাত্র কুফরের কারণেই হতে পারে।

২। এ কারণে এটাও তাকফিরের কোনো প্রতিবন্ধক নয় যে, মুরতাদরা ও তাদের সহযোগীরা অসহায়ত্বের ওযর পেশ করে এবং এই ওযর পেশ করে যে, শাসকদের কারণে তাদের কিছু করার নেই।

কেননা তাদের যদি বাস্তবে গ্রহণযোগ্য ওযর থেকেও থাকে, তথাপি তা তো তাদের শিরক ও কুফরের সাহায্য করা এবং তার অনুসারীদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাহায্য করার অনুমোদন দেয় না। কেননা কেউ তো তাদের এই কাজটিতে বাধ্য করে না, কেউ তাদের ঐ সব পদের দায়িত্ব নিতেও বাধ্য করে না, যাতে এ ধরনের কুফরিসমূহ রয়েছে। বরং তারাই তা অর্জনের

জন্য মৃত্যুর ঝুঁকিও নিতে চায় এবং তা লাভের জন্য বিভিন্ন সুপারিশ ও মাধ্যম তালাশ করতে থাকে।

অতএব বুঝা গেল, আল্লাহ সুবহানাহুতা’লা, অসহায় হওয়ার দলিল দিয়ে কাফেরদের কুফর ও শিরকের অনুসরণকারীদের ওযর গ্রহণ করেননি, যা অনেক আয়াতে স্পষ্ট। যেমন আল্লাহ তা’আলা বলেন,

وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعاً فهل انتم مغنون عنا نصيباً من النار * قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد

“এবং সেই সময়কে স্মরণ রাখ, যখন তারা জাহান্নামে একে অন্যের সঙ্গে ঝগড়া করবে। সুতরাং (দুনিয়ায়) যে ছিল দুর্বল, সে আত্মগর্বীদের বলবে, আমরা তো তোমাদের অনুগামী ছিলাম। তা তোমরা কি আমাদের পরিবর্তে আগুনের কিছু অংশ গ্রহণ করবে?

যারা আত্মগর্বী ছিল তারা বলবে, আমরা সকলেই জাহান্নামে আছি। আল্লাহ বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করে ফেলেছেন।” (গাফির: ৪৭-৪৮)

অন্যত্র বলেন,

ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين * وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا ، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون

“তুমি যদি সেই সময়ের দৃশ্য দেখতে, যখন জালিমদেরকে তাদের প্রতিপালকের সামনে দাঁড় করানো হবে আর তারা একে অন্যের কথা রদ করবে। দুনিয়ায় যাদেরকে দুর্বল মনে করা হয়েছিল, তারা ক্ষমতা-দর্পীদের বলবে, তোমরা না হলে আমরা অবশ্যই মুমিন হয়ে যেতাম।

যারা ক্ষমতাদর্পী ছিল তারা, যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তাদের বলবে, হিদায়াত তোমাদের কাছে এসে যাওয়ার পর আমরাই কি তোমাদের তা থেকে ফিরিয়ে রেখেছি? প্রকৃতপক্ষে তোমরা নিজেরাই অপরাধী ছিলে। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হয়েছিল তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে, না, বরং এটা তো তোমাদের দিবা-রাত্রের চক্রান্তই ছিল (যা আমাদেরকে হিদায়াত থেকে ফিরিয়ে রেখেছিল), যখন তোমরা আমাদের আদেশ করছিল আমরা যেন আল্লাহর কুফরি করি এবং তার সাথে (অন্যদেরকে) শরিক সাব্যস্ত করি। তারা যখন আযাব দেখবে তখন তারা অনুতাপ গোপন করবে এবং যারা কুফরি অবলম্বন করেছিল আমি তাদের সকলের গলায় বেড়ি পরাব। তাদের তো কেবল তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান দেওয়া হবে।”

(সাবা: ৩১-৩৩)

৩। মুরতাদরা এবং তাদের সহযোগীরা নিজেদের মুমিন দাবি করে, অথবা এই দাবি করে যে, তারা যেসব কুফরিতে লিপ্ত হচ্ছে, তাতে তারাই সত্যের ওপর আছে, এটাও তাকফিরের প্রতিবন্ধকসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়।

কারণ আল্লাহ সুবহানাহুতা'লা অনেক কাফেরদেরই এরূপ অবস্থা বর্ণনা করেছেন। আর তিনি এটাকে তাদের জন্য তাকফিরের প্রতিবন্ধক হিসবে গণ্য করেননি।

যেমন আল্লাহ সুবহানাহুতা'লা বলেন,

قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا

"বলে দাও, আমি কি তোমাদেরকে বলে দেব, কর্মে কারা সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত? তারা সেই সব লোক, পার্থিব জীবনে যাদের সমস্ত দৌড়-ঝাপ সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, অথচ তারা মনে করে, তারা খুবই ভাল কাজ করছে।" (কাহফ: ১০৪)

তিনি আরো বলেন,

إنهم اتخذوا الشياطين أولياء لهم من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون

"নিশ্চয়ই তারা আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে আর তারা মনে করছে যে, তারা সরল পথে প্রতিষ্ঠিত আছে।" (আ'রাফ: ৩০)

৪। যাকে কুফরির কারণসমূহের কোনো কারণে লিপ্ত হওয়ার ফলে বা ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহের কোনো বিষয়ে লিপ্ত হওয়ার ফলে তাকফির করা হয়, সে ইসলামের কিছু কিছু বিধান পালন করে, যেমন নামায পড়ে বা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের ব্যাপারে স্বাক্ষ্য দেয় বা এজাতীয় আরো কিছু করে- এটাও তাকফিরের কোনো প্রতিবন্ধক নয়।

আল্লাহ সুবহানাহুতা'লা তার কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, মুশরিকদেরও অনেক আমল আছে এবং তাদের কারও মাঝে ইমানের শাখাসমূহের অনেক শাখা বিদ্যমান, কিন্তু এগুলো তার শিরককে মুছে ঢেকে দেয় না। যেমন আল্লাহ সুবহানাহুতা'লা বলেন,

وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون

"তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই এমন যে, তারা আল্লাহর প্রতি ইমান রাখলেও তা এভাবে যে, তাঁর সঙ্গে শরীক করে।"

৫। যে স্পষ্ট কোনো কুফরি কাজে লিপ্ত হয়েছে সে ধর্মীয় গুরু, সন্ন্যাসী, নেতা, শাসক বা অন্যান্যদের দ্বারা পথভ্রষ্ট হওয়াও তাকফিরের কোনো প্রতিবন্ধক নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا * خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا * يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا * وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا * ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا

"এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ কাফেরদেরকে তাঁর রহমত থেকে বিতাড়িত করেছেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জ্বলন্ত আগুন। তাতে তারা সর্বদা এভাবে থাকবে যে, তারা কোনো অভিভাবক পাবে না এবং সাহায্যকারীও না।

যেদিন আগুনে তাদের চেহারা ওলট-পালট হয়ে যাবে, তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম এবং রাসুলের কথা মানতাম! এবং বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! প্রকৃতপক্ষে আমরা আমাদের নেতৃবর্গ ও আমাদের গুরুজনদের আনুগত্য করেছিলাম, তারা আমাদেরকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করেছে।

হে আমাদের প্রতিপালক! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন এবং তাদের প্রতি এমন লানত করুন, যা হবে অতি বড় লানত।" (আহযাব: ৬৪-৬৮)

এই বিষয়ে অনেক আয়াত রয়েছে।

৬। মুরতাদ ইলমের অধিকারী, বা শ্মশ্রুমণ্ডিত বা অমুক ইসলামি দলের সদস্য বা শরিয়া বিষয়ে এত এত ডিগ্রিধারী বা এ জাতীয় যা কিছু রয়েছে, এগুলোও তাকফিরের কোনো প্রতিবন্ধক নয়, যেমনটা কেউ কেউ মনে করে থাকে।

কেননা স্বীয় যামানার সবচেয়ে বড় আলেম ছিল, এমন এক ব্যক্তির ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহুতা'লা বলেছেন,

واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آيتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين

"এবং (হে রাসুল!) তাদেরকে সেই ব্যক্তির ঘটনা পড়ে শোনান, যাকে আমি আমার নিদর্শন দিয়েছিলাম, কিন্তু সে তা সম্পূর্ণ বর্জন করে। ফলে শয়তান তার পিছু নেয়। পরিণামে সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়"

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরেক স্থানে তার সৃষ্টির সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দল তথা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদের ব্যাপারে বলেন,

ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون * أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة

"তারা যদি শিরক করত, তবে তাদের সমস্ত (সৎ) কর্ম নিস্ফল হয়ে যেত। তারা এমন লোক, যাদেরকে আমি কিতাব, হিকমত ও নবুওয়াত দান করেছিলাম।" (আনআম: ৮৮-৮৯)

কিন্তু এখানে দুটি বিষয়ের মাঝে পার্থক্য করতে হবে: একটি হলো, এমন স্পষ্ট কুফর, যা ধর্ম থেকে বের করে দেয়। উপরে এইমাত্র এটার কথাই আলোচিত হয়েছে।

আরেকটি হলো, যা কুফর নয়, বরং এমন ভুল ইজতিহাদ বা গবেষণা, যার জন্য ইজতিহাদকারীকে ইজতিহাদের সাওয়াব দেওয়া হবে, অথবা ঐ সব ত্রুটি-বিচ্যুতি, যা কখনো কখনো উলামায়ে কেরাম ও তালিবুল ইলমদের হয়ে যায়। এর কারণে তাদের সাথে অশিষ্ট আচরণ করা বা তাদের ব্যাপারে জবানের অসংযত চর্চা করা বা তাদের ইলম থেকে বিমুখতা অবলম্বন করা বা যুবকদের তাদের কিতাবসমূহ থেকে দূরে রাখা উচিত হবে না। বিশেষত যখন তারা আল্লাহর দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত ও তার সাহায্যকারী হয় এবং তাগুত ও মুরতাদগোষ্ঠী থেকে সম্পর্ক ছিন্নকারী হয়, তখন তো কিছুতেই না।

৭। নির্দিষ্ট কোনো কুফরি কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণে যাদের তাকফির করা হবে, তারা সংখ্যায় অনেক, এটাও তাকফিরের কোনো প্রতিবন্ধক নয়। কেননা আল্লাহর দ্বীন কারও প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। আল্লাহ সুবহানাহুতা'লা বলেন,

وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغني حميد

"এবং মূসা বলেছিল, তোমরা এবং পৃথিবীতে বসবাসকারী সকলেই যদি অকৃতজ্ঞতা কর, তবে (আল্লাহর কোনোও ক্ষতি নেই। কেননা) আল্লাহ অতি বেনিয়ায, তিনি আপনিই প্রশংসার উপযুক্ত।" (ইবরাহিম: ৮)

আল্লাহ সুবহানাহুতা'লা আরো বলেন,

وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين

"এতদসত্ত্বে অধিকাংশ লোক ইমান আনার নয়, তা তোমার অন্তর যতই কামনা করুক না কেন।"

(ইউসুফ: ১০৩)

আল্লাহ সুবহানাহুতা'লা আরো বলেন,

وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون

"বহু লোকই এমন, যারা নিজ প্রতিপালকের সাথে মিলিত হওয়াকে অস্বীকার করে।" (রূম: ৮)

৮। কুফরি কথা, ঠাট্টা, বিনোদন ও খেল-তামাশাচ্ছলে বলাও উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মতিক্রমে তাকফিরের কোনো প্রতিবন্ধক নয়। তার দলিল হলো আল্লাহ সুবহানাহুতা'লার বাণী-

ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب ، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

"তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, তবে তারা অবশ্যই বলবে, আমরা তো হাসি-তামাশা ও ফূর্তি করছিলাম। বল, তোমরা কি আল্লাহ, আল্লাহর আয়াত ও তার রাসুলকে নিয়ে ফূর্তি

করছিলে? অজুহাত দেখিও না। তোমরা ইমান জাহির করার পর কুফরিতে লিপ্ত হয়েছ।” (তাওবা: ৬৫-৬৬)

আল্লাহ সুবহানাহুতা'লা তাদের এই ওযর গ্রহণ করলেন না। অথচ তারা রাসুল ﷺ এর সাথে সংকটময় যুদ্ধে জিহাদের জন্য বের হয়েছে। আর ঐ সব কুফরি বাণীগুলো তারা ঠাট্টাচ্ছলে ও সফরের পথে সময় কাটানোর জন্য বলেছিল, যেমন, সওয়ারিরা রাস্তা পার করার জন্য পরস্পরে বিভিন্ন কথাবার্তা বলে থাকে, যেমনটি আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে।

৯। কাফের আখ্যা দানকারীগণ যাদের কাফের আখ্যা দিয়েছেন, তাদের ওপর কুফরের শাস্তিগুলো বাস্তবায়ন করতে পারবেন না, এটাও তাকফিরের কোনো গ্রহণযোগ্য প্রতিবন্ধক নয়। যেমন, তাদের ওপর ধর্ম ত্যাগের শাস্তি বাস্তবায়ন করতে পারবেন না, কাফের শাসককে হটাতে পারবে না ইত্যাদি।

এ ব্যাপারে সত্য এবং সঠিক কথা হলো, যা আল্লাহ সুবহানাহুতা'লা আমাদেরকে তাঁর প্রজ্ঞাময় কিতাবে আদেশ করেছেন:

فاتقوا الله ما استطعتم

“সুতরাং তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় করে চলো।” (তাগাবুন: ১৬)

অনুরূপ আল্লাহ সুবহানাহুতা'লা শুআইব (আঃ) এর ব্যাপারে বলেন:

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

“নিজ সাধ্যমত সংস্কার করা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য আমার নেই।” (হুদ: ৮৮)

এ হিসাবেই ফুকাহায়ে কেরাম তাদের প্রসিদ্ধ ফিকহি মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন, “কঠিন বিষয়টির কারণে সহজ বিষয়টি রহিত হয়ে যাবে না।” সুতরাং যখন কোনো সময় মুসলমানগণ কাফের শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে এবং তাকে হটাতে না পারবে তখন এর অর্থ এই হবে না যে, তারা তাকে তাকফির করাও ছেড়ে দেবে, বরং এটি একটি শরঈ' হুকুম, যা তারা করতে সক্ষম।

সুতরাং তাদের এর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করতে হবে এবং শাসককে তাকফির করার অন্য যেসব ফলাফল রয়েছে, যেগুলো তারা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম সেগুলোর ব্যাপারেও আল্লাহকে ভয় করা উচিত।

অর্থাৎ তার সাহায্য করা, পৃষ্ঠপোষকতা করা এবং তার কুফরি আইনের কাছে বিচার-ফয়সালা চাইতে যাওয়া থেকে বিরত থাকবে, তাকে তাদের দ্বীনি বিষয়ের দায়িত্বশীল বানাবে না, যতক্ষণ

পর্যন্ত কোনো উপায় থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে তাদের ওপর কর্তৃত্বশীল বানাবে না, তার বায়আতে প্রবেশ করবে না, তার পতাকাতলে যুদ্ধ করবে না, তাকে তার বাতিলের ওপর সাহায্য করবে না বা কোনো মুসলিমের বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করবে না, ইত্যাদি যে যে বিষয়গুলো তারা করতে পারবে তা করবে। এছাড়া শাসকের কুফরি জানতে পারলে তার যথাযথ ব্যবস্থা নিতে ও প্রস্তুতি গ্রহণ করতে প্রেরণা জোগাবে এবং এর ফলে কোনো একদিন তাকে হটানোর মত যোগ্যতা সৃষ্টি হবে।

১০। কুফরিতে লিপ্ত ব্যক্তি মন্দভাবে প্রতিপালিত হয়েছে, এটাও তাকফিরের কোনো প্রতিবন্ধক নয়। অথচ এমন কতিপয় লোক এটাকে তাকফিরের প্রতিবন্ধক মনে করছে, যাদের অনুসরণ করা হয় এবং যাদের দিকে রীতিমত আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করা যায়। তাও এমন লোকদের ব্যাপারে, যারা আল্লাহ, দ্বীন ও রাসুল ﷺ-কে গালিগালাজ করে।

অথচ অধিকাংশ কাফের মুশরিকরা তো মন্দভাবে প্রতিপালিত ও বেড়ে উঠার কারণেই কুফর ও শিরক করেছে। যেমন, চির সত্যবাদী নবি ﷺ বলেছেন,

“প্রত্যেক নবজাতক ফিতরাত, তথা ইসলামের ওপর জন্মগ্রহণ করে, তারপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদি, অগ্নিপূজক বা মুশরিক বানায়।” (হাদিসটি ইমাম মুসলিম ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন)

সুতরাং এটা তাদেরকে কাফের আখ্যাদান করতে বাধা দেবে না।

১১। কোনো প্রকাশ্য ও স্পষ্ট কুফরিকে কল্যাণ বিবেচনা করে বা সময়োপযোগী মনে করে করা, অথবা ‘দাওয়াতের স্বার্থ’র নাম দিয়ে কুফরি করা, এগুলোও তাদের কাফের সাব্যস্ত হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধক নয়। কেননা শিরক বা কুফরিতে কোনো গ্রহণযোগ্য কল্যাণ নেই।

কারণ এটা হচ্ছে আসমান-জমিনের সবচেয়ে বড় গুনাহ, যার দ্বারা আল্লাহ সুবহানাহুতা’লার অবাধ্যতা করা হয়। এ কারণেই আল্লাহ সুবহানাহুতা’লা বলেন,

إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শরিক করাকে ক্ষমা করেন না। এর নিচের যে-কোনো গুনাহ যার ক্ষেত্রে চান ক্ষমা করে দেন।” (নিসাঃ ১১৬)

বুখারি ও মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে:

রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো: কোন গুনাহ সবচেয়ে বড়?

রাসুল ﷺ বললেন, তা হচ্ছে এই যে, তুমি আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করলে, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।

(জ্ঞাতব্য: ৩) أسباب التكفير (তাকফিরের কারণসমূহ):

ফিকহি মূলনীতিবিদদের মতে শরিয়তে 'কারণ' হলো, এমন একটি বাহ্যিক ও সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, যার দ্বারা হুকুম সাব্যস্ত হয়, এই হিসাবে যে, শরিয়ত তার সাথে উক্ত হুকুমটিকে সম্পৃক্ত করেছেন। অথবা তার সংজ্ঞাটি এভাবেও বলা যায়, 'কারণ' বলা হয়, যার উপস্থিতির কারণে তার ফলাফল বা পরিণতিটির উপস্থিতি এবং তার অনুপস্থিতির দ্বারা পরিণতিটির অনুপস্থিতি অনিবার্য হয়।

যেহেতু আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মত হলো, ইমান তিনটি রুকন বা ভিত্তি-বিশিষ্ট: বিশ্বাস, কথা ও কাজ। এ কারণে হুবহু এর বিপরীত তিনটি বিষয় হবে তাকফিরের কারণ। অর্থাৎ কুফরি কথা, অথবা কুফরি কাজ (এর মাঝে ঐ সব জিনিস পরিত্যাগ করাও অন্তর্ভুক্ত, যা পরিত্যাগ করা কুফর) অথবা সন্দেহ বা কুফরি বিশ্বাস।

সাধারণত: এগুলোই কুফরির কারণ।

তবে তাকফিরের সেই সব কারণ, যা দুনিয়াবি বিধানাবলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে সেগুলো কেবল কুফরি কথা বা কুফরি কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। শরিয়ত দুনিয়াতে কাফের সাব্যস্ত করার কারণগুলোকে শুধু এর মাঝেই সীমাবদ্ধ করেছে। কারণ অবিশ্বাস ও সন্দেহ হলো, অপ্রকাশ্য কারণ, যা দুনিয়াবি বিধানগুলোতে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। এ কারণে শরিয়ত তার সাথে কোনো দুনিয়াবি বিধানের সম্পর্ক রাখেনি এবং দুনিয়াতে তাকে তাকফিরের কারণও গণ্য করেনি। এটাকে সেই সত্ত্বার কাছে কারণ হিসাবে গণ্য করেছে, যিনি অন্তরের রহস্য ও গোপন বিষয়গুলো জানেন। এ কারণে এটা হচ্ছে কাফের সাব্যস্ত করার পরকালীন কারণ। তার সাথে দুনিয়াবি বিধি-বিধানের কোনো সম্পর্ক নেই।

এ কারণে যে কুফর গোপন রাখে, প্রকাশ করে না; বরং ইসলামের নিদর্শনগুলোই প্রকাশ করে তাকে বলা হয় মুনাফিক। দুনিয়াতে তার সাথে মুসলমানদের অনুরূপ আচরণ করা হবে। আর সে যে কুফরি বিষয়গুলোকে গোপন রাখত এর হিসাব আল্লাহ পরকালে নেবেন। ফলে তার পরিণাম হবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তর। এ কারণে যখন মুকাল্লাফ (বিধানাবলির আওতাধীন ব্যক্তি) কুফরের প্রকাশ্য কারণসমূহের কোনোটিতে লিপ্ত হয়, তথা কুফরি কথা বলে বা কুফরি কাজ করে, আর তাকফিরের শর্তগুলো পাওয়া যায় এবং কোনো প্রতিবন্ধকও না থাকে, তখন

তাকে তাকফির করা হবে, যদিও সে এ কথা বলে যে, সে এর দ্বারা কুফরি করা বা দ্বীন থেকে বের হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করেনি। কেননা কেউই এর ইচ্ছা করে না, একমাত্র আল্লাহ যা ব্যতিক্রম চান। এমনকি খৃষ্টানদেরকেও যদি জিজ্ঞাস করা হয়, তোমরা কি 'ঈসা আল্লাহর পুত্র' এ কথার দ্বারা কুফরি করার ইচ্ছা করো? তারা না করবে এবং তা অস্বীকার করবে।

তাকফিরের কারণগুলোর ব্যাপারে একটি জ্ঞাতব্য:

মনে রাখবেন, যখনই কোনো মুকাল্লাফ কুফরের প্রকাশ্য কারণসমূহের কোনোটিতে লিপ্ত হয় আর তার ক্ষেত্রে তাকফিরের কোনো প্রতিবন্ধকও না থাকে, তখনই তাকে কাফের আখ্যা দেওয়া যাবে। তাকফিরের জন্য একাধিক কারণ জমা হওয়া শর্ত নয়; বরং একাধিক কারণ কুফরিকে আরো কঠিন ও বৃদ্ধি করবে। অতএব ইমানের মতো কুফরেরও বিভিন্ন স্তর রয়েছে।

শাইখ আবু মুহাম্মদ আসিম আল-মাকদিসী (আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন)

রচিত একটি অপূর্ব প্রবন্ধ

শীঘ্রই আমি তোমাকে শিখাবো, কিভাবে বাজপাখি শিকার করতে হয়

(সুওয়াকাহ কারাগার থেকে লিখিত কিছু কথা)

লেখক: আবু মুহাম্মদ আসিম আল-মাকদিসী

পরিবেশনায়: বালাকোট মিডিয়া

নিঃসন্দেহে এই সময়টা আমাদের জন্যে খুবই আবেগঘন সময়, আর এখানে আমরা সারা দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি, আজ কারাগারে আমাদের বন্দীরত জীবনের চতুর্থ রমজানে এসে আমরা পৌঁছেছি।

এই সময়ে মানুষ আল্লাহর যিকিরে ব্যস্ত থাকে অথবা অন্যান্য উপকারী আমলে ব্যস্ত থাকে যেন সে তার আবেগ ও স্মৃতির পাতায় হারিয়ে না যায়, বিশেষ করে আজকের এই মুহূর্তগুলোতে যখন কিনা আমার মনে এমন একটি দৃশ্য রয়েছে যা প্রতি বছর রমজান মাসের প্রথম দিনটি এলেই আমার চোখে ভেসে উঠে।

খাবারের টেবিলের চতুর্দিকে বাচ্চাদের দৌড়াদৌড়ি আর আযানের জন্য অপেক্ষা, আর তাদের ইফতার প্রস্তুত করার জন্য তাদের মায়ের ইতস্তত ছোটাছুটি, যেখানে বাচ্চাদের কেউই সেই বয়সে পৌঁছায় নি যে বয়সে মানুষের উপর রোজা ফরয হয়। তবুও তারা সকলেই রোজা রাখার ব্যাপারে অতি উৎসাহী, বিশেষ করে রমজানের প্রথম দিনটিতে তো অবশ্যই।

যা কিছুই নতুন, তার সবটাতেই বাচ্চারা এমন উচ্ছলতা দেখায়। তারা প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে সবটুকু খাবার খেয়ে নেয়! ঠিক আছে...তবে, সত্যের পথে অবিচল থাকার জন্য শুধু উৎসাহই যথেষ্ট নয়, তাই নয় কি?

আমার কারাকক্ষের ছোট্ট জানালাটা দিয়ে আমি কাহালাহ মরুভূমিতে সূর্যাস্তের অপরূপ দৃশ্য তাকিয়ে দেখছি। সূর্য তার রশ্মিগুলোকে এক আশ্চর্য পদ্ধতিতে গুটিয়ে নিচ্ছে...এবং বেশ দ্রুত, আযানের ধ্বনি নিশ্চিত করে দিচ্ছে যে সূর্য ডুবে গেছে।

আহ...জীবনটা কত ছোট!...এক ঝাঁক পাখি লাল আকাশের অসীম দিগন্তের পানে উড়ে উড়ে তাদের নীড়ে ফেরত যাচ্ছে যেখানে তাদের কচি ছানাগুলো রয়েছে, অন্ধকার নেমে আসার আগেই পৌঁছাতে হবে। মুতামিদ বিন ইবাদ কারারুদ্ধ অবস্থায় যা বলেছিলেন সেই কথাগুলো আমার বার বার মনে পড়ছিল,

আল্লাহ বিড়ালের শাবকগুলোকে রক্ষা করেছেন,
আর আমার ক্ষুদ্র ছানাগুলো পানি ও ছায়ার কাছে প্রতারিত হলো।

এটাই মানব প্রকৃতি, আল্লাহ তাদের অন্তরে স্বীয় রহমতের যে বীজ বপন করে দিয়েছেন তা নিয়ে তারা বিনত। কখনো এই রহমত মানুষকে পুরোপুরি পরাভূত করে ফেলে সে যতই কঠিন, শক্ত ও সহিষ্ণু হোক না কেন।

আমি এই স্মৃতির জাল থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেই এবং মুখ ফিরিয়ে নেই, আমার ছোট্ট কারাকক্ষের দেয়ালগুলোতে কিছু কবিতার পংক্তি লিখেছিলাম সেগুলো মনে পড়ে যায়,

হে আমার ভাই, আমরা তো খারাপ কিছু আশা করি নি
মহাপরাক্রমশালী প্রতিপালকের ওয়াদার ব্যাপারে,
এই বন্দীত্ব তো আমাদের দৃঢ়তাকেই বৃদ্ধি করেছে,
আর বৃদ্ধি পেয়েছে আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস এই কারাগারে।

ভাইদের উপর যে নির্যাতন ঘটেছে,
আর শত শত দায়ীকে যে হত্যা করা হয়েছে,
সে তো শুধুমাত্র আমাদের ঈমানের পতাকাকেই উত্তোলন করেছে,
আর আমাদের দ্বীন ও তাওহীদের সত্যতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

এক রবের সন্তুষ্টি অর্জন এবং এক দ্বীনকে সমর্থন করতে
এই কারাগার তো সুগন্ধময় আর মৃত্যুও সুমিষ্টরূপ,
এক মহাপরাক্রমশালী ও পরম করুণাময় রবকে খুশি করতে
এই জীবন আর সন্তান-সন্ততি সবই শূণ্যের স্বরূপ।

এই মুহূর্তগুলোতে আমার শিশু ছেলে উমার এর কিছু কথা মনে পড়ছে যা অতীতের একটি রমজানে সে তার মাকে বলছিল, “আমার বাবা একজন ভালো মানুষ, আমি তাকে ভালবাসি, তাকে নিয়ে আমি গর্বিত। কিন্তু আমি তাকে আমাদের সাথে দেখতে চাই, কারাগারে না।”

তার মা তার কথার উত্তর দিতে গিয়ে তাকে পূর্বেকার কিছু ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিলো, আর আমি যেন রাতের আঁধারে সেই কথাগুলোর প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলাম, “উমার? এসব তুমি কি বলছো? আমি কি তোমাকে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এর ঘটনাটি বলি নি যে, তিনি যে বিষয়ের দিকে আহবান করেছিলেন সে জন্য তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল? আর মূসা ও ঈসা (আলাইহিমাস সালাম), আসহাবে কাহফ আর আসহাবুল উখদুদের কথাও ভুলে গেলে?”

হে উমার! এর প্রয়োজন আছে। তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই যখন আমি ছুটির দিনগুলো তোমাদের সাথে কাটিয়েছিলাম। কোথায় তোমার সেই কথাগুলো যা তুমি আমার মানহাজের (কর্ম পদ্ধতির) সমালোচনাকারীদের ব্যাপারে তোমার মাকে বলেছিলে, “আমি আমার বাবার মতো হতে চাই, আর যখন আমি বড় হবো তখন আমি সেটাই করবো যা তিনি করেছিলেন। আর আমি স্বৈরাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবো।”

আর আজকে তুমি কি বলছো? দিন ও রাতের দৈর্ঘ্য কি এতই বেড়ে গেছে? যাত্রা তো সবে শুরু হয়েছে, ব্যাটা আমার। তুমি কি তোমার ছোট দুই ভাইবোনের মতো হয়ে গেছো যারা আমার কারাবন্দীত্বে অতিমাত্রায় ব্যথিত হয়ে পড়েছে? তুমি কি বিজয়ের ব্যাপারে হতাশ হয়ে এই রাস্তা পরিত্যাগ করেছো?

আমার এখনো মনে পড়ে তোমার চোখের সেই ঝলকানির কথা, যখন মধ্যরাতে আল্লাহর শত্রুরা আমাদের বাসায় হানা দেয় আর তুমি তাদের প্রতি চিৎকার করছিলে, যখন শীতের সেই রাতে তুমি হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে গেলে, আর তাদের নোংরা গলার আওয়াজ শুনে বিছানা থেকে উঠে এসে দেখলে যে, পুরো বাড়িতে তারা ছড়িয়ে আছে, প্রতিটা জিনিস আর ঘরের প্রতিটা কোণা তারা খুঁজে খুঁজে দেখছে। তাদের মধ্যে একটা কাফের তোমাকে জিজ্ঞেস করলো, “তোর বাবা কই?”

তাই তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে চোখ ডলতে ডলতে বললে, "আমি জানি না।" অথচ তুমি খুব ভালোভাবেই জানতে যে, সেই রাতে তোমার বাবা কোথায় ছিল।

আবু হাফস, আমার এখনো মনে পড়ে, আর আমি তা কখনো ভুলবো না যে, সেই রাতে তুমি তাদের দিকে কিভাবে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলে যখন শেষবারের মতো আমি তোমাদের ছেড়ে যাই; রাতটা ছিল আমার গ্রেফতার হবার রাত, আজকের থেকে চার বছর আগে। আমার হাতে তারা হাতকড়া পরিয়ে দেয় আর চতুর্দিক থেকে আমাকে ঘিরে ফেলে, আর লাঠি আর রাইফেলের বাট দিয়ে আমাকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে সামনে নিয়ে যায়। আমি তোমাকে আঁধারের মাঝেও দেখছিলাম যখন তুমি বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলে, যখন আমি তোমাকে বলছিলাম, "এদেরকে ভয় পেয়ো না! এদের দ্বারা শঙ্কিত হয়ো না! এরা পোকামাকড় ছাড়া কিছুই না! এরা সব মাছি!" আমার খুব ভালোভাবেই মনে আছে যে, তোমার মনে এই কথাগুলো কিভাবে গেঁথে গেছে আর তোমার স্মৃতিতে মুদ্রিত হয়েছে, কারণ ছ'মাস পর যখন তারা আমাকে তাদের থানা থেকে কারাগারে নিয়ে গেলো আর তুমি আমাকে দেখতে গেলে, তখন তোমাকে সেই রাতের কথা মনে করিয়ে দেবার সাথে সাথেই তুমি বলে উঠেছিলে, "হ্যা বাবা, আমার খুব ভালোমতোই মনে আছে। তুমি আমাদেরকে বলেছিলে যে, তাদেরকে ভয় না পেতে, আর বলেছিলে যে, তারা তো কীটপতঙ্গ আর মাছি।"

আমার অবাক লাগছে যে, তোমার কচি মন সেই অন্ধকারময় রাতের এত ঘটনার মাঝে কিভাবে শুধু ঐ কথাগুলোই মনে রেখেছে। আমি তোমাকে সেদিন ইবনুল কাইয়্যুমের (রহিমাহুল্লাহ) কবিতা থেকে একটি পংক্তি শুনিয়েছিলাম, যা আমি তোমার জন্য আমার কারাকক্ষের দেয়ালে লিখেও রেখেছি,

তাদের অধিক সংখ্যাকে ভয় করো না,
যেহেতু তারা গুরুত্বহীন এবং মাছির মতো।
তোমরা কি একটা মাছি কে ভয় পাও?

মনে পড়ছে কি? ও উমার! আল্লাহর দুশমনেরা এই লেখাটি দেখে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে পড়ে। তাদের এত ক্রোধান্বিত দশা সত্ত্বেও তোমাকে এই কথাটি জানাতে আমার আনন্দ লাগছে।

তাহলে আজকে কেন তুমি আমাকে পাওয়ার জন্য এত ব্যাকুল হয়ে পড়ছো?

আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি এখনোও ছোট্ট, আর এই রাস্তাটি অনেক দীর্ঘ এবং প্রতিকূলতায় ভরা। এমনকি সেরারাও এই রাস্তার ধারে পড়ে থাকে, কত মানুষ এই চলার পথে থেমে যায়!

আমি কি তোমাকে এবং অন্যান্যদেরকে বার বার বলি নি যে, অন্যান্য দেশে আমাদের ভাইদের উপর চালানো অত্যাচারের তুলনায় আমাদের প্রতি চালানো এই অত্যাচার খুবই কম? এটা তো শুধু সূচনা মাত্র, ছোট্ট ছেলে আমার। আর এই মূল্যবান দাওয়াত এবং মহামূল্য পুরস্কার লাভের পথে এগুলো তো প্রথম ধাপ মাত্র, যার মূল্য দিতে শুধুমাত্র সত্যিকার পুরুষেরাই উঠে দাঁড়ায়,

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا۟ مَا عَـٰهَدُوا۟ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُۥ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا۟ تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾

মুমিনদের মধ্যে কতক পুরুষ আছে যারা আল্লাহর সাথে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে; তাদের মধ্যে কেউ কেউ শাহাদাত বরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা স্বীয় সংকল্প একটুও পরিবর্তন করে নি।[১]

হে আল্লাহর পুরস্কার, নও তুমি কম দামি,
বরং, অলসদের জন্য তুমি সাধ্যাতীত দামি।
হে আল্লাহর পুরস্কার, যদি এমন না হতো যে, তুমি -
প্রত্যেক কষ্টবেষ্টিত, যখনই কেউ তোমার দিকগামী,
তবে কেউই আজ পিছনের দিকে বসে থাকতো না,
আর দ্বিতীয় শ্রেণীর পুরস্কার বলেও কিছু থাকতো না।

---

[১] সূরা আহযাব, আয়াত: ২৩

যাই হোক, এটি প্রতিটি অপ্রিয় কষ্টের দ্বারা বেষ্টিত,
যেন সেই অলস মিথ্যারোপকারীরা হয় দ্রুত বিতাড়িত,
আর যেন এটি সে সকল উচ্চাকাঙ্ক্ষীদের দেয়া যায়,
যে স্পৃহা মহান রবের ইচ্ছায় তাঁর পানে উপনীত হয়।

ইবনুল কাইয়্যুমের (রহিমাহুল্লাহ) কথাগুলো কতই না সুন্দর। তাঁর কবিতার পংক্তিগুলোতে কি সুন্দর করে বর্ণনা করলেন, "আল্লাহর কসম, এটি তো সস্তা নয় যে, একজন দেউলিয়া লোক তা কিনে নিয়ে যাবে। এটি তো এমনও নয় যে, বিক্রয় না করে অভাবগ্রস্ত মানুষের প্রয়োজন পূরণে তা সম্পূর্ণরূপে দান করা হয়। বরং বাজারে এটিকে খুবই উঁচু দামে উপস্থিত করা হয়, আর এটির একমাত্র মূল্য নির্ধারিত হয় যে, নিজের সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে দিয়ে দিতে হবে। তাই অস্বীকারকারীরা পিছু হটে যায়, আর যারা এটিকে ভালোবাসে তারা তা দেখার জন্য দাঁড়িয়ে যায় যে, কে এটি ক্রয় করার সম্মানের অধিকতর যোগ্য। পুরস্কারটা তাদের হাতে ঘুরতে থাকে, আর শেষ পর্যন্ত সেটা তার হাতে গিয়ে পড়ে যে,

أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ

...মুসলমানদের প্রতি হবে দয়ালু ও মেহেরবান এবং কাফেরদের প্রতি হবে অত্যন্ত কঠোর...[২]

যখন ক্রমান্বয়ে আরো বেশী মানুষ এসে এই পুরস্কারের দাবি করছিল তখন তাদেরকে নিজ দাবির সত্যতা প্রমাণ করতে বলা হয়। কারণ যদি শুধু এই দাবির ভিত্তিতেই তাদেরকে এটা দিয়ে দেয়া হতো, তাহলে যারা এই পুরস্কারের ব্যাপারে পরোয়া করে না সেই সব লোকেরাও এসে দাবি তুলতো যে, তারা সেটিকে প্রবলভাবে কামনা করে। সুতরাং, এভাবে বিভিন্ন ধরনের মানুষেরা যখন তাদের দাবি তুলতে লাগলো, তখন বলা হলো, 'এই প্রমাণ ছাড়া তাদের দাবি গৃহীত হবে না,'

[২] সূরা মায়িদা, আয়াত: ৫৪

قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ

যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমার অনুসরণ করো, এবং আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন...[৩]

ফলে, অধিকাংশ লোক পিছু হটে গেলো, আর শুধুমাত্র তারাই রয়ে গেলো যারা প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে তাদের আমল (কর্ম), কথা ও চারিত্রিক ক্ষেত্রে অনুসরণ করে। তাই তারা যেন নিজেদের দাবি প্রমাণ করতে পারে সে জন্য সেই শর্তে তারা কিছু স্পষ্ট বিষয় যোগ করতে অনুরোধ করলো যা করার মাধ্যমে তারা সেই দাবি প্রমাণ করতে পারবে, ফলে বলা হলো,

يُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوۡمَةَ لَآئِمٖۚ

...তারা আল্লাহর রাহে জিহাদ করবে, আর তারা কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করবে না...[৪]

এর ফলে ভালোবাসার দাবিদার বেশীরভাগ লোকই সরে পড়লো, আর শুধুমাত্র মুজাহিদীনগণ থেকে গেলেন। তাদেরকে বলা হলো, 'যারা এই ভালোবাসার দাবিদার তারা তো নিজেদের জীবন ও ধন-সম্পদের মালিক নয়, সুতরাং এগিয়ে গিয়ে আল্লাহর সাথে চুক্তি পূর্ণ করো,'

إِنَّ ٱللَّهَ ٱشۡتَرَىٰ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَنفُسَهُمۡ وَأَمۡوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلۡجَنَّةَۚ

নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের নিকট থেকে তাদের প্রাণ ও তাদের ধন-সম্পদ সমূহকে এর বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন যে, তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাত...[৫]

তাই যখন তারা এই খরিদকারীর মহত্ত্ব ও মহানুভবতা সম্পর্কে জানলো, তাঁর পুরস্কারের গুণকে বুঝলো, আর যাদের হাত এই চুক্তিতে আবদ্ধ তাদের মর্যাদাকে উপলব্ধি করলো; তখন তারা এই পুরস্কারের মূল্য বুঝলো, বুঝলো যে এটা সত্যিকার অর্থেই মহাগুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তারা দেখলো যে, সবচেয়ে বড় ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে অল্প দামে এই পুরস্কারকে বিক্রি করে দেয়। তাই

---

[৩] সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩১

[৪] সূরা মায়িদা, আয়াত: ৫৪

[৫] সূরা তাওবা, আয়াত: ১১১

তারা সন্তুষ্টচিত্তে অন্য কোনো বিকল্পের কথা না ভেবেই এই চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে গেলো, আর তারা বললো, 'আমরা এই রাস্তা থেকে হটবো না।' ফলে যখন এই চুক্তিটি সম্পূর্ণ হলো এবং বেচাকেনা শেষ হলো, তখন তাদেরকে বলা হলো, 'আমার জন্যে তোমাদের জীবন ও সম্পদ যখনই নিঃশেষ হয়ে যাবে, তখন এগুলোকে আমি বহুগুণে বর্ধিত করে ফেরত দিবো!'

وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾
فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ

যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় তাদেরকে তোমরা মৃত ধারণা করো না; বরং তারা জীবিত, তারা তাদের প্রতিপালক হতে জীবিকা প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ হতে যা দান করেছেন তা নিয়ে তারা উৎফুল্ল...[৬]

সুতরাং, যখন তারা তাদের মহান প্রতিপালকের অনুগ্রহ লাভ করলো তখন তারা তাঁর প্রশংসা করলো, আর মহান অভিভাবকের থেকে যে পুরস্কার তারা পেয়েছে সে জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করলো, এবং পরদিন সকালেও তারা আবারও তাঁর প্রশংসা করতে লাগলো।"

আমার ব্যাটা, তোমাকে এটা খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে। এটা মুখস্ত করে ফেলো যাতে এই পথের বাস্তবতা ও এর চাহিদা সম্পর্কে জানতে পারো। তাই আজকের পর আর কখনোও অধৈর্য হয়ো না, আর যতদিন জীবন ধারণ করছো কখনোও ক্লান্ত বা নিরাশ হয়ো না।

আমার সাথে তোমার শেষবারের সাক্ষাতের কথা মনে করো, আমি দর্শনার্থীর জানালা দিয়ে তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। সে চোখ দু'টো যেন আমাকে দেখার খুশিতে আনন্দে বড় হয়ে গিয়েছিল। তুমি বলছিলে, "বাবা! গতকাল আমি আমার উস্তাযের সাথে শিকারে গিয়েছিলাম, আর জীবনে প্রথমবারের মতো আমি রাইফেল দিয়ে একটি কবুতর শিকার করেছি! হ্যা বাবা! রাইফেল দিয়ে! আমি জীবনে প্রথমবার রাইফেল দিয়ে কবুতর শিকার করেছি!"

---

[৬] সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৬৯-১৭০

“চমৎকার, উমার! চমৎকার! এখন হলো বাজপাখি শিকারের সময়। যদি আল্লাহ চান, শীঘ্রই আমি তোমাকে শিখাবো, কিভাবে বাজপাখি শিকার করতে হয়।”

আযান শেষ হয়েছে, স্মৃতির জানালাও বন্ধ হয়েছে। এক ফোঁটা মূল্যবান অশ্রু জমা হয়েছে চোখে। খুব দ্রুত আমি তা মুছে ফেললাম আর মৃদুস্বরে বললাম,

“হে আল্লাহ! তোমার ইচ্ছায় রাত শুরু হলো আর দিন শেষ হলো। তোমার কাছেই সব দোয়া, সুতরাং, আমাকে ক্ষমা করো।”

আবু মুহাম্মদ আসিম আল-মাকদিসী
রমজানের প্রথম রাত্রি,
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হিজরতের ১৪১৭ বছর পর

শাইখ আবু মুহাম্মদ আসিম আল-মাকদিসী (আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন) রচিত
একটি উপকারী প্রবন্ধ

দাওয়াহ ও জিহাদের বিষয়ে সর্বসাধারণকে সম্বোধন: শৈথিল্য ও চরমপন্থার মাঝে ভারসাম্যকরণ

লেখক: আবু মুহাম্মদ আসিম আল-মাকদিসী

পরিবেশনায়: বালাকোট মিডিয়া

..."হে আমার জাতি! আল্লাহর ইবাদাত করো! তিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য এক মহা দিবসের আযাবের ভয় করছি!"[১]

[১] সূরা আরাফ, আয়াত: ৫৯

আমাদের দাওয়াহ ও জিহাদকে আরও সমৃদ্ধ করার জন্য নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবন থেকে আমাদের অনেক শিক্ষা নেবার আছে। এই শিক্ষা দায়ী ও মুজাহিদগণের সামনে যে পথ আছে তা সহজতর করে দেবে এবং তাদেরকে সফলতা অর্জন করতে সাহায্য করবে। ফলে দাওয়াহ ও জিহাদে কল্যাণ আসবে এবং একই সঙ্গে তা দায়ী ও মুজাহিদীনদেরকে মন্দ ও ক্ষতিকর প্রভাব থেকে দূরে রাখবে।

নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহান, মহিমামন্ডিত জীবন ইতিহাসের উপর যত্ন সহকারে গবেষণা ও বিবেচনা করলে যে কেউ জানতে পারবেন যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে কিভাবে পরিচালিত করতেন। ফলে তিনি উপলব্ধি করতে পারবেন যে, দাওয়াহ এর ভাষা, পদ্ধতি, একাধিক পন্থার মধ্যে কোনটি সর্বোত্তম এবং কোন বিষয়টি অগ্রাধিকার পাবে ইত্যাদি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাকে বা যাদেরকে সম্বোধন করে দাওয়াহ দিতেন তাদের ব্যাপারে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করতেন:

• সম্বোধিত ব্যক্তির স্বভাব এবং তার আদর্শিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক অবস্থানের পটভূমি। কাজেই একটি নির্দিষ্ট এলাকার মানুষজন, তাদের গোত্রসমূহ, এবং তাদের স্বভাব সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।
• সম্বোধিত ব্যক্তির দাওয়াহ গ্রহণের স্পৃহা এবং আল্লাহর দ্বীনের প্রতি তার অবস্থান, অর্থাৎ সে দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত কি না সেই তথ্য।
• মুমিনদের দল এবং দাওয়াহ এর সামর্থ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা, অর্থাৎ সেই নির্দিষ্ট পর্যায়, অবস্থা, বাস্তবতা বা সময়ের প্রকৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা।

এসবকিছুই করা হয় শরীয়তের সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড অনুযায়ী। যেকোনো ব্যাপারে লাভ-ক্ষতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর্যবেক্ষণ করতেন যে, শরীয়তের অপরিবর্তনীয় নীতিমালা এবং দ্বীন ও তাওহীদের সুদৃঢ় খুঁটিসমূহ লঙ্ঘন না করে কোন বিষয়টি সবচেয়ে বেশী উপকার বয়ে এনেছে এবং সবচেয়ে বেশী ক্ষয়-ক্ষতি এড়াতে সহায়তা করেছে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দাওয়াহ এর প্রারম্ভিক যুগের দিকে মনযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর দাওয়াহ এর সম্বোধিত ব্যক্তির স্বভাব, নৈতিক, সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থানের পটভূমি এবং যেসকল গুণাবলী ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিটি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে ও ভালোবাসে সেগুলোকে কিরূপে বিবেচনা করতেন এবং গুরুত্ব দিতেন। উদাহরণস্বরূপ, আবু সুফিয়ান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যখন ইসলামের শত্রু ছিলেন, তখন তিনি ও রোমানদের নেতা হেরাক্লিয়াসের মাঝে একবার কথোপকথন হয়। সেখানে হেরাক্লিয়াসের প্রশ্ন ছিল, "তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমাদেরকে কি করার নির্দেশ দেন?" হেরাক্লিয়াসের এই প্রশ্নের জবাবে আবু সুফিয়ান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে দাওয়াহ এর প্রতি মানুষদেরকে সম্বোধন করতেন তার মূলভিত্তি তথা তাওহীদের কথা উল্লেখ করেন। এরপর তিনি বলে চলেন, "তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে নামায পড়া, যাকাত দেয়া, সত্যবাদিতা, সচ্চরিত্র ও পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ দেন।" এক মুহূর্ত ভেবে দেখুন, দাওয়াতের বক্তব্য কতটা শক্তিশালী হলে তা শত্রুর মনেও গেঁথে যায়!

অন্যান্য হাদীসের বর্ণনায় এসেছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওয়াদা পালন করা, আমানতদারিতা রক্ষা করা, ভালোবাসা ছড়িয়ে দেয়া, ভালোবাসাহীন কর্কশ ব্যবহারকে তিরস্কার করা এবং অনুরূপ সর্বজনস্বীকৃত উত্তম গুণাবলী চর্চা করার নির্দেশ দিতেন। জনগণকে দ্বীনের ভালো দিকগুলো দেখানোর জন্যই তিনি এমনটা করেছিলেন। এটা এজন্য যেন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে এই শিক্ষা দিতে পারেন যে, যেসকল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে সমাজের বুদ্ধিমান ও অভিজাত মানুষেরা গর্ববোধ করে এবং যেসকল উত্তম গুণাবলীকে তারা শ্রদ্ধার চোখে দেখে, সেগুলোকে উৎকর্ষ দান করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

অনুরূপভাবে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এর মিল্লাতের ব্যাপারে দাওয়াহ দিয়েছিলেন। ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) কে কুরাইশরা সম্মান করতো এবং তাঁর অনুসারী হিসেবে নিজেদেরকে দাবি করতো। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে বুঝান যে, তিনি এবং যারা তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে তারাই ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এর সবচেয়ে যোগ্য অনুসারী।

একইভাবে, হেরাক্লিয়াসের কাছে প্রেরিত পত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাওহীদের বাণীর পরেই উল্লেখ করেন,

“ইসলাম গ্রহণ করুন এবং আপনি নিরাপত্তা লাভ করবেন, এবং আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেবেন। আর যদি আপনি ইসলামের এই দাওয়াহ প্রত্যাখ্যান করেন, তবে আপনার অধীনস্তদের বিপথগামিতার গুনাহসমূহ আপনার উপর অর্পিত হবে।”

এই বার্তা হেরাক্লিয়াসের রাজ্যে তার অধীনস্তদের মাঝে সচেতনতা তৈরি করে এবং তাদেরকে জানিয়ে দেয় যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের হেদায়াতের জন্য চিন্তিত ছিলেন, এবং সেই সাথে এটা আরও ইঙ্গিত করে যে, তাদের পথভ্রষ্টতার জন্য হেরাক্লিয়াসই দায়ী ছিল। এ ধরনের বিবৃতির মাধ্যমে নবীগণ (আলাইহিমিস সালাম) প্রমাণ করেছিলেন যে, তারা আন্তরিকভাবেই মানুষদের হেদায়াতের জন্য চিন্তিত ছিলেন এবং তাদের জন্য ভয়াবহ শাস্তির ভয় করেছিলেন। সকল নবীর (আলাইহিমিস সালাম) দাওয়াতেই একই মঙ্গল কামনা, উদ্বেগ ও আশংকা প্রতিধ্বনিত হয়। এর উদাহরণ আমরা দেখতে পাই যখন নূহ (আলাইহিস সালাম) তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন,

يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥٩﴾

…“হে আমার জাতি! আল্লাহর ইবাদাত করো! তিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য এক মহা দিবসের আযাবের ভয় করছি!”[২]

এমন কথা ব্যবহারে কোনো লজ্জা নেই যা মানুষের হেদায়াতের ব্যাপারে একজন দায়ী বা মুজাহিদের আন্তরিকতার সাক্ষ্য দেয়। এটি আরও সাক্ষ্য দেয় যে, সে কিভাবে তাদের মঙ্গল কামনা করে, কিভাবে সে দুর্বল ও মজলুমদের সাহায্য করতে ভালবাসে এবং তাদেরকে জুলুম থেকে, জালেম ও সীমালঙ্ঘনকারীদের শোষণ থেকে রেহাই দিতে চায়, অথবা কিভাবে সে নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার ও ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠা করতে চায়, আর লড়াই করতে চায় জুলুম, মন্দ ও স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে। আল্লাহর কসম, দুর্বল মনের অধিকারীরা এবং নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবন ও অন্যান্য সকল নবীদের (আলাইহিমিস সালাম) দাওয়াতের ব্যাপারে অজ্ঞ

---

[২] সূরা আরাফ, আয়াত: ৫৯

লোক ছাড়া আর কেউ এমন কথায় লজ্জা পেতে পারে না অথবা তার সমালোচনা করতে পারে না।

আমদের দ্বীন এসেছে সমগ্র মানবজাতিকে পথ প্রদর্শন করতে, এবং তাদেরকে দাসদের (সৃষ্টির) ইবাদত থেকে মুক্ত করে সকল দাসের পালনকর্তা এক আল্লাহর ইবাদতমুখী করতে। আর আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রেরিত হয়েছেন সমগ্র মানবজাতির প্রতি রহমত স্বরূপ।

এ ধরনের বিবৃতি দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদিকে বিকৃত করে না, অথবা তার নীতিগুলোকে অস্পষ্ট করে ফেলে না, কিংবা কাফেরদেরকে তোষামোদ করে না। বরং এটি দ্বীনের অপরিবর্তনীয় মৌলিক ভিত্তিসমূহ থেকে উৎসরিত এক জ্যোতির্ময় ও সুদৃঢ় সত্যকে উপস্থাপন করে। মানুষদের কাছে দায়ীকে অবশ্যই পরিষ্কারভাবে তা ব্যাখ্যা করতে হবে। যে সকল কাফেররা এই সকল গুণাবলীকে ভালোবাসে ও শ্রদ্ধা করে তাদেরকে সম্বোধনের সময় এই সত্যকে আলোকিত করা এবং তুলে ধরার মাঝে দোষের কিছু নেই।

হুদায়বিয়াহ সন্ধির ব্যাপারে বুখারীতে বর্ণিত একটি ঘটনাও এই বিষয়টির পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, কুরাইশ বংশের বনু কিনানাহ গোত্রের এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীদের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) কাছে এসে বললো, "এ হচ্ছে অমুক ও অমুক এবং সে এমন এক সম্প্রদায়ের লোক যারা কোরবানির জন্য নির্ধারিত পশুদেরকে সম্মান করে, তাই পশুগুলো তাকে দিয়ে দাও।" তাই তাকে পশুগুলো দিয়ে দেয়া হয় এবং তাকে সমাদর করা হয় যখন তাঁরা তালবিয়াহ পাঠরত অবস্থায় ছিলেন। এই দৃশ্য দেখে সে বলে উঠলো, "আল্লাহ মহান! এই লোকসকলকে কাবায় যেতে না দেয়া ন্যায়সঙ্গত হবে না।" পরে সে তার গোত্রের মানুষদের কাছে ফিরে এসে বললো, "আমি মালা পরানো এবং চিহ্নিত করা কোরবানির পশু দেখেছি, তাই আমি মনে করি যে, তাদেরকে কাবায় যেতে না দেয়া যুক্তিসঙ্গত হবে না...।"

সুতরাং তৎকালীন সময়ে জনগণের সাধারণ অবস্থার প্রতি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জ্ঞান এবং অন্তর্দৃষ্টির প্রখরতা সম্পর্কে ভাবুন। আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে তাঁর বাণী,

“ঈমান হচ্ছে ইয়েমেনীদের মাঝে, আর কুফর পূর্ব দিক হতে; শান্তি তাদের মধ্যে যারা ছাগল ও ভেড়া লালনপালন করে, আর অহংকার ও লোকদেখানো ভাব – এবং আরেক বর্ণনা অনুযায়ী: আত্মগরিমা - রয়েছে ঘোড়ার অসামাজিক ও অভদ্র মালিক আর বেদুঈনদের মধ্যে।”

এর মাধ্যমে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাহাবীদেরকে (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) সেসকল মানুষদের অবস্থা ও প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা দেন যাদেরকে নিয়ে তাঁরা কাজ করতেন।

তাই তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে বিদ্রূপাত্মক বর্ণনার মাধ্যমে কুরাইশদেরকে আক্রমণ করতে আদেশ দেন তখন তিনি তাঁকে আগে আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর কাছে গিয়ে কুরাইশদের যুদ্ধ ও ইতিহাসের ব্যাপারে জেনে নিতে আদেশ করেছিলেন। একইভাবে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুআয (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে ইয়েমেনের উদ্দেশ্যে পাঠানোর সময় প্রথমে বলেন, “তুমি কিতাবীদের কাছে যাচ্ছ।” এরূপে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুআয (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে প্রথমেই তাদের আদর্শিক বা সাংস্কৃতিক পটভূমি সম্বন্ধে অবহিত করেন এবং তারপর নির্দেশ করেন যে, কিভাবে তাদের সাথে কথা বলতে হবে, তাদেরকে সম্বোধন করার সময় কোন বিষয়টি প্রাধান্য দিতে হবে এবং কি বিষয় দিয়ে তাদেরকে দাওয়াহ দেয়া শুরু করতে হবে।

এই বিষয়গুলো বিবেচনা করুন এবং তা নিজের অন্তরে গেঁথে নিন। তারপর ভেবে দেখুন কিভাবে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মানুষদেরকে তাদের বুদ্ধিমত্তা অনুযায়ী দাওয়াহ দিয়েছেন এবং তাদের সাথে কথা বলেছেন। মানুষেরা যে ব্যাপারগুলো শ্রদ্ধা করে সেগুলো ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক না হলে তিনি সেগুলোকে স্পষ্টভাবে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাদের সামনে তুলে ধরতেন! এই বিষয়টি বুঝার জন্য সংকীর্ণমনা হওয়া থেকে সতর্ক হোন, এ ব্যাপারটিকে কোনো প্রকারের চাটুকারিতা বা তোষামোদ ভাববেন না, যেমনটা অজ্ঞ লোকেরা ভেবে থাকে। কারণ বুখারীতে এসেছে আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণনায়,

“মানুষদেরকে তাদের বুঝ অনুযায়ী দাওয়াহ দাও – তুমি কি এমনটা পছন্দ করবে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ব্যাপারে মিথ্যা ধারণা দেয়া হোক?”

সম্বোধিত ব্যক্তি একগুঁয়ে ও দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত নাকি শান্ত ও শুনতে ইচ্ছুক এই বিষয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিজ্ঞ বিবেচনার পরিচয় পাওয়া যায় যখন তিনি মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিম্নোক্ত নির্দেশ বিচক্ষণতার সাথে প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করেছিলেন,

لَا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নি এবং কখনোও তোমাদেরকে তোমাদের বাড়িঘর থেকে বহিস্কার করে নি, তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার ও ন্যায় আচরণ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন।[৩]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরও বলেন,

۞ وَلَا تُجَٰدِلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مِنْهُمْ ۖ

তোমারা কিতাবধারীদের সাথে উত্তম পন্থা ব্যতীত কোনোরকম তর্ক-বিতর্ক করো না, তবে তাদের মধ্যে যারা জুলুম করে তাদের কথা আলাদা...[৪]

অনুরূপভাবে, স্বৈরশাসক ফেরাউনকে প্রথমবার সম্বোধন করার সময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মূসা ও হারূন (আলাইহিমাস সালাম) কে নির্দেশ দিয়েছিলেন,

فَقُولَا لَهُۥ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿٤٤﴾

তোমরা তার সাথে নম্র কথা বলবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা (আমায়) ভয় করবে।[৫]

---

[৩] সূরা মুমতাহিনা, আয়াত: ৮

[৪] সূরা আনকাবূত, আয়াত: ৪৬

[৫] সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ৪৪

কিন্তু যখন সে সুস্পষ্ট আয়াতের বিরোধিতা ও প্রত্যাখ্যান করলো এবং অহংকার প্রদর্শন করলো, তখন মূসা (আলাইহিস সালাম) তাকে বললেন,

لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنزَلَ هَٰٓؤُلَآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآئِرَ وَإِنِّى لَأَظُنُّكَ يَٰفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴿١٠٢﴾

..."তুমি একথা ভালো করেই জানো যে, এই সমস্ত স্পষ্ট নিদর্শনাবলী আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালকই অবতীর্ণ করেছেন (তাঁর একত্ববাদ ও সর্বশক্তিমত্তার) প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ; হে ফেরাউন, আমি তো মনে করি তুমি সত্যিই একজন ধ্বংসপ্রাপ্ত মানুষ।"[৬]

তাই একবার ভেবে দেখুন, তাঁরা (আলাইহিমাস সালাম) ফেরাউনকে প্রথমে কিভাবে সম্বোধন করেছিলেন, আর একগুঁয়েমি প্রদর্শনের পর কিভাবে তাকে সম্বোধন করেছিলেন।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিভাবে মুমিনদের ও তাঁদের দাওয়াতের সামর্থ্য এবং তাঁরা যে পর্যায়ে বসবাস করছিলেন তার প্রকৃতি, এবং জিহাদের বিধানসমূহের ধারাবাহিক আগমনের বাস্তবতাকে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন তাও লক্ষ্যণীয়; যেখানে প্রাথমিক সময়ে ইসলামের শত্রুদের কৃত আক্রমণের প্রতিউত্তরে আক্রমণ না করা, ক্ষমা করা, উপেক্ষা করা এবং সেসকল মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং তাদের কৃত ক্ষয়-ক্ষতির ব্যাপারে ধৈর্যশীল হবার আদেশ দেয়া হয়েছিল।

মুমিনরা যখন হিজরত করলেন এবং আশ্রয় ও সমর্থন পেলেন, এবং তাঁরা যখন তাঁদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্যায়ে ছিলেন, তখন তাঁদেরকে আত্মরক্ষামূলক ও মুশরিকদের আক্রমণ প্রতিহত করতে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়, কিন্তু তখনও তা তঁদের উপর ফরয (আবশ্যকীয়) ছিল না।

এই সময়ে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন অনেকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হতে বিরত থাকতেন যাদের মৃত্যু মুসলমানদের জন্য আরও বেশী ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। মুনাফিকেরা

---

[৬] সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ১০২

কিভাবে তাঁদের ক্ষতিসাধন করেছে তা শুনে সাহাবীরা (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) যখন সেসকল মুনাফিকদের হত্যা করার অনুমতি চেয়ে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে আবেদন করতেন, তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উত্তর দিতেন, "তাদেরকে ছেড়ে দাও, (নতুবা) মানুষেরা বলবে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সঙ্গীদেরকে হত্যা করে।" কোনো সময় তিনি বলতেন, "তাহলে ইয়াসরিবে অনেকগুলো নাক তার জন্য দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে।"

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইহুদীদের সঙ্গে সন্ধি ও শান্তি চুক্তি করেছিলেন এবং তাদের বিদ্যমান চুক্তি এই পর্যায়ে তুলে ধরেছিলেন যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমনকি তাদের সাথে এই চুক্তিও করেন যে, তিনি কোনো যুদ্ধে লিপ্ত হলে তারা তাকে সাহায্য করবে। কিন্তু পরবর্তীতে তারা তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ক্ষতি করতো এবং "রাইনা" বলতো যা অত্যন্ত অপমানজনক কথা হিসেবে বিবেচিত হতো, এবং তারা বলতো, "আমরা শুনি এবং তোমরা যেন কিছুই শুনতে না পাও," এবং অনুরূপ অন্যান্য বাক্য বলতো যা তিনি ধৈর্য সহকারে সহ্য করতেন। তারা তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যু কামনা করে তাঁকে অভিবাদন জানাতো। এর জবাবে তিনি সহজ উত্তর দিতেন, "ওয়া আলাইকুম (তোমাদের উপরেও)।" তারা তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ক্ষতিসাধন করা সত্ত্বেও তিনি তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেন না, তাদেরকে হত্যা করতেন না। বরং এর বিপরীতে যখন সাহাবাগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) তাদেরকে হত্যা করার অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছিলেন তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদেরকে বারণ করেছেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বলতেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আইশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) কে তাদের কৃত অনিষ্টের পাল্টা জবাবে তাদেরকে অভিশাপ দিতে বারণ করতেন, আর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতেন, "যেখানে উদারতা পাওয়া যায় সেখানে সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়, আর যেখানে উদারতা নেই তা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যায়।" নিঃসন্দেহে এগুলো একারণেই যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুসলিম রাষ্ট্রের অবস্থার কথা বিবেচনা করতেন যেটা তখনও সূচনাপর্বের কাছাকাছি ছিল ও প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল মাত্র।

পরবর্তী আদেশ ছিল সীমালঙ্ঘনের প্রতিউত্তরে অনুরূপ জবাব দেয়া এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যারা ঈমানদারদেরকে তাঁদের ঘরবাড়ি ও সম্পদসমূহ থেকে বহিষ্কার করেছিল।

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বদরে মুসলমানদেরকে শক্তিশালী করেন। এটাই ছিল তাঁদের প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্যায়, কারণ তা মদীনার অধিকাংশ কাফেরদের ঘাড়ে আঘাত হানে ও বাকিদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার ঘটায়। এই পর্যায়ে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিছু সংখ্যক ইহুদীকে বশীভূত করেন, যাদের মৃত্যু মুসলমানদের বা তাঁদের রাষ্ট্রের কোনো ক্ষতি সাধন করবে না; নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইহুদীদের তাগুত কাব ইবনুল আশরাফ এবং তার মতো অন্যান্যদেরকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যাপকহারে এই হত্যাকান্ড ঘটান নি; বরং, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শুধু তাদের হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন যারা তাঁর ক্ষতি করেছিল এবং যাদেরকে হত্যার ফলে কোনো খারাপ প্রতিক্রিয়া হবে না। যখন মদীনার পরিস্থিতি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্য আরও স্থিতিশীল হলো, তখন তিনি কিছু সংখ্যক লোককে নির্বাসিত করেন এবং কিছু সংখ্যক লোককে হত্যা করেন, কিন্তু এগুলোও করা হয়েছিল ইহুদীরা তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা বা চুক্তিভঙ্গ করার ফলস্বরূপ, এবং তা করা হয়েছিল মদীনাবাসী ও সেসকল নতুন মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে যারা ইহুদীদের সাথে চুক্তিবদ্ধ ও স্বার্থযুক্ত ছিল। যদি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোনো ভালো কারণ ছাড়া এর আগেই এমনটা করতেন তাহলে তা তাদের মধ্যে ক্রোধের উদ্রেক করতো। কিন্তু নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কর্মপদ্ধতি ছিল প্রাজ্ঞ শরীয়ত এর ফিক্হ ও রাজনীতি ভিত্তিক; আর যে কেউই এই শরীয়ত এর দিক নির্দেশনা থেকে বঞ্চিত, নিশ্চয়ই সে পথভ্রষ্ট হবে এবং মুসলমানদের ক্ষতি সাধন করবে।

শাইখ আবু মুহাম্মদ আসিম আল-মাকদিসী (আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন) এর পক্ষ থেকে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা

{هذا بعض ما عندي وليس كله}

এখানে আমি কিছু বলেছি, পুরোটা নয়

লেখক: আবু মুহাম্মদ আসিম আল-মাকদিসী

পরিবেশনায়: বালাকোট মিডিয়া

বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম

আলহামদুলিল্লাহি ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহ

হামদ ও সালাতের পর,

পবিত্র কোরআন নাযিলের মাস রমজানকে সামনে রেখে আমার কয়েকটি উপলব্ধি ও পর্যালোচনা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা উচিৎ বলে মনে করছি। আল্লাহর কাছে দোয়া করছি, তিনি যেন আমাদেরকে হক্ ও বাতিলের পার্থক্য করার যোগ্যতা দেন এবং . . . .(আরো কয়েকটি দোয়া)।

প্রথমত: গত দুই সপ্তাহ ধরে সাক্ষাতপ্রার্থীদের ভীড় থাকার পরও আমি অনেক বিষয়ে শুনেছি। সবগুলো বিস্তারিত না শুনলেও অনেক বিষয়েই শুনেছি। আরো অনেক বিষয় বিস্তারিত পড়ার ও জানার আছে। সবকিছু জানার পর (এটাই উপলব্ধি হয়েছে যে), দুই গ্রুপের (শাইখ এর দ্বারা ISIS ও শামের অন্যান্য মুজাহিদদের উদ্দেশ্য করেছেন) প্রত্যেকেই নিজের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী নিজের পক্ষের মতটিকে দলিল-প্রমাণ দিয়ে (হক্ বলে) প্রমাণ করার চেষ্টায় কোমর বেঁধে নেমেছেন। তাদের অধিকাংশের দলিলই শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য নয়। এসব কথার অধিকাংশই আমার কাছে জেলখানা থেকে বের হবার আগেই এসেছে, এবং আমি তখনই সেগুলো ভালোভাবেই জেনেছি। কিন্তু তারপরও আমি চোখ কান বন্ধ না করে ধৈর্য ধরে সেগুলো শুনেছি। কেননা এর মধ্যেও উপকার রয়েছে। কেননা আমি মনে করি, হয়তোবা এর মাধ্যমে “অন্তরে” হক্ আরো সুদৃঢ় হবে নতুবা পূর্বের ভুল থেকে “হক্” এর দিকে ফিরে আসা যাবে।

দ্বিতীয়ত: এতে কোন সন্দেহ নেই, দুই গ্রুপের যাদের কাছ থেকে আমি (যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি) শুনেছি, তারা জ্ঞানী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিত্ব। তারা হক্বের বিজয়ই চান। এবং বাতিলের পক্ষে দলবাজি করেন না, বরং তারা এরকম দলবাজি থেকে মুক্ত। যদিও যারা তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাদের মাঝে এমন দলবাজি (তাআসসুব) দেখা যায়। আমি তাদের সাথে সাক্ষাত করতে পেরে খুবই আনন্দিত, এবং তাদের সাথে সম্পর্ক থাকার ব্যাপারটি দৃঢ়ভাবে স্বীকার করছি। তারা আমার মজলিসে (বৈঠকে) খুবই প্রভাব ফেলেছেন।

আবার অন্যদিকে তাদের মতো আরো কিছু লোক রয়েছে, যারা সংশোধন ও হক্ নির্ধারণের ক্ষেত্রে সত্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে। এদের ভিতর আবার কতক এমন দলান্ধ ব্যক্তি আছে, যাদের ব্যাপারে এই প্রবাদটি বলা যায়,

(المتحيز لا يميز) **"পক্ষপাতদুষ্ট ব্যক্তি হক্ বাতিলের আর কি পার্থক্য করবে!"**

এরা আমার সাথে সাক্ষাত করে কোনো উপকার তো বয়ে আনে নি, উপরন্তু আমাকে কেবল ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে। এদের জন্য উচিত হলো, "কথা শুনা ও সংরক্ষণ" করার প্রশিক্ষণ নেয়া।

তৃতীয়ত: আমাকে খুব চাপ প্রয়োগ করা হয়েছে, যাতে করে আমি আমার পূর্বের বিবৃতি থেকে ফিরে আসি, যা আমি প্রকাশ করেছিলাম "দাওলাহ" নামক দলটির (ISIS) সাথে অন্যান্যদের সমঝোতা চুক্তি অথবা উভয়ের মাঝে তাহকীমের (সালিশ) চেষ্টা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর। "দাওলাহ" (ISIS) জামাআতই এই সালিশ প্রত্যাখ্যান করেছিল। তখন কিছু লোক এই বলে শপথ করেছিল যে, আমার পূর্বের বিবৃতি প্রত্যাখ্যাত (বাতিল) অথবা অচিরেই প্রত্যাখ্যান করা হবে। এসব শপথের কিছুই আমার পক্ষ থেকে বলা হয় নি। আর আমি এ ব্যাপারে কাউকে দায়িত্বও দেই নি। (এর সবই মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ব্যতীত আর কিছুই নয়)

কিন্তু এসব লোকের সামনে আমি বারংবার যা বলেছি এবং এখনও বলছি, স্বাভাবিকভাবে আমার কথা "নিষ্পাপ" নয় , এবং আমি নিজেও "নিষ্পাপ" নই। কিন্তু উভয় পক্ষ থেকে প্রাপ্ত চিঠিপত্রের মাধ্যমে পাওয়া ধারাবাহিক সংবাদের উপর ভিত্তি করেই তা (আমার পূর্বের বিবৃতি) এসেছিল। বিশেষ করে, সমঝোতা ও শরঈ সালিশ প্রত্যাখ্যানকারীদের খবরাখবর (আমি ভালোভাবেই পেয়েছি)। এদের কেউ কেউ দাবি করছেন যে, আমি কেবল এক দিক থেকেই সংবাদ পেয়েছি। এই দাবি বাতিল (প্রত্যাখ্যাত)। কেননা জেলখানায় আমার সাথে একই কামরায় "দাওলাহ" দলটির (ISIS এর) সমর্থকও ছিল। যারা সিরিয়ার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সাপ্তাহিক সংবাদ পেতো। বেশীরভাগ সংবাদই হতো জামাআতুদ দাওলাহ এর (ISIS এর)। এবং (কারাগারে থাকাকালীন) আমার নিকট জামাআতুদ দাওলাহ (ISIS) এর অনেক ঘটনা, সংবাদ ও চিঠিপত্র এসেছে। অনুরূপভাবে পত্র বিনিময়ের মাধ্যমেই দাওলাহ এর শরঈ সালিশ প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারটি জেনেছিলাম। আর (দাওলাহ এর) সমঝোতা প্রত্যাখ্যানের এসব ডকুমেন্টগুলো এখনও আমার কাছে সংরক্ষিত আছে, যা সংশয়গ্রস্থ লোকদের সংশয় দূর করতে সক্ষম হবে।

আমি আবারও এ কথার পুনরাবৃত্তি করছি, যখনই আমার সামনে মনে হবে যে, আমি আমার পূর্বের বিবৃতিতে কারো উপর জুলুম করেছি, অথবা সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে সীমালঙ্ঘন করেছি, তৎক্ষণাৎ পূর্বের কথা থেকে ফিরে আসতে আমি দ্বিধাবোধ করব না। কেননা "হক্" হলো আমার হারিয়ে যাওয়া সম্পদ। আর হক্বের অনুসারীরা সবাই আমার কাছে সমান, তিনি যে কোনো পক্ষের সাথে সম্পৃক্ত বা বিচ্ছিন্ন থাকুক না কেন।

আমার (পূর্বের বিবৃতিটি) প্রকাশ করার কারণ হলো, এক পক্ষের (ISIS) "আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী শরঈ সালিশ" মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানানো। এটাও ঠিক যে, যারা (IF ও JN) আল্লাহর বিধান অনুযায়ী সালিশ মেনে নিয়েছিল, আমরা তাদেরকে (ঐসব লোকদের সাথে) সম্পর্কচ্ছেদের নাসীহা দিয়েছি যারা সালিশ প্রত্যাখ্যান করেছে (ISIS)। তবে আমরা এটাও বলছি না যে, যাদেরকে সম্পর্কচ্ছেদের আহ্বান জানানো হয়েছে (IF & JN), তারা একেবারেই নিষ্পাপ অথবা আমরা তাদেরকে পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ (তাজকিয়ার সনদ দিচ্ছি না) বলে স্বীকৃতিও দিচ্ছি না। বরং বিষয়টিকে আমরা সেভাবেই দেখছি, যেভাবে শাইখুল ইসলাম (ইবনে তাইমিয়্যাহ) রহিমাহুল্লাহ বলেছেন:

(والعدل المحض في كل شيء متعذر، علماً وعملاً، ولكن الأمثل فالأمثل) الفتاوى (99/10)

"ইনসাফভিত্তিক মূলনীতি হলো, প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই অভিযোগ রয়েছে। তবে বিচার হবে অধিক থেকে অধিকতর উদাহরণের (প্রমাণের) মাধ্যমে।" (মাজমুউল ফাতওয়া- ১০/৯৯)

চতুর্থত: এটা আমি বারবারই বলেছি, ইনসাফ বা ন্যায়পরায়ণতা হলো সম্ভ্রান্ত বংশের নেতাদের ভূষণ। আর লড়াইরত দুই গ্রুপের মধ্যেই সম্ভ্রান্ত নেতার অভাব প্রকট। কিন্তু সব দেশেই তাদের সমর্থকদের উপস্থিতি আছে। এই ইনসাফ স্বল্পতার কারণে দু'গ্রুপের একদল নিউজ একটিভিস্ট ও মুফতী থেকে এমন কিছু অপরাধ প্রকাশ পাচ্ছে, যা বিভিন্ন দেশের অহঙ্কারী যুবকদের মাঝে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। এসব অহঙ্কারী যুবকরা যেন তাদের মনের মতো একজন দুষ্কৃতিকারী নেতা পেয়েছে। গালাগালি, বেয়াদবী, অহেতুক খারাপ ধারণা আর অপরকে হেয় করার ক্ষেত্রে এরা এসব নেতাকে ইমাম হিসেবে মান্য করছে। মুক্তি পাবার পূর্বেই আমি উভয় গ্রুপের ঝগড়ারত একরকম নিউজ একটিভিস্ট ও মুফতীদের সম্পর্কে জেনেছি। এদের কিছু কিছু কথা আমি প্রত্যাখ্যান করেছি ও অস্বীকার করেছি। জেলের ভিতরে যেরকম নির্বোধ আচরণ ও অন্যায় দেখেছি, জেল থেকে বের হবার পরও এমনই দেখেছি। এহেন কাজের "কারবারী"কে মুজাহিদ কিংবা শরঈ গুণে গুণান্বিত করা যায় না। বরং তাদেরকে শরঈ (শরীয়তের) লোক না বলে "শাওয়ারী" (রাস্তার লোক) বলাই

অধিক যুক্তিযুক্ত। তাছাড়া বিরোধীদেরকে রাস্তার ছেলে, জারজ সন্তান এবং এ ধরনের বিভিন্ন অশ্লীল শব্দ ও রুচি-বহির্ভূত শব্দ দ্বারা অপবাদ দেওয়া ...এগুলো ছাড়াও অন্যান্য মিথ্যা, অপবাদ ও মিথ্যাচার শব্দ দ্বারা প্রতিপক্ষকে আঘাত করা - এটা তাদের জন্যে উচিত না যাদের হাত দিয়ে আল্লাহর নামে স্বাক্ষর ও দ্বীনের ফতোয়া বের হয়... তাছাড়া উদ্বুদ্ধ করা মুসলমানদেরকে নির্দোষ রক্ত প্রবাহ করার দিকে এবং রক্তকে সস্তা মনে করার দিকে; এমনকি এটা যেন সারা বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এ যুগের যুবকদের জন্যে মন্দ অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, এটা শুধু যে শামের পরিমণ্ডলে তা নয়, এটা সাধারণ ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে এবং ছেয়ে গেছে স্বল্প শিষ্টাচার প্রকাশ, ছোট, বড়, উলামা ও গুরুজনদের ব্যাপারে জুলুম করার মধ্য দিয়ে; বরং মুসলমান প্রতিপক্ষের উপর সীমালঙ্ঘন, তাদের চামড়া ও রক্তকে হালাল মনে করা (পর্যন্তও), আমাদের জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট, যা তারা প্রচার করছে সাধারণ ও বিশেষ ব্যক্তিদের মাঝে।

আমরা অবাক হই যে, এই সব নীচুমনের চরিত্রের অধিকারী শরীয়াহ বিশেষজ্ঞরা, মুফতিরা ও অফিসিয়াল মুখপাত্ররা মুসলমানদের রক্তের প্রতি দু:সাহস দেখিয়ে কী বলে!!!

তাই আমরা নিজেদেরকে তাদের এই বাতিল থেকে মুক্ত ঘোষণা করলাম এবং সব স্থানের দায়িত্বশীলদের প্রতি আহবান করছি, "তারা যদি আল্লাহর দ্বীনের প্রতি সত্যিকার প্রেমী হয় তাহলে তারা যেন এই ধরনের পরিবেশ এবং চরিত্রকে ছাটাই করে, বিশেষ করে জিহাদ ও মুজাহিদদের ক্ষেত্রে; আমরা তাদের নিকট প্রত্যাশা করবো তারা যেন এদেরকে বক্তব্য ও নেতৃত্বের স্থান থেকে দূরে রাখেন; তারা প্রতিদিন তাদের অন্তঃসারশূন্য ভাষণ দ্বারা দ্বীনের মাঝে বাধা সৃষ্টি করছে এবং তাদের তির্যক পদ্ধতির দ্বারা দ্বীনের মজবুত পদ্ধতি থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে, দ্বীনের মহান চরিত্রকে তাদের নোংরা চরিত্র দ্বারা কলুষিত করছে; সুতরাং যারা জিহাদের কল্যাণ চায় তাদের জন্যে এ ধরনের স্বল্প শিষ্ট, নিজে ভ্রষ্ট ও অন্যকে ভ্রষ্টকারী, মুসলমানদের রক্ত প্রবাহের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী, নোংরা চরিত্র বিস্তারকারী ও যুবকদের মধ্যে অশ্লীল শব্দ প্রয়োগকারীদেরকে দূরে সরানো ব্যতীত উপায় নেই; তাদের বদলে এমন ব্যক্তিদেরকে দায়িত্বশীল বানানো উচিৎ যারা নিজে হেদায়াতপ্রাপ্ত, অন্যকে হেদায়াতকারী, মুসলমানদের প্রতি কোমল নবী-চরিত্রে চরিত্রবান এবং উম্মতকে নিয়ে এই আদর্শেই চলে ... যারা জানে কিভাবে সকল মানুষদেরকে সম্বোধন করতে হয়।"

পঞ্চমত: আমার কাছে সিরিয়ার লোকদের সুত্রে অনেক বিজ্ঞজন বর্ণনা করেছেন যাতে করে তারা আমার উপর প্রভাব ফেলেন যেন আমি ঐ বিবৃতি থেকে ফিরে আসি কেননা এই বিবৃতির কারণে অনেক রক্ত প্রবাহিত হয়েছে অথবা এর প্রকাশের পর দাওলার বিরোধীরা আমার নামে অনেক অপারেশন উৎসর্গ করেছে যার নাম ছিল **"মিল্লাতে ইব্রাহীম"**। এখানে এটা হচ্ছে চাপ ও প্রভাব বিস্তারের কথা, যেন আমি আমার বক্তব্য থেকে ফিরে আসি। এই ধরনের পদ্ধতি যা কখনো কখনো উপকারী হয় "আলোচনা" অথবা "লেনদেনের" ক্ষেত্রে, কিন্তু এটা (এই পদ্ধতি) অসার হয় "দলিল উপস্থাপন", মুখোশ উন্মোচন, সত্যকে প্রমাণিত করা এবং বাতিলকে বাতিল বলে আখ্যায়িত করার ক্ষেত্রে। সুতরাং এই অবস্থায় এ ধরনের আচরণে কোনো লাভ নেই, দাবির ক্ষেত্রে অবশ্যই মাপকাঠি দেখা প্রয়োজন। কেননা বিবৃতির মধ্যে মুসলমানদের রক্ত প্রবাহের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয় নি, না হত্যার দিকে নক করা হয়েছে অথবা একথা বলা হয়েছে যে, সর্বশক্তি দিয়ে যুদ্ধ করা হউক যা বিগত আট মাসের মধ্যে ব্যয় হয়েছে তা নিয়ে। বরং এই বিবৃতি এই উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে যাতে করে এর দ্বারা রক্তের রক্ষা হয় ও বন্দুকের নল মুসলমান ও মুজাহিদদের বুক থেকে ফিরিয়ে নেওয়া হয় এবং অন্য মুসলমানকে অবজ্ঞা করা অথবা তার অধিকার আদায় করা থেকে বিমুখতা ত্যাগ করা হয়; এর উদ্দেশ্য ছিল, দাওলার অজুহাত তুলে ও দাওলা প্রতিষ্ঠা বা অন্য কারণ দর্শিয়ে মুসলমানদের রক্ত ও মালকে সস্তা করার কাজ থেকে বিরত রাখা। মনে হচ্ছে যে, অন্যরা তা চায় না যে, দাওলা প্রতিষ্ঠা বা আল্লাহর আইন বাস্তবায়িত হউক। সর্বাবস্থায় যারা সালিশ মানতে প্রত্যাখান করে তারাই রক্ত প্রবাহের ধারাবাহিকতার দায়িত্ব বহন করতে পারে; তেমনিভাবে তারাও এর দায় নিতে পারে যারা সব দিক দিয়ে রক্তপাতে লিপ্ত আছে; অতঃপর আমি আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করি যে, তিনি আমাকে মুসলমানদের একফোঁটা রক্ত প্রবাহ করা থেকে মুক্ত করেছেন এবং আমি আল্লাহর কাছে চাই যে, আমি যেন এ ব্যাপারে কারণ না হয়ে পড়ি, হোক তা এক অক্ষর অথবা শব্দাংশের দ্বারা; সুতরাং আমি এই পদ্ধতিতে চাপ প্রয়োগকারীদেরকে বলছি **"আপনারা থামুন"**। **(আমি সেই ব্যক্তি নই, যে পিছন দিয়ে আঘাত করে),** তেমনি আমি তাদেরকে বলছি যারা আমাকে উৎসর্গ করে কোনো অপারেশন করেছে, যার দ্বারা কোনো না কোনো ভাবে কোনো মুসলমানের রক্ত প্রবাহিত হয়েছে, **(بل أنتم بهديتكم تفرحون)** তোমরাই তোমাদের উৎসর্গ দ্বারা আনন্দিত হয়েছো।

তোমরা যদি আমাকে উৎসর্গ করতে চাও তাহলে উৎসর্গ করো আমার উপদেশের আনুগত্য করে ও সাড়া দাও আমার ডাকে মুসলমানদের রক্ত রক্ষায়, সালিশ, আত্মশুদ্ধি এবং দাওয়াত ও জিহাদের ক্ষেত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মানহাজের (পন্থার) উপর অবিচল থেকে; এটাই আমি তোমাদের কাছে চাই যে, তোমরা আমাদেরকে উৎসর্গ করো যদি তোমরা আমাদেরকে ভালোবাসো এবং তোমরা চাও আমাদের চক্ষুকে শীতল করতে; আমাদের চক্ষু কখনো ইসলামের গন্ডিতে থাকাবস্থায় কোনো মুসলমানের রক্ত প্রবাহ দ্বারা শীতল হবে না যদিও সে গোনাহগার হয়; আমরা ঘাতক থেকে আত্মরক্ষা ব্যতীত কোনো মুসলমানকে হত্যা করাকে বৈধ মনে করি না, যেটা মুখ ও হাত দ্বারা প্রতিহত করা যায় এর জন্যে অস্ত্র ব্যবহার জায়েজ নয়, কেননা আসল কথা হচ্ছে একজন মুসলমানের রক্ত, জান ও ইজ্জত হারাম বা সম্মানিত।

ষষ্ঠত: আমাকে ইরাকে দাওলার বিজয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে।

আমি বলেছি, এমন কোনো মুমিন পাওয়া যাবে না যারা মুসলমানদের বিজয়ে আনন্দিত হবে না যখন এই বিজয় অর্জিত হয় রাফেজী এবং মুরতাদদের বিপক্ষে; কিন্তু ভয় হচ্ছে এই বিজয়ের সর্বশেষ লক্ষ্য নিয়ে, যে, কি ব্যবহার করা হবে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ, অন্য দাওয়াতী ও মুজাহিদ গ্রুপসমূহ অথবা স্বাধীন এলাকার সাধারণ মুসলমানদের সাথে? এই ভারী অস্ত্রের বিরোধী কারা হবেন যা ইরাক থেকে গণীমত হিসেবে অর্জিত হয়েছে এবং সিরিয়ায় তা প্রেরণ করা হয়েছে? এটা আমার প্রশ্ন এবং এটা জানা আমার আগ্রহ? আমরা ভয় করছি এই বিষয়ের উত্তরের ব্যাপারে; কেননা আমরা অনেক কারণে অস্ত্র উঠানোর কারণ সম্পর্কে বুদ্ধির উপর নির্ভর করছি না।

সপ্তমত: আজকের এই দিনে আমাকে বলা হলো, আপনি কি অমুকের লেখা সম্পর্কে অবগত হয়েছেন যিনি খিলাফাহ সম্পর্কে বলেছেন অথচ তামকীন (ভূখন্ডে পূর্ণ অবস্থান) শর্ত দেন নি!!!

আমি বললাম, আমি এ ব্যাপারে অবগত হই নি; কিন্তু লিখিত বিষয় তার শিরোনাম সহকারে পড়া হয়েছে; অবশ্যই তাদের তানযীমকে "খিলাফাহ" নামে নামকরণ করা তাড়াহুড়া হয়ে যাবে।

তারপর তিনি বললেন, আপনার অভিমত কি যদি তারা এ ব্যাপারে ঘোষণা দিয়ে দেয়?

আমি বললাম, তাদের নামকরণ ও ঘোষণায় আমার কোনো ক্ষতি হবে না এবং কক্ষনো আমার সময় ব্যয় করবো না ওই ব্যক্তি যা লিখেছেন এ ব্যাপারে অতিরিক্ত কথা বলে; আমরা প্রত্যেকেই কামনা করি খিলাফাহ প্রত্যাবর্তনের জন্যে, সীমান্ত চূর্ণ হওয়ার জন্যে, তাওহীদের ঝান্ডা উত্তোলনের জন্যে, শিরকের পতাকা অবদমিত করার জন্যে এবং এটা মুনাফিক ছাড়া কারো কাছে অপছন্দনীয় হবে না; **আসল কথা হচ্ছে নামের সাথে কাজের মিল, বাস্তবে তা প্রয়োগ, কার্যত তা ভূমিতে বাস্তবায়ন।**

যে ব্যক্তি সময়ের পূর্বে কোনো কিছু পাওয়ার জন্যে তাড়াহুড়ো করে, সে তা হারিয়ে এর পরিণাম ভোগ করে; কিন্তু যে বিষয়কে আমি অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি তা এই যে, এই ঘোষণাকে জাতি কিভাবে দেখবে? এবং এই নামকরণকে? যা ক্রমান্বয়ে ইসলামিক স্টেইট ইন ইরাক অতঃপর ইরাক ও শাম, অতঃপর জনসাধারণের খিলাফাহ; এটা কি হতে পারবে প্রত্যেক দুর্বলের আশ্রয়স্থল! এবং প্রত্যেক মুসলমানের নিরাপদস্থল! নাকি এই নামকরণ হবে তাদের বিরোধীদের জন্যে উন্মুক্ত তরবারি!! এবং এর দ্বারা ওইসব ইমারাহ লুপ্ত করা যেগুলো তাদের রাষ্ট্র ঘোষণার পূর্বে হয়েছে!! এবং এর দ্বারা ওইসব গ্রুপ বাতিল বলে গণ্য হবে যারা তাদের পূর্ব থেকে বিভিন্ন ময়দানে জিহাদ করছে!!!

এক্ষেত্রে অগ্রগামী হয়েছেন ককেশাশে আমাদের ভাইয়েরা তাদের বরকতময় ইমারাহ ঘোষণা করে এবং এক্ষেত্রে তারা এমন কিছু করেন নি যা সমগ্র ভূখন্ডের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জন্যে আবশ্যক হয়ে যায় এবং এই নামকরণের দ্বারা রক্তপাত হয় নি বা হারাম রক্ত প্রবাহিত হয় নি; সুতরাং "ইমারাতে ইসলামী ককেশাশ" এর প্রতি এই গোষ্ঠীর (ISIS এর) নিজেদেরকে "খিলাফাহ" নামকরণ ঘোষণার পরে নীতি কী হবে?

তেমনি তালেবানগণ তাদের (ISIS এর) পূর্বে "ইমারাতে ইসলামী" ঘোষণা করেছে, এবং এখন পর্যন্ত তাদের **আমীর "মোল্লা উমর"** (আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন) বিদ্যমান থেকে তিনি এবং তাঁর বাহিনী শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছেন। সুতরাং, (তাদের পক্ষ থেকে) কি হুকুম প্রয়োগ করা হবে ওই ইমারাহ (ISIS) সম্পর্কে যা বাস্তবেই ভূমিতে কয়েক বছর ধরে বিদ্যমান হয়ে হারাম রক্ত প্রবাহ শুরু করেছে অথবা কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে ফেলেছে; অপরদিকে এই ইমারাহ ("ইমারাতে ইসলামী আফগানিস্তান") সম্পর্কে কি হবে তাদের (ISIS এর) দৃষ্টিভঙ্গি যারা খিলাফাহ নামকরণ করেছে অথবা ঘোষণা করেছে?

কি হবে তাদের (ISIS এর) দৃষ্টিভঙ্গি ওই সব মুসলিম মুজাহিদ জামাআত ও মানুষদের সম্পর্কে যারা তাদের কাছে বাইয়াত দিয়েছেন যাদের লোক ইরাক-শাম এবং সমগ্র বিশ্বে রয়েছে? তাদের রক্তের মূল্য এদের (ISIS এর) কাছে কি হবে, যারা (ISIS) আজ নিজেদেরকে "খিলাফাহ" নামে নামকরণ করেছে অথচ তাদের (এই পদক্ষেপের) বিরোধী মুসলমানদেরকে একথা বলতে দ্বিধা বোধ করেনি যে, তাদের মস্তকসমূহ গুলি দ্বারা ছিন্ন করে দিবে?????

এইসব প্রশ্নসমূহ যেগুলো আমার কাছে অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ, যেগুলোর উত্তর জানা প্রয়োজন।

এখানে আমরা আদনানীর চিৎকারে কিছু সম্ভাব্য প্রশ্নের জবাব পেয়েছি; এটা হচ্ছে ওই জবাব যা আমরা ধারণা করেছি তার উপর বিন্দুমাত্র জুলুম করা ব্যতীত।

ইয়া আল্লাহ! মুসলমানদের উপর রহম করুন।

পরিশেষে আমরা মুসলমানদের রক্ত নিয়ে লিপ্ত ব্যক্তিদের সতর্ক করে বলছি, আপনারা একথা ভাববেন না যে, আপনাদের উচ্চস্বরই হবে সত্যের স্বর; আপনাদের হুমকি দ্বারা, আপনাদের চেঁচামেচি দ্বারা, আপনাদের স্বল্প শিষ্টাচার দ্বারা ও সীমালঙ্ঘন দ্বারা আমাদের সত্য প্রকাশের সাক্ষ্য প্রদানকে লোপ করতে পারবেন। না তা নয়.. বরং আমরা থাকবো এই দ্বীনের নিষ্ঠাবান পাহারাদার হয়ে; এই মিল্লাতের পাহারায় বিনিদ্র রক্ষক হয়ে, আমরা প্রতিহত করবো বিকৃতিকারীদের বিকৃতি, বাতিলের ধারকদের চৌর্যবৃত্তি, আত্মপ্রশংসা ও অতিরঞ্জনকারীদের ধুম্রজাল এবং অন্যান্য মুখোশধারীদেরকে... হয়তো তারা সংশোধিত হবে, সঠিক পথে আসবে, সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে ও বিরত হবে মুসলমানদের রক্তপাত করা থেকে এবং এই দ্বীনকে কুহেলিকাময় করা থেকে।

অন্যথায় তোমাদের বিরুদ্ধে আমাদের ধারালো তরবারির মতো জিহ্বা উন্মুক্ত করে দিবো যার অকাট্য প্রমাণ দ্বারা বাহনের কলিজা কর্তিত হয়ে যাবে এবং যার কথা দ্বারা আরোহী চলতে থাকবে ...

আপনারা এবং অন্যরা ভালোভাবে জানেন যে, আমরা শিকলে আবদ্ধ এবং কাঁটাসমূহ দ্বারা বেষ্টিত হয়েও কখনো নিশ্চুপ হই নি; সুতরাং কক্ষনো জেলের আগ্রাসন থেকে মুক্তির পরও নিরব হবো না;

আল্লাহর কসম, যিনি খুঁটিবিহীন আকাশকে দাঁড় করিয়েছেন! আমরা তাদের কাউকে ছাড়বো না যারা এই দ্বীনকে নিয়ে খেলা করবে এবং মুসলমানদের রক্তকে সস্তা মনে করবে, যদিও আমাদের মাথার উপরে পাখি উড়ে (মৃত্যু বুঝানো উদ্দেশ্য) এবং নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সবাই আমাদের উপর মিথ্যা, অপবাদ, এবং অপপ্রচারের তীর নিক্ষেপ করে...

এখানে আমরা আপনাদেরকে সতর্ক করছি দ্বীনকে নিয়ে ভাওতাবাজি করা, ফাসাদ সৃষ্টি, ফাসাদ এবং মুসলমান ও মুজাহিদদেরকে রক্তে রঞ্জিত করা থেকে ...

সুতরাং আল্লাহকে ভয় পাও এবং সত্য কথা বলো।

ولكل حادث حديث و لكل مقام مقال

"প্রত্যেক ঘটনায় কথা থাকে এবং প্রত্যেক স্থানে বাক্য থাকে।"

এখানে আমি কিছু বলেছি আমার কাছে যা ছিল পুরোটা নয়... আমি এটা এই সম্মানিত মাসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীস স্মরণ করাবস্থায় প্রচার করছি:

(من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه)

"যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলা এবং মিথ্যা কর্ম ত্যাগ করলো না, আল্লাহ্র নিকট তার খাওয়া ও পান করা ত্যাগ করার (উপবাসের) মধ্যে কোনো মূল্য নেই।"

এবং ইবনে মাসঊদ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, **"কিভাবে আপনারা রমজান মাসকে অভ্যর্থনা জানাতেন?"** তিনি জবাব দিলেন,

(ما كان أحدنا يجرؤ أن يستقبل الهلال وفي قلبه مثقال ذرة حقد على أخيه المسلم)

"আমাদের কেহ নতুন চাঁদ আগমনের ফলে তার মুসলমান ভাইয়ের প্রতি বিন্দু পরিমাণ হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করতো না।"

আবু মুহাম্মদ আসিম আল মাকদিসী
রমজানের প্রারম্ভ, ১৪৩৫ হিজরতে মুস্তফা আলাইহিস সালাহ ওয়াস সালাম

প্রকৃত মুমিন কখনো একই গর্ত থেকে দু'বার দংশিত হয় না

সতর্কতার মধ্যম পন্থা

শায়খ আবু মুহাম্মাদ আসিম আল মাকেদসী

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

আল্লাহ রব্বুল আলামীন ঈমানদারদেরকে আদেশ দিয়ে বলছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انفِرُوا جَمِيعًا

হে ঈমানদাররা! তোমরা তোমাদের সতর্কতা অবলম্বন করো, অতঃপর হয় দলে দলে বিভক্ত হয়ে কিংবা সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে অভিযানে বেরিয়ে পড়। (সূরা আন নিসা, আয়াত ৭১)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আরও বলেন-

وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। (সূরা আন নিসা, আয়াত ১০২)

অতএব আল কুরআনের এ সব আয়াত সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, সতর্কতামুলক উপায় অবলম্বন করা, সতর্ক পদক্ষেপ নেয়া, সাবধান থাকা এবং সতর্কতামুলক পদক্ষেপ হিসেবে প্রয়োজনে বিশেষ কোন তথ্য অন্যের কাছ থেকে গোপন রাখা অবশ্যই শরিয়াহ সম্মত; বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তা ফরয বা আবশ্যক হয়ে দাড়ায়[1]। আর একারণে

---

[1] শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহঃ বলেন বলেন জিহাদ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে এটা শুধু বৈধই নয় বরং অনেক ক্ষেত্রে দ্বীনের বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে বাহ্যিক বেশভূষা ও চালচলনে কাফেরদেরকে অনুকরণ করা বাধ্যতামুলক। বিষয়টির ব্যখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'কাফিরদের অনুকরণের বৈধতা প্রসঙ্গে যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তা সবই ছিল হিজরতের পূর্বে এবং পরবর্তীতে তা মানসুখ হয়ে গেছে; কেননা তখন পর্যন্ত ইহুদীরা তাদের বেশ ভুষা, পোশাক পরিচ্ছদ, হেয়ার স্টাইল কিংবা প্রতীকিভাবেও মুসলমানদের থেকে আলাদা স্বকীয়তা প্রকাশ করতে তৎপর হয়ে ওঠেনি। অতঃপর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ, চালচলন ও বেশভুষা সকল ক্ষেত্রে কাফিরদের বিরোধিতা ও নিজেদের স্বকীয়তা বজায় রেখে চলার হুকুম আসলো হিজরতের পরে। আর মুসলিম জাতির মাঝে বিষয়টি ব্যপকভাবে বিষয়টি বিকশিত হয় ওমর রাঃ এর সময় থেকে। এ হুকুম হিজরতের পরে আসার কারণ হল দ্বীনের প্রভাব প্রতিপত্তি সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, জিহাদের আমল আরম্ভ করা, তাদেরকে নত করে তাদের উপর জিযিয়া কর আরোপ করা ছাড়া কাফিরদের বিরোধিতা করে নিজেদের সম্পূর্ণ স্বকীয়তা বজায় রেখে চলা অনেক ক্ষেত্রে প্রায় অসম্ভব। একারণে শুরুর দিকে মুসলিমরা যখন দুর্বল ছিল তখন তাদের উপর এ হুকুম আরোপ করা হয়নি। অতঃপর আল্লাহ্‌র দ্বীন যখন স্ব মহিমায় নিজ প্রভাব নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে তখনই কেবল এই হুকুম এসেছে।

বর্তমান যুগের প্রেক্ষাপটে এর একটি উদাহরণ হল; এখনকার সময়ে যদি কোন মুসলিম কোন দারুল হারবে কিংবা দারুল কুফুরে থাকে তাহলে তার উপর এটা ফরয নয় যে বেশভূষা চালচলনে তাকে সকল ক্ষেত্রে কাফিরদের থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চলতে হবে; কেননা তার জন্য তা অনেক সময় ক্ষতির কারণ হয়ে দাড়াতে

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে কোন প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে গোপনীয়তা বজায় রাখার এমন কি তা সামরিক বিষয়াদি না হলেও। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'সতর্কতা অবলম্বন কর এবং লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য প্রার্থনা করো, কেননা যে ব্যক্তিই কোন অনুগ্রহ লাভে ধন্য হয় তাকেই ঈর্ষার পাত্র হতে হয়।[2]

রসুলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র শত্রুদের ব্যপারে সতর্কীকরণের ক্ষেত্রে যে সব শব্দাবলী ব্যবহার করেছেন এক্ষেত্রে তাও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি *তাম'ওয়ীহ* শব্দ ব্যবহার করেছেন যার অর্থ হল, মেকি, মিথ্যা ঘটনা সাজানো, জালিয়াতি; তিনি ব্যবহার করেছেন *মুখাদা'য়াহ* যার অর্থ হল বোকা বানানো, ধোঁকা দেয়া, প্রতারণা করা ইত্যাদি। আল্লাহ্‌র রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সতর্কতা বলতে নিছক স্পর্শকাতর তথ্য গোপন করাকেই বুঝাননি বরং এসব শব্দ তিনি প্রয়োগ করেছেন আগ বাড়িয়ে পরিকল্পিতভাবে শত্রু সেনাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব কলহ, মতবিরোধ ও বিভক্তি তৈরী, ফাটল ধরানো, বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতা সৃষ্টি করার নির্দেশ দান প্রসঙ্গে। এর প্রধান উদ্দেশ্য শত্রু সেনা ও তাদের গোয়েন্দাদেরকে বিভ্রান্ত করা।[3]

পারে। বরং দ্বীনী কল্যাণ থাকলে অনেক ক্ষেত্রে তাদের সাথে বাহ্যিকভাবে তাল মিলিয়ে চলা মুস্তাহাব, এমনকি অনেক সময় ওয়াজিবও হয়ে দাঁড়ায়; যদি এর মধ্যে দ্বীনী কল্যান থাকে। যেমন মুসলিমদেরকে তাদের চক্রান্ত ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচানোর জন্য তাদের মধ্যে গোয়েন্দাগিরী করা, এবং দ্বীনী দিক থেকে কল্যাণকর এমন যে কোন প্রয়োজনে। তবে আল্লাহ্ তা'য়ালা যে দেশে তার দ্বীনকে বিজয়ী করেছেন এবং কাফিরদের উপর অপমান ও জিযিয়া কর চাপিয়ে দিয়েছেন সে দেশে প্রকাশ্যে কাফিরদের বিরোধিতা করা এবং সকল দিক থেকে নিজেদের স্বকীয়তা বজায় রেখে চলা ওয়াজিব। (ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকীম ১/৪১৮- ৪১৯, তাহকীক শায়খ নাসীর আল আকল)

কারাবন্দি আপোষহীন মুজাহিদ নেতা শায়খ আব্দুল কাদের বিন আব্দুল আযিয (আল্লাহ্ তাকে দ্রুত মুক্ত করুন) এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন 'এই গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারে ইসলামের নীতি শরিয়াতের সুস্পষ্ট দলীল দ্বারা প্রমানিত। এর দ্বারা সে সব লোকের বক্তব্যও বাতিল হয়ে যায় যারা দাবী করে যে ইসলামে গোপন সংগঠন করা বৈধ নয়। এটা খুবই দুঃখজনক দাওয়াহর কাজে নিয়জিত অনেক লোকেরাও গোপনীয়তা রক্ষা করার ব্যাপারে বিরুপ মন্তব্য করে থাকে। তাদের এই বিরুপ মন্তব্য প্রমাণ করে যে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'য়ালা প্রস্তুতি গ্রহণ করার যে নির্দেশ দিয়েছেন তার বাস্তবতা তারা মোটেই অনুধাবন করতে পারেনি। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, **'তারা যদি জিহাদের পথে বের হতে চাইত তাহলে তারা অবশ্যই কিছু না কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ করে রাখত।** (সুরা আত তাওবা, আয়াত ৪৬)

[2] ইমাম বায়হাকী তার শুয়াবুল ঈমান এবং ইমাম তাবরানী তার মু'জামুল কাবির গ্রন্থে হাদিসটি সংকলন করেছেন এবং ইমাম আলবানী তার সহীহ আল জামে ও সিলসিলাতুস সাহীহার মধ্যে হাদিসটিকে সহীহ সাব্যস্ত করেছেন।

[3] এ বক্তব্যের পক্ষে জলন্ত প্রমাণ হিসেবে আমাদের সামনে রয়েছে বিভিন্ন সহীহ হাদীস ও সীরাত গ্রন্থে বর্ণীত নাঈম বিন মাসঊদ রাঃ এর ঘটনা। ঘটনাটি খন্দক যুদ্ধের সময়ের। এ যুদ্ধের মদীনার মুনাফিক ও ইহুদীরা মক্কার কাফেরদের সাথে এই মর্মে কোয়ালিশন করে যে তারা তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সহযোগিতা করবে। নাঈম বিন মাসউদ রাঃ তখনও পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন কুফফারদের এই কোয়ালিশনের মদীনা পক্ষের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। আল্লাহ্ তায়ালা এই সময়ে তার অন্তরে হেদায়াত ঢেলে দেন এবং তিনি গোপনে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তার ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখার নির্দেশ দিয়ে বলেন,

তাবুক যুদ্ধে দুই সাহাবীর অংশ্রগ্রহণ না করা সম্পর্কিত ঘটনা প্রসঙ্গে সহীহ আল বুখারীর বর্ণনায় কা'ব বিন মালেক রাঃ বলেন 'রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই কোন সেনা অভিযান প্রেরণ করতেন তখন (কোন অঞ্চলে বা কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করবেন সে সম্পর্কে) অভিযান শুরু হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি সব সময় ভুল তথ্য দিয়ে রাখতেন'।

তিনি তার সাহাবীদের মিশন এবং তার সেনা অভিযানের সফলতার লক্ষে যে সকল বিষয়ের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন তার মধ্যে অন্যতম হল *কিতমান* বা গোপনীয়তা রক্ষা। যেমন অনেক সময় তিনি কোন দিকে সেনা অভিযান প্রেরণ করতেন কিন্তু স্বয়ং সেই বাহিনীকেও বলতেন না যে তাদের গন্তব্যস্থান কোথায় ও লক্ষবস্তু কি, তিনি তাদেরকে

'তুমি যদি আমাদের মাঝে থাকতে চাও থাকতে পারো, তবে (উত্তম হবে) তুমি তাদের মাঝে ফিরে যাও এবং তাদের মধ্যে থেকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো; তোমার পক্ষে যতদুর সম্ভব তাদের মধ্যে থেকে তাদেরকে ভেতর থেকে দুর্বল করে দাও; মনে রাখবে যুদ্ধ মানেই হল ধোঁকা'। এ কালের সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য সীরাত গ্রন্থ আর রাহীকুল মাখতুমের বক্তব্য অনুযায়ী রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিমদেরকে সাহায্য করার জন্য সম্ভাব্য যে কোন রণকৌশল প্রয়োগের জন্য তাকে উৎসাহ দেন। এর পর তিনি ফিরে গিয়ে কুফফার কোয়ালিশনের প্রধান তিন পক্ষ কুরায়শ গাতফান ও ইহুদীদেরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলেন। তিনি বনু কুরায়যার প্রধানের সাথে সাক্ষাত করে বলেন যে কুরায়শদেরকে কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না, যদি তারা কাউকে আপনাদের কাছে যামিন না রাখে। তিনি তাদের নিজেদের পরামর্শ সভায় দাবী করেন যে কুরায়শরা যদি বুঝতে পারে যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর বিজয় লাভ করা সুদুর পরাহত তাহলে তারা তাদেরকে ফেলে চলে যাবে এবং মুসলমানরা তখন তাদেরকে একা পেয়ে তাদের উপর ভয়ানক প্রতিশোধ নিবে । এরপর নাঈম বিন মাসউদ রাঃ কুরায়শ বাহিনীর কাছে গিয়ে একই রকম কৌশল প্রয়োগ করেন, তিনি তাদেরকে বলেন যে তার মনে হচ্ছে ইহুদীরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করে এখন অনুতপ্ত, তারা এখন নিয়মিত তাঁর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছে। তারা তাঁর সাথে একটা চুক্তি করেছে যে তোমাদের থেকে জামিন স্বরূপ কয়েকজন লোককে নিয়ে তারা তাদেরকে মুসলমানদের কাছে হস্তান্তর করবে। নাঈম রাঃ কুরায়শদেরকে কিছুতেই জামিনদার না পাঠাতে পরামর্শ দেন। একইভাবে এরপর তিনি গাতফান গোত্রের কাছে গিয়েও একই কৌশল প্রয়োগ করেন। এরপর ৫ই শাওয়াল শনিবার কুরায়শ ও গাতফান উভয় গোত্র ইহুদীদের কাছে এই মর্মে বার্তা দিয়ে প্রতিনিধি পাঠায় যে তারা যেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে মদিনার ভেতর থেকে যুদ্ধ আরম্ভ করে। এর উত্তরে ইহুদীরা জানিয়ে দেয় যে তারা (তাদের ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞার কারণে) শনিবার যুদ্ধ করতে পারবে না এবং আরও জানায় যে তারা যে তাদেরকে বিপদে ফেলে পালিয়ে যাবে না তার গ্যারান্টি হিসেবে কয়েকজন জামিনদার চায়। তাদের এ জবাব পেয়ে কুরায়শ ও গাতফান নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে যে নাঈম বিন মাসউদের কথা সম্পূর্ণ সত্য। এরপর গাতফান ও কুরায়শ আবারও যুদ্ধ আরম্ভ করার আহবান জানিয়ে বার্তা পাঠায় এবং জামিনদার রাখার শর্ত বাদ দিতে বলে। এভাবে তাদের তিন পক্ষের মধ্যে আস্থার সঙ্কট তৈরী হয়, একে অপরকে অবিশ্বাস ও সন্দেহ করতে আরম্ভ করে, তাদের কোয়ালিশন ভেঙ্গে যায় এবং এভাবে তাদের নৈতিক ভিত্তি ভেঙ্গে ধুলোয় মিশে যায় এবং নাঈম বিন মাসউদ রাঃ এর পরিকল্পনা সফল হয়।

এভাবে গোয়েন্দাবৃত্তির ব্যবহারের আর একটি উদাহরণ পাওয়া যায় এই একই যুদ্ধে আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাঃ কে এ কাজে ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। এ ধরণের সিদ্ধান্তকর মুহূর্তে যুদ্ধের ফলাফল নিয়ন্ত্রণে গোয়েন্দা তথ্যের ভুমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিরোধ যুদ্ধের এই পর্যায়ে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাবলেন যে তিনি হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাঃ এর বিশেষ বুদ্ধিমত্তা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবেন। তিনি পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে শত্রু শিবিরের সর্বশেষ পরিস্থিতি জানতে রাতের আঁধারে হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামানকে তাদের মধ্যে পাঠিয়েছিলেন।

একটি চিঠিতে তাদের গন্তব্য ও লক্ষবস্তুর কথা লিখে দিয়ে নির্দেশ দিতেন যে অমুক স্থানে না গিয়ে বা কোন নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে যেন চিঠিটি না খোলা হয়।

এমনই একটি সেনা অভিযান ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাঃ এর নেতৃতে পরিচালিত সেই অভিযান যে অভিযানে আল হাদরামী নিহত হয়। এ ঘটনা আমাদেরকে স্পর্শকাতর সামরিক তথ্য গোপন রাখার বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেয়। এবং শুধু সাধারণ জনগণ নয় বরং স্বয়ং মুজাহিদদের থেকেও অপারেশন বা যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তথ্য গোপন রাখার প্রমাণ রয়েছে।[4]

---

[4] আল্লাহ্‌র রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই নীতিই আধুনিক বিশ্বে নিরাপত্তা, গোয়েন্দা ও সামরিক বাহিনীতে principle of the need to know basis হিসেবে সবিশেষ পরিচিত, যার অর্থ হলো প্রত্যেক সদস্য কেবল ততটুকু জানবে যতটুকু তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য জানা প্রয়োজন। মুজাহিদদের জন্য নিরাপত্তা বিশ্লেষণধর্মী প্রতিষ্ঠান আবু যুবায়দা সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত Encyclopedia of Security তে এ বিষয়ে একটি বিশ্লেষণ রয়েছে, পাঠকদের জন্য আমি তার কিছু অংশ তুলে ধরছি-

'নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মানুষদেরকে তিন শ্রেনীতে ভাগ করা যায়। এর প্রথম শ্রেণী হল যারা মুসলিম ও মুজাহিদ- (আর এখানে আমরা কেবল এই শ্রেণী সম্পর্কেই আলোচনা করব)- যারা আল্লাহ্‌র দ্বীনের বিজয়ের জন্য সক্রিয়ভাবে আল্লাহ্‌র হুকুম ও রসূলের সুন্নাহ মোতাবেক কাজ করছে, এদের মধ্যে যে নীতি অবলম্বন করা বাধ্যতামুলক তা হল 'কেবল একান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যই প্রত্যেকে জানবে'। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'ইসলামের সৌন্দর্যসমুহের মধ্যে একটি সৌন্দর্য হল কোন ব্যক্তি এমন বিষয়ে মাথা ঘামাবে না যে বিষয়ে তার সংশ্লিষ্টতা নেই'। (হাদিসটি ইমাম তিরমিযি রহঃ বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম নববী এটিকে হাসান সাব্যস্ত করেছেন।) একারণে মুজাহিদ সংগঠনের প্রত্যেক সদস্যকে এমন তথ্য থেকে দূরে রাখা উচিৎ যা তার জানার প্রয়োজন নেই। আর যাকে কাজের প্রয়োজনে তথ্য সরবরাহ করা হবে তাকেও ঠিক ততটুকু তথ্য দেয়া হবে তার কাজটি সমাধান করার জন্য যতটুকু একান্ত জরুরী। আর কোন সদস্যেরও উচিত নয় দায়িত্বশীলদের কাছে এমন কিছু জানতে চাওয়া যেটা তার জানার কোন প্রয়োজন নেই। একইভাবে দায়িত্বশীলদেরও উচিৎ নয় কাউকে এমন কিছু জানান যা তার জানার কোন প্রয়োজন নেই। সংগঠনের প্রত্যেকের উচিৎ নিষ্প্রয়োজন তথ্য জানা থেকে দূরে থাকা, কারণ প্রাথমিক পর্যায়ে হয়তো আমাদের মনে হতে পারে যে এটা কোন ক্ষতির কারণ নয় কিন্তু পরবর্তীতে হয়তো দেখা যাবে এটাই ভয়াবহ কোন সমস্যার কারণ হয়ে দাড়াতে পারে।

সারসংক্ষেপঃ (১) কাউকে নিষ্প্রয়োজন তথ্য প্রদান থেকে বিরত থাকা। (২) যাকে তথ্য দেয়া হবে তাকে কেবল ততটুকুই দেয়া হবে যতটুকু এই মুহূর্তে তার প্রয়োজন, পরবর্তীতে প্রয়োজন সাপেক্ষে বাড়তি তথ্য প্রদান করা হবে। বিষয়টির অধিকতর ব্যখ্যা প্রসঙ্গে আমরা ধরে নিলাম যে কোন একটি সংগঠনের যদি একজন আমীর থাকে আর তিনি যদি সংগঠনের কোন সদস্যকে দায়িত্ব দেন কোন অপারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের, তাহলে তার উপর অর্পিত দায়িত্বের বাইরে অন্য কোন বিষয়ে জানার কোন প্রয়োজন তার নেই। একজন অর্থ সংগ্রহকারীর নিশ্চয়ই জানার প্রয়োজন নেই কবে কোথায় কখন বা কে অপারেশন চালাবে, বা কে অস্ত্রের চালান এনে দিবে, গোলা বারুদ কোথায় মজুদ রাখা হবে ইত্যাদি। একই ভাবে যারা অপারেশন পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট তাদেরও জানার কোন প্রয়োজন নেই কে অর্থের যোগান দিচ্ছে। কারো উপর যদি একাধিক দায়িত্ব অর্পিত হয় তাহলে সেও কেবল তার উপর অর্পিত দায়িত্বসমুহ পালনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যই পাবে। তারপরও বলবো, আমরা এখানে প্রাথমিক পর্যায়ের ভাইদেরকে সংক্ষিপ্ত ও সামগ্রিক একটা ধারণা দেয়ার চেষ্টা করলাম মাত্র, যারা দায়িত্বশীল তাদেরকে গভীর জ্ঞানের অধিকারী এবং পূর্ব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হওয়া উচিৎ যাতে তারা তাদের স্থান কাল পাত্র ও অবস্থা বিশ্লেষণ করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণীত এক হাদিসে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও আখিরাতের উপর ঈমান রাখে তার উচিৎ

এর উদ্দেশ্য হল, মুজাহিদদের কেউ যদি দুর্বল হয়ে পড়ে, কিংবা কেউ যদি কাফেরদের হাতে বন্দি হয়ে যায় তাহলে সে যেন তাদের কাছে কোন তথ্য ফাস করে না দিতে পারে[5], এমনকি তাকে যদি কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয় তবুও[6]।

হয় সত্য সঠিক কথা বলা অথবা চুপ থাকা'। সহীহ মুসলিমে বর্ণীত অন্য এক হাদিসে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- 'একজন মানুষ মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এততুকুই যথেষ্ট যে সে যা শোনে তাই বলে বেড়ায়'। আর এটা একটা প্রমাণিত সত্য যে, যে ব্যক্তি বেশী কথা বলে সে বেশী ভুল করে।

শায়খ আবু যুবায়দার পরিচয়ঃ উল্লিখিত শায়খ আবু যুবায়দা হলেন জিহাদী কার্যক্রম ও অপারেশনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিরাপত্তা বিশ্লেষনে একজন বিশেষজ্ঞ। তিনি কয়েক যুগ ধরে মুজাহিদদেরকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ লজিস্টিক সাপোর্ট দিয়েছেন। তার সুগভীর বুদ্ধিদীপ্ত পরিকল্পনার মাধ্যমে হাজার হাজার মুজাহিদগন আফগানিস্তানে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছেন। তার সম্পর্কে পরবর্তীতে বিভিন্ন পত্র পত্রিকা যে রিপোর্ট করেছে তার সার সংক্ষেপ হলঃ 'তিনি ছিলেন আল কায়েদার সেই সব সুচতুর নেতাদের অন্যতম যারা ছিলেন ধরা ছোঁয়ার বাইরে, সাধারনতঃ কোথাও তার ছবি দেখা যেতনা। তিনি যখন তখন দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়ানো সত্ত্বেও তার গ্রেফতারের পূর্বে সি আই এ তাকে কখনই শনাক্ত করতে পারেনি। অবশেষে অনেক কাঠ খড় পোড়ানোর পর সি আই এ, এফ বি আই ও আই এস আই এর পরিচালিত এক যৌথ অভিযানে পাকিস্তানের ফয়সালাবাদের একটি এপার্টমেন্ট থেকে ২০০২ সালের ২৮ মার্চ ভোর রাত তিনটার সময় তিনি গ্রেফতার হন। লস এঞ্জেলস এয়ার পোর্টে হামলার দায়ে অভিযুক্ত রেসাম এর বক্তব্য মতে শায়খ আবু যুবায়দা ছিলেন মুজাহিদদের ট্রেনিং ক্যাম্পের দায়িত্বশীল, বিভিন্ন দেশ থেকে আসা যুবকদের কাকে কোথায় পাঠানো হবে সে সিদ্ধান্তও তিনি দিতেন, বিশেষ অপারেশনের জন্য কাকে গ্রহণ করা হবে কাকে হবে না তাও তিনি বাছাই করতেন, কোন ক্যাম্পে কতো জন থাকবে তার সংখ্যাও তিনিই নির্ধারণ করতেন। শায়খের সংস্পর্শে ছিলেন এমন এক ভাই আমাদেরকে বলেন যে নিরাপত্তা বিষয়ক ব্যাপারে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে বিশেষ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছেন। তিনি এতটাই চতুর যে ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদকেও তিনি ঘোল খাইয়ে দিয়েছেন, তিনি তাদের চোখে ধুলা দিয়ে ইসরাইলে ঢুকে সফলভাবে অপারেশন পরিচালনা করা আবার নিরাপদে বেরিয়ে এসেছেন কিন্তু তারা তার টিকিটিও স্পর্শ করতে পারেনি। আমরা অন্তরের অন্তস্তল থেকে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করি যেন তিনি আবার তাকে মুক্ত করে আমাদের মুজাহিদদের মাঝে ফিরিয়ে আনুন। আমীন!

[5] অনেক সময় দেখা যায় যে দায়িত্বশীলগণ যদি কারো থেকে কিছু গোপন রাখেন তাহলে কোন কোন অতি উৎসাহি ভাইয়েরা তাদের মাথা নষ্ট করে ফেলেন। বোকার মতো বলতে থাকেন, 'আরে ভাই আমাকে বিশ্বাস করেন না! আল্লাহ্র কসম করে বলছি আমি কাউকে বলবো না, আমাকে ঘটনাটি খুলে বলুন'। শুধু এতটুকুতেও তারা ক্ষান্ত হয় না, বরং যারা কিছু গোপন রাখে তাদের ব্যপারে অবিশ্বাস, সন্দেহ পোষণ ও আস্থাহীনতার অভিযোগ করতে আরম্ভ করে। অথচ বিষয়টি মোটেই তা নয় যা সে ভাবছে; তারা তার প্রতি নিখাদ আস্থা বিশ্বাস পোষণ করা সত্ত্বেও তার ও তার ভাইদের নিরাপত্তার কারণেই যে কেবল তার থেকে বিশেষ কোন তথ্য গোপন করা হচ্ছে তা বুঝতেই চায় না। অতএব এমন বিষয়ে কখনো তথ্য গোপনকারী ভাইদেরকে দোষারোপ করা বৈধ নয়। লেখক এখানে আল্লাহ্র রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক তার সাহাবাদের থেকে এমনকি স্বয়ং মুজাহিদদের থেকে তথ্য গোপন করার যে দলীল পেশ করেছেন তাতে কী প্রমাণিত হয়? সাহাবীদের কেউ কি আল্লাহ্র রসুলকে একারণে দোষারোপ করেছেন? কিংবা তার তথ্য গোপন রাখা কি তার মহান আত্মত্যাগী সাহাবীদের প্রতি তার অবিশ্বাস প্রমাণ করে? কক্ষনোই নয়! অতএব হে ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ ভাইয়েরা! বিষয়টি নিয়ে একটু গভীরভাবে ভাবুন।

[6] বরং তথ্য গোপন রাখার জন্য প্রয়োজনে নিজেকে হত্যা করে ফেলাও অনেক ক্ষেত্রে বৈধ। এ বিষয়ের উপর আত তিবইয়ান পাবলিকেশন কর্তৃক প্রকাশিত 'The Ruling Regarding Killing oneself to Protect Information' নামে একটি খুবই চমৎকার বই রয়েছে। পাঠকগণ বইটি পড়ে নিতে পারেন।

এমন আর একটি ঘটনা হল রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের ঘটনা। যে ঘটনার সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণের সারসংক্ষেপ বিশ্লেষণ হল এমন যে-

১) তিনি এমন সময় আবু বকর রাঃ এর কাছে এসেছিলেন যে সময়ে তিনি সাধারনতঃ কখনো আসতেন না।

২) তিনি মুখ ঢেকে আসেন।[7]

৩) সাহাবীদেরকে তার নিজের হিজরতের পূর্বে হিজরত করার নির্দেশ প্রদান; অথচ আবু বকর রাঃ অনুযোগ করে বলেছিলেন 'তারা আপনার অনুসারী! (কিভাবে তারা আপনাকে এই বিপদের মধ্যে রেখে চলে যাবে?)

৪) আবু বকর রাঃ এর পুত্র আব্দুল্লাহ রাতে তাদের সাথে সেই গোপন স্থানে থাকলেও দিন শুরুর পূর্বেই তাদেরকে রেখে আবার মক্কায় চলে আসতেন, যাতে কুরায়শরা ভাবে যে তিনি রাতেও মক্কাতেই ছিলেন। এবং কাফিররা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর রাঃ এর বিরুদ্ধে কি ষড়যন্ত্র করে সে তথ্য সংগ্রহের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। আর রাতের আঁধার নেমে আসার সাথে সাথে তিনি চলে যেতেন সেই পাহাড়ের গুহায় যেখানে তারা লুকিয়ে থাকতেন এবং তাদেরকে সকল বিষয়ে অবহিত করতেন[8]।

---

[7] নির্ভরযোগ্য সীরাত গ্রন্থ আর রাহীকুল মাখতুমের ভাষ্য অনুযায়ী মক্কার কাফিররা যখন ইতিহাসের সবচেয়ে ন্যক্কারজনক সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করলো তখন জিবরীল আঃ কে পাঠিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কুরায়শের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত করা হয় এবং তাকে মক্কা ছেড়ে মদিনায় হিজরতের অনুমতি দেয়া হয়। তিনি তার হিজরতের সময় নির্ধারণ করে দেন এবং তাকে সে রাতে নিজ বিছানায় ঘুমাতে নিষেধ করেন। এরপর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুপুরের সময় আবু বকর রাঃ এর সাথে সাক্ষাত করতে যান হিজরতের যাবতীয় বিষয় নির্ধারণ করার জন্য। আবু বকর রাঃ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই অসময় আগমন এবং তার মুখ ঢাকা দেখে কিছুটা বিস্মিত হন। পরক্ষণেই তিনি জানতে পারেন যে আল্লাহ্‌র অনুমতি এসে গেছে এবং তিনি প্রস্তাব করেন যে তারা দু'জন একত্রে হিজরত করবেন। যাত্রার সময় রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী রাঃ কে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়ে তার বিছানায় চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে থাকতে বলেন। এরপর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ঘর থেকে বের হয়ে হাতে এক মুঠো ধুলা নিয়ে সূরা ইয়াসিনের নয় নাম্বার আয়াতটি পাঠ করে ঘাতকদের দিকে নিক্ষেপ করে তাদের সামনে দিয়ে বেরিয়ে পড়েন অথচ তারা কিছুই টের পেল না।

[8] আর রাহিকুল মাখতুমের বর্ণনা মতে তারা শুক্র শনি ও রবি এই তিন রাত পর্যন্ত সে গুহায় আত্মগোপন করে থাকেন। আবু বকর রাঃ এর পুত্র আব্দুল্লাহ প্রতিদিন অন্ধকার নেমে আসার পর তাদের কাছে এসে মক্কার সর্বশেষ পরিস্থিতি তাদেরকে অবহিত করতেন; আবার ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগেই তিনি মক্কায় ফিরে এসে সবার সাথে এমনভাবে মিশে যেতেন যে তারা তার এই সব গোপন কার্যক্রম সম্পর্কে কিছুই আঁচ করতে পারত না। এদিকে কুরায়শরা যখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বকর রাঃ এর তাদেরকে ফাকি দিয়ে চলে যাওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হল তখন তারা ভয়ানক ক্রোধ ও আক্রোশে ফেটে পড়লো। তারা আল্লাহ্‌র রসুলের

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাঃ এর বর্ণনায় সহীহ আল বুখারীতে ৩৯০৫ নং হাদিসে হিজরতের যে বিস্তারিত ঘটনা বর্ণীত রয়েছে সেখানে আমাদের এখানে আলোচিত প্রত্যেকটি বিষয় পাওয় যাবে[9]। সে বর্ণনায় এও রয়েছে যে পথিমধ্যে সুরাকার সাথে দেখা হলে রসুলল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন যে, 'আমাদের বিষয়টি অন্যদের থেকে গোপন রেখো'।

বিছানায় শুয়ে থাকা আলী রাঃ কে কাবার চত্বরে ধরে এনে তাদের দুজন সম্পর্কে তথ্য বের করার জন্য তাকে বেদম প্রহার করল; কিন্তু তাতে কোনই লাভ হল না।

[9] আল কায়েদার সিনিয়র কমান্ডার সায়ফ আল আদল (আল্লাহ্ তাকে রক্ষা করুন) এবং অন্য আরেক জন কাউনটার ইনটেলিজেন্স ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক *আল আমান ওয়াল ইস্তিখারা* নামক গ্রন্থে হিজরতের ঘটনা থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয়কে একত্রে সন্নিবেশিত করেছেন। যেমন-

১। আলী রাঃ কে আল্লাহ্র রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহিই ওয়া সাল্লামের বিছানায় শুইয়ে দেয়া হয়েছিলো কাফের শত্রুদেরকে প্রতারিত করার জন্য।

২। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকরের কাছে আসেন দুপুরের বিশ্রাম নেয়ার সময়ে যখন খুব কম মানুষই ঘরের বাইরে থাকে।

৩। তারা আবু বকর রাঃ এর ঘর থেকে বের হওয়ার সময় সদর দরজা দিয়ে বের না হয়ে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়েছেন যাতে তাদেরকে কেউ দেখতে না পারে।

৪। তারা সরাসরি মদিনার দিকে না গিয়ে প্রথমে গিয়ে গুহায় আত্নগোপন করেন, শত্রুরা যদি মদিনার দিকে যাওয়ার রাস্তায় ওঁৎ পেতে থাকে তা থেকে নিজেদেরকে রক্ষার জন্য।

৫। তারা আত্নগোপনের জন্য যে গুহাটি বাছাই করেন সেটিও মদিনায় যাওয়ার দিকে ছিল না বরং গুহাটি ছিল অন্য দিকে, এর উদ্দেশ্য ছিল শত্রুরা যাতে তাদেরকে অনুসরণের ব্যপারে ধোঁকার মধ্যে পড়ে যায়।

৬। মক্কার সর্বশেষ পরিস্থিতি জানার জন্য আব্দুল্লাহ বিন আবু বকরের মাধ্যমে তাদের নিজস্ব গোয়েন্দা কার্যক্রম অব্যাহত ছিল।

৭। আসমা বিনতে আবু বকরের মাধ্যমে তাদের নিরাপদ রসদ সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছিলো।

৮। আব্দুল্লাহ ও আসমা বিনতে আবু বকরের পদচিহ্ন মুছে ফেলার জন্য আমীর বিন ফুহায়রা এক অসাধারণ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করত। তাদের দুজনের আসা যাওয়ার পর তাদের পদচিহ্নের উপর দিয়ে গাধার পাল চালিয়ে নিয়ে যেত যাতে তাদের পদচিহ্নগুলি একেবারে মুছে যায়।

৯। শত্রুদের হাতে গ্রেফতার এড়ানো এবং তাদেরকে পরিস্থিতি শান্ত হওয়ার জন্য তারা একাধারে তিন দিন পর্যন্ত গুহায় অবস্থান করেন।

১০। তারা তাদের এই গোটা সফর জুড়ে কাফেরদেরকে ধোঁকা দিয়ে যাওয়া এবং গোপনীয়তা বজায় অব্যাহত রাখেন। যেমন আল্লাহ্র রসুলকে দেখিয়ে এক ব্যক্তি আবু বকরকে যখন জিজ্ঞাসা করেছিল যে ইনি কে? তিনি বলেছিলেন ইনি আমার গাইড বা পথ প্রদর্শক। লোকটি ভেবেছিল চলার রাস্তা প্রদর্শক অথচ তিনি বুঝিয়েছেন আল্লাহ্র দ্বীনের দিকে পথ প্রদর্শক।

আর সব শেষে এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে তাদের আত্নগোপনের গুহার অবস্থান সম্পর্কে কেবল আব্দুল্লাহ তার বোন আয়েশা ও আসমা রাঃ এবং তাদের ভৃত্য আমীর বিন ফুহায়রা ব্যতিত অন্য কেউ কিছুই জানত না।

সহীহ্ আল বুখারীতে **'যুদ্ধ মানেই ধোঁকা'** শিরোনামে একটি স্বতন্ত্র্য অধ্যায়ই রয়েছে; আর উল্লেখিত এ হাদিসটি সে অধ্যায়েই সংকলিত[10]। হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী এ

---

[10] এই অধ্যায়ে আবু হুরায়রা ও জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাঃ এর বর্ণনায় *আল হারবু খিদা' উন* মর্মে যে হাদিসটি রয়েছে এর ব্যখ্যায় ইমাম নববী রহঃ তার সহীহ্ মুসলিমের ব্যখ্যা গ্রন্থে বলেন, পূর্বে সম্পাদিত নিরাপত্তা চুক্তি ভঙ্গ করা ব্যতিত যে কোন উপায়ে যুদ্ধে কাফেরদেরকে ধোঁকা দেয়া যে বৈধ এ ব্যপারে সকল আলিমগন একমত। আর এ বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এই ধোঁকা দেয়ার বৈধতার আওতায় আধুনিক যুগের যে কোন প্রকারের উপায় উপকরণ অবলম্বন শামিল। যেমন ডকুমেন্টস জালিয়াতি, ভুয়া পরিচয় পত্র ও পাসপোর্ট ব্যবহার, প্রতারণামূলক আচার আচরণ ও বেশ ভুষা গ্রহণ ইত্যাদি। মনে রাখতে হবে যে এ ব্যপারে আমাদের মোটেই লজ্জা পাওয়া বা ইতস্তত বোধ করা উচিৎ নয়; কেননা বিষয়টি সরাসরি আল্লাহ্র কুরআন ও রসুলের সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত ও নির্দেশিত। তাছাড়া 'Central Ignorance Agency' CIA সহ অন্যান্য সকল গোয়েন্দা সংস্থাসমুহ দেশ বিদেশ সফরের সময় নিয়মিত এ ধরণের প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে থাকে। এই নিকৃষ্ট সৃষ্টি কাফির মুশরিকরা যদি আল্লাহ্র দ্বীনের বিরুদ্ধে কাজ করার ক্ষেত্রে এ ধরণের প্রতারণার আশ্রয় নিতে পারে তাহলে আল্লাহ্র দ্বীনের জন্য আত্মনিবেদিত জীবন উৎসর্গকারী, তাওহীদবাদী ও সুন্নাহর অনুসারী ঈমানদাররা কেন এসব পদ্ধতির আশ্রয় নিতে পারবে না! যারা আল্লাহ্র দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য আল্লাহ্র তরফ থেকে, তার রসুলের পক্ষ থেকে সতর্কতামূলক এসব পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশিত হয়েছেন! নিশ্চয়ই এই মুজাহিদগণই এসব পদ্ধতি ব্যবহারের অধিক হকদার।

আল্লাহ্র রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এসব হাদিস প্রমাণ করে যে তিনি কত বড়ো মাপের সমর বিশারদ ছিলেন। এসব হাদিস আমাদেরকে অন্য একটি হাদিস মনে করিয়ে দেয় যেখানে তিনি বলেন **أنا نبي الرحمة أنا نبي الملحمة** অর্থাৎ আমি হলাম রহমতের নবী ও যুদ্ধের নবী। (ইমাম ইবনে তাইমিয়ার *আস সিয়াসাতুশ শরইয়াহ* গ্রন্থ থেকে হাদিসটি গৃহীত) । একটি সফল যুদ্ধ পরিচালনার জন্য আল্লাহ্র রসুলের প্রণীত এই মুলনীতি কতটা বাস্তব সম্মত তা যে কোন চৌকস আর্মি আফিসাররা উপলব্ধি করতে পারবেন। সামরিক দিক থেকে আল্লাহ্র রসুলের সফলতাও একারণে গোটা পৃথিবীর ইতিহাসে দিবালোকের মতো এক উজ্জ্বল অধ্যায়। যদিও অত্যান্ত দুঃখজনকভাবে মুসলমানরা আজকাল এ কথা ভুলেই গেছে যে তাদের নবী কেমন এক জন বীর যোদ্ধা ও সমর বিশারদ ছিলেন, তারা কেবল তাঁর আধ্যাত্মিক ও সামাজিক সংস্কার নিয়েই পড়ে আছে। আমরা যদি আল্লাহ্র রসুলের জীবনের এসব দিক ও তার এসব বাণীসমূহকে সামরিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অধ্যায়ন ও প্রচার করি তাহলে আত্মপরাজিত সেই সব তথাকথিত আধুনিকতাবাদীদেরকে কিছুটা হলেও দমন করা যাবে যারা মানুষকে প্রবঞ্চিত করার জন্য বলে বেড়ায় যে 'ইসলাম হল মহান শান্তির ধর্ম এবং জিহাদ হল কেবল আত্মরক্ষামুলক' এবং নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন কেবল দয়ার নবী, যুদ্ধের নবী নন। এমন ইসলাম বিরোধী কথা থেকে আমরা আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাই! আমরা বিশ্বের বিভিন্ন বিখ্যাত সমর বিশারদদের লিখনির মধ্যেও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এসব বক্তব্যের প্রতিধ্বনি দেখতে পাই। ষষ্ট শতাব্দির চাইনিজ সমর বিশারদ সান ঝ্যু এর ইতিহাস খ্যাত সমর বিদ্যার বই The Art of war এর মধ্যেও আল্লাহ্র রসুলের কথার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। আর এ কথা সকলেরই জানা এ বইটি সমর বিদ্যার জগতে এমনই একটি মাস্টার পিস যার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন জার্মান জেনারেল স্টাফ নেপোলিয়ন, এমনকি প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধে অপারেশন Desert Storm এর পরিকল্পনাও এই বইয়ের দ্বারা প্রভাবিত। এখানে এ বইটি থেকে কিছু কথা না বললেই নয়। এ বইতে গুরুত্বের সাথে বলা হয়েছে যে-

'যে কোন আক্রমণের প্রধান কৌশল হল **'হামলা করো এমন জায়গা থেকে যেখান থেকে তারা হামলার কথা চিন্তাই করে না, আঘাত করো এমন অবস্থায় যখন তারা প্রস্তুত নয়'**। আর এমন আক্রমনের পরিকল্পনা কেবল তখনই সফল করা যায় যখন সকল কাজ গোপনীয়তার সাথে সম্পাদন করা যায়, সেনাবাহিনীর মধ্যে কঠোর শৃঙ্খলা বজায় রাখা যায়। আর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হল, নিজেদেরকে এমন এক সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার মধ্যে রাখতে হবে যাতে কিছুতেই শত্রুরা আমাদের শক্তি সামর্থ্য ও প্লান পরিকল্পনা সম্পর্কে কোন অনুমান করতে না পারে। প্রয়োজনে নিজেদেরকে শক্তি সামর্থ্যহীন বুঝাতে হবে যাতে শত্রু পক্ষ গা ছাড়া ভাব দেখিয়ে হালকা ভাবে নেয়। শত্রু শিবিরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে হবে। যখন তাদের কাছে পৌঁছে যাবেন বুঝাবেন এখনো অনেক দূরে আছেন,

হাদিসে উল্লেখিত ধোঁকার ব্যাখ্যায় বলেন ‘ধোঁকা অর্থ হল কোন এক জিনিস প্রকাশ করে তার অন্তরালে অন্য জিনিস গোপন রাখা। এ হাদিসে যুদ্ধে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ এবং কাফিরদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য প্রতারণামূলক কাজ করতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। আর যে ব্যক্তি তার শত্রুদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান রাখে না এবং যে এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন নয় সে তার চারপাশের ঘটনা প্রবাহ তার বিরুদ্ধে চলে যাওয়া থেকে মোটেই নিরাপদ নয়।[11]

ইমাম বুখারী রহঃ **‘যুদ্ধে মিথ্যা বলা’**[12] নামে আরও একটি অনুচ্ছেদ কায়েম করেছেন, আর এখানে তিনি উল্লেখ করেছেন ইহুদী তাগুত কা’ব বিন আশরাফকে সাহাবায়ে কেরাম রাঃ কিভাবে হত্যা করেছিলেন। তারা তাকে মিথ্যা কথা বলে এমনভাবে বিভ্রান্ত করেছিলেন যে সে ভাবছিল যে সাহাবায়ে কেরামগন সত্যিই আল্লাহ্‌র রসুলের উপর চরমভাবে বিরক্ত, আল্লাহ্‌র রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক তাদের উপর আরপিত দান সাদাকা করতে করতে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এভাবে তার সাথে তারা

আর যখন দূরে থাকবেন বুঝাবেন আপনি একান্তই তাদের কাছে পৌঁছে গেছেন। তারা যদি ঐক্যবদ্ধ তাকে তাহলে তাদের মাঝে মতবিরধিতা তৈরি করুন। যুদ্ধকে সব সময়ই একটা ধোঁকা প্রতারণার বিষয় হিসেবে মূল্যায়ন করতে হবে, প্রতিনিয়ত নিজেদেরকে ছদ্মাবরণে প্রকাশ করতে হবে, মিথ্যা গুজব ছড়াতে হবে। নিজেদের সম্পর্কে শত্রুকে ভুল তথ্যের উপর রাখতে পারলে তারা হিমশিম খাবে তাদের পরিকল্পনা তৈরি করতে, এতে তারা এমন জায়গায় আক্রমন করবে যেখানে আক্রমন করা দ্বারা তাদের শক্তি খর্ব হওয়া ছাড়া কিছুই লাভ হবে না, আর এমন জায়গা তারা অরক্ষিত রেখে দিবে যেখান থেকে তারা ভয়াবহ আক্রমনের শিকার হবে…। (সংক্ষিপ্ত আকারে নেয়া।)

[11] ফতহুল বারী ৬/১৫৮

[12] কারাবন্দী শায়খ আব্দুল কাদির বিন আব্দুল আযিয (আল্লাহ্‌ তার মুক্তি তরান্বিত করুন) তার রচিত The Fundamental Concept Regarding Al- Jihad গ্রন্থে ‘শত্রুদের সাথে মিথ্যা বলা’ অধ্যায়ে তিনি লিখেছেন- ‘আমি এ অধ্যায়টিকে ‘যুদ্ধে মিথ্যা বলা’ নামে নামকরণ করিনি, কারণ শত্রুদের সাথে মিথ্যা কথা বলা যুদ্ধের সময় যেমন বৈধ তেমনি শান্তির সময়ও বৈধ। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত দলীলসমুহ প্রণিধানযোগ্য:
১। উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা রাঃ থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিনটি বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে মিথ্যা বলার অনুমতি দিতে শুনিনি। ক) যুদ্ধের সময় খ) মানুষের মধ্যে বিবাদ মিমাংসা করে দেয়ার জন্য গ) স্বামী স্ত্রীর একে অন্যের সাথে কথা বলা। (মুসনাদে আহমাদ ও আবু দাউদ; একই রকম বর্ণনা ইমাম তিরমিযী সংকলন করেছেন আসমা বিনতে ইয়াযিদের সুত্রে)
২। শান্তির সময়ে শত্রুর সাথে মিথ্যা কথা বলা অনেক কারণে বৈধ। যেমন এর দ্বারা যদি মুমিনদের দ্বীনী কিংবা দুনিয়াবী কোন কল্যাণ সাধিত হয়, অথবা কুফফারদের ক্ষতি ও ষড়যন্ত্র থেকে মুমিনদেরকে হেফাযত করার জন্য যদি মিথ্যা বলার প্রয়োজন হয়। এ বক্তব্যের পক্ষে দলীল হিসেবে রয়েছে সহীহ আল বুখারীতে ৩৩৫৮ নং হাদিসে বর্ণীত ইবরাহীম আঃ কর্তৃক মিথ্যা বলার ঘটনা। এরপর রয়েছে সহীহ মুসলিমে বর্ণীত আসহাবুল উখদুদের ঘটনায় দ্বীনদার আলিম কর্তৃক বালকটিকে যাদুকর ও পরিবারের কাছে মিথ্যা বলার উপদেশ দেয়ার ঘটনা। মুমিনদের বৈষয়িক স্বার্থ রক্ষার জন্য কাফিরদের কাছে মিথ্যা বলার অনুমোদনের ব্যপারে হাজ্জাজ বিন ইলাতের ঘটনাও শিঘ্রই আমরা ফুটনোটে উল্লেখ করব ইনশা আল্লাহ্‌।

মিথ্যা মিথ্যি কথা বলতে থাকে যতক্ষণ না তারা তাকে সম্পূর্ণরূপে বাগে আনতে পেরেছিলেন এবং অতঃপর আল্লাহ্‌র এ দুশমনকে তারা হত্যা করে ফেলেন[13]।

---

[13] কা'ব বিন আশরাফ ছিল মদিনার এক কুখ্যাত ইহুদী। সে মুশরিকদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলতো, সে আল্লাহ্‌র রসুলকে অপমান করে এবং মুসলিম নারীদেরকে নিয়ে অশ্লীল কবিতা রচনা করত, বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থেই তাকে হত্যা করার ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণীত রয়েছে। বিখ্যাত সীরাত গ্রন্থ আর রাহীকুল মাখতুমে ঘটনাটি এভাবে বর্ণীত রয়েছে যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে একত্রিত করে একদিন বলেন, কা'ব বিন আশরাফ আল্লাহ্‌ তায়ালা এবং তার রসুলকে আহত করেছে, কে আছে যে তাকে হত্যা করতে পারবে? তখন মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ, আব্বাদ বিন বিশর, আল হারিস বিন আওস, আবু আবস বিন হিবর এবং কা'ব বিন আশরাফের দুধ ভাই সালকান বিন সালামাহ স্বেচ্ছায় এ দায়িত্ব পালনের জন্য এগিয়ে আসেন। মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ বলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ আপনি কি চান আমি তাকে হত্যা করি? তিনি বলেন, হ্যাঁ। তারপর মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ বলেন, তাহলে আমাকে অনুমতি দিন তার সাথে যে কোন ধরণের কথা বলার, তিনি বলেন, তুমি বল (যা তোমার বলা প্রয়োজন)। এরপর মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ কা'ব বিন আশরাফের কাছে এসে আল্লাহ্‌র রসুলের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, এই ব্যক্তি দান সাদাকার নামে মানুষের অর্থ কড়ি নেয়া ছাড়া কিচ্ছু বোঝে না, আর এটা আমাদেরকে আজ মারাত্মক কষ্টকর অবস্থার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। এ কথা শুনে কা'ব বিন আশরাফ বলে যে, সম্যার আর দেখেছ কি, আল্লাহ্‌র কসম সে তোমাদেরকে আরও ভয়াবহ সমস্যায় ফেলবে। মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ তার উত্তরে বলেন যে, এতে কোন সন্দেহ নেই, তবে যেহেতু আমরা একবার তার অনুসারীর খাতায় নাম লিখিয়ে ফেলেছি, অতএব তার শেষ না দেখে ছাড়ছি না। যাই হোক শোন, আমি তোমার কাছে এসেছি কিছু অর্থ ধার নেয়ার জন্য। সে বললো, ঠিক আছে তা দেয়া যাবে, তবে বন্ধক হিসেবে কী রাখবে? তিনি বললেন, তুমিই বল তুমি কী বন্ধক চাও? পাষণ্ড হৃদয়হীন ইহুদী ঋণের বিপরিতে তাদের নারী শিশুদেরকে বন্দক হিসেবে রাখার দাবী জানালো। ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ বললেন, আমরা কিভাবে তোমার কাছে আমাদের নারীদেরকে রাখতে পারি অথচ তুমি হলে আরবের সবচেয়ে হ্যান্ডসাম সুপুরুষ, তাছাড়া এমন কাজ করলে লোকেরা আমাদেকে ছিঃ ছিঃ করবে! আমাদের সন্তানদেরকে একথা বলে লোকেরা অপমান করবে যে, আমরা সামান্য কিছু ঋণের বিনিময়ে তাকে বন্ধক রেখেছিলাম! আমরা বরং তোমার কাছে আমাদের অস্ত্রশস্ত্র বন্ধক রাখতে পারি। কা'ব এ প্রস্তাবে সম্মত হয়। সালকান বিন সালামাহ ও আবু নায়লা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে গিয়ে তার সাথে সাক্ষাত করে কমবেশি একই ধরণের কথাবার্তা বলে। আবু নায়লা তারপর এমনভাবে পরিকল্পনা সফল করে নিয়ে আসেন যে তিনি তার সাথে কথাবার্তা বলে বন্ধক দেয়ার জন্য তার কিছু বন্ধুকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তার কাছে আসার সম্মতি গ্রহণ করেন। অবশেষে তৃতীয় হিজরির রবিউল আউয়াল মাসের ১৪ তারিখ রাতের বেলায় আল্লাহ্‌র রসুলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন, আর আল্লাহ্‌র রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সফলতার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করতে থাকেন।

তারা রাতের বেলায় গিয়ে তাকে ডাক দেন। তাদের ডাক শুনে সে নেমে আসে, যদিও তার স্ত্রী তাকে এই বলে সতর্ক করেছিল যে, 'আমি কেমন যেন মৃত্যুর গন্ধ পাচ্ছি'। সে তাকে এই বলে আশ্বস্ত করে যে এ তো শুধু মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ আর আমার দুধ ভাই আবু নায়লা, তাছাড়া কোন ভদ্র লোককে রাতের বেলায় ডাক দিলে তার অবশ্যই সাড়া দেয়া উচিৎ তাতে যদি সে তলোয়ারের আঘাতে দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায় তবুও। এদিকে আবু নায়লা তার সাথীদেরকে আগেই বলে রাখে যে আমি যখন ঘ্রান শোঁকার ভান করে তার মাথা ধরবো তখন তোমরা তোমাদের কাজ সেরে ফেলবে।

সে নেমে আসার পর তারা তার সাথে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে বিভিন্ন গল্প গুজব করে; তারপর তাকে তারা একটু বাহিরে গিয়ে চাঁদনী রাতে কিছু সুন্দর সময় কাটানোর আহবান জানায়। বাইরে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আবু নায়লা তাকে বলে যে, আরে তোমার মাথা থেকে তো চমৎকার ঘ্রান আসছে! কা'ব উত্তরে বলে যে আমার এমন একজন রক্ষিতা আছে যে আরবের সবচেয়ে সুগন্ধিনি নারী। আবু নায়লা বলে আমি কি একটু তোমার মাথাটা শুঁকে দেখতে পারি? সে বলে, অবশ্যই, নাও শুঁকে দেখ, আবু নায়লা তার মাথা ধরে প্রথমে একবার শুঁকে ছেড়ে দেয়, একটু পর সে আবার তার মাথার ঘ্রান শোঁকার কথা বলে (চুল ধরে) তার মাথাটা নিচু করে ধরে তার সাথীদেরকে বলে যে,

হাফেজ ইবনে হাজার এই হাদিসের ব্যখ্যায় তার ফতহুল বারী গ্রন্থে তিনটি ক্ষেত্রে মিথ্যা কথা বলার বৈধতা প্রসঙ্গে অন্য আরও একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন যে হাদিসটি ইমাম তিরমিযী রহঃ তার সুনানে উম্মে কুলসুম রাঃ এর বর্ণনায় সংকলণ করেছেন। এই তিনটি ক্ষেত্রের একটি হল যুদ্ধ। হাফিজ ইবনে হাজার রহঃ হাজ্জাজ ইবনে ইলাতের ঘটনাটিও সেখানে উল্লেখ করেছেন যেখানে দেখা যায় হাজ্জাজ ইবনে ইলাত তার সম্পদ মক্কার লোকদের কাছ থেকে ফেরত পাওয়ার জন্য রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মিথ্যা বলার অনুমতি প্রার্থনা করেন।[14]

নাও এবার তোমাদের কাজ সেরে ফেল; তখন তারা তাকে হত্যা করে ফেলে। সাহাবীদের দলটি তাদের মিশন সফল করে ফিরে আসে। অসতর্ক ভুলবশতঃ তাদের একজন সাথী হারিস বিন আওস তাদেরই তলোয়ারের আঘাতে আহত হন এবং তার রক্তক্ষরণ হতে থাকে। তারা বাকিউল গারকাদ নামক স্থানে এসে আল্লাহু আকবার বলে তাকবীর ধ্বনি দেন। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের তাকবীর শুনেই বুঝে ফেলেন যে তারা আল্লাহ্‌র শত্রুকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছে। তারা আল্লাহ্‌র রসূলের কাছে এলে তিনি তাদেরকে বলেন তোমাদের চেহারা উজ্জল হোক! জবাবে তারাও বলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ আপনার মোবারক চেহারাও উজ্জ্বল হোক। অতঃপর তারা তার ছিন্ন মস্তক আল্লাহ্‌র রসূলের কাছে হস্তান্তর করেন; রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সফলতার জন্য আল্লাহ্‌র প্রশংসা করেন।

আমাদের খুব আশ্চর্য হওয়ার তেমন কোন কারণ নেই। কেননা, আমাদের এই জামানায়ও আফগানিস্তানের মুরতাদ তাগুত আহমাদ শাহ মাসউদকে হত্যার নিল নক্সাও উল্লেখিত হাদিসটিকে হুবহু অনুসরণ করে প্রণয়ন করা হয়েছিলো। শায়খ উসামাহ বিন লাদেনের পরিকল্পনা অনুযায়ী ফ্রেঞ্চ ভাষায় পারদর্শী শ্বেতাঙ্গ দু'জন তিউনিসিয়ান ভাই সাংবাদিক সেজে তার ছবি তোলা ও সাক্ষাতকার গ্রহণের বাহানা ধরে তার কাছে আসা যাওয় আরম্ভ করে। সুক্ষভাবে তৈরী করা সাংবাদিক পরিচয়ের কাগজ পত্র, ফ্রেঞ্চ ভাষায় পারদর্শী হওয়া, গায়ের রং সাদা হওয়া ইত্যাদি সব মিলিয়ে তারা সে তাগুতের নিরাপত্তা রক্ষীদেরকে এমনভাবে বোকা বানাতে সক্ষম হন যে তারা তাদেরকে সত্যিই ফ্রেঞ্চ সাংবাদিক ভাবতে বাধ্য হয়। তারা প্রথমে আহমাদ শাহ মাসউদ, তার নিরাপত্তারক্ষী ও তার কাছে থাকা অন্যান্য ব্যক্তিদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলেন; একই সাথে তারা তার আচার আচরণ, অভ্যাস তার নিরাপত্তারক্ষীদের রুটিন ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। এভাবে দীর্ঘ দিন ধরে তারা তার সাক্ষাতকার নিতে নিতে তাদের অপারেশন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করে ফেলেন। এরপরও তারা অপেক্ষা করতে থাকেন সঠিক সময় সুযোগের সন্ধানে। এভাবে যাওয়া আসা করতে করতে এক সময় তাদেরকে নিরাপত্তারক্ষীরা তল্লাশি করা বন্ধ করে দেয়, শুধু হাসি দিয়ে তাদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে ভিতরে নিয়ে যেতে আরম্ভ করে। এভাবে এক পর্যায়ে তারা যখন সম্পূর্ণ নিশ্চিত হলেন যে এবার অপারেশন চালাতে আর কোন অসুবিধা নেই তখন তারা ক্যমেরা ও অন্যান্য ফটোগ্রাফি যন্ত্রপাতির মধ্যে লুকিয়ে বিস্ফোরক নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেন এবং সে তাগুত যখন একেবারে সে যন্ত্রপাতির কাছে আসে তখনই তারা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেন। আল্লাহ্‌ তায়ালা আমাদের এ দুটি ভাইয়ের আত্নত্যাগকে কবুল করুন এবং তাদেরকে শহীদদের দলে শামিল করুন।

[14] হাজ্জাজ বিন ইলাত আস সুলামী রাঃ জনগণ থেকে তার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ গোপন রাখেন এবং রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে মিথ্যা বলার অনুমতি চান মক্কার কাফিরদের থেকে তার সমুদয় সম্পদ উদ্ধার না করা পর্যন্ত। হাফেয ইবনে হাজার রহঃ এ হাদিসের ব্যখ্যায় বলেন, হাজ্জাজ বিন ইলাতের ঘটনা সম্পর্কে মুসনাদে আহমাদ ও সহীহ ইবনে হিব্বানে যে বর্ণনা রয়েছে তাতেও তার এ মিথ্যা বলার অনুমতি সমর্থিত হয়, একই হাদিস ইমাম নাসায়ীও বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম হাকেম একে সহীহ সাব্যস্ত করেছেন। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ও সাল্লাম তাকে তার সম্পদ কাফিরদের হাত থেকে রক্ষার জন্য যা খুশী তাই বলার অনুমতি দান করেন। এমনকি মক্কার কাফিরদেরকে এমন কথা বলার অনুমতি তাকে দেন যে খায়বারের লোকেরা মুসলমানদেরকে পরাজিত করেছে। মনে রাখা চাই যে হাজ্জাজ ইবনে ইলাতের এ ঘটনা কোন যুদ্ধকালীন ঘটনা ছিল না; বরং এটা

ইমাম বুখারী রহঃ ৩৮৬১ নং হাদিসে হযরত আবু যার রাঃ এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। এ ঘটনাটি বিশ্লেষণ করলেও আমরা সতর্কতা অবলম্বন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। আর এ ঘটনা আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে সাহাবায়ে কেরাম রাঃ যে কোন কাজে নিরাপত্তামুলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন, সতর্ক থাকতেন এবং সব সময় যত্নের সাথে গোপনীয়তা রক্ষা করে চলতেন; নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণকে কখনো তারা অবহেলা করতেন না। আবু যার রাঃ এর এ ঘটনায় আমরা দেখতে পাই আলী রাঃ সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত নিজে থেকে আগ বাড়িয়ে কিছু না বলে কিভাবে টানা তিন দিন পর্যন্ত তাকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি অপেক্ষা করেছেন তার আগমনের উদ্দেশ্য তার থেকে না জানা পর্যন্ত; এভাবে তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়েছেন যে তিনি সত্যিই ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র রসুলের সাথে সাক্ষাত করতেই এসেছেন। এরপরি তিনি সম্মত হন তাকে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে যেতে এবং তাকে বলেন দূর থেকে তাকে অনুসরণ করতে যাতে কুরায়শরা কিছু টের না পায়। আমরা দেখতে পাই কত সতর্কভাবে আলী রাঃ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন! তিনি আবু যার রাঃ কে বলেন 'আমি যদি আপনার জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে এমন কোন কিছু আঁচ করি তাহলে আমি প্রশ্রাব করার ভান করে রাস্তার পাশে চলে যাবো; এর পর যখন আমি আবার চলা আরম্ভ করবো আপনি আমাকে অনুসরণ করে চলতে থাকবেন যতক্ষণ না আপনিও সেই বাড়িতে প্রবেশ করেন যে বাড়িতে আমি প্রবেশ করি'।

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ্‌ তা'য়ালা আসহাবে কাহাফের ঘটনায় আমাদেরকে দেখিয়েছেন কিভাবে সেই যুবকরা তাদের জাতির লোকদের থেকে সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন। তাদের মধ্য থেকে যাকে তারা খাবার ক্রয় করতে শহরে পাঠিয়েছিলেন তাকে তারা বলেছিলেন-

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

তোমরা তোমাদের একজনকে তোমাদের পয়সা দিয়ে বাজারে পাঠাও, সে গিয়ে দেখুক কোন খাবার উত্তম,অতঃপর তা থেকে তোমাদের জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসুক; সে যেন অবশ্যই বিচক্ষণতার সাথে কাজ করে এবং তোমাদের ব্যাপারে কাউকে কিছু না বলে। (সুরা আল কাহাফ, আয়াত ১৯-২০)

ছিল স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় থাকা অবস্থার কথা। ফাতহুল বারীতেও ঘটনাটির বর্ণনা এসেছে এবং ইমাম ইবনে কাসীর আল বেদায়া ওয়ান নিহায়াতেও এ ঘটনাটি বিস্তারিত এনেছেন।

এখানে উল্লেখিত এবং এমন অন্য আরও অনেক ঘটনা প্রমাণ করে যে, সাবধানতা অবলম্বন, সতর্কতা মুলক পদক্ষেপ গ্রহণ, গোপনীয়তা বজায় রাখা, আল্লাহ্‌র শত্রুদের কাছে বানোয়াট ঘটনা সাজানো, তাদেরকে প্রতারিত ও বিভ্রান্ত করা, তাদের দুষ্কৃতি থেকে নিজেদেরকে রক্ষার জন্য মিথ্যা কথা বলা সম্পূর্ণভাবে শরিয়াহ সম্মত হালাল ও বৈধ এবং একারণে কোন মুসলমানকে কিছুতেই দোষারোপ কিংবা ভর্তসনা করা যাবে না। আর একথা অনস্বীকার্য সত্য যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হালাল করে দেয়া এ সুযোগকে যথাযথভাবে ব্যবহার না করা, সাবধানতা অবলম্বনের এসব পদক্ষেপকে অবহেলা আল্লাহ্‌র শত্রুদেরকে দ্বীনের দায়ী ও মুজাহিদদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দেবে এবং কঠোর পরিশ্রম সত্ত্বেও তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে নস্যাত করে দেবে, তাদের জান মাল কোরবানি করে পরিচালিত জিহাদকে বিফল করে দেবে।[15]

শর’য়ী দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টির বৈধতা প্রমানিত হওয়ার পর এখন আমরা এর বাস্তব প্রয়োগের ব্যাপারে কিছু আলোচনা করবো।

---

[15] আবু যুবায়দা সেন্টার থেকে প্রকাসশিত সিকিউরিটি এনসাইক্লোপিডিয়াতে আরও বলা হয়েছে যে, উপায় উপকরণ অবলম্বন করলেই যে সফলতা আসবে বিষয়টি মোটেই তা নয়; এটা খুবই ভয়াবহ ব্যাপার যে অনেকে কেবল উপায় উপকরণের উপরই নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। আমাদের মনে রাখা চাই যে আমরা উপায় উপকরণ অবলম্বন করি এ কারণে যে আল্লাহ্‌ তায়ালা আমাদেরকে গুরুত্বের সাথে উপায় উপকরণ অবলম্বনের আদেশ দিয়েছেন এবং উপায় উপকরণ বাস্তবেও একটা ভুমিকা রাখে। এটা খুবই স্বাভাবিক যে কোন ভাই যদি সঠিকভাবে নিরাপত্তা রক্ষার পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করে তাহলে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তাকে গ্রেফতার করাটা মোটেই সহজ বিষয় নয়। সুরা আল মায়িদার ৬৭ নং আয়াত ‘(হে নবী) আল্লাহ্‌ তা’য়ালাই আপনাকে মানুষদের থেকে রক্ষা করবেন’ এ আয়াতের ব্যখ্যায় ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহঃ বলেন, আল্লাহ্‌র তরফ থেকে তার রসূলের জন্য এই নিরাপত্তা ঘোষণার সাথে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণের সাথে নীতিগতভাবে কোন বৈপরীত্য নেই। ঠিক যেমন কোন সংঘর্ষ নেই দ্বীনকে বিজয়ী করার ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তায়ালার ঘোষণা ও আমাদের প্রতি জান মাল কোরবানি করা, প্রস্তুতি গ্রহণ করা, শত্রুদের থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা ও জিহাদের নির্দেশ দানের মধ্যে। (যাদুল মাআদ ৩/৪৮০)
আমাদের মনে রাখতে হবে যে আল্লাহ্‌ তায়ালা যেমন *হুকমুশ শরয়ী* বা ইসলামিক বিধি বিধান প্রণয়ন করেছেন তেমনি তিনিই প্রণয়ন করেছেন *হুকমুল কাওনী* বা প্রাকৃতিক বিধি বিধান। শরয়ী বিধানে যেমনি তিনি আমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন সতর্কতা অবলম্বন করতে, একইভাবে আল্লাহ্‌ তায়ালা তার প্রাকৃতিক বিধানে এই নিয়ম রেখেছেন যে সতর্কতা অবলম্বন করলে তার ইচ্ছায় এর একটা ফলাফল আছে। ঠিক যেমন গাছের ফল খেতে চাইলে আগে বীজ বপন করে তার যত্ন নিয়ে তারপর আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করতে হবে। একইভাবে কোন গোয়েন্দা সংস্থাকে ফাঁকি দিতে হলে কিংবা সফলভাবে কোন অপারেশন পরিচালনা করতে হলে অবশ্যই সম্ভাব্য সকল সতর্কতা অবলম্বন করে তার পর আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করতে হবে। এ প্রসঙ্গে চমৎকার একটি হাদিস সংকলন করেছেন ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম ইবনে হিব্বান একে সহীহ সাব্যস্ত করেছেন; হাদিসটি হল এক ব্যক্তি এসে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন যে আমি কি উট বেঁধে রাখবো নাকি আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করব? রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্ললাম তাকে বলেন, প্রথমে উট বাঁধবে তারপর আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করবে। অতএব, হে আমাদের প্রান প্রিয় ভাইয়েরা! আপনারা অবশ্যই প্রথমে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করবেন তারপর আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করবেন। ইমাম তাবরানী হাসান সনদের অন্য একটি হাদিস সংকলন করেছেন যেটিতে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমার উপর যা আসা নির্ধারিত হয়ে আছে তা কখনো তোমার উপর থেকে সরে যাবে না, আর যা তোমার উপর আসার নয় তা কখনো তোমার উপর আসবে না।

সাবধানতা অবলম্বনের ব্যাপারে লোকেরা উভয় দিকেই প্রান্তিকতার শিকার; একদল হয়তো সতর্কতার ব্যপারে এমন মারাত্নক উদাসীন যে বিষয়টিকে মোটেই গুরুত্ব দেয় না; অন্য দিকে একদল সতর্কতার নামে এমন বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে যে সব কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে একেবারে স্থবির হয়ে বসে আছে, ভীতি তাদের অন্তরে এমনভাবে ছেয়ে গেছে যে তারা তাদের নিজ ছায়া দেখেও ভয়ে কেপে ওঠে, তারা মনে করে আশপাশের সব কিছু বুঝি শুধু তারই বিরুদ্ধে কাজ করছে। কাজ আরম্ভ করার প্রথম দিকে নিরাপত্তামুলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টিকে অবহেলা হেতু তাদের উপর আপতিত বিপদ মুসীবতের কারণে তারা দাওয়াহ ও জিহাদের কাজ ছেড়ে দিয়ে ঘরের কোণে ঘাপটি মেরে অলস হয়ে বসে থাকে। এবং মানসিক দিক থেকে এমনভাবে ভেঙ্গে পড়ে যে তারা মনে করে তাদের সকল গোপন তথ্য বুঝি আল্লাহ্‌র শত্রুদের জানা।[16] আল্লাহ্‌র শত্রুদের আড়ি পাতা, দলের মধ্যে গোপন অনুপ্রবেশ, গোপন পর্যবেক্ষণ, তাদের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ইত্যাদির ভয়ে সে এমনভাবে কুঁচকে যায় যে সে ফোন, কম্পিউটার বা অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার একেবারেই ছেড়ে দেয়। তার অবস্থা এমন হয়ে দাড়ায় যে সে যদি যোগাযোগের জন্য বার্তাবাহক হিসেবে কবুতর ব্যবহার করতে পারতো তাহলে অন্য কিছুই ব্যবহার করতো না।

অথচ এসব তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা সত্ত্বেও নিজেকে এর ক্ষতিকারক দিক থেকে নিরাপদ রাখার জন্য এমন কোন মহা পণ্ডিত হওয়ার প্রয়োজন নেই, সামান্য একটু সচেতনতাই এখেকে আপনাকে নিরাপদ রাখতে পারতো। এজন্য আল্লাহ্‌র শত্রুদের বিভ্রান্ত করার কিছু পদ্ধতি জানা, নিপুন কভার স্টোরি তৈরি করতে শেখা, তথ্য গোপন রাখার প্রযুক্তিগত আধুনিক কিছু টেকনিক শিখে নেয়া প্রতিটি মুজাহিদ ভাইয়েরই একান্ত

---

[16] আল্লাহ্‌র কাছে এমন অবস্থা থেকে আশ্রয় চাই। এই অবসাদগ্রস্থ মূর্খেরা তাওয়াক্কুল ও ইয়াকীনের অর্থই জানে না। আল্লাহ্‌ তায়ালা তাঁর নিজ মহান গুণাবলীর বর্ণনা দিয়ে বলেন 'তোমরা প্রকাশ্যে যা বল তা যেমন তিনি জানেন তেমনি যা গোপন তাও তিনি জানেন'। (সুরা ত্বা- হা,আয়াত ৭) মরহুম শায়খ আব্দুল্লাহ আর রাশুদ (আল্লাহ্‌ তাকে সর্বোচ্চ শহীদী মর্যাদা দান করুন) তার এক খুতবায় বলেন- 'আমার মনে পড়ে একবার এক ছাত্র আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বলছিল যে পেন্টাগন হল এমন এক সুরক্ষিত স্থান যার উপর দিয়ে মাছিও উড়ে যেতে পারে না। আমি বলতে চাই যে সে নির্ঘাত আল্লাহদ্রোহীতামুলক কথা বলেছে, তারা শুধু দুনিয়ার বাহ্যিক দিকটা সম্পর্কেই জানে, আর আখিরাত সম্পর্কে তারা একেবারেই উদাসীন (সুরা আর রুম আয়াত ৭), সে আসলে বিশ্বাসই করে না যে তাকে শীঘ্রই আল্লাহ্‌র সামনে দাড়াতে হবে, তার আসলে আখিরাতের উপর মোটেই ঈমান নেই, সে এও জানে না যে, যে কোন পরিস্থিতি যে কোন সময় আল্লাহ্‌ তায়ালা ঈমানদারদের পক্ষে নিয়ে আসতে পারেন; যদি সে জানত তাহলে এমন কথা কিছুতেই মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পারতো না। এই আত্নপরাজিত আমেরিকার গোলামরা আত্নত্যাগী স্বাধীন বিবেকবান মুজাহিদ যুবকদেরকে জিহাদের মহান পথ থেকে ফিরিয়ে রাখার নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছুই করতে পারে না। আর এ ধরণের মানসিক গোলামদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যে স্থাপনার উপর দিয়ে তোমরা মাছি উড়ে যাওয়াকেও অসম্ভব মনে করেছিলে আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে মুজাহিদরা উড়ে গিয়ে সেখানে ভয়াবহ আঘাত হেনেছে। এসব গোলামদের পরাজিত করার জন্য এর চেয়ে বাস্তব আর কি প্রমাণ প্রয়োজন!

কর্তব্য। এর ফলে দেখা যাবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় যাদুকর তার নিজ যাদুতেই আক্রান্ত হয়ে পড়বে।

‘সব কিছুই তাদের পর্যবেক্ষণের আওতাধীন’ এমন কথা বলে কিংবা তাদের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আধুনিক এসব উপায় উপকরণসমুহকে দাওয়াহ ও জিহাদের কাজে ব্যবহার বন্ধ করে দেয়া, যৌক্তিক কোন বৈধ কারণ ছাড়া আধুনিক এসব যোগাযোগ মাধ্যমসমুহকে উপেক্ষা করা সেচ্ছায় পরাজয় বরণ করা ও আত্মপ্রবঞ্চনা বৈ কিছুই নয়। এর অর্থ দাঁড়াবে আল্লাহ্‌র শত্রুদের বোগাস সব প্রযুক্তির সামনে অকারণ ভেংগে পড়া এবং আল্লাহ্‌র শত্রুদের ‘ক্ষমতাকে’ বাড়াবাড়ি পর্যায়ে অতি মুল্যায়ন করা।[17]
জেলের কষ্টকর জীবন থেকে সদ্য মুক্তি পাওয়া কয়েকজন যুবকের সাথে আমি দেখা করেছিলাম যারা জেলে থাকা অবস্থায় জিজ্ঞাসাবাদের সময় একে অপরের বিরুদ্ধে জবানবন্দি দিয়েছে। এদের এক জনের সাথে কথা বলার জন্য যখন আমি বসলাম তখন সে উঠে গিয়ে রেডিওর একটি চ্যানেল ছেড়ে দিল যাতে শুধু উচ্চস্বরে বিরক্তিকর শব্দ হচ্ছিল, আমি তাকে বললাম, তুমি রেডিও ছাড়ছো কেন, ওটা বন্ধ করে দাও, শব্দে তো কিছু শোনা যাচ্ছে না! সে বলল, না এটা বন্ধ করা যাবে না, আমাদের কথোপকথনকে অবোধগম্য করার জন্য এর প্রয়োজন আছে, যদি কেউ আমাদের কথাবার্তায় আড়ি পাতে? আমি তাকে বললাম, এটা তোমার নিজের ঘর, আর আমাদের কথাবার্তা একান্তই সাধারণ সামাজিক কথাবার্তা, আমরা না দাওয়াহর বিষয়ে কথা বলছি না জিহাদের, না নিরাপত্তা বিষয়ক কোন ব্যপারে; আমার তো মনে হয় তোমার এই রেডিওর অপ্রাসঙ্গিক শব্দ বরং অন্যদের মধ্যে সন্দেহের উদ্রেক করা ছাড়া অন্য কোন উপকারে আসবে না।

এদের অনেককে দেখা যায় এরা কারো সাথে ফোনে কথা বলার সময় কোন প্রয়োজন ছাড়াই এমন সব বিকৃত ও সাংকেতিক শব্দ ব্যবহার করে যে শুনে মনে হয় যে সে অন্য কোন ভাষায় কথা বলছে, অনেক সময় দেখবেন আপনি বুঝতেই পারবেন না এরা কি বলছে; অথচ তাদের আলোচনার বিষয় বস্তু হয়তো ছিল এমন একান্তই সাধারণ যেক্ষেত্রে এরকম সন্দেহজনক আচরণের কোনই প্রয়োজন ছিল না। আল্লাহ্‌র শত্রুরা যদি সত্যিই

---

[17] কারাবন্দী শায়খ ফারিয আয যাহরানী (আল্লাহ্‌ তার মুক্তির পথ খুলে দিন) *তাহরিয়ুল মুজাহিদীন আলা ইহইয়াইস সুন্নাতিল ইগতিয়াল* নামক গ্রন্থে গুপ্ত হত্যার মিশন সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য মুজাহিদদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন, ‘এ বিষয়ে একটি পুর্নাঙ্গ সিলেবাস থাকা প্রয়োজন যাতে করে ভাইয়েরা নিরাপত্তা ও গোয়েন্দাগিরি সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করতে পারে এবং ইহুদী খ্রিস্টান সহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তাদের দক্ষতা যোগ্যতা সম্পর্কে হলিউড সহ বিভিন্ন মিডিয়া ব্যবহার করে তাদের ব্যপারে যেসব ভীতিকর পরিস্থিতি তৈরি করে রেখেছে সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেতে পারে। কারণ তারা তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতা সম্পর্কে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা চালিয়ে মানুষের মধ্যে এক ধরণের ভীতি সৃষ্টি করে রেখেছে। যদিও আমেরিকার টুইন টাওয়ার ও পেন্টাগন আক্রমন, কেনিয়ার তানজানিয়ায় আমেরিকান এম্বেসি আক্রমন, ইয়েমেনে ইউ এস এস কোল ওয়ারশিপ ইত্যাদি আক্রমন তাদের অযোগ্যতাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

তাদের এসব সন্দেহজনক সাংকেতিক কথাবার্তা আড়ি পেতে শুনে থাকে তাহলে তারাও হয়তো বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে নিবে, হয়তো ভাববে যে এই সাংকেতিক কথাবার্তার পেছনে নিশ্চই নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ার আক্রমনের চেয়েও ভয়াবহ কোন আক্রমনের পরিকল্পনা লুকিয়ে আছে।

আমাদের বুঝা উচিত যে সন্দেহজনক ভঙ্গিতে কথা না বলে স্পষ্ট ভাষায় কথা বলাই উত্তম; অকারণ সন্দেহ সৃষ্টি করা মোটেই ঠিক নয়। এতদসত্ত্বেও কিছু লোক আছে যারা বিনা কারণেই এমন সন্দেহজনক আচরণ করতে পছন্দ করে। দেখা যায় এদের কেউ হয়তো আপনাকে ফোন করে বললো যে 'আপনার কাছে আমার একটা আমানত আছে' কিংবা বললো, 'আপনি আজ অবশ্যই আসবেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ আছে'। হয়তো দেখা যাবে গুরুত্বপূর্ণ আমানতটি হল এক প্যাকেট চকলেট বা কোন কাপড় চোপড়, বা এক জোড়া সানগ্লাস যেটা তার থেকে আপনি হয়তো ধার নিয়েছিলেন; আর মহা গুরুত্বপূর্ণ সেই কাজটি হল এক সাথে আনন্দ করে লাঞ্চ বা ডিনার করা। এরা অকারণ অস্পষ্টতা ও নাটকীয়তা পছন্দ করে। এই বোকারা অনুধাবন করেনা যে বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে এই স্থুল নাটকীয়তা কত ভয়াবহ পরিণতি বয়ে আনতে পারে। বিশেষ করে যাদের সাথে এভাবে কথা বলছে তারা যদি এমন ব্যক্তি হন যাদেরকে সরকারী গোয়েন্দারা পর্যবেক্ষণ করছে, যাদেরকে আল্লাহ্‌র শত্রুরা মনিটর করছে।

এরা যদি কখনো কারাবন্দি হয় তাহলে শত কসম করে বললেও আল্লাহ্‌র শত্রুরা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না যে সেই আমানতটি ছিল একান্তই তুচ্ছ কোন জিনিস, আর সেই গুরুত্বপূর্ণ কাজটা ছিল নিছক লাঞ্চ বা ডিনার। তারা একথা বললে কিছুতেই তাদেরকে ছাড়বে না, তারা তাদের শরীর ক্ষত বিক্ষত করবে, তাদের নখ উপড়ে ফেলবে যতক্ষন না তারা 'স্বীকার' করবে যে তাদের অস্ত্রসস্ত্র ও গোলা বারুদের মজুদ কোথায় লুকানো আছে; যতক্ষণ না তারা 'গোপন সামরিক মিটিং' কিংবা 'সংগঠনের' গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেয়ার ব্যপারে জবানবন্দি দিতে সম্মত হয় যা সেই সাংকেতিক কথার আড়ালে লুকিয়ে আছে।

কিছু লোক আছে যারা সামান্য নির্যাতনের মুখোমুখি হওয়ার আগেই আল্লাহ্‌র শত্রুদের কাছে সব কথা গড়গড় করে বলে দেয়, সবার কন্টাক্ট নাম্বার দিয়ে দেয় এবং অজুহাত দেয় যে তারা শুনেছে নতুন এক ধরণের প্রযুক্তি এসেছে যার সাহায্যে মানুষের কণ্ঠস্বর সনাক্ত করা যায়, মিথ্যা শনাক্তকারী মেশীনের সাহায্যে কেউ মিথ্যা বললে তাও ধরে ফেলা যায় এবং আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে দুনিয়ার সকল ফোনের কথোপকথন রেকর্ড করা হয়... ইত্যাদি ইত্যাদি। কথা শুনে মনে হয় যেন তারা ব্যপক গন বিধ্বংসী অস্ত্রের বিষয়ে কথাবার্তা বলছিল। এসব হাইপোথেটিক চিন্তা করে গোয়েন্দাদের কাছে তারা মিথ্যা কথা বলাকে সমীচীন মনে করে না।

আমি বুঝি না এর চেয়ে ভয়াবহ ক্ষতি আর কি হতে পারে যে আল্লাহ্‌র শত্রুরা তাকে শনাক্ত করতে পেরেছে এবং তারা এও বুঝতে পেরেছে যে সে তাদের কাছে মিথ্যা বলছে। নাকি সে তাদের থেকে নিরীহ সাধারণ ও অমায়িক ভদ্রলোক হওয়ার সার্টিফিকেট চায়! নাকি সে মিথ্যা বলতে লজ্জাবোধ করছে সেই সব লোকদের কাছে যারা সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিশ্বাসঘাতক ও পথভ্রষ্টকারী![18] অথচ তার এই মিথ্যা হয়তো আল্লাহ্‌র দ্বীনের দাওয়াহ ও জিহাদকে আল্লাহ্‌র শত্রুদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করতে পারতো, তাকে ও তার দ্বীনী ভাইদেরকে তাদের যুলুম অত্যাচার থেকে বাঁচাতে পারতো। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র শত্রুদের এই জঘন্য মিথ্যাচার তো দ্বীনের দাওয়াহকে বন্ধ ও জিহাদকে উৎখাত করার জন্য; তার দ্বীনী ভাইদের উপর দমন পীড়ন ও যুলুম নির্যাতন চালানোর জন্য।

এই হল আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ও আল্লাহ্‌র শত্রুদের ক্ষমতা সম্পর্কে অতিরঞ্জিত ধারণা পোষণ করা, তাদেরকে খুব ভয় করা এবং তাদেরকে ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যে বোকার মতো অপ্রয়োজন অতি বাড়াবাড়ি করার পরিণাম।

এতো গেল আমাদের এক শ্রেনীর ভাইদের অবস্থা, অন্য দিকে রয়েছে আমাদের সে সব ভাইয়েরা যারা সাবধানতা অবলম্বন ও নিরাপত্তা ইস্যুকে মোটেই গুরুত্ব দেয় না। দেখা যায় যে তারা তাদের গুরুত্বপূর্ণ গোপন তথ্য, গুরুত্বপূর্ণ তারিখ ও স্থানের নাম, সংগঠনের সদস্যদের নাম ঠিকানা, তাদের পরিকল্পনা, তাদের অর্থের উৎস, খরচের খাত ইত্যাদি সব কোন রকম সিকিউরিটি কোড ছাড়াই প্রকাশ্যে ও সাধারণ বোধ্য ভাষায় বিস্তারিত লিখে রাখে; অথচ আমরা তথ্য প্রযুক্তির এমন উন্নতির যুগে বাস করছি যেখানে তথ্য গোপন রাখার অনেক রকম নিরাপদ ও আধুনিক পদ্ধতি আমাদের হাতের নাগালে রয়েছে। এসব ভাইদেরকে দেখা যায় সাংগঠনিক, নিরাপত্তা সংক্রান্ত বা গুরুত্বপূর্ণ কোন বার্তা তার কাছে আসার পর সে সেটিকে দিনের পর দিন সপ্তাহের পর সপ্তাহ পকেটে নিয়ে ঘুরছে, কিংবা তার ঘরে হয়তো মাসের পর মাস বসরের পর বসর ধরে পড়ে আছে অথচ সে তা নষ্ট রে ফেলছে না।[19] যেন সে অপেক্ষা করছে কখন আল্লাহ্‌র শত্রুরা আকস্মিক তার

---

[18] আল্লাহ্‌র কাছে সৃষ্টির মধ্যে সব চেয়ে নিকৃষ্ট জীব হল সেই সব মুক ও বধীর লোকেরা যারা আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করে এবং তাই তারা ঈমান আনয়ন করে না। (সুরা আল আনফাল আয়াত ৫৫)

[19] বিখ্যাত নিরাপত্তা ও কৌশল বিশ্লেষক শায়খ আবুবকর আন নাজি তার *ইদারাতুত তাওয়াহহুশ* নামক গ্রন্থে এ সম্পর্কে উদাহরণ দিয়ে বলেন, কোন এক ভাইকে একবার একটি ডকুমেন্টস দিয়ে বলে দেয়া হয়েছিলো যে সে যেন এটা পড়ে সাথে সাথে পুড়িয়ে ফেলে, কিন্তু সে সেটি পুড়িয়ে না ফেলে খুবই যত্নের সাথে তার বাড়িতে একান্ত গোপন এক স্থানে সে লুকিয় রাখে; পরবর্তীতে তাগুতী নিরাপত্তা রক্ষীরা তার বাড়ি রেইড দিয়ে যখন সব কিছু তন্ন তন্ন করে খোজা আরম্ভ করে তখন তারা সেই ডকুমেন্টসটি পেয়ে যায়। আর তার এই একটু অসতর্কতা গোটা একটা পরিকল্পনাকে নস্যাত করে দেয় এবং গোয়েন্দারা আদা জল খেয়ে তদন্তে নামে। পরবর্তীতে জেলে থাকা অবস্থায় তাকে সে ডকুমেন্টসটি পুড়িয়ে না ফেলার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলে যে, 'আমি তার মতো একজন মহান শায়খ ও কমান্ডারের নিজ হাতে লেখা কাগজটিকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলাকে সমিচীন মনে করেছিলাম না'।

বাড়িতে হানা দেবে আর দাবি করবে যে 'ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার পরিকল্পনা' তারা নস্যাত করে দিয়েছে; আর সেও সেই অরক্ষিত অবহেলায় ফেলে রাখা তথ্যটির কারণে জিজ্ঞাসাবাদের সময় তা অস্বীকার করার সুযোগ পাবে না, আর এটিই তার বিরুদ্ধে ভয়াবহ সন্ত্রাসী কাজে সম্পৃক্ততার প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা হবে।

এর চেয়েও যে ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে পারে তা হল তার এই অসতর্কতার কারণে অনেক ভাইয়েরা গ্রেফতারের শিকার হতে পারে, দাওয়াহ ও জিহাদের কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। এদেরকে দেখা যায় কোন রকম নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া নির্বিঘ্নে সব ধরণের যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে চলছে, আর কেউ যদি তাকে সাবধান হওয়ার পরামর্শ দেয়, কোন মিটিঙের বিষয়বস্তু গোপন রাখতে বলে, বার্তাটি পড়ার পর যদি চিরকুটটি ছিড়ে ফেলতে বলে, ভাইদের আসল নাম ঠিকানা না রাখতে বলে এবং তাকে সাবধানতা অবলম্বন করে চলতে বলে তখন সে বিরক্ত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে, কল্যাণকামী ভাইদেরকে গালমন্দ করে; এমনকি এগুলোকে লজ্জস্কর, দুঃখজনক ও কাপুরুষতা বলে আখ্যায়িত করে।[20]

আমি জানি না তার মধ্যে কেমন প্রতিক্রিয়া হতো যদি সে আফগানিস্তানের সেই দৃশ্য দেখত যখন সাপের গর্তে ভরা এবং দুজন মানুষের জন্য জায়গা হয় না এমন সংকীর্ণ গুহার মধ্য তার অনেক মুজাহিদ ভাইদেরকে লুকিয়ে থাকতে হয়েছে।

---

[20] সিকিউরিটি এনসাইক্লোপিডিয়াতে এ বিষয়ে বলা হয়েছে যে, যে সব দরজা দিয়ে শয়তান মুজাহিদ ভাইদেরকে কাবু করে ফেলে তার মধ্যে একটি হল, ভীতু লোকদের কাজ বলে নিরাপত্তা পদক্ষেপ গ্রহণকে অবেহেলা করতে উৎসাহ দেয়া। শয়তানের ওয়াস ওয়াসায় তখন সে মনে করতে আরম্ভ করে যে সে যেহেতু আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের জন্য বেরিয়েছে এখন তার আর নিরাপত্তা পদক্ষেপ গ্রহন করার কোন প্রয়োজন নেই, তার নিরাপত্তা এখন স্বয়ং আল্লাহ্‌ নিশ্চিত করবেন। কিন্তু সত্য হল এই যে আল্লাহ্‌ রব্বুল আলামিনের উপর তাওয়াক্কুলের প্রথম দাবীই হল তাঁর হুকুম মাফিক সতর্কতা অবলম্বন করা। যদিও আমরা একথার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে আমাদের উপর যা কিছু আপতিত হওয়ার তা হবেই। আল্লাহ্‌র রসূলের হিজরতের ঘটনার মধ্যে আমাদের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে। নিজের কিংবা সাথী ভাইদের জেলে যাওয়া ইত্যাদি সম্পর্কে নির্ভয় উদাসীন বা ড্যাম- কেয়ার ভাব হওয়াটা ভয়াবহ এক আত্মঘাতি ভুল। সে নির্ভীক হওয়ার একটি গুন অর্জন করার সাথে সাথে সাথী ভাই, সংগঠন ও নিজেকে অকারণ ক্ষতিগ্রস্ত করার মতো ভয়াবহ ত্রুটিও অর্জন করেছে।
তাগুতী গোয়েন্দা সংস্থা ও নিরাপত্তা কর্মীদের জন্য সব চেয়ে আনন্দদায়ক খুশির বিষয় হল কোন মুজাহিদ ভাইকে গ্রেফতার করতে পারা; আর যে কারণে তারা পা থেকে মাথা পর্যন্ত তেলে বেগুনে জলে ওঠে তা হল তাদের হাত থেকে কোন মুজাহিদ ভাই ছুটে যায়, কিংবা কোন ভাই যখন তাদের চোখে ধুলা দিয়ে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করে কিংবা জিহাদের ময়দানে চলে যায়। অতএব আপনার সতর্কতামূলক নিরাপত্তা পদক্ষেপ গ্রহণ আল্লাহ্‌র শত্রুদের মধ্যে রাগ ও ক্ষোভের সঞ্চার করে, আর একারণে আপনি এমনিতেই আল্লাহ্‌র তরফ থেকে পুরস্কার পেতে থাকবেন; কেননা আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেছেন- **'আল্লাহ্‌র পথে ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও ক্লান্তিতে তারা যতটুকু কষ্ট পাবে, যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করে তারা কাফেরদের ক্রোধের উদ্রেক করবে এবং কাফিরদেরকে আহত করবে অবশ্যই তার বিনিময়ে একটি নেক আমল তাদের জন্য লিখে দেয়া হবে... (সুরা আত তাওবা আয়াত ১২০)**

সত্যিই এমন ব্যক্তিকে ভর্তসনা করাটা কোন অন্যায় নয় যে দুর্দশায় পতিত হওয়ার একমাত্র কারণ হল আল্লাহ্‌র রসুলের জীবনী সম্পর্কে তার অসচেতনতা, আরাম আয়েশের মধ্যে ডুবে যাওয়া, আল্লাহ্‌র দ্বীনের জন্য একজন সত্যিকার মুজাহিদ হিসেবে সৈনিক সুলভ জীবন যাপন থেকে দূরে থাকা এবং দুনিয়াদার সাধারণ মানুষদের মতো তাগুতদের প্রচারিত তথাকথিত নিরাপদ জীবনের কুহেলিকায় ডুবে থাকা।
কঠোর পরিশ্রম, ত্যগ তিতিক্ষা ও সাধনা করে সফলতার দ্বার প্রান্তে আনা অনেক পরিকল্পনা কেবল এই অসতর্কতা, অসাবধানতা ও বেখেয়ালীপনার কারণে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে এবং মুসলিমদেরকে হতাশার মধ্যে ফেলেছে; একই সাথে আল্লাহ্‌র শত্রুদের জন্য এ ঘটনা বয়ে এনেছে এক মহা আনন্দ বার্তা, তারা এটাকে 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে' তাদের নিরাপত্তা বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার বিরাট সাফল্য হিসেবে জনগণের সামনে তুলে ধরছে। অথচ বাস্তবে বিষয়টি হয়তো মোটেই তা নয়, এই ব্যর্থতা আল্লাহ্‌র শত্রুদের গোয়েন্দাদের কোন সফলতা ছিল না, বরং এটা ছিল ভাইদের অসতর্কতা, অসাবধানতা ও নিরাপত্তা ইস্যুকে যথাযথ গুরুত্ব না দেয়ার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।[21]

আমার সত্যি কষ্ট হয় যখন দেখি অনেক যুবকেরা এ বিষয়ে উপদেশ গায়ে মাখে না, অন্যদের ভুল থেকে শিক্ষা নেয় না[22] এবং একই ভুল বারবার করতে থাকে; আর একারণে একই পরিণতির শিকার হয়।[23] এদের কেউ যখন জিহাদে অংশগ্রহণ করার

[21] লেখকের এ বক্তব্যটি আসলেই স্বর্নালী অক্ষরে লিখে রাখার মতো। নিরাপত্তা ইস্যুতে উদাসীন ও অতি বাড়াবাড়ি উভয় প্রান্তিকতার শিকার লোকদের শিক্ষার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। অতএব বিষয়টিকে একটু গভীরভাবে একটু ভেবে দেখুন।

[22] আবু যুবায়দা সেন্টার থেকে প্রকাশিত সিকিউরিটি এনসাইক্লোপিডিয়াতে এ বিষয়ে বলা হয়েছে যে, 'স্মার্ট হল সে যে অন্যদের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। সাথী ভাইদের ব্যপারে শত্রুদেরকে তথ্য দেয়া যেমন হারাম তেমনি এই নিরাপত্তা ইস্যুকে উপেক্ষা করাও হারাম। কারণ এই নিরাপত্তা ইস্যুকে অবহেলা ও উপেক্ষা করার কারণেই আপনি হয়তো বাধ্য হবেন- আপনাকে বাধ্য করা হবে শত্রুদের কাছে সাথী ভাইদের তথ্য প্রদান করতে। শত্রুরা আসলে এভাবেই একজনকে গ্রেফতার করে তার থেকেই অন্যদের সম্পর্কে তথ্য আদায় করে; অন্যথায় আপনিই বলুন লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্য থেকে তারা কিভাবে একজন মানুষকে আলাদা করে চিহ্নিত করে! নিশ্চয়ই তারই কোন ভাই শত্রুদেরকে তার কথা বলে দিয়েছে।

[23] এ বিষয়ে আল্লাহ্‌র রসূলের পথনির্দেশ হল সহীহ্‌ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণীত হাদীস, যেখানে তিনি বলেন, **'প্রকৃত মুমিন কখনো একই গর্ত থেকে দু'বার দংশিত হয় না'**। আমাদের চার জন অনুবাদক ভাই সহ আরও অনেক ভাই আল্লাহ্‌র শত্রুদের হাতে গ্রেফতার হওয়ার পর এই হাদিসটিকেই আমরা আমাদের এই প্রজেক্টের মুল প্রতিপাদ্য হিসেবে গ্রহণ করেছি। আমরা আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করি আল্লাহ্‌ তায়ালা যেন তাদের কষ্ট লাঘব করে দেন, তাদের সংকল্পকে আরও শক্তিশালী করে দেন, তাদের উৎসাহ উদ্দিপনা আরও বাড়িয়ে দেন, তাদেরকে ধৈর্য ধারণ করার তাওফিক দান করেন, তাদের চেহারাকে উজ্জ্বল করেন, তাদের অন্তরকে প্রশস্ত করে দেন এবং তাদের ঈমান হেফাযত করেন- আমীন!!! আর সাথে সাথে আমরা স্বরণ করতে চাই আল কুরআনের সেই আয়াত যেখানে আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন, **'তুমি বল, আল্লাহ্‌ তায়ালা আমাদের জন্য যা অবধারিত করে রেখেছেন তা ছাড়া কখনই আমাদের**

নিয়ত করে এবং এ উদ্দেশ্যে যদি কিছু অস্ত্রশস্ত্র এদের হস্তগত হয় তাহলে সে অন্যদের কাছে কেবল অস্ত্রের কথা বলেই ক্ষান্ত হয় না বরং তার লক্ষ উদ্দেশ্য ও জিহাদের পরিকল্পনা ইত্যাদি বলতে গর্ব বোধ করে। তারপর যখন আকস্মিকভাবে তাকে তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় কিংবা তার বাড়ি রেইড দেয়া হয় তখন সে ভাবে কিভাবে তার পরিকল্পনা তারা জেনে গেলো!

এটা সত্যিই দুঃখজনক যে আমরা দ্বীনী বিষয়ে যে নিয়ম শৃঙ্খলা পালন করতে পারি না, দেখা যায় দুনিয়াবী বিভিন্ন সন্ত্রাসী সংগঠন সে নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলে।[24] সশস্ত্র সংগঠনের নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলা, গোপন সংগঠনের মৌলিক নীতিমালা অনুসরণ করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তারা অনেক সচেতন। আপনি দেখবেন কোন অপারেশন চালানোর ক্ষেত্রে তারাও চূড়ান্ত গোপনীয়তা বজায় রাখে, তারা কাউকে কিছু জানায় না, এমনকি স্বয়ং যারা অপারেশন চালাবে তাদেরকেও প্রয়োজনের চেয়ে বেশী কিছুই বুঝতে দেয়া হয় না। অপারেশনে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কেও কাউকে কিছু টের পেতে দেয় না, এমন কি কোথায় অপারেশন চালাবে তাও জানানো হয় কেবল অপারেশনের একান্ত পূর্ব মুহূর্তে। যারা অপারেশন চালায় তারা পর্যন্ত প্রয়োজনের চেয়ে বেশী কিছুই জানে না, অপারেশন বাস্তবায়নের জন্য ঠিক যতটুকু না জানলেই নয় ঠিক ততটুকুই কেবল জানে। তারা জানে না অর্থায়ন কে করে, অস্ত্র কোত্থেকে আসে, অস্ত্রের মজুদ কোথায়, কে এটা আমদানি করেছে, কে বহন করে এনে দিয়েছে, অন্য সদস্যরা অন্য কোথাও আক্রমনের প্রস্তুতি নিচ্ছে কি না। এ ধরণের প্রতিটি স্তর হল একেকটা নিরাপত্তা চাদর; এসব বিশেষ তথ্যের ব্যাপারে সংগঠনের কোন সদস্যের উচিত নয় অযাচিত প্রশ্ন করা কিংবা অনধিকার চর্চা করা। যে ব্যক্তি তার নিজ সামরিক কার্যক্রমের প্রতি শ্রদ্ধা রাখে সে কিছুতেই এ ধরণের স্পর্শকাতর তথ্য যাকে না জানালেই নয় তাকে ছাড়া অন্য কাউকে দিতে পারে না। একারণে দেখা যায় এই ধরণের কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করে যেসব অপারেশন

উপর কিছু আপতিত হবে না, তিনিই আমাদের মাওলা, ঈমানদারদের উচিৎ একমাত্র আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা করা। (সুরা আত তাওবা, আয়াত ৫১)

[24] এসব সন্ত্রাসী সংগঠনের তালিকার শীর্ষে রয়েছে ইহুদী, নাসারা, পৌত্তলিক ও (মুসলমান নামধারী) মুরতাদ শাসকদের অনুগত সকল দেশের সামরিক বাহিনী। এছাড়া আরও রয়েছে জাতিয়তাবাদী, স্বাধীনতাকামী, মার্ক্সবাদী, মাওবাদী, বিভিন্ন দেশের বিদ্রোহী গ্রুপ সহ আন্তর্জাতিক মাফিয়া চক্রসমূহ। সিকিউরিটি এনসাইক্লোপিডিয়াতে এ বিষয়ে বলা হয়েছে- ‘এটা সত্যিই লজ্জাজনক ও দুঃখের বিষয় যে তুচ্ছ দুনিয়াবী স্বার্থ হাসিলের জন্য নিবেদিত মাফিয়া চক্রের সদস্যদেরকেও নিরাপত্তা ও সাবধানতার ক্ষেত্রে অনেক সময় আমাদের ভাইদের চেয়ে অনেক বেশী দক্ষ অভিজ্ঞ ও সতর্ক দেখা যায়। অথচ সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বনের ক্ষেত্রে আমাদেরই উচিৎ গোটা পৃথিবীর সামনে উদাহরণ স্থাপন করা। কেননা স্বয়ং আল্লাহ্‌ তায়ালা আমাদেরকে তাঁর কুরআনে ও তাঁর রসূলের জবানে সতর্কতা অবলম্বনের কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। আর একজন মুজাহিদ কখনোই শত্রুর আক্রমন থেকে শঙ্কামুক্ত নয়; অতএব যে সম্ভাব্য সকল ধরণের সাবধানতা অবলম্বন করে তারপর দৃঢ় ঈমানের সাথে আল্লাহ্‌র সাহায্য চায় সে উত্তম না কি যে উদাসীনভাবে ঘুরে বেড়ায় সে উত্তম!

পরিচালনা করা হয় তার ব্যর্থতার আনুপাতিক হার খুবই কম। অন্য দিকে দেখা যায় সশস্ত্র সংগঠনের নিয়ম শৃঙ্খলার কঠোরতা সম্পর্কে কোন রকম ধারণা না নিয়ে দরবেশ গোছের বোকা ও নির্বোধ লোকেরা এসব সংগঠনে যোগ দিয়ে এমন ভয়াবহ রকম আত্মঘাতি ভুল করে বসে যে তার কারণে গোটা সংগঠনের কার্যক্রম ও এর সদস্যদের জীবন হুমকির মুখে পড়ে যায়। অথচ নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষা, সতর্ক পদক্ষেপ গ্রহণ, সাবধানতা অবলম্বন ও গোপনীয়তা বজায় রাখা ইত্যাদি ক্ষেত্রে গোটা মানবজাতির সামনে মুসলিমদের হওয়া উচিত ছিল অনুসরনীয় আদর্শ। কেননা তাদের মহান আদর্শ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবীদের জীবনে এ বিষয়ের উপর শিক্ষণীয় এতো উদাহরণ রয়েছে যা গুনে শেষ করা যাবে না; যার কয়েকটি আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। **আসলে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের জন্য প্রয়োজন চিতাবাঘের মতো ক্ষিপ্র ও বাজ পাখির মতো দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষের; সুফী দরবেশ আর তোতা পাখির কোন প্রয়োজন এখানে নেই।**

অসাবধানতার আর একটি উদাহরণ হল জাহেলী সময়ের মতো অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়ানো। অনেক যুবককে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে হেদায়াত দান করার পরও দেখা যায় জাহেলী সময়ে সে যেমন অস্ত্রের বরাই দেখিয়ে বেড়াতো তেমনি এখনো সে একই রকম আচরণ করে যাচ্ছে। আগেও যেমন প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াতো এখনো তেমনি করে চলছে। সে জানে না তার পূর্বেকার জীবনের সাথে এই জীবনের কতো বিস্তর ফারাক রয়েছে, সে জানে না আল্লাহ্‌র শত্রুরা তাকে আগে যে দৃষ্টিতে দেখত এখন তার মুখে দাড়ি গজানোর পর কিন্তু আর সেই একই দৃষ্টিতে দেখবে না। সে নতুন যে সব লোকের সাথে এখন চলা ফেরা করে, যাদের সাথে যোগাযোগ রাখে তাদের সংস্পর্শে আসার পর আল্লাহ্‌র শত্রুদের দৃষ্টিভঙ্গি তার ব্যাপারে সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে যাবে। অথচ এদেরকে যদি সাবধানতা অবলম্বনের উপদেশ দেয়া হয় এরা সাবধানতাকে কাপুরুষতা ও দুর্বলতা বলে উড়িয়ে দেয়। এরপর এই অসাবধানতার কারণে যখন সে জেলে যায়, রিমান্ডের মুখোমুখি হয় তখন আর বিষয়টা সাধারণ থাকে না;[25] এ ধরণের লোকেরা যখন একবার বিপদে পড়ে তখন মানসিক দিক থেকে একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। এরপর এই 'দুঃসাহসী বীর বাহাদুররা' তাদের নিজ ছায়াকেও ভয় পেতে শুরু করে, জিজ্ঞাসাবাদের আধুনিক প্রযুক্তির সামনে একাবারে ভেঙ্গে পড়ে, আল্লাহ্‌র শত্রুদের চতুর গোয়েন্দা সংস্থা ও তাদের ক্ষমতার সামনে সে একেবারে কুঁচকে যায়। সে তার নিজের অসাবধানতা ও বোকামির কথা ঢাকতে গিয়ে

---

[25] সিকিউরিটি এনসাইক্লোপিডিয়াতে বলা হয়েছে যে 'সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বনের বিষয়টি জিহাদী কার্যক্রম আরম্ভ করার একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকেই গুরুত্ব দেয়া উচিৎ। এমন কি কোন সংগঠনের সাথে যুক্ত হওয়ারও আগে থেকেই সিকিউরিটি প্রটোকল মেনে চলা বাঞ্ছনীয়। এটা খুবই দুঃখজনক যে অনেক ভাইয়েরা প্রাথমিক অবস্থায় এর গুরুত্ব বুঝতেই চায় না; আর একারণে একের পর এক ভুল করে যখন সে কিংবা তার সাথী ভাই পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়ে যায় তখন একথা ভেবে নিজের আঙ্গুল নিজে কামড়াতে থাকে আর বলে আহ! আগে থেকে যদি সতর্ক হতাম, সাবধান থাকতাম! কিন্তু সময় হারিয়ে তার এই বোধোদয় তখন আর কোন কাজে আসে না।

আল্লাহ্‌র শত্রুদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা, তাদের গোয়েন্দা সংস্থার চতুরতা ও ক্ষমতার গুণকীর্তন আরম্ভ করে দেয়।

চূড়ান্ত কথা হল সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বনকে যেমন মোটেই উপেক্ষা করার সুযোগ নেই তেমনি অতি সতর্কতার নামে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ ছেড়ে দিয়ে স্থবির হয়ে বসে থাকারও কোন সুযোগ নেই। বরং সকল ক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত মধ্যম পন্থা অবলম্বনই বাঞ্ছনীয়। এ পথের সঙ্গীদেরকে জিহাদের রক্ত পিচ্ছিল পথ পাড়ি দিতেই হবে; অতএব তাদের শত্রুদের পরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে শিথিলতা ও বাড়াবাড়ির উভয় প্রান্তিকতাকে পরিহার করে যথাযথ নিরাপত্তামুলক সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বনের কোন বিকল্প নেই।

আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করি যেন তিনি তার বন্ধুদের বিজয় দান করেন এবং তা শত্রুদের লাঞ্ছিত করেন।

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ

আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সব সময়ই বিজয়ী, যদিও অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।
(সুরা ইউসুফ, আয়াত ২১)

কে বড় কাফের
ও অধিক পথভ্রষ্ট

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী নাকি মুশরিক?

শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল-মাকদিসী (হাফিজাহুল্লাহ)

মাওলানা আইমান মাহমুদ অনূদিত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ الرَّحْمَٰنُ.

প্রশ্নঃ

আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপনকারী এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী (যে ধর্মকে দুনিয়া থেকে পৃথক করার চেষ্টায় রত আছে), তাদের মাঝে কে বড় কাফের ও অধিক পথভ্রষ্ট? শিরক ও শিরকের চর্চা এবং ধর্মনিরপেক্ষতা ও মানুষদেরকে ধর্মনিরপেক্ষতার দিকে আহবান করার মাঝে কোনটি বড় অন্যায়?

উত্তরঃ

الحمدُ للهِ والصلاةُ والسلامُ على رسولِ الله.

হামদ ও সালামের পর কথা হল:-

একজন ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি সন্দেহাতীতভাবে একজন মুশরিক ব্যক্তির চেয়ে অধিক নিকৃষ্ট কাফের। ধর্মনিরপেক্ষতা শিরকের তুলনায় অধিক ঘৃন্যতর অপরাধ।

এর অনেকগুলো কারণ রয়েছে এবং এগুলো সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। নিম্নে কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা হল:-

প্রথম কারণঃ

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. বলেছেন, “মুমিনরা যেভাবে ঈমানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরের হয়ে থাকে, তেমনিভাবে কাফেররাও তাদের কুফুরীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরের হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ ... ﴾[التوبة: ٣٧]

“এই মাস পিছিয়ে দেয়ার কাজ কেবল কুফুরীর মাত্রা বৃদ্ধি করে।” (সূরা তাওবাহ: ৩৭)

(আল ফাতাওয়া: ১/১০৯)

একদল আলেমদের মতে, ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা পরিচয়গতভাবে হলেও ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত থাকে, তারা মুরতাদদের মধ্যে গণ্য হবে। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. ‘সকল কুফুরীর সমতা’কে প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, “এটা সবাই জানে যে, কাফের তাতারীরা তাদের (ধর্মনিরপেক্ষ ইয়াসিক ধর্মানুসারীদের) থেকে উত্তম। কেননা তারা নিকৃষ্ট পর্যায়ের ইরতিদাদের মাধ্যমে ইসলাম থেকে ফিরে গেছে। আর আসলী কাফেরদের তুলনায় মুরতাদরা বিভিন্ন দিক দিয়ে নিকৃষ্ট।” (মাজমুউল ফাতাওয়া: ২/১৯৩)

কুফুরীর বিভিন্ন প্রকারের মধ্যকার ভিন্নতা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি পরকালকে অস্বীকার করে, কিন্তু এ পৃথিবীর নশ্বরতাকে স্বীকার করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে অবশ্যই কাফের সাব্যস্ত করবেন। কিন্তু যে ব্যক্তি পরকালকে অস্বীকার করার পাশাপাশি এ পৃথিবীকে অবিনশ্বর মনে করবে, আল্লাহ তা'আলার নিকট সে সবচাইতে বড় কাফের বলে সাব্যস্ত হবে।" (মাজমুউল ফাতাওয়া: ১৭/২৯১)

সুতরাং যে ব্যক্তি দুনিয়ার সাথে দ্বীনের সম্পৃক্ততা ও দুনিয়ায় দ্বীনের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করবে; সে ঐ ব্যক্তির তুলনায় অধিক নিকৃষ্ট, যে আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করলেও দুনিয়ার উপর দ্বীনের কর্তৃত্বকে স্বীকার করে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. এ সিদ্ধান্তেও উপনীত হয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলার পরিচয় লাভ, ইবাদাত ও স্মরণ থেকে বিমুখতা প্রদর্শন করে আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করাটা ইবলীস কর্তৃক আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণের চেয়েও মারাত্মক। কারণ ইবলীস আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করলেও আল্লাহকে স্বীকার করে। দেখুন– (মাজমুউল ফাতাওয়া: ৫/৩৫৬)

ইবলীস দ্বীন ও দুনিয়ার উপর আল্লাহর কর্তৃত্বকে অস্বীকার করেনি বা তা প্রত্যাখ্যানও করেনি। সে কেবল তা মেনে চলাকে অস্বীকার করে ও মানুষদেরকে তা থেকে ফিরিয়ে রাখে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার হুকুম ও ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে এবং দুনিয়ার উপর আল্লাহ তা'আলার কর্তৃত্বকে অস্বীকার করবে, বাস্তবিকই সে ইবলীসের চেয়ে নিকৃষ্ট বলে পরিগণিত হবে।

আল্লাহ তা'আলার ইবাতদের ক্ষেত্রে অহংকার প্রদর্শন করা ও আল্লাহ তা'আলার শরীয়তের সামনে মাথানত করাকে অস্বীকার করা– এই জায়গাগুলোতে ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসীরা ইবলীসের সাথে সাদৃশ্যতা রাখে। অতঃপর এর চেয়েও আগে বেড়ে ইবলীস যে জিনিসকে স্বীকার করে অর্থাৎ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে আল্লাহ তা'আলার প্রভূত্ব ও শাসন ক্ষমতাকে মেনে নেয়া, সেটাকেও তারা(ধর্মনিরেপেক্ষতায় বিশ্বাসী) অস্বীকার করে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. বলেছেন, "যেই দাম্ভিক অহংকারী বাহ্যত ফেরআউনের মত আল্লাহ তা'আলাকে অস্বীকার করে, সে তাদের থেকে তথা আরবের মুশরিক ও সেই ইবলীস থেকেও বড় কাফের। অথচ ইবলীস নিজেই এধরনের কাজের নির্দেশ দেয়, এগুলোকে ভালবাসে এবং আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে অহংকার প্রদর্শন করে। যদি সেই দাম্ভিক অহংকারী আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব ও বড়ত্বের ব্যাপারে জ্ঞাত থাকে, যেমনিভাবে ফেরআউন আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের ব্যাপারে জ্ঞাত ছিল, তবুও তার ব্যাপারে এমন সিদ্ধান্তই নেয়া হবে।" (মাজমুউল ফাতাওয়া: ৭/৬৩৩)

সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা ইবাদতে অহংকার প্রদর্শন ও শরীয়তের সামনে মাথানত করতে অস্বীকার করার কুফুরীর ক্ষেত্রে ইবলীসের সাথে মিল রাখে। অতিরিক্তভাবে তারা ভূপৃষ্ঠে আল্লাহ তা'আলার শাসন ক্ষমতাকে অস্বীকার করার কুফুরীতেও লিপ্ত। এ কারণে তারা আরবের মুশরিক ও সে সকল ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের চেয়েও নিকৃষ্ট, যারা বিভিন্ন ধরনের আদেশ-নিষেধ ও আশা-হুশিয়ারির বাণীকে স্বীকার করে। সুতরাং তারা সে সমস্ত মুবাহিয়্যাহ ও তার অনুরূপ দলগুলোর ন্যায়, যাদের ব্যাপারে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. বলেছেন,

“তেমনিভাবে যে সকল মুবাহিয়্যারা আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধকে পুরোপুরিভাবে বাদ দিয়ে দেয় এবং নিয়তি ও তাকদীরকে প্রমাণ স্বরূপ পেশ করে, তারা ইয়াহুদী-খৃষ্টান ও আরবের মুশরিকদের চেয়েও নিকৃষ্ট। কেননা ইয়াহুদী-খৃষ্টান ও আরবের মুশরিকরা তাদের কুফুরী সত্ত্বেও বিভিন্ন ধরনের আদেশ-নিষেধ ও আশা-হুঁশিয়ারি বাণীকে স্বীকার করে। তবে (সমস্যা হল,) তাদের এমন কিছু শরীক দেবতা ছিল, যার ইবাদাত করার অনুমতি আল্লাহ তা'আলা দেননি।

অন্যদিকে মুবাহিয়্যারা শরীয়তকে পুরোপুরিভাবে বাদ দিয়ে দেয়। কেননা তাদের মনে যা চায়, তারা কেবল সে জিনিসেই আনন্দিত ও ক্রোধান্বিত হয়। তারা আল্লাহর জন্য আনন্দিতও হয় না, ক্রোধান্বিতও হয় না। তারা আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসে না, ঘৃণাও করে না। আল্লাহ যে কাজের আদেশ দিয়েছেন তারা সে কাজের আদেশ দেয় না এবং আল্লাহ যে কাজ করতে নিষেধ করেছেন, তারা সে কাজ হতে মানুষদের বারণ করে না। তবে সে কাজটি যদি তাদের মনঃপূত হয়, তাহলে আপন রবের ইবাদত স্বরূপ নয় বরং কেবল আপন প্রবৃত্তির অনুসরণ বশত: তারা তা সম্পাদন করে। এ কারণেই ভূপৃষ্ঠে যত কুফুরী, ফুসুকী ও পাপাচার সংঘটিত হয়, তারা সেগুলোর বিরোধিতা করে না। তবে এগুলো যখন তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়, তখনই কেবল তারা তার বিরোধিতা করে। আর এ বিরোধিতা তাদের মধ্যকার স্বভাবগত শয়তানীভাব থাকার দরুন করে থাকে। তাদের মধ্যকার রহমানীভাব বা শরীয়তের কারণে নয়।” (মাজমুউল ফাতাওয়া: ৮/৪৫৭-৪৫৮)

এর দ্বারা বুঝা গেল, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার রবুবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতকে স্বীকার করে ও বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলা হুকুম প্রদান করার ও বিধান প্রণয়ন করার অধিকার রাখেন এবং এ সকল বিষয়ে নিজেকে সে তাঁর সামনে সপে দেয়, সে ব্যক্তি যদি এগুলোর কোন কোন অংশে বা সর্বাংশেও অন্য কাউকে আল্লাহ তা'আলার সহিত শরিক করে তবুও সে ঐ ব্যক্তির তুলনায় কম পথভ্রষ্ট, যে এসব কিছু থেকে আল্লাহ তা'আলাকে আলাদা করে দিয়ে দাবি জানায় যে, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর দ্বীনের জন্যে উচিত নয় মানবজীবন, শাসনকার্য বা রাজনীতিতে নাক গলানো!!

সুতরাং ইয়াহুদী, খৃষ্টান, কবরপূজারী, মুশরিক ও কাফেরদের অনেকেই তাদের কুফুরীর ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের চেয়ে নিম্নতর।

দ্বিতীয় কারণঃ

এ কথা সর্বজন বিদিত যে, শিরক, কুফর কিংবা রিদ্দাহর সাথে যখন যুদ্ধ ও আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার মত বিষয় এসে যুক্ত হয়, তখন তা অন্যান্য সাধারণ কুফুরী ও রিদ্দাহর চেয়ে আরো গুরুতর অন্যায় ও বড় কুফুরীতে রূপ নেয়।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. বলেছেন, “রিদ্দাহ দু'প্রকার: সাধারণ রিদ্দাহ ও এমন কঠিন রিদ্দাহ, যার ব্যাপারে হত্যার বিধান রয়েছে। উভয় প্রকারের রিদ্দাহ'তে প্রবিষ্ট মুরতাদকেই হত্যা করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে দলিল রয়েছে। যে দলিলের ভিত্তিতে তাওবার কারণে হত্যা মাফ হয়ে যায়, তা উভয় প্রকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বরং তা প্রথম প্রকার তথা সাধারণ রিদ্দাহর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যা মুরতাদের তাওবা কবুল হওয়ার দলিলগুলো নিয়ে চিন্তা করার দ্বারা বুঝে আসে।

বাকি রইল দ্বিতীয় প্রকার তথা কঠিন রিদ্দাহ। এ প্রকারের রিদ্দাহ'তে প্রবিষ্ট মুরতাদকে হত্যা করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে দলিল থাকার পাশাপাশি তার হত্যা মাফ হওয়ার ব্যাপারে কোন নস ও ইজমা পাওয়া যায় না। আর উভয় প্রকারের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকার কারণে কিয়াসও অসম্ভব। তাই সঙ্গত কারণেই দ্বিতীয় প্রকারকে প্রথম প্রকারের সাথে জুড়ে দেয়ার কোন অবকাশ নেই। যে জিনিসটি এই বিষয়টিকে নিশ্চিত করে তা হচ্ছে - যে কেউই কোন কথা বা কাজের মাধ্যমে মুরতাদ হয়ে যাবে, সে যদি গ্রেফতার হওয়ার পর তাওবা করে নেয়, তাহলে তার হত্যা মাফ হয়ে যাবে এমনটা কোরআন, হাদিস ও ইজমার কোথাও উল্লেখ নেই। বরং কুরআন, হাদিস ও ইজমা মুরতাদদের প্রকারসমূহের মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা করে দিয়েছে।" (আছ-ছারিমুল মাসলূল: ৩/৬৯৬)

যে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী দ্বীনকে মানবজীবন থেকে পৃথক করে দেয়, দ্বীনকে বিচারব্যবস্থা ও আইন প্রণয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে এবং দ্বীনকে রাজনীতি, রাষ্ট্র ও দুনিয়া থেকে আলাদা করে দেয়, সে ইসলামের সাথে সম্পৃক্ততার দাবি করলেও সে কঠিনতর রিদ্দাহে লিপ্ত রয়েছে। মুশরিক ও কাফেরদের অনেকেই এই ধরমনিরেপেক্ষতাবাদীদের থেকে উত্তম। এক শ্রেণীর মুরতাদ রয়েছে এমন, যাদের মাঝে ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহের মধ্য থেকে কোন একটি পাওয়া যাওয়ার কারণে সে কাফের হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই শ্রেণীর মুরতাদরা ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদাকরণের দিকে মানুষদের আহবান জানায় না। কিংবা মানুষদের মাঝে এই মতবাদ ছড়িয়ে দেয়া, তাদের হৃদয়ে তা স্থির করে দেয়ার চেষ্টাও করে না। এই শ্রেণীর মুরতাদরা ধর্মনিরেপক্ষতার দিকে আহবানকারীদের চাইতে উত্তম।

তৃতীয় কারণঃ

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় গুনাহ। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ.

"আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, কোন্ গুনাহ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন, আল্লাহ্র জন্য অংশীদার সাব্যস্ত করা। অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।..." (বুখারী, মুসলিম)

কিন্তু এ হাদিসটি হল ব্যাপক, যেটিকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে এ আয়াতের মাধ্যমে-

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿الأعراف: ٣٣﴾

"আপনি বলে দিনঃ আমার পালনকর্তা কেবলমাত্র অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এবং হারাম করেছেন গোনাহ, অন্যায়-অত্যাচার আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা, তিনি যার কোন, সনদ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যা তোমরা জান না।" (সূরা আরাফ: ৩৩)

আল্লাহ তা'আলা উপরের উল্লেখিত আয়াতে গুনাহগুলোকে ছোট থেকে বড় আকারে বিন্যস্ত করেছেন। এখানে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সবচেয়ে বড় গুনাহ সাব্যস্ত করেছেন "না জেনে আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনের প্রতি কোন কথা আরোপ করা"কে। সুতরাং এ আয়াতে আপনি দেখছেন যে, না জেনে আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনের প্রতি কোন কথা আরোপ করা আল্লাহর সঙ্গে শিরক করার চেয়েও বড় গুনাহ। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. কে যেই উত্তর দিয়েছিলেন, সেটা ছিল এ প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে যে, তাদের যমানার মুশরিকদের মাঝে প্রচলিত গুনাহসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি? অর্থাৎ সর্বকালের হিসেবে নয় বরং সেই যুগে তাঁর উম্মতের জন্য সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ও বিপজ্জনক গুনাহ কোনটি।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেছেন, "ফতোয়া ও বিচার-ফয়সালায় না জেনে আল্লাহর প্রতি কোন কথা আরোপ করাকে আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন ও এটিকে সবচেয়ে বড় গুনাহসমূহের একটি বলে গণ্য করেছেন। উপরন্তু এ কাজটিকে তিনি সবচেয়ে বড় গুনাহসমূহের মাঝে সর্বোচ্চ পর্যায়ের বলে আখ্যা দিয়ে বলেছেন,

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿الأعراف: ٣٣﴾

"আপনি বলে দিন, আমার পালনকর্তা কেবলমাত্র অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এবং হারাম করেছেন গুনাহ ও অন্যায়-অত্যাচার করা, আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা, তিনি যার কোন সনদ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যা তোমরা জান না।" (সূরা আরাফ: ৩৩)

সুতরাং এখানে তিনি হারাম কাজগুলোকে চারটি স্তরে ধারাবাহিকভাবে সাজিয়েছেন-

প্রথমে তিনি এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে হালকাটির মাধ্যমে শুরু করেছেন। আর তা হচ্ছে, অশ্লীল বিষয়সমূহ।

অতঃপর দ্বিতীয়তে তিনি ঐ গুনাহের কথা উল্লেখ করেছেন, যা প্রথমটির চেয়ে অধিকতর হারাম। আর তা হচ্ছে, পাপ ও অন্যায়-অত্যাচার করা।

অতঃপর তৃতীয়তে তিনি ঐ গুনাহের কথা উল্লেখ করেছেন, যা আগের গুলোর চেয়ে গুরুতর হারাম। আর তা হচ্ছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সাথে শিরক করা।

অতঃপর চতুর্থতে তিনি ঐ গুনাহের কথা উল্লেখ করেছেন, যা আগের সবগুলোর চেয়ে তীব্রতর হারাম। আর তা হচ্ছে, না জেনে আল্লাহর ব্যাপারে কোন কথা আরোপ করা। আর এই না জেনে আল্লাহর প্রতি কোন কথা আরোপ করাটা তাঁর পবিত্র নাম, গুনাবলী ও কার্যাদির ব্যাপারেও হতে পারে এবং তাঁর প্রদত্ত দ্বীন ও শরীয়তের ব্যাপারেও হতে পারে।" (ই'লামুল মুওয়াক্কিয়ীন)

ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি, তাঁর গুনাবলী ও কার্যাদির প্রতি এবং তাঁর দ্বীন ও শরীয়তের প্রতি দুঃসাহস দেখিয়ে থাকে। এগুলোকে সে অকেজো করে দেয়, বিচারকার্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং পৃথিবীর নিয়ম-নীতে থেকে এগুলোকে আলাদা করে দেয়। এর দ্বারা সে মুশরিকের চেয়েও নিকৃষ্ট ও অধিক পথভ্রষ্ট প্রমাণিত হয়।

না জেনে আল্লাহর ব্যাপারে কোন কথা আরোপ করা শিরকেরও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে তা হবে শিরকের সবচেয়ে মারাত্মক ও ভয়ঙ্কর স্তর। এ কাজটি শিরকের অন্তর্ভুক্ত হয় এভাবে যে, একজন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী নিজের প্রবৃত্তির পূজা করে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿الجاثية: ٢٣﴾

"আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার খেয়াল-খুশীকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে? আল্লাহ জেনে শুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তার কান ও অন্তরে মোহর এঁটে দিয়েছন এবং তার চোখের উপর রেখেছেন পর্দা। অতএব আল্লাহর পর কে তাকে পথ প্রদর্শন করবে? তোমরা কি চিন্তাভাবনা কর না?" (সূরা জাসিয়া: ২৩)

সুতরাং ইতিপূর্বে প্রথমোক্ত আয়াতে যে বিন্যাসের উল্লেখ রয়েছে, তা কোন বিষয়ের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য ও তার ভয়াবহতা ফুটিয়ে তোলার জন্য ব্যাকরণগত দিক থেকে ব্যাপকভাবে কোন বিষয়কে উল্লেখ করার পর বিশেষভাবে সে বিষয়টাকে পুনরায় উল্লেখ করার আওতায় পরবে। তবে এর দ্বারা অর্থের মাঝে বৈপরীত্যতা বজায় থাকবে।

চতুর্থ কারণঃ

এ কথা সর্বজন বিদিত যে, ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বানকারী ও বিভ্রান্তি বিস্তারকারী নেতারা তাদের অধীনস্থ পথভ্রষ্ট ব্যক্তিদের তুলনায় বেশী নিকৃষ্ট ও অধিকতর অপরাধী। তাই ফেরআউন ও হামান, তাদের অনুসারী ও পূজারীদের তুলনায় বেশী নিকৃষ্ট। যদিও উভয় শ্রেণীই কাফের। কিন্তু কুফুরীর বিভিন্ন স্তর রয়েছে। সবাই এক ধরনের নয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, সমস্ত উম্মাহর মাঝে বিদ্যমান বিভ্রান্তি এ দুই অপরাধের কোন একটি হয়ে থাকে:

প্রথম অপরাধটি হচ্ছে, গাইরুল্লাহর ইবাদত করা।

আর দ্বিতীয় অপরাধটি হচ্ছে, আল্লাহ যা হালাল করেছেন, সেটাকে হারাম করা; কিংবা তিনি যা হারাম করেছেন, সেটাকে হালাল করা; অথবা তিনি যার অনুমতি দেননি, এমন বিধান প্রবর্তন করার মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করা।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, দ্বিতীয়টি অধিক নিকৃষ্ট। মুশরিক সাধারণত গাইরুল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে অন্য কারো অনুসারী হয়ে থাকে। আর মিথ্যারোপকারী অথবা আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে মানুষের বিধান প্রবর্তনকারীরা দুনিয়ার বুকে মানুষকে ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বানকারী। এ বিষয়টিই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসে কুদসিতে বর্ণিত হয়েছে। যেখানে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، حرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا

"আমি আমার সকল বান্দাদেরকে একনিষ্ঠ করে সৃষ্টি করেছি। তারপর তাদের নিকট শয়তানেরা এসে তাদেরকে তাদের দ্বীন থেকে ঘুরিয়ে দিয়েছে ও আমি তাদের জন্য যা হালাল করেছি, সেগুলোকে তারা হারাম করে দিয়েছে এবং তাদেরকে আমার সাথে এমন কাউকে শরিক করতে নির্দেশ দিয়েছে, যার সম্পর্কে আমি কোন সনদ অবতীর্ণ করিনি।"(সহীহ মুসলিম)

এ হাদিস একত্ববাদ থেকে সরে যাওয়া ব্যক্তিদেরকে দুই ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে- 'মুশরিক অনুসারী' ও 'বিধান প্রবর্তক'। আর এই বিধান প্রবর্তকেরা হচ্ছে, মানব ও জ্বীন শয়তান। সুতরাং কাফের প্রধান ও ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীরা তাদের অধীনস্থ যাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে, তাদের তুলনায় তারা নিকৃষ্ট ও গুরুতর কাফের।

কোন কাফের যখন ভ্রষ্টতার প্রচারক ও বিভ্রান্তির প্রধান হয়, তখন সকল উলামা, উকালা/জ্ঞানীরা ও ফুকাহারাই অন্যান্য কাফেরদের তুলনায় সেই কাফেরকে আলাদাভাবে গণ্য করেছেন। কেননা সাধারণ পথভ্রষ্ট অনুসারী ও সে সমান নয়। বরং সাধারণ পথভ্রষ্ট অনুসারীদের চেয়ে সে ঢের বড় পাপী ও জঘণ্য কাফের। এ কারণেই যারা আল্লাহর পথে বাধা দেয় ও মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করে, তাদের জন্য দ্বিগুন শাস্তির ধমকি এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে তাদের চেয়ে বড় জালেম আর কেউ হতে পারে না। এরা আল্লাহর পথে মানুষদেরকে বাধা দিত ও তাতে বক্রতা খুঁজে বেড়াত। আর এ সবই হচ্ছে বিভ্রান্তির প্রধান ও অনুসৃত ব্যক্তিদের গুনাবলী। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, يضاعف لهم العذاب "তাদের জন্য দ্বিগুণ শাস্তি রয়েছে" এবং তাদেরকে الأخسرون (সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত) বলে গুনান্বিত করেছেন। আর এটা হচ্ছে সেই الخاسرون (ক্ষতিগ্রস্ত) এর অগ্রাধিকার সূচক বিশেষণ, যার দ্বারা কুরআনের জায়গায় জায়গায় সাধারণ পথভ্রষ্টদেরকে গুনান্বিত করা হয়েছে। এবার আপনি আল্লাহ তা'আলার আয়াতটি দেখুন-

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿هود: ١٨﴾ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿هود: ١٩﴾ أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴿هود: ٢٠﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿هود: ٢١﴾ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ﴿هود: ٢٢﴾

"আর তাদের চেয়ে বড় জালেম কে হতে পারে, যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে। এসব লোককে তাদের পালনকর্তার সাক্ষাতের সম্মুখীন করা হবে আর সাক্ষীগণ বলতে থাকবে, এরাই ঐসব লোক, যারা তাদের পালনকর্তার প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। শুনে রাখ, যালেমদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত রয়েছে। যারা আল্লাহর পথে বাধা দেয়, আর তাতে বক্রতা খুজে

বেড়ায়, এরাই আখেরাতকে অস্বীকার করে। তারা পৃথিবীতেও আল্লাহকে অপারগ করতে পারবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই, তাদের জন্য দ্বিগুণ শাস্তি রয়েছে; তারা শুনতে পারতো না এবং দেখতেও পেত না। এরা সে সমস্ত লোক, যারা নিজেরাই নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, আর এরা যা কিছু মিথ্যা মা'বুদ সাব্যস্ত করেছিল, তা সবই তাদের থেকে হারিয়ে গেছে। আখেরাতে এরাই হবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত কোন সন্দেহ নেই।" সূরা হুদ: ১৮-২২)

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, গোটা মানবজীবনের সঙ্গে বা মানবজীবনের কতক অংশ, যেমন রাজনীতি কিংবা বিচারকার্যের সঙ্গে আল্লাহর দ্বীন ও শরীয়তের কোন সম্পর্ক নেই বলে দাবি করা- আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনের প্রতি মিথ্যারোপ করা এবং তাঁর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার নামান্তর। এমন দাবি যারা করে, তারাই হচ্ছে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত ও অন্যান্য সাধারণ মুশরিকদের তুলনায় গুরুতর কাফের। এমন দাবি জানিয়ে মানুষদের বিভ্রান্ত করা মূলত: দ্বীনের পথে এক ধরনের বাধা প্রদান। তাদের এই বিভ্রান্তি সাধারণ মুশরিকদের বিভ্রান্তির চেয়েও মারাত্মক। কেননা মুশরিকদের কতক সকল বিধানকেই স্বীকার করে, কেউ কেউ কতিপয় বিধানকে, কতক আবার অধিকাংশ বিধানকেই স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। তাদের কেউ কেউ সকল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্যতা অর্জন করার চেষ্টা করে, কেউ আবার আংশিক ইবাদতের মাধ্যমে। কিন্তু তারা কোন না কোন ভাবে আল্লাহর সাথে একজন শরিক স্থাপন করে। আল্লাহর সাথে তারা যার ইবাদত করে থাকে, তারা ধারণা করে থাকে যে, হাশরের মাঠে সে আল্লাহর সামনে তার জন্য সুপারিশ করবে। এইভাবে মুশরিকরা যোগসাজশ করে আল্লাহর ইবাদত করে ও অন্যান্য ইলাহদের প্রতি ভক্তি করে। কিন্তু তারা তাদের দ্বীন ও দুনিয়ার প্রতি আল্লাহর কর্তৃত্বকে বাতিল করে দেয় না, যেননটি করে থাকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা।

আজকের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ যে বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করতে চায় সেটি হচ্ছে, "পার্থিব বিষয়াবলীতে ধর্মের কোন কর্তৃত্ব নেই"। বাক্যটির প্রকৃত উদ্দেশ্য হল: নিম্নের আয়াতটিকে কর্তন করে দেয়া, যেখানে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ﴾[الزخرف: ٨٤]

"তিনিই উপাস্য নভোমণ্ডলে এবং তিনিই উপাস্য ভূমণ্ডলে। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।" (সূরা যুখরুফ: ৮৪)

অথবা আয়াতটিকে সংক্ষিপ্ত করে দেয়া ও এই ফ্রেমে এঁটে দেয়া যে, তিনি শুধুমাত্র নভোমণ্ডলে ইলাহ। আর ভূমণ্ডলের সাথে তাঁর কোন সম্পৃক্ততা নেই।

সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতার বাস্তবতা হল, ভূপৃষ্ঠে আল্লাহ তা'আলার শাসন ক্ষমতাকে বাতিল করে দেয়া, বান্দাদের মধ্যকার বিচারকার্য থেকে ধর্মকে দূরে সরিয়ে রাখা এবং রাজনীতি থেকে ধর্মকে অপসারণ করে দেয়া। আর সন্দেহাতীতভাবেই বলা যায় যে, এই শ্রেণীর লোকেরা ঐ সমস্ত লোকদের চেয়েও বড় পাপী, যারা ভূপৃষ্ঠে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে শরীক স্থাপন করে, কিন্তু আল্লাহ বিধানদাতা ও শাসন ক্ষমতার অধিকারী হওয়াকে অস্বীকার করে না।

সুতরাং কুফুরীর বিভিন্ন স্তর রয়েছে ও ধর্মনিরপেক্ষতা নামক কুফুরীর স্তর অন্যান্য কুফুরীর তুলনায় অধিক নিকৃষ্ট ও তীব্রতর। কেননা ধর্মনিরপেক্ষতা আল্লাহ তা'আলার প্রতি, তাঁর দ্বীন-শরীয়তের প্রতি মিথ্যারোপ করে থাকে। তাঁকে দুনিয়া থেকে অপসারণ করে দেয় এবং তাঁর থেকে তাঁর শাসন ক্ষমতাকে ছিনিয়ে নিয়ে পুরোটাই এককভাবে সাব্যস্ত করে দেয় বান্দাদের জন্য।

এ কারণে এখানে এই উত্তরের সাথে অতিরিক্ত আরো কিছু কথা সংযোজন করা যেতে পারে। যা প্রশ্নকারী যতটুকু জানতে চেয়েছে তাকে তারচেয়ে বেশী কিছু দেয়ার পর্যায়ে পড়বে।

প্রথম অংশঃ যে সকল শাসকরা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ছাড়া অন্য আইন দ্বারা বিচার-ফয়সালা করে, তাদের মাঝে তুলনা করা। সন্দেহাতীতভাবে কুফুরীর স্তরের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে পার্থক্য থাকবে। তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি শরীয়তের সকল আহকাম বাতিল করে দিবে, সে ঐ ব্যক্তির তুলনায় অধিক নিকৃষ্ট, যে শরীয়তের কিছু দণ্ডবিধি অবশিষ্ট রাখবে। যে ব্যক্তি শরীয়তের মধ্যকার পারিবারিক আইন (বিবাহ, তালাক ও উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিধান)সহ গোটা শরীয়তকেই অপসারণ করবে, সে ঐ ব্যক্তির তুলনায় নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্যতর, যে শরীয়তকে উপযুক্ত মনে করে পারিবারিক আইনকে শরীয়ত অনুযায়ীই রাখবে। যে ব্যক্তি তার সংবিধানে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে এবং শরীয়তকে আইন প্রণয়নের উৎসসমূহের মধ্য থেকে একটি উৎস হিসেবে নির্ধারণ করাকে বাতিল করে দিবে, সে ঐ ব্যক্তির তুলনায় নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্যতর কাফের, যে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে এবং শরীয়তকে আইন প্রণয়নের উৎসসমূহের মধ্য থেকে একটি উৎস হিসেবে বহাল রাখার উপর সংকল্প করবে। তথাপি সে শিরক ও কুফর থেকে মুক্ত হতে পারবে না, যে বিষয়টি আমি আমার উপরোক্ত লেখায় উল্লেখ করেছি।

যে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদকে গ্রহণ করার পরিবর্তে তার থেকে দায়মুক্তি ঘোষণা করে ও তার সংবিধান ইসলাম এবং সে আল্লাহর শরীয়ত ছাড়া অন্য কোন বিধান দ্বারা বিচার-ফয়সালা করে না বলে দাবি জানায়; সে ব্যক্তি তার চাইতে উত্তম যে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলে, সে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদকে গ্রহণ করেছে। যদিও প্রথমোক্ত ব্যক্তির যে বিষয়গুলো তার ঈমান নষ্ট করে দিয়ে, তাকে কাফের বানিয়ে দিয়েছে ও বর্তমানে আমাদের কাছে তার হুকুম কী সেদিকে তার কোন ভ্রুক্ষেপই নেই, তবুও সে দ্বিতীয় ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম।

দ্বিতীয় অংশঃ স্বয়ং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরাও বিভিন্ন শ্রেণীর রয়েছে। এদের কুফুরীর স্তরের ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও জঘণ্যতর হচ্ছে তারা, যারা ফেরআউনের মত দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। এই শ্রেণী দ্বীনকে পুরোপুরি অস্বীকার করে, লোকদেরকে দ্বীন মানতে বাধার সৃষ্টি করে, দ্বীনের বিধানাবলীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করে এবং নিজেদের ধর্ম ত্যাগের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে বেড়ায়।

তাদের আরেক শ্রেণী রয়েছে, যারা এদের চেয়ে কম নিকৃষ্টতর। তারা দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ও দ্বীনের পথে বাধা সৃষ্টি করার প্রতি তেমন আগ্রহী না। কিন্তু দুনিয়া, বিচারকার্য ও রাজনীতির বিষয়াবলীতে শরীয়তের হস্তক্ষেপকে তারাও বাধাগ্রস্ত করে।

তাদের তৃতীয় আরেক শ্রেণী রয়েছে, যাদেরকে 'এরদোগানী' বলে নাম রাখা যেতে পারে। এই এরদোগানী ধর্মনিরপেক্ষতার বিশেষ সংজ্ঞা রয়েছে। তারা শরীয়তকে মুখে স্বীকার করে এবং কখনো কখনো ব্যক্তিগতভাবে চালচলনেও স্বীকার করে। কিন্তু বিচারকার্য ও শাসনব্যবস্থায় শরীয়তকে তারা অদৃশ্য করে ফেলে। তারা সকল ধর্ম ও ধর্মানুসারীদেরকে সমান চোখে দেখে। তাই

তাদের কারো সাথেই তারা সম্পর্ক ছিন্ন করে না ও ইসলামকে তারা কোন বাড়তি শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করে না কিংবা অন্যান্য ধর্মের উপরে স্থান দেয় না। এমনিভাবে তারা বিচারকার্য থেকেও ইসলামকে অপসারণ করে দিয়েছে। এই এরদোগানী ধর্মনিরপেক্ষতার চেয়েও অধিকতর বিপথগামী ও বক্রতাপূর্ণ হচ্ছে, ঘানুশী ধর্মনিরপেক্ষতা।

এই আলোচনার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, এটা উম্মাহকে জানানো যে, স্বয়ং ধর্মনিরপেক্ষতাও বিভিন্ন স্তরের রয়েছে। এর বিভিন্ন শ্রেণী কুফুরের বিভিন্ন স্তরের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং আতাতুর্কী ধর্মনিরপেক্ষতা কখনোই এরদোগানী ধর্মনিরপেক্ষতার সমপর্যায়ের হতে পারে না। যদিওবা এরদোগানী ধর্মনিরপেক্ষতা আতাতুর্কী ধর্মনিরপেক্ষতা থেকে দায়মুক্তি ঘোষণা করে না ও সেটাকে অস্বীকার করে না; বরঞ্চ সেটার অনুসরণ করে থাকে, সেটাকে স্বাগত জানিয়ে থাকে ও সেটার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকে!

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

উত্তর প্রদানে-

শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল-মাকদিসী হাফিজাহুল্লাহ

শাইখ আবু মুহাম্মদ আসিম আল-মাকদিসীর (আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন) লিখা "জিহাদ থেকে প্রাপ্ত সুফলসমূহ" রিসালাহ এর অংশবিশেষ

যেন অপরাধী লোকদের পথরেখা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ে

লেখক: শাইখ আবু মুহাম্মদ আসিম আল-মাকদিসী

পরিবেশনায়: বালাকোট মিডিয়া

وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيَٰتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٥٥﴾

এমনিভাবে আমরা আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করে থাকি, যেন অপরাধী লোকদের পথরেখা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ে।[১]

[১] সূরা আনআম, আয়াত: ৫৫

যে বান্দা দ্বীনের শত্রুদের মোকাবেলা করতে চায়, তাদের মিথ্যাকে নিজ হাতে ধ্বংস করে দিতে চায়, তার পক্ষে সেই শত্রুদের ব্যাপারে আল্লাহর বিধান সম্পর্কে জ্ঞান না রাখা মোটেও শোভা পায় না। এমন বান্দার জন্যে তো এই জ্ঞান রাখা খুবই জরুরি, কারণ এই জ্ঞানের অভাবে এমনকি এমনও হতে পারে যে, সে শত্রুদেরকে চিনতে ভুল করছে, তাদের সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করছে, অথবা ভাবছে যে এখনও তারা দ্বীন থেকে বেরিয়ে যায় নি (অর্থাৎ, এখনো তাদেরকে মুসলমান ভাবছে!)।

আমি কিছু যুবক ভাইদের চিনি। তারা প্রবল উদ্দীপনার সাথে জিহাদের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন, অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করলেন। জিহাদের ভূমিতে পৌঁছবেন এই ছিল তাদের মনের কামনা। কিন্তু পথে ধরা পড়ে গেলেন। তখন তারা তাদেরকে বন্দীকারী বাহিনীদের[২] সাথে এমন আচরণ করতে লাগলেন যেন সেই বাহিনীর লোকেরা মুসলমান! আমি বিস্ময় এবং বেদনায় হতবাক হয়ে গেলাম যখন জানতে পারলাম যে, জিজ্ঞাসাবাদের সময় এই বাহিনীদেরকে মুসলমান ভেবে এই ভাইয়েরা তাদেরকে ধোঁকা দেন নি, তাদের সাথে কোনো মিথ্যা কথা বলেন নি, বরং তাদের দেয়া মিথ্যা প্রতিশ্রুতিকে নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করেছেন। মুসলমানদের সাথে দয়ালু ও সদাচারী হতে হবে ভেবে এই ভাইয়েরা সত্যবাদীর মতো সবকিছু স্বীকার করেছেন! কোনো খুঁটিনাটি ব্যাপার পর্যন্ত বাদ রাখেন নি, সবকিছু বলে দিয়েছেন! কিন্তু স্বীকার করার ফল হলো এই যে, নির্দয় অন্যায় আচরণ ও চরম অত্যাচার সহ্য করে এই ভাইগুলিকে দীর্ঘ সময় যাবৎ কারাবন্দী থাকতে হলো। জালেমদের ব্যাপারে আল্লাহর বিধান না জানার কারণেই এমনটা হলো। বন্দীকারী লোকেরা যে তাদের কাফের প্রভুদের আনুগত্য করে ইসলামের বিরুদ্ধে কাজ করছে, তা না দেখার কারণেই এমনটা হলো। তারা বোঝেনি যে, প্রতিরক্ষা বাহিনীর এসব লোক মুসলমানদের সাথে ওয়াদা পালনের ধার ধারে

---

[২] অর্থাৎ, সেই ভূখন্ডের অত্যাচারী তাগুত মুর্তাদ সরকারের সেবায় নিয়োজিত প্রতিরক্ষা বাহিনীর কোনো একটি দল; বাংলাদেশের র‍্যাব, পুলিশ, আর্মি ইত্যাদির অনুরূপ।

না, কোনো সম্পর্কের সম্মানও করে না। তারা জানতো না যে, এ লোকগুলো মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে কী ভয়ানক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, এদের কাজের ভিত্তিই হচ্ছে ধোঁকা, মিথ্যা আর ষড়যন্ত্র।

আমি এক ভাইকে চিনি, তিনি কোরআনের হাফেজ। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধৈর্যশক্তি ও সহ্যক্ষমতার অধিকারী। ধরা পরার পরে তাকে মারধর, জুলুম-অত্যাচার, তার ওপর নিষ্ঠুর নির্যাতন চালানো, কি না করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো, তার মুখ থেকে যেন এমন স্বীকারোক্তি আদায় করা যায়, যার দ্বারা তাকে সুদীর্ঘ সাজা দেয়া সম্ভব হয়। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ, তিনি এই সবকিছুর মাঝেও দৃঢ় ছিলেন, এতো অত্যাচার সহ্য করা সত্ত্বেও তিনি তাদের ষড়যন্ত্রে পতিত হয়ে স্বীকারোক্তি দিতে রাজি হন নি। তো বন্দীকারীরা তাকে ফাঁদে ফেলার জন্য এবার একটি নতুন ফন্দি আঁটলো। ধরা পড়ার পূর্বে এই ভাই এক মসজিদে ইমামতি করতেন। এবার শত্রুরা তাকে এমন একজনের হাতে তুলে দিলো যে ব্যক্তি কিনা সেই মসজিদে তার পিছে দাঁড়িয়েই নামাজ আদায় করতো।

লোকটি এসে নিজের পরিচয় দিলো, ভাইটিকে স্মরণ করিয়ে দিলো যে, সে একসময় তার সাথে নামাজ পড়েছে। এই লোক বহু রকম ওয়াদা করে, কসম কেটে বললো, যদি এই ভাই স্বীকারোক্তি প্রদান করেন, তবে সে নিজে তাকে সাহায্য করবে, এমনকি তাকে কোর্টেও যেতে হবে না। তো ভাইটি তার কথার ওপর ভরসা করে এবারের প্রশ্নকর্তার কাছে সবকিছু অকপটে স্বীকার করলেন। এই দফায় তাকে একটিও আঘাত করা লাগলো না, আর কি সহজেই না তার স্বীকারোক্তি মিলে গেলো। অথচ কত ভয়ানক নির্যাতনের মুখেও এই ভাই অবিচল ছিলেন, খুব অল্প লোকই এমনটা সহ্য করতে পারেন। কিন্তু চালাকি, ধোঁকাবাজি, আর মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারা এমন কিছু আদায় করে নিতে সক্ষম হলো, যা মারধর আর অত্যাচার করেও আদায় করা সম্ভব হয় নি। আর এই ভাইয়ের কি হলো? তাদেরকে বিশ্বাস করার ফলে, তাদের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করার

বিনিময়ে তাকে পেতে হলো যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। অবশ্যই এই ভাই আগে এই জালেমদেরকে[৩] কাফের হিসেবে গণ্য করতেন না, তিনি জালেমদের সঠিক বাস্তবতা সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে অবগত ছিলেন না, প্রশ্নকর্তার নামাজী ব্যক্তিত্ব তার কাছে অনেক গুরুত্ব বহন করতো। কিন্তু এই চরম ভুলের কুফল তাকে আজো বয়ে বেড়াতে হচ্ছে, দশ বছর যাবৎ তিনি কারাদণ্ডের পেছনে, আল্লাহ তাআলা তাকে বন্দীশালা থেকে মুক্ত করুন। আমীন!

আমি এক যুবককে চিনতাম, সে জঙ্গলে একদিন একটা বোমা খুঁজে পেলো, সে এটা তার বাড়িতে নিয়ে গেলো। এরপর কোনো এক সময়ে, ভয়ংকর মূর্খের মতো সিদ্ধান্ত নিলো যে, সে হবে একজন সচ্চরিত্র নাগরিক (তারা যেমনটা বলে থাকে!), আর তাই সে আদর্শ নাগরিকের মতো পুলিশের কাছে গিয়ে সব খুলে বলবে। সে অবশ্যই নিরাপত্তা রক্ষী কর্মীদেরকে কাফের হিসেবে বিবেচনা করতো না। তাই সে তাদের কাছে গিয়ে বললো যে, সে জঙ্গলে একটা বোমায় হোঁচট খায়, আর পরে সে বোমাটি বাসায় নিয়ে যায়। সে তাদেরকে বললো তারা যেন তার বাড়িতে এসে বোমাটি অপসারণ করে। পুলিশ তাকে অপেক্ষা করতে বললো, আর বললো বোমাটি সংগ্রহ করার জন্য তারা এক ঘণ্টার মাঝেই পৌঁছে যাবে। আর সত্যিই, তারা এক ঘণ্টার আগেই ছেলেটির বাসায় পৌঁছে গেলো! তবে তারা একা ছিল না, তাদের সাথে ছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী, বিশেষ বাহিনী, ইন্টেলিজেন্স ফোর্স, এবং অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই গাড়ি। তারা ছেলেটির বাসা ঘিরে ফেললো। বাসার মধ্যে ঢুকে তল্লাসি চালালো, সবকিছু তছনছ করে ফেললো, এরপর তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেলো, সেই বোমাসহ।

---

[৩] মুসলিম ভূখন্ডসমূহে আজ যে সকল তাগুত সরকার শরীয়তের বদলে ব্রিটিশ-আমেরিকার আইন দিয়ে শাসন করছে এবং নামে মাত্র কিছু ইসলামী আচরণ পালন করছে বা তাও করছে না, তাদের সরাসরি সেবায় নিয়োজিত প্রতিরক্ষা বাহিনী হলো জালেম কাফের তাগুতী সেনাবাহিনী। এই তাগুতী সেনাবাহিনীতে র‍্যাব, আর্মি, নেভি, পুলিশ ইত্যাদির ন্যায় ইউনিফর্ম পরিহিত মুর্তাদ সেনাবাহিনীর পাশাপাশি অনেক সাদা পোশাকের কর্মচারীও নিয়োজিত আছে যারা মূলত গোয়েন্দা সংস্থায় চাকুরি করে। এই ভাইকে শেষ মুহূর্তে যে ব্যক্তি প্রতারিত করেছে সে ছিল সাদা পোশাকের তাগুতী মুর্তাদ বাহিনী।

তারা ছেলেটির বিরুদ্ধে অবৈধ বোমা ও আগ্নেয়াস্ত্র রাখার মামলা ঠুকে দিলো, কিন্তু মামলার কোথাও উল্লেখ করলো না যে, সে নিজেই তাদেরকে বোমার কথা বলেছিল, এবং সে নিজেই তাদেরকে বোমা সরানোর অনুরোধ করেছিল! উল্টো তারা লিখলো যে, ইন্টেলিজেন্স এজেন্টস এবং পুলিশেরা তাদের অভিজ্ঞতা, দূরদৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বুঝতে পেরেছে যে, এই ছেলের নিকটে একটি বোমা আছে। তারা ভাব নিলো যে, বোমাসহ ছেলেটিকে আবিষ্কার করে তারা সমাজকে এক আসন্ন বিপদের হাত থেকে উদ্ধার করেছে। ওদিকে এই মামলার উপর ভিত্তি করে সেই ছেলের হয়ে গেলো সাত বছরের জেল।

আমি আরেক ভাইকে চিনি, উনি আরবে থাকতেন। ওখানকার সরকারি আলেমরা বরাবরই মানুষদের তাকফীর বিষয়ক বিধান নিয়ে পড়াশুনা করতে বাধা দেয়, তারা মানুষকে এ বিষয়ে এক প্রকার আতঙ্কিত করে রাখে! তাদের ভাষ্যমতে সরকার ও তার সেনাবাহিনীকে নিয়ে তাকফীর করার অর্থ দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা, এটা করা তাকফীরীদের কাজ, খারেজীদের বৈশিষ্ট্য। এভাবে তারা সাধারণ মুসলমান জনতাকে ভয়ংকর বিভ্রান্তির দিকে ঠেলে দিতে চায় এবং অপরাধীদের সুস্পষ্ট পথরেখাকে অস্পষ্ট করে দিতে চায় যেন তাদের চক্রান্ত বুঝে উঠা সাধারণ মানুষদের জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে উঠে। এই ধরনের সরকারি আলেমদের দ্বারা প্রভাবিত কেউ যদি ইসলামের সাথে প্রতারণাকারী মুর্তাদ সরকার গোষ্ঠীর কোনো ব্যক্তিকে বা এই গোষ্ঠীকে রক্ষাকারী মুর্তাদ বাহিনীর কোনো লোককে নামাজ পড়তে দেখে, তাহলে এই অপরাধীকে সে কি মনে করতে পারে? আর যদি এই অপরাধীর কপালে নামাজের দাগ থাকে?? হায়! কি সাংঘাতিক ব্যাপার!

আমাদের এই আরবের অধিবাসী বন্ধু প্রবল উৎসাহে সিদ্ধান্ত নিলো, সে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে, ফিলিস্তিনের ইহুদীদের বিরুদ্ধে লড়বে। সে ইহুদী সীমানার নদীপথে তার স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র পাচার করলো, নিজেও অলৌকিকভাবে জর্দানি সৈন্যদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে নদী পার হয়ে যেতে

সক্ষম হলো, কেউ কিছুই টের পেলো না। সে ঘুণাক্ষরেও জানতো না যে, এরা সবাই ইহুদীদের পাহারাদার, বা তাদের গুপ্তচর। নতুবা সে কোনোদিনও তাদেরকে বিশ্বাস করতো না বা তাদের উপরে ভরসা করতো না। নদী পার করার পরে, সে খুব তৃষ্ণা বোধ করছিল, তার মনে পড়লো যে, সে পানি আনতে ভুলে গেছে। তাই সরলমনে সে ফিরে গেলো এদের মাঝে কোনো এক পাহারাদারের কাছ থেকে পানির সন্ধান করতে। ওখানে পৌঁছনোর পর সেই সৈন্যকে নামাজরত দেখে তো সে আরো স্বস্তি বোধ করলো, তার ব্যাপারে কোনো সন্দেহই মনে আসলো না। নামাজ পড়া শেষ হলে সেই সৈন্য আমাদের এই বন্ধুকে বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেলো, সে তাকে জিজ্ঞেস করলো যে, সে এখানে কি করছে। আমাদের এই বন্ধুও সরলমনে সৈন্যের কাছে তার মনের ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করলো আর পানি চাইলো। সৈন্যটি তাকে পানি দিয়ে, তার বন্দুকটা একটু দেখতে চাইলো। আমি এখানে এক মুহূর্তের জন্য থামতে চাই। আর পাঠকদের মনে করিয়ে দিতে চাই আবু বাসির (রাঃ) এর কথা! ঈমানদারদের বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার কথা। স্মরণ করে দেখুন, আবু বাসির (রাঃ) কী চাতুর্যের সাথে তার বন্দীকারীদের বলেছিল যে, সে তার তরবারি দেখতে চায়। অতঃপর সে ঐ তরবারির আঘাতে তাদের একজনকে হত্যা করে নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিল। কিন্তু আমাদের এই বন্ধুর ক্ষেত্রে কি হলো? সে নিজেই বোকার মতো প্রতিপক্ষের সৈন্যের হাতে নিজের বন্দুক তুলে দিলো, তাকে বিশ্বাস করলো! আর ফলস্বরূপ তাকে ভোগ করতে হলো এক নিদারুণ পরিণতি। সেই সৈন্য তৎক্ষণাৎ বন্দুক পরখ করে দেখার নাম করে গুলি ছুঁড়তে লাগলো। আসলে সে তার উর্ধ্বতন নেতাদেরকে সঙ্কেত দিচ্ছিল। এরপর তারা ওখানে এসে সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাইকে গ্রেফতার করলো, তাকে ধরে আদালতে নিয়ে গেলো। তার হয়ে গেলো সাত বছরের জেল।

হে আমার ভাইয়েরা, আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, এই সবগুলো ঘটনা সত্যি। এরা সবাই এখন আমার দেশের বন্দীশালায় আবদ্ধ। এগুলো আমার কল্পনাপ্রসূত কাহিনী নয়, বরং আমাদের চারপাশে এমন আরো বহু ঘটনা ঘটে চলেছে। সবচেয়ে শোচনীয় ব্যাপার হলো, উপরের

ঘটনাগুলোর প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইসলামের শত্রুদের সম্পর্কে ভালো ধারণা করা হয়েছে। অপরাধী কারা তা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণার অভাব, তাদের প্রকৃত স্বরূপ না জানা, জিহাদ ও মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্রের কথা না জানা, এবং দ্বীনের শত্রুদের প্রতি তাদের আনুগত্যের ব্যাপারটিকে সঠিক দৃষ্টি দিয়ে না দেখার কারণেই এই নির্মম পরিণতি নেমে এসেছে।

যারা দ্বীন ইসলামের সাথে প্রতারণা করে নিজের দ্বীনকে পরিত্যাগ করেছে এবং তাগুত মুর্তাদ সরকারের দাসে পরিণত হয়েছে, সেই সকল অপরাধী মুর্তাদ লোকদের কাছে তুচ্ছ কিছু পার্থিব লাভ অর্জনই পরম লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে, তার জন্য যে পথই নিতে হোক না কেন তারা সেটার পরোয়া করে না। হোক তা অসম্মানজনক পথ, কিংবা সম্মানজনক পথ। তারা কেবল নিজেদের স্বার্থ হাসিল করতে চায়, এর ফলে আজ জিহাদে ব্যাঘাত ঘটানো, মুজাহিদীনদের বাধা দেয়া, আর জালেমদের রাজত্বকে নিরাপত্তা প্রদান করাই তাদের পরম লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে।

এই অপরাধী গোষ্ঠীর কর্মপদ্ধতির মূল ভিত্তি হলো, মিথ্যা কথা ও মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, এবং তাদের পথরেখা গঠিত হয় প্রতারণা, কপটতা ও ছলনার সমন্বয়ে।

لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴿١٠﴾

তারা কোনো মুমিনের ব্যাপারে আত্মীয়তার মর্যাদাও রক্ষা করে না, এবং অঙ্গীকারেরও না। আর তারাই হলো সীমালঙ্ঘনকারী।[৪]

---

[৪] সূরা তাওবা, আয়াত: ১০

وَدُّوا۟ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا۟ فَتَكُونُونَ سَوَآءً ۖ فَلَا تَتَّخِذُوا۟ مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا۟ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٨٩﴾

তারা চায় যে, তারা যেমন কুফরী করেছে, তোমরাও তেমনি কুফরী করো, যাতে তোমরাও তাদের সদৃশ হয়ে যাও। অতএব, তাদের মধ্য থেকে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর পথে হিজরত করে চলে আসে। অতঃপর যদি তারা বিমুখ হয়, তবে তাদেরকে পাকড়াও করো এবং যেখানে পাও তাদেরকে হত্যা করো। এবং তাদের মধ্য থেকে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না এবং সাহায্যকারী বানিও না।[৫]

۞ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِن يَقُولُوا۟ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ۖ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ۖ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۚ هُمُ ٱلْعَدُوُّ فَٱحْذَرْهُمْ ۚ قَـٰتَلَهُمُ ٱللَّهُ ۖ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٤﴾

আপনি যখন তাদেরকে দেখেন, তখন তাদের দেহাকৃতি আপনার নিকট প্রীতিকর মনে হয়। আর যদি তারা কথা বলে, তবে আপনি সাগ্রহে তাদের কথা শ্রবণ করেন। তারা দেয়ালে ঠেকানো কাঠ সদৃশ্য। তারা যে কোনো বড় আওয়াজ বা শোরগোলকে নিজেদেরই বিরুদ্ধে মনে করে। তারাই শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক হোন। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন। বিভ্রান্ত হয়ে তারা কোথায় চলেছে?[৬]

যে এসব বিষয় সম্বন্ধে জানে না, এসব ব্যাপারে সচেতন নয়, এবং এই ঘৃণ্য অপরাধীদের পথরেখা সম্পর্কে যার সুস্পষ্ট জ্ঞান নেই, সে জেনে রাখুক, জিহাদ তার বোকামি ও ছেলেমানুষি চায় না, ঠিক যেমন জিহাদ চায় না আরো ব্যর্থতা ও পরাজয়ের বোঝা উঠাতে।

---

[৫] সূরা নিসা, আয়াত: ৮৯

[৬] সূরা মুনাফিকূন, আয়াত: ৪

শাইখ আবু মুহাম্মদ আসিম আল-মাকদিসী (আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন) রচিত "দুঃখ করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন" কিতাবের অংশবিশেষ

সুতরাং, ওদেরকে ভয় করো না

লেখক: শাইখ আবু মুহাম্মদ আসিম আল-মাকদিসী

পরিবেশনায়: বালাকোট মিডিয়া

إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ يُخَوِّفُ أَوۡلِيَآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمۡ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ﴿١٧٥﴾

নিশ্চয়ই এ হচ্ছে শুধুমাত্র শয়তান যা তোমাদের কাছে তার অনুসারী ও সমর্থকদের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করে; সুতরাং, ওদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকেই ভয় করো, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো।[১]

[১] সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৭৫

সত্যের উপর অটল থাকার জন্য একটি উৎসাহমূলক বাণী; প্রকাশ্যে সত্য প্রচার করো এবং জালেমদের সাহায্যকারীদের ভয় করো না[২]

জেনে রাখুন যে, তাগুতের সাহায্যকারীদের মুখের উপর দৃঢ়ভাবে সত্য কথা বলে দেয়া, তাওহীদের যে বিষয়গুলো তাদের অপ্রিয় সেই বিষয়গুলো তাদেরকে শুনিয়ে দেয়া, তাদের ভ্রান্ত উপাস্যদের তিরস্কার করা, তাদের সকল মিথ্যা উপাস্য, এগুলোর সমর্থক ও এগুলোর প্রতি সাহায্যকে প্রত্যাখ্যান করা – এটাই সর্বোত্তম পন্থা সেই মুসলমানদের জন্যে যারা নিজেদেরকে আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যকারীদের মাঝে শামিল করতে চায় এবং সেই সাহায্যকারী দলের[৩] অন্তর্ভুক্ত হতে চায় যারা কেয়ামত পর্যন্ত তাদের দ্বীনকে সমুন্নত রাখবে এবং যারা তাদের বিরোধীদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

এটা হয়তো বলা হয়ে থাকে যে, কোনো মুসলমানকে যখন তাগুতের দোসররা বন্দী করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে সেই সময়টা সত্য প্রকাশের জন্য উপযুক্ত সময় নয়, কারণ জালেমরা তখন সত্য শুনতে চায় না, বরং তারা সেই মুসলমান ভাইয়ের মন-মানসিকতার ধরন ও বিশ্বাসের প্রকৃতি জানতে চায়, অর্থাৎ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে এর বিচার প্রক্রিয়া চালাতে সহায়ক হবে এমন কথাই শুনতে চায়।

এর জবাবে আমরা বলতে চাই যে, হ্যাঁ এটা সত্যি। তবে মন-মানসিকতার ভিতকে নাড়িয়ে দেয় এবং অন্তরে গেঁথে যায় এমন হৃদয়স্পর্শী পদ্ধতিতে তাদের কারোও কাছে সত্যের অনস্বীকার্য বাণী

---

[২] এই অংশটি লেখক রচিত "লা তাহযান ইন্নাল্লাহ মা'আনা" (দুঃখ করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন) নামক কিতাবের থেকে নেয়া হয়েছে।

[৩] এখানে লেখক সেই বিজয়ী দলের (আত্ তাইফাহ আল মানসূরাহ) কথা বলছেন যার কথা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীস থেকে পাওয়া যায়, "আমার উম্মতের মাঝে সর্বদা একটি দল থাকবে যারা আল্লাহর বিষয়াদি (তাওহীদের হক্) তুলে ধরবে, যারা তাদের বিরোধিতা করে তারা তাদের কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না, আর বিষয়টা এরূপই থাকবে যে পর্যন্ত না আল্লাহর হুকুম চলে আসে এবং তারা মানুষদের মাঝে সবচেয়ে উচ্চতম অবস্থানে থাকে।"

পৌঁছে না দেয়ার কোনোই কারণ নেই। আর এই সকল ক্ষেত্রেই পরিস্থিতি মানুষ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভেদে বিভিন্ন হয়ে থাকে।

কোনো বন্দী যদি দুর্বল হয় এবং অনুভব করে যে, প্রকাশ্যে সত্য ঘোষণার ফলাফল সে সহ্য করতে পারবে না, সেক্ষেত্রে তাকে সত্য প্রকাশ করতে হবে না। তবে এখানে শর্ত হলো, তাকে যদি সত্যিকারের জোর-জবরদস্তি ও বাধ্যবাধকতার দ্বারা কুফরী কথা বলতে বাধ্য করা না হয়, তবে সে এমন কথা বলবে না যা কুফরী বহন করে। অনেকে বন্দী অবস্থায় খুব অল্পতেই কুফরী কথা বলে ফেলে এই অজুহাতে যে, সে দুর্বল অবস্থায় ছিল; অথচ তাকে বলপ্রয়োগ বা মারধর বা বাধ্য করা হয় নি। আর এমনটা হয়ে থাকে যদিও এমন পরিস্থিতিতে মিথ্যা ফতোয়া প্রদান কিংবা আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীনের ব্যাপারে জ্ঞান ছাড়া কথা বলার পরিণামকে ভয় করে সেগুলোর বদলে অস্পষ্ট কথা বলে কিংবা প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ অপর প্রশ্ন করে কিংবা শুধুমাত্র "আমি এটা জানি না" বলে সেই পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠার সুযোগ থাকে। আমি বলি যে, এটা[৪] একজন মুসলমানকে জবরদস্তির শিকার না হওয়া সত্ত্বেও বাতিলপন্থী কিংবা কুফরী কথা বলা, বা সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ ঘটানো, অথবা জালেমদের কুফরী ও তাদের বাতিল উপাস্যদেরকে অনুমোদন করার মতো কঠিন গুনাহের হাত থেকে বাঁচিয়ে দেয়।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,
"যে আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে, সে সত্য বলুক অথবা চুপ থাকুক।"[৫]

অনেক দেশে জিজ্ঞাসাবাদে আপনি তাদেরকে কি বলেন বা কি বিশ্বাস করেন তা নিয়ে তারা তেমন পরোয়া করে না যতটা না পরোয়া তারা করে যখন আপনি রাস্তাঘাট কিংবা মসজিদে অনেক মানুষের মাঝে অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে কথা বলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে মানুষকে

---

[৪] এমন পরিস্থিতিতে মিথ্যা ফতোয়া প্রদান কিংবা আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীনের ব্যাপারে জ্ঞান ছাড়া কথা বলার পরিণামকে ভয় করে সেগুলোর বদলে অস্পষ্ট কথা বলা কিংবা প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ অপর প্রশ্ন করা কিংবা শুধুমাত্র "আমি এটা জানি না" বলে পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠার চেষ্টা করা।

[৫] বুখারী (৬০১৮, ৬১৩৬, ৬৪৭৫), মুসলিম (৪৭), আহমদ (২/২৬৭, ৪৩৩, ৪৬৩), আবু দাঊদ (৫১৫৪), তিরমিজি (২৫০০), ইবনে হিব্বান (৫০৬, ৫১৬)

পরিচালিত করেন। অনেক দেশে জিজ্ঞাসাবাদে আপনি কি বললেন তা আপনার ক্ষতি করে না যতক্ষণ না আপনি ওদের লিখিত কাগজে সই করেন। এমন জায়গায় আপনি সত্য মুখে বলতে পারেন কাগজে সই না করে। আসলে কোনো নির্দিষ্ট তাগুতের নাম না বলে সাধারণভাবে সব তাগুতের বিরুদ্ধে কথা বলা সম্ভব। বিভিন্ন অবস্থায় একই সত্য প্রকাশের সঠিক উপায় বিভিন্ন হতে পারে, আর যারা তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন তারা সেই অবস্থা অনুসারে উপায় নির্ধারণ করতে পারেন।

তাওহীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত ভাইদের জন্য - বিশেষ করে যারা অন্যদেরকে সত্যের দিকে আহবান করা ও সত্য প্রকাশ করাকে নিজেদের দায়িত্ব হিসেবে স্থির করে নিয়েছেন তাদের জন্য - উত্তম হলো সমস্ত অত্যাচার, নির্যাতন, জেল-জরিমানার মুখে সত্যের উপর অটল থাকা। মনে রাখবেন, আপনি এই পথে নতুন নন, আপনার আগে বহু নবী-রাসূল (আলাইহিমিস সালাম), সত্যবাদী ও শহীদ এই পথে হেঁটেছেন। অনেক নবীকে (আলাইহিমিস সালাম) হত্যা করা হয়েছে। সঠিক পথের মানুষকে করাত দিয়ে কাটা হয়েছে। কিন্তু এসব নির্যাতন শুধু তাদের ঈমানকেই আরও মজবুত করেছে। আল্লাহর বান্দা ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

“শহীদদের নেতা হচ্ছেন হামজা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং সেই লোক যে অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সৎ কাজের আদেশ করে ও অসৎ কাজের নিষেধ করে এবং এ কারণে সেই অত্যাচারীর হাতে সে নিহত হয়।”[৬]

সুতরাং আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করবেন না। বরং আল্লাহকে খুশি করার জন্য মানুষকে রাগান্বিত করুন। তখন আপনি তাদের অন্তর জয় করতে পারবেন, তাদের উপর প্রাধান্য পাবেন এবং আল্লাহ তাদের অন্তরে আপনার প্রতি সম্মান ও আতংক জন্ম দিবেন।

ইমাম আহমদ (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

---

[৬] আস সিলসিলাহ আস সাহীহাহ (৩৭৪)

“একজন মানুষের উচিত নয় লোকজনের ভয়ে সত্য বলা থেকে বিরত থাকা যখন সে এমন অবস্থা দেখে যেখানে সত্য প্রকাশ করা উচিত, কারণ সত্য বলা অথবা গুরুত্বপূর্ণ কিছু উল্লেখ করা তার আয়ু কমায় না বা জীবিকা বিলম্বিত করে না।”[৭]

আর এ ধরনের অবস্থা আল্লাহ দেখেন, তাঁর ফেরেশতারা দেখেন এবং তা লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়। সুতরাং, নিজের জন্য এমন একটি লিপি তৈরি হতে দিন, যে অবস্থায় আপনি আল্লাহর শত্রুদের থেকে দূরে ছিলেন এবং আল্লাহর নিকটবর্তী ছিলেন এবং ঘটনাটিকে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন এমন এক দিনে যখন কোনো সম্পদ বা সন্তান কাজে আসবে না এবং শুধুমাত্র তারাই বাঁচতে পারবে যারা পরিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে।

ইবনুল কাইয়্যুম (রহিমাহুল্লাহ) তার “ইগাসাত আল লাহফান”[৮] নামক গ্রন্থে লিখেছেন,
“শয়তানের ষড়যন্ত্রগুলোর একটা হলো, সে বিশ্বাসীদেরকে তার সেনাবাহিনী ও মিত্রদের ব্যাপারে ভীত করে তোলে। এজন্য তারা (বিশ্বাসীরা) শয়তানের বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক চেষ্টা চালায় না, ভালো কাজের আদেশ করে না এবং খারাপ কাজে নিষেধ করে না। এটা শয়তানের সবচেয়ে বড় চক্রান্তগুলোর মাঝে অন্যতম।”

আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٥﴾

নিশ্চয়ই এ হচ্ছে শুধুমাত্র শয়তান যা তোমাদের কাছে তার অনুসারী ও সমর্থকদের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করে; সুতরাং, ওদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকেই ভয় করো, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো।[৯]

---

[৭] আস সিলসিলাহ আস সাহীহাহ (১৬৮)

[৮] ১/৯৪

[৯] সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৭৫

কাতাদাহ (রহিমাহুল্লাহ) আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, "শয়তান তার বাহিনীকে বড় ও শক্তিশালী হিসেবে বিশ্বাসীদের অন্তরে পেশ করে। এজন্য আল্লাহ বলেছেন, '......সুতরাং, ওদের ভয় করো না, বরং আমাকেই ভয় করো, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো।' সুতরাং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস যত শক্তিশালী হবে, অন্তরে শয়তানের মিত্রদের ভয় তত কমে যাবে। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস যত দুর্বল হবে, শয়তানের মিত্রদেরকে তত ভয়ংকর মনে হবে।"

হ্যাঁ, এটাই হলো সত্য, কারণ আল্লাহভীতি যার অন্তর পূর্ণ করে তার অন্তরে অন্যকে ভয় করার জায়গা অবশিষ্ট থাকে না। যখন কোনো লোক উপলব্ধি করে যে, আল্লাহ সর্বোচ্চ, সর্বশক্তিমান, সব কিছুই আল্লাহর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন, তখন তার কাছে অন্য যেকোনো কিছুই তুচ্ছ ও নগণ্য মনে হবে। সে যদি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে যে, যেসব কিছুর মুখোমুখি সে হচ্ছে সেগুলো তার জন্যই ছিল এবং যেসব কিছুর সম্মুখীন সে হয়নি সেগুলো তার জন্য ছিল না, এবং যদি সকল জিন ও মানুষ একত্রিত হয়ে তার ক্ষতি চায় তারা তার ক্ষতি করতে পারবে না শুধুমাত্র আল্লাহ যদি কোনো ক্ষতি চান সেটুকু ছাড়া, যদি সে এটা উপলব্ধি করে, তবে আল্লাহ তাকে দৃঢ় রাখবেন এবং তার অন্তরকে শক্তিশালী করবেন। পৃথিবীর সকলে তার বিরুদ্ধে একত্রিত হলেও সে তার পথ থেকে সরবে না, বরং তার ঈমান ও আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ আরও বেড়ে যাবে।

ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَٰلَٰتِ ٱللَّهِ وَيَخۡشَوۡنَهُۥ وَلَا يَخۡشَوۡنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَۗ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ٣٩

যারা আল্লাহর রিসালাত (বার্তাসমূহ) প্রচার করতেন এবং তাঁকে ভয় করতেন, আর আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করতেন না। হিসাব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট।[১০]

বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আল্লাহর দুশমনেরা যে পদ্ধতি ব্যবহার করে তা হলো, বিশ্বাসীদের অন্তরে আল্লাহর দুশমনদের ব্যাপারে ভয় ও অজানা আতংক তৈরি করা। আর এই পদ্ধতিটি তারা তাদের নেতা শয়তানের থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছে। তাই ঠিক যেমন শয়তান – তার উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক – ঈমানদারদেরকে সত্য থেকে দূরে সরানোর জন্য তার সহচরদের

---

[১০] সূরা আহযাব, আয়াত: ৩৯

ব্যাপারে ঈমানদারদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করতে চায়, তারাও ঠিক একই কাজ করে। তারা তাদের ক্ষমতা, তাদের সংখ্যা, সেনাবাহিনী, অস্ত্র, গোয়েন্দা সংস্থা, প্রচার মাধ্যম ইত্যাদির অহমিকা প্রদর্শনের মাধ্যমে মুসলমানদের অন্তরে ভীতি ছড়ানোর চেষ্টা করে। তারা মুসলমানদের এমন ধারণা দেয়ার চেষ্টা করে যে, পুরো পৃথিবী তাদের হাতের মুঠোয়; তারা ছোট, বড় সকল বিষয়ের খোঁজ-খবর রাখে। তারা তাদের বিভিন্ন সংস্থাগুলোর ক্ষমতা অতিরঞ্জন করে প্রচার করে। তাদের এরকম আচরণের কথা আল্লাহ পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করেছেন,

أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ ۖ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍ ﴿٣٦﴾

আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্যে যথেষ্ট নন? অথচ তারা আপনাকে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যান্যদের ভয় দেখায়। আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন, তার কোনো পথপ্রদর্শক নেই।[১১]

জালেমদের এসব প্রচার-প্রপাগানডা শুধুমাত্র দুর্বল ঈমানদারদেরই প্রভাবিত করে যাদের অন্তর আল্লাহর প্রতি গভীর ভক্তি ও ভীতির দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত থাকে না। এর ফলে তারা আল্লাহর চাইতে নিছক কিছু মানুষকেই অধিক ভয় করে। এসব দুর্বল লোকেরা বিশ্বাসীদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ, কারণ তারা আল্লাহর দুশমনদের দ্বারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ঐক্যপূর্ণ মনোবলকে দুর্বল করে তোলার একটি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তাই এটা আবশ্যক যে, এই ধরনের মানুষদেরকে এমন জায়গাসমূহে রাখা যেখানে থেকে তাদের পক্ষে অন্য মুসলমানদেরকে প্রভাবিত করার সুযোগ না মিলে, ঠিক যেমন তাদের প্রতি মনযোগ প্রদান না করা কিংবা তাদের কথা বিবেচনা না করা কিংবা তাদের দ্বারা প্রতারিত না হওয়া আবশ্যক। আল্লাহ আআলা বলেন,

لَوْ خَرَجُوا۟ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا۟ خِلَٰلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّٰعُونَ لَهُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٤٧﴾

[১১] সূরা যুমার, আয়াত: ৩৬

যদি তারা তোমাদের সাথে বের হতো, তবে তারা তোমাদের অনিষ্ট ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করতো না, আর তারা ছুটে বেড়াতো তোমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। আর তোমাদের মাঝে কতক রয়েছে যারা তাদের শ্রবণ করে। বস্তুতঃ আল্লাহ জালেমদের ভালোভাবেই জানেন।[১২]

বিশ্বাসীদের কঠিন সময়ে উৎসাহহীন, নেতিবাচক মানসিকতাসম্পন্ন, ভীত দুর্বল লোকেরা মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। কারণ এ ধরনের কঠিন পরিস্থিতিতে বিশ্বাসীদের উৎসাহ দেয়া প্রয়োজন, প্রয়োজন সত্যের উপর দৃঢ় থাকার, অন্তরকে শক্তিশালী রাখার। তাদেরকে মনে করিয়ে দেয়া দরকার পূর্ববর্তী বিশ্বাসীগণ ও উলামাগণ কিভাবে ভয়ংকর প্রতিকূলতার মধ্যে ঈমানের উপর দৃঢ় থেকেছেন। আল্লাহ এরকম সময়ে নিরুৎসাহ প্রদানের ও নেতিবাচক থাকার নিন্দা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُوا۟ بِهِۦ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنۢبِطُونَهُۥ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ لَٱتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَـٰنَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

আর যখন তাদের কছে পৌঁছে কোনো সংবাদ শান্তি-সংক্রান্ত কিংবা ভয়ের, তখন তারা সেগুলোকে রটিয়ে দেয়। আর যদি তারা সেগুলো পৌঁছে দিতো রাসূল পর্যন্ত কিংবা তাদের দায়িত্বশীলদের পর্যন্ত, তখন অনুসন্ধান করে দেখা যেতো সেসব বিষয়, যা তাতে রয়েছে অনুসন্ধান করার মতো। বস্তুতঃ আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা যদি তোমাদের উপর বিদ্যমান না থাকতো তবে তোমাদের অল্প কতিপয় লোক ব্যতীত সবাই শয়তানের অনুসরণ করতে শুরু করতো![১৩]

এগুলো হলো, কঠিন সময় ও অবস্থা যখন আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে পরীক্ষা করেন তাদেরকে পরিশুদ্ধ করার জন্য এবং ভালো মানুষদেরকে খারাপ মানুষদের থেকে আলাদা করার জন্য। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

---

[১২] সূরা তাওবা, আয়াত: ৪৭

[১৩] সূরা নিসা, আয়াত: ৮৩

إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ يُخَوِّفُ أَوۡلِيَآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمۡ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ﴿١٧٥﴾

নিশ্চয়ই এ হচ্ছে শুধুমাত্র শয়তান যা তোমাদের কাছে তার অনুসারী ও সমর্থকদের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করে; সুতরাং, ওদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকেই ভয় করো, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো।[১৪]

আর এর একটু পরেই তিনি সুবহানাহু তাআলা বলেন,

مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ عَلَىٰ مَآ أَنتُمۡ عَلَيۡهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلۡخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطۡلِعَكُمۡ عَلَى ٱلۡغَيۡبِ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَجۡتَبِي مِن رُّسُلِهِۦ مَن يَشَآءُۖ فَـَٔامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦۚ وَإِن تُؤۡمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمۡ أَجۡرٌ عَظِيمٞ ﴿١٧٩﴾

আল্লাহ, ঈমানদারগণকে সে অবস্থাতে রাখবেন না যাতে বর্তমানে তোমরা রয়েছো যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি মন্দ থেকে ভালো কে আলাদা করেন, আর আল্লাহ এমন নন যে, তোমাদিগকে গায়েবের সংবাদ দেবেন। কিন্তু আল্লাহ স্বীয় রাসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা বাছাই করে নিয়েছেন। সুতরাং, আল্লাহর ওপর এবং তাঁর রাসূলগণের ওপর তোমরা প্রত্যয় স্থাপন করো। বস্তুতঃ তোমরা যদি বিশ্বাস ও পরহেযগারীর ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে থাকো, তবে তোমাদের জন্যে রয়েছে বিরাট প্রতিদান।[১৫]

এজন্য যে সকল ঈমানদারগণ আল্লাহর সাথে কৃত চুক্তির ব্যাপারে সত্যবাদী থেকেছে তারা শয়তানের ষড়যন্ত্রে প্রভাবিত হয় না, অত্যাচার ও জুলুমের ভয়ে ভেঙে পড়ে না। সত্যের প্রতি তাদের মানসিকতার কোনো পরিবর্তন আসে না। তারা যে পদক্ষেপ নেয় তা নড়বড়ে হয় না। বরং তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণ আরও বেড়ে যায়। আল্লাহ আরও বলেছেন,

---

[১৪] সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৭৫

[১৫] সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৭৯

ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا۟ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَٰنًا وَقَالُوا۟ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾

فَٱنقَلَبُوا۟ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوٓءٌ وَٱتَّبَعُوا۟ رِضْوَٰنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿١٧٤﴾

إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٥﴾

যাদেরকে লোকেরা বলেছিল, “নিশ্চয়ই তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য লোকেরা সমাবেশ করেছে বহু সাজ-সরঞ্জাম; সুতরাং, ওদেরকে ভয় করো।” তখন তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হয়ে যায় এবং তারা বলে, “আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; তিনি কতই না চমৎকার অভিভাবক।” অতঃপর ফিরে এলো মুসলমানেরা আল্লাহর অনুগ্রহ নিয়ে, তাদের কিছুই অনিষ্ট হলো না। তারপর তারা আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত হলো। বস্তুতঃ আল্লাহর অনুগ্রহ অতি ব্যাপক। নিশ্চয়ই এ হচ্ছে শুধুমাত্র শয়তান যা তোমাদের কাছে তার অনুসারী ও সমর্থকদের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করে; সুতরাং, ওদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকেই ভয় করো, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো।[১৬]

এই আয়াতগুলির পূর্বে বিশ্বাসীদেরকে নৈতিকভাবে দুর্বল করা এবং ভীতি প্রদর্শনের ব্যাপারে মুনাফিকদের হীন অবস্থানের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন এবং মুনাফিকদের প্রতিউত্তরও দিয়েছেন,

ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ لِإِخْوَٰنِهِمْ وَقَعَدُوا۟ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا۟ ۗ قُلْ فَٱدْرَءُوا۟ عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿١٦٨﴾

[১৬] সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৭৩-১৭৫

যারা ঘরে বসে থেকে নিজেদের ভাইদের সম্বন্ধে বলে, “যদি তারা আমাদের কথা শুনতো তবে তারা নিহত হতো না।” তাদেরকে বলে দিন, “এবার তোমাদের নিজেদের উপর থেকে মৃত্যুকে সরিয়ে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।”[১৭]

তারপর আল্লাহ শহীদদের মর্যাদা বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেছেন যারা তাঁর সাথে কৃত চুক্তি পূরণ করেছে,

وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾ فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا۟ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٠﴾

۞ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧١﴾ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنۢ بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا۟ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٢﴾

ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا۟ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَٰنًا وَقَالُوا۟ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾

আর যারা আল্লাহর রাহে নিহত হয়, তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত। আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তার প্রেক্ষিতে তারা আনন্দ উদযাপন করছে। আর যারা এখনও তাদের সাথে সম্মিলিত হয় নি তাদের জন্যে তারা আনন্দ প্রকাশ করে। কারণ, তাদের কোনো ভয়-ভীতিও নেই এবং কোনো চিন্তা-ভাবনাও নেই। আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহ লাভের জন্যে তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং এজন্য যে, আল্লাহ ঈমানদারদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না। যারা আহত হয়ে পড়ার পরেও আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য করেছে, তাদের মধ্যে যারা সৎ ও পরহেযগার, তাদের

---

[১৭] সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৬৮

জন্য রয়েছে মহান সওয়াব। যাদেরকে লোকেরা বলেছিল, "তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য লোকেরা সমাবেশ করেছে বহু সাজ-সরঞ্জাম; সুতরাং, ওদেরকে ভয় করো।" তখন তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হয়ে যায় এবং তারা বলে, "আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; তিনি কতই না চমৎকার অভিভাবক।"(১৮)

একইভাবে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦۚ

...অথচ তারা আপনাকে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যান্যদের ভয় দেখায়...(১৯)

অতঃপর তিনি তাঁর নবীকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিক্ষা দেন,

...বলুন, "আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তাঁর উপরেই নির্ভর করে।"(২০)

আল্লাহ ছাড়া আর যা কিছু আছে সবই আল্লাহর সৃষ্টি এবং সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল। সুতরাং, যারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহর উপর ভরসা করে তারা কিভাবে আল্লাহকে ভয় না করে শয়তানের অনুসারীদের অস্ত্র, সংখ্যা, কৌশল, প্রচার-প্রপাগানডাকে ভয় করে? নবী-রাসূলদের (আলাইহিমিস সালাম) ইতিহাস বিবেচনা করে দেখুন। উদ্ধত অহংকারী সম্প্রদায়ের কঠোর হুমকির মুখে নবী ও রাসূলদের (আলাইহিমিস সালাম) আদর্শগত অবস্থানের দৃঢ়তা দেখুন এবং নিজের অন্তরকে এর নিখাদ শক্তি দ্বারা শক্তিশালী করুন। উদাহরণস্বরূপ, নূহ (আলাইহিস সালাম) এর ঘটনাটিকে দেখুন, আর খেয়াল করে দেখুন যে, তিনি (আলাইহিস সালাম) তাঁর কওমের মানুষদেরকে উদ্দেশ্য করে কি দৃঢ়তার সাথে কথা বলেছেন, অথচ তিনি ছিলেন তাদের মাঝে একা। কিন্তু তিনি আল্লাহর উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন এবং তাঁর প্রবল প্রতাপময়

(১৮) সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৬৯-১৭৩

(১৯) সূরা যুমার, আয়াত: ৩৬

(২০) সূরা যুমার, আয়াত: ৩৮

মহাশক্তির ব্যাপারে উপলব্ধি করেছিলেন, তাই কোনো প্রকারের ভয়-ভীতি ছাড়াই তিনি তাঁর (আলাইহিস সালাম) সময়কার অত্যাচারী শাসক কিংবা শাসনব্যবস্থাকে সম্বোধন করেছিলেন,

إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓا۟ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوٓا۟ إِلَىَّ وَلَا تُنظِرُونِ ﴿٧١﴾

..."যদি তোমাদের কাছে আমার অবস্থান এবং আল্লাহর আয়াতসমূহের মাধ্যমে নসীহত করা ভারী বলে মনে হয়ে থাকে, তবে আমি আল্লাহর উপর ভরসা করছি। সুতরাং, তোমরা তোমাদের শরীকদের সঙ্গে নিয়ে নিজেদের তদবীর মজবুত করে নাও, অতঃপর তোমাদের সেই তদবীর (গোপন ষড়যন্ত্র) যেন তোমাদের দুশ্চিন্তার কারণ না হয়, তারপর আমার সাথে (যা করতে চাও) করে ফেলো, আর আমাকে মোটেই অবকাশ দিও না।"[২১]

আর এই কথাগুলো নূহ (আলাইহিস সালাম) নিছক বেপরোয়া হয়ে কিংবা এমন অসার উদ্দীপনার বশবর্তী হয়ে বলে ফেলেন নি যা কিছুক্ষণের মাঝেই হারিয়ে যায়। বরং তিনি (আলাইহিস সালাম) জানতেন যে, তিনি এমন মহাশক্তির দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে আছেন যা কোনোদিনই হারিয়ে যাবে না, আর তিনি (আলাইহিস সালাম) জানতেন যে, আল্লাহ তাঁর সাথে আছেন, আর যতক্ষণ তিনি আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা করবেন এবং তাঁর দেয়া রজ্জু আঁকড়ে ধরে থাকবেন ততক্ষণ তারা তাঁর (আলাইহিস সালাম) কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না শুধুমাত্র তা ব্যতীত যা আল্লাহ ইচ্ছা করেছেন। আর আল্লাহ যদি এমন কিছু ইচ্ছা করেই থাকেন তবে তা তাঁর বান্দার প্রতি মোটেও প্রতারণা নয়, বরং তা হলো একটি পরীক্ষা, একটি মূল্যায়ণ, যা হলো বান্দাকে পরিশোধিত করা এবং সত্য-মিথ্যাকে পার্থক্যপূর্ণ করে দেয়ার একটি মাধ্যম।

হূদ (আলাইহিস সালাম) এর ঘটনাটি পর্যালোচনা করে দেখুন, তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের মুখোমুখি হয়েছিলেন একা এবং তাঁর সম্প্রদায় ছিল তখনকার সময়ের সবচেয়ে শক্তিশালী, কুখ্যাত

---

[২১] সূরা ইউনুস, আয়াত: ৭১

সম্প্রদায়। তারা তাদের মিথ্যা উপাস্যদের ব্যাপারে ভয় দেখিয়ে হূদ (আলাইহিস সালাম) কে থামানোর চেষ্টা করেছিল,

إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوٓءٍ ۗ

"আমাদের কথা তো এই যে, আমাদের উপাস্য দেবতাদের মধ্য হতে কেউ তোমাকে দুর্দশায় ফেলে দিয়েছে"...[২২]

হূদ (আলাইহিস সালাম) পর্বতসম দৃঢ়তা নিয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করে তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন,

قَالَ إِنِّىٓ أُشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓا۟ أَنِّى بَرِىٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ مِن دُونِهِۦ ۖ فَكِيدُونِى جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ﴿٥٥﴾ إِنِّى تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّى وَرَبِّكُم ۚ مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَآ ۚ إِنَّ رَبِّى عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾

..."আমি আল্লাহকে সাক্ষী করছি এবং তোমরাও সাক্ষী থাকো যে, আমার কোনো সম্পর্ক নেই তাদের সাথে যাদেরকে তোমরা শরীক করছো। তাঁকে (আল্লাহকে) ছেড়ে, অনন্তর তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাও, অতঃপর আমাকে সামান্য অবকাশও দিও না। আমি আল্লাহর উপরে ভরসা করেছি যিনি আমারও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক, ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কিছুই নেই যা তাঁর পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক সরল পথে অবস্থিত।"[২৩]

খলিলুল্লাহ্ ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এর নেয়া পদক্ষেপের কথা চিন্তা করুন, তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে বিতর্ক করেছিলেন, তাদের মোকাবেলা করেছিলেন এবং তাদের এই শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, তিনি তাদেরকে কিংবা তাদের সেই সকল মিথ্যা উপাস্যদেরকে মোটেও

---

[২২] সূরা হূদ, আয়াত: ৫৪

[২৩] সূরা হূদ, আয়াত: ৫৪-৫৬

পরোয়া করেন না যেগুলোর দ্বারা তারা তাঁকে ভয় দেখিয়েছিল। নিরাপত্তা, প্রশান্তি ও প্রতিষ্ঠা শুধুমাত্র তাদেরই প্রাপ্য যারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহর তাওহীদে (একত্ববাদ) বিশ্বাস করে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক হিসেবে স্থির না করে জীবন অতিবাহিত করে। আর যারা আল্লাহর সাথে শিরক করে, তাদের প্রতি কিভাবে প্রশান্তি ও নিরাপত্তা প্রেরিত হতে পারে? বরং, এই ধরনের মানুষেরা শুধুমাত্র ভয়, আতংক ও প্রতারণাই অর্জন করে,

وَحَآجَّهُۥ قَوۡمُهُۥۚ قَالَ أَتُحَٰٓجُّوٓنِّي فِي ٱللَّهِ وَقَدۡ هَدَىٰنِۚ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشۡرِكُونَ بِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيۡـٔٗاۗ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيۡءٍ عِلۡمًاۗ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ٨٠

وَكَيۡفَ أَخَافُ مَآ أَشۡرَكۡتُمۡ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمۡ أَشۡرَكۡتُم بِٱللَّهِ مَا لَمۡ يُنَزِّلۡ بِهِۦ عَلَيۡكُمۡ سُلۡطَٰنٗاۚ فَأَيُّ ٱلۡفَرِيقَيۡنِ أَحَقُّ بِٱلۡأَمۡنِۖ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٨١

..."তোমরা কি আল্লাহর ব্যাপারে আমার সাথে বিতর্ক করছো, অথচ তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করেছেন? তোমরা যাদেরকে শরীক করো, আমি তাদেরকে ভয় করি না, আমার কোনো ক্ষতিই হতে পারে না তা ব্যতীত যা আমার পালনকর্তা ইচ্ছা করেন। আমার পালনকর্তাই প্রত্যেক বস্তুকে স্বীয় জ্ঞানের দ্বারা বেষ্টন করে আছেন। এরপরেও কি তোমরা চিন্তা করো না? যাদেরকে তোমরা আল্লাহর সাথে শরীক করে রেখেছো, তাদেরকে আমি কিভাবে ভয় করতে পারি, অথচ তোমরা ভয় করো না যে, তোমরা আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে শরীক করছো, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তোমাদের প্রতি কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নি? সুতরাং, এই দু'টি দলের মধ্যে কোন দলটি প্রশান্তি ও নিরাপত্তা লাভের অধিক যোগ্য, যদি তোমাদের জানা থাকে?"[২৪]

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلۡمٍ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلۡأَمۡنُ وَهُم مُّهۡتَدُونَ ٨٢

[২৪] সূরা আনআম, আয়াত: ৮০-৮১

যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে শিরকের সাথে মিশ্রিত করে না, তাদের জন্যেই শান্তি ও নিরাপত্তা এবং তারাই সুপথগামী।[২৫]

সুতরাং, সত্যিকারের নিরাপত্তা, প্রশান্তি এবং দৃঢ়তা তাদের জন্য যারা শুধুমাত্র আল্লাহর উপাসনা করে এবং তাঁর সাথে কাউকে কোনোভাবেই শরীক করে না।

চিন্তা করুন সেই মূসা (আলাইহিস সালাম) এর কথা যিনি আল্লাহর সাথে কথা বলার সম্মান লাভ করেছিলেন। যখন ফেরাউন তার দলবল নিয়ে সাগর তীরে মূসা (আলাইহিস সালাম) ও তাঁর অনুসারী বনী ইসরাঈলদের ধরে ফেলার অবস্থায় চলে গিয়েছিল। মূসা (আলাইহিস সালাম) তাঁর অনুসারীদের নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন ফেরাউনদের থেকে তাঁদের দ্বীন রক্ষার জন্য এবং পালাবার পথে সাগর তীরে হঠাৎ করে ফেরাউনের বিশাল বাহিনী পেছন থেকে তাঁদের দিকে ধেয়ে আসছিল। এ সময় মূসা (আলাইহিস সালাম) এর অনুসারীদের অবস্থা ছিল,

..."আমরা যে ধরা পড়ে গেলাম।"[২৬]

কিন্তু এমন চরম বিপদজনক, কঠিন এবং ভীতিকর অবস্থাতেও মূসা (আলাইহিস সালাম) এমন পরম আস্থা ও বিশ্বাস, নিশ্চিন্ততা ও দৃঢ়তার সাথে জবাব দিলেন যার সাথে পৃথিবীর সবচাইতে দৃঢ়তম পর্বতগুলোরও তুলনা করা যায় না,

..."কখনোই নয়, আমার সাথে আছেন আমার পালনকর্তা। সত্বর তিনি আমাকে পথ-নির্দেশ করবেন।"[২৭]

---

[২৫] সূরা আনআম, আয়াত: ৮২

[২৬] সূরা শুআরা, আয়াত: ৬১

[২৭] সূরা শুআরা, আয়াত: ৬২

তারপর দেখুন মূসা (আলাইহিস সালাম) এর আল্লাহর উপর দৃঢ় থাকা ও ভরসা করার প্রতিদান,

فَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ ۖ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٦٣﴾
وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ ٱلْـَٔاخَرِينَ ﴿٦٤﴾
وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓ أَجْمَعِينَ ﴿٦٥﴾
ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْـَٔاخَرِينَ ﴿٦٦﴾
إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٦٧﴾
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٦٨﴾

অতঃপর আমি মূসা এর প্রতি ওহী করলাম, “তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রকে আঘাত করো।” ফলে, তা বিভক্ত হয়ে গেলো এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতসদৃশ হয়ে গেলো। আমি সেথায় তাদের দলটিকে পৌঁছিয়ে দিলাম। এবং মূসা ও তাঁর সঙ্গীদের সবাইকে বাঁচিয়ে দিলাম। অতঃপর অপর দলটিকে নিমজ্জিত করলাম। নিশ্চয়ই এতে একটি নিদর্শন আছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুমিন নয়। আর নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তা অবশ্যই পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।[২৮]

ফেরাউনের জাদুকরদের অবস্থা চিন্তা করুন যখন তারা মূসা (আলাইহিস সালাম) এর প্রতি ঈমান এনেছিল এবং অতঃপর তারা সেই অত্যাচারী শাসকের দেয়া কঠোর হুমকি ও কঠোর নির্যাতনের ভীতি প্রদর্শনের প্রতি মোটেও দৃষ্টিপাত করে নি,

قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُۥ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُۥ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِى عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ ۖ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَٰفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِى جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَآ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴿٧١﴾

ফেরাউন বললো, “আমার অনুমতি দানের পূর্বেই কি তোমরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে? দেখছি সেই তোমাদের প্রধান, সেই তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে। সুতরাং, অবশ্যই আমি

[২৮] সূরা শুআরা, আয়াত: ৬৩-৬৮

তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কর্তন করবো এবং আমি তোমাদেরকে খেজুর বৃক্ষের কান্ডে শূলবিদ্ধ করবোই এবং তোমরা নিশ্চিত রূপেই জানতে পারবে আমাদের মধ্যে কার আযাব (শাস্তি) কঠোরতর এবং অধিক স্থায়ী।”[২৯]

আর লক্ষ্য করুন, যখন ফেরাউনের জাদুকরেরা তাদের ঈমানকে তাদের অন্তরের উপর সম্পূর্ণরূপে কর্তৃত্বশীল হতে দিলো, তখন কোনো ধরনের ভয় ও দ্বিধা ছাড়াই তারা বলেছিল,

قَالُواْ لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلَّذِى فَطَرَنَا ۖ فَٱقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ ۖ إِنَّمَا تَقْضِى هَٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَآ ﴿٧٢﴾
إِنَّآ ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَٰيَٰنَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ ۗ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ ﴿٧٣﴾

...“আমাদের কাছে যে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসেছে তার উপর এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর উপর আমরা কিছুতেই তোমাকে প্রাধান্য দিবো না। সুতরাং, তুমি যা ইচ্ছা করতে পারো। তুমি তো শুধু এই পার্থিব জীবনেই যা করার করবে। আমরা আমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি যাতে তিনি আমাদের পাপসমূহ এবং তুমি আমাদেরকে যে জাদু করতে বাধ্য করেছ, তা ক্ষমা করেন। আল্লাহ শ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী।”[৩০]

লক্ষ্য করুন, তাদেরকে যে সকল হুমকি ও নির্যাতনের ভয় দেখানো হচ্ছিল সেগুলোর দ্বারা তারা বিন্দুমাত্রও প্রভাবিত হয় নি। এর কারণ হলো, আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ ঈমান আনার পর অন্তরে এই সত্য চিরস্থায়ী হয়ে যায় যে, আল্লাহই একমাত্র সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তাঁর শাস্তিই সবচাইতে কঠিনতম শাস্তি, আর একমাত্র তিনিই চিরস্থায়ী শাসন-কর্তৃত্বের অধিকারী। সুতরাং, এর পর আল্লাহর সাথে কোনো সৃষ্টির ক্ষমতার কি করে তুলনা করা যেতে পারে? এর পর সর্বময় মালিকানার অধিকারী ও চিরস্থায়ী কর্তৃত্বের অধিকারীর শাস্তির সাথে কি করে তুচ্ছ সৃষ্টির শাস্তির তুলনা করা যেতে পারে? মহাশক্তিশালী ও পরম ক্ষমতাশীলের কর্তৃত্বের সাথে কিভাবে দুর্বল ও

---

[২৯] সূরা ত্বাহা, আয়াত: ৭১

[৩০] সূরা ত্বাহা, আয়াত: ৭২-৭৩

গুরুত্বহীনের কর্তৃত্বের তুলনা করা যায়? ঈমান আনার পূর্বে এই একই জাদুকরেরা এই অত্যাচারী শাসকের হুকুম ও আদেশের সামনে প্রকম্পিত হয়ে থাকতো এবং ত্বরিৎ আদেশ পালনের চেষ্টা করতো, অথচ তাদের ঈমান তাদের মাঝে এমন অলৌকিক বৈশিষ্ট্যের সঞ্চার করলো যে, তারা সেই একই শাসকের সামনে দাঁড়িয়ে কোনো প্রকারের ভয়-ভীতি ও দ্বিধাবোধ ছাড়া তাকে স্পষ্ট ভাষায় প্রত্যাখ্যান করলো।

আর এরূপ অসংখ্য উদাহরণ আছে...

আল্লাহর সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। চিন্তা করুন সেই হাদীসটি যেটি আমর ইবনে আস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে ইমাম আহমদ (রহিমাহুল্লাহ) ও আরও কয়েকজন আলেম বর্ণনা করেছেন। সেই সময়টাতে মুসলমানেরা ছিল দুর্বল। মক্কার কাফেররা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে চারদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল এবং তাদের একজন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পোশাকের কলার ধরে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল,

"তুমি কি সেই লোক যে এমন-এমন বলে?" তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উত্তর দিয়েছিলেন, স্পষ্ট ও সোজাসুজি, কোনো ধরনের ভয় ও দ্বিধা ছাড়া, "হ্যাঁ, আমিই সে যে এমন কথা বলে।" এবং এর পূর্বে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন, "শোনো, হে কুরাইশরা! শপথ আল্লাহর যার হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, আমি তোমাদের কাছে এসেছি এবং সাথে এনেছি জবাই!"[৩১]

উপস্থিত সকলে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এ কথায় চমকে যায় এবং তারা সবাই চুপ করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল এবং পূর্বে যারা তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর ছিল তারা সবচাইতে নম্রভাবে কথা বলা শুরু করেছিল।

---

[৩১] মুসনাদে আহমদ (৭০৩৬)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর উপর অবতীর্ণ কোরআনের মাধ্যমে সাহাবাদের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) অব্যাহতভাবে কোরআনের উপর দৃঢ় থাকতে বলতেন। তিনি সাহাবাদের মনে করিয়ে দিতেন পূর্বের সেসব লোকদের কথা যারা কঠিনতম অবস্থাতেও দৃঢ় ও শক্ত থেকেছে,

"তোমাদের পূর্বে একজন ব্যক্তিকে ধরা হয়েছিল এবং তার জন্য মাটিতে গর্ত খুঁড়া হয়েছিল এবং গর্তে তাকে স্থাপন করা হয়েছিল। একটি করাত এনে তার মাথার উপর স্থাপন করা হয়েছিল এবং তাকে কেটে দ্বিখন্ডিত করা হয়েছিল এবং তার হাড় থেকে তার গোশত আঁচড়ে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু এসব কিছু তাকে তার দ্বীন থেকে এক চুলও দূরে নেয় নি। আল্লাহর শপথ, আল্লাহ এই দ্বীনকে সম্পূর্ণ করবেন যতক্ষণ না সানা থেকে হাদরা মাউত পর্যন্ত একজন ভ্রমণ করবে এবং সে কোনো লোকের ভয় করবে না আল্লাহ ছাড়া এবং তার ভেড়ার জন্য নেকড়ে ছাড়া। যাই হোক, তোমরা খুব তাড়াহুড়ো করছো।"[৩২]

বাস্তবতা হচ্ছে, মিথ্যা অতি ক্ষুদ্র, তুচ্ছ ও দুর্বল; কাফেররা যতই বুঝানোর চেষ্টা করুক না কেন যে, তারা ব্যাপক ক্ষমতাবান, অপরাজেয়, অভেদ্য। আল্লাহর শপথ, আল্লাহর কাছে কাফেরদের সব শক্তি ও হাতিয়ার মাছির মতো গুরুত্বও বহন করে না।

আল্লাহ রহম করুন ইবনুল কাইয়্যুম এর প্রতি, যিনি তাঁর "নূনিয়াহ" তে বলেছেন,

"তাদের অধিক সংখ্যাকে ভয় করো না, যেহেতু তারা গুরুত্বহীন এবং মাছির মতো। তোমরা কি একটা মাছি কে ভয় পাও?"

হ্যাঁ, সত্যিই তারা মাছির মতো, বরং মাছির চেয়েও দুর্বল,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٞ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُۥٓۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخۡلُقُواْ ذُبَابٗا وَلَوِ ٱجۡتَمَعُواْ لَهُۥۖ وَإِن يَسۡلُبۡهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيۡـٔٗا لَّا يَسۡتَنقِذُوهُ مِنۡهُۚ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلۡمَطۡلُوبُ ﴿٧٣﴾

---

[৩২] বুখারী (৩৬১২, ৬৯৪৩)

হে লোক সকল! একটি উপমা বর্ণনা করা হলো, অতএব তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করো; তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের উপাসনা করো, তারা তো কখনোও একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা এই উদ্দেশ্যে সকলে একত্রিত হয়। আর একটি মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোনো কিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধারও করতে পারবে না, প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয়, উভয়েই শক্তিহীন।[৩৩]

এবং এমনকি যদিও মিথ্যার অনুসারীরা সমৃদ্ধির কিছু সময় পার করে থাকে, কিন্তু সত্যের অনুসারীরা সমৃদ্ধির আরও বেশী বেশী সময় পার করে। কাফের অবিশ্বাসীদের প্রকৃত চরিত্র এবং তাদের ক্ষমতার অসারতা পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে কালের পরিক্রমায়। আর কাফের-মুশরিকদের এই অসারতা ও গুরুত্বহীনতাকে আল্লাহ প্রকাশ করে দেন তাদের মাধ্যমে যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ করে, তাদের কেউ কেউ তাদের কৃত চুক্তি ইতিমধ্যে পূর্ণ করেছে, আর কেউ কেউ তা পূর্ণ করার অপেক্ষায় আছে। বর্তমান অবস্থায় এমন বিশ্বাসীদের খুবই প্রয়োজন।

সবশেষে:

কোরআন শরীফ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় ঐ সব ক্ষণিকের জন্য অস্তিত্বশীল জাতিগুলোর কথা যারা জমিনে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করতো এবং ফাসাদ সৃষ্টি করতো। ঐ সব জাতিদের কথাও আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যারা উপরে উল্লিখিত জাতিগুলোর চেয়েও শক্তিশালী ছিল,

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿٦﴾

إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ﴿٧﴾

ٱلَّتِى لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى ٱلْبِلَـٰدِ ﴿٨﴾

وَثَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُوا۟ ٱلصَّخْرَ بِٱلْوَادِ ﴿٩﴾

وَفِرْعَوْنَ ذِى ٱلْأَوْتَادِ ﴿١٠﴾

---

[৩৩] সূরা হাজ্জ, আয়াত: ৭৩

ٱلَّذِينَ طَغَوْا۟ فِى ٱلْبِلَٰدِ ﴿١١﴾

فَأَكْثَرُوا۟ فِيهَا ٱلْفَسَادَ ﴿١٢﴾

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿١٣﴾

আপনি কি লক্ষ্য করেননি, আপনার পালনকর্তা আদ বংশের ইরাম গোত্রের সাথে কি আচরণ করেছিলেন, যাদের দৈহিক গঠন স্তম্ভ ও খুঁটির ন্যায় দীর্ঘ ছিল এবং যাদের সমান শক্তি ও বলবীর্যে সারা বিশ্বের শহরসমূহে কোনো লোক সৃজিত হয়নি? এবং সামুদ গোত্রের সাথে, যারা উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল? এবং বহু কীলকের অধিপতি ফেরাউনের সাথে, যারা দেশে সীমালজ্ঘন করেছিল? অতঃপর সেখানে বিস্তর অশান্তি সৃষ্টি করেছিল। অতঃপর আপনার পালনকর্তা তাদেরকে শাস্তির কশাঘাত করলেন।[৩৪]

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَٰبِ ٱلْفِيلِ ﴿١﴾

أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِى تَضْلِيلٍ ﴿٢﴾

وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴿٣﴾

تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ﴿٤﴾

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ﴿٥﴾

আপনি কি দেখেন নি আপনার পালনকর্তা হস্তীবাহিনীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি কি তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেন নি? তিনি তাদের উপর প্রেরণ করেছেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি, যারা তাদের উপর পাথরের কংকর নিক্ষেপ করছিল। অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণসদৃশ করে দেন।[৩৫]

---

[৩৪] সূরা ফাজর, আয়াত: ৬-১৩

[৩৫] সূরা ফীল, আয়াত: ১-৫

কোরআন শরীফ এই জাতিগুলোর শেষ পরিণতি আমাদের সামনে তুলে ধরে এবং পৃথিবীতে তাদেরকে ও তাদের বাসস্থানসমূহ আমরা মূলোৎপাটিত অবস্থায় দেখতে পাই, আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করেছিলেন এবং বিশ্বাসীদের বিজয় দান করেছিলেন। তাদের ক্ষমতার বড়াই, সংখ্যাধিক্যের অহংকার, তাদের একদম কোনো কাজেই আসে নাই। আল্লাহর বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করার কে ছিল? বিশ্বাসীদের সাহায্যকারী হচ্ছেন আল্লাহ, আর অবিশ্বাসীদের কোনো সাহায্যকারী নাই।

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٢﴾

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٨٣﴾

فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿٨٤﴾

فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ۖ سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ۖ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ﴿٨٥﴾

তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নি ও দেখে নি, তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছিল? তারা তাদের চেয়ে সংখ্যায় বেশী এবং শক্তি ও কীর্তিতে অধিক প্রবল ছিল, অতঃপর তাদের কর্ম তাদের কোনো উপকারে আসে নি। তাদের কাছে যখন তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ আগমন করেছিলেন, তখন তারা নিজেদের জ্ঞান-গরিমার দম্ভ প্রকাশ করেছিল। তারা যে বিষয় নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রুপ করেছিল, তাই তাদেরকে গ্রাস করে নিয়েছিল। তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করলো, তখন বললো, "আমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করলাম এবং যাদেরকে শরীক করতাম তাদেরকে পরিহার করলাম।" অতঃপর তাদের এ ঈমান তাদের কোনো উপকারে আসলো না

যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করলো। আল্লাহর এ নিয়মই পূর্ব থেকে তাঁর বান্দাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। সেক্ষেত্রে কাফেররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[৩৬]

সুতরাং, এগুলো হচ্ছে বাস্তবতা যাতে আছে চিন্তার উপাদান আমাদের নিজেদের জন্য এবং আমাদের বিরোধীদের জন্যও, যাতে তারা তাদের জীবনধারা নতুন করে চিন্তা করে,

وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ سَبَقُوٓا۟ ۚ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴿٥٩﴾

আর কাফেররা যেন মনে না করে যে, তারা ছাড়া পেয়ে যাবে, কখনোও এরা (আল্লাহকে) ব্যর্থ করতে পারবে না।[৩৭]

ইবনুল কাইয়্যুম (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর "নূনিয়াহ" তে বলেন,

আল্লাহ যা আদেশ করেছেন তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করো,
আর আল্লাহর পরিবর্তে গুরুত্বহীনদের ভয় পরিহার করো,
আর শুধুমাত্র আল্লাহকেই ভয় করো,
তবেই নিরাপত্তা ও প্রশান্তি পেতে পারো।

আর বিজয়ী করো আল্লাহর কিতাব ও ঐতিহ্যকে,
কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে যার (সাঃ) প্রতি,
এই ঐতিহ্য এসেছে তাঁরই (সাঃ) থেকে।

আঘাত করো প্রত্যেক প্রত্যাখ্যানকারীকে
ঐশী বাণীর তরবারি দ্বারা,
ঠিক যেমন মুজাহিদ আঘাত করে শত্রুকে
অঙ্গুলির উপর অস্ত্রের দ্বারা।

---

[৩৬] সূরা গাফির, আয়াত: ৮২-৮৫

[৩৭] সূরা আনফাল, আয়াত: ৫৯

আর চলতে থাকো সত্যের দ্বারা চালিত উদ্দীপনা নিয়ে,
আল্লাহর নির্ভেজাল ও সাহসী বান্দারা
ঠিক যে পথে চলেন নির্ভয়ে।

হেদায়েতের ছায়াতলে প্রতিষ্ঠিত থাকো,
সর্বদা ধৈর্য্যের উপরেই,
আর যদি এ পথে আঘাতগ্রস্ত হয়ে থাকো,
সে তো অতি করুণাময়ের সন্তুষ্টির স্বার্থেই।

আল্লাহর কিতাব ও হাদীসসমূহকে
নিজের অস্ত্র বানিয়ে নাও,
আর মজবুত করে নাও নিজের অন্তরকে।

যে লড়বে ও নিজেকে উপস্থাপন করবে
আপন রবের দরবারে,
আর ময়দানে সৎকাজের প্রতিযোগিতা করবে
দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে।

রাসূলের (সাঃ) আনীত বাণী প্রচার করো,
আর তা করো সম্পূর্ণ প্রকাশ্যে,
আর সাহায্যকারীর স্বল্পতা নিয়ে ভয় পরিহার করো।

কারণ আল্লাহ তাঁর দ্বীন ও কিতাবকে দিবেন
এমন বিজয় যা সর্বোৎকৃষ্ট,
আর নিজ বান্দাকে রক্ষা করার জন্য
শুধুমাত্র তিনিই হলেন যথেষ্ট।

আর শত্রুর ষড়যন্ত্রকে ভয় করো না,
কারণ মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে
তারা মোটেও চলতে পারে না।

রাসূলের (সাঃ) অনুসারীগণ!
তাদের তো সাহায্য করে ফেরেশতাগণ!
আর শয়তানের অনুসারীগণ!
তাদের তো প্রতারণা করে শয়তান!!

দুইটি দলের মাঝে কতই না ব্যবধান বিদ্যমান!
এর পরেও যারা দল দু’টি নিয়ে বিভ্রান্ত,
তুলনা করতে গেলেই পেয়ে যাবে প্রমাণ।

দৃঢ় থাকো এবং যুদ্ধ করো
হেদায়েতের পতাকাতলে অকপটে,
আর দৃঢ়তার সাথে ধৈর্য ধরো,
কারণ আল্লাহর সাহায্য অতি সন্নিকটে।

কারণ আল্লাহ তাঁর দ্বীন ও কিতাবকে বিজয় দিবেন,
বিশ্বাসীদেরকে জ্ঞান ও কর্তৃত্ব প্রদান করে
তাঁর রাসূলকে (সাঃ) বিজয়ী করবেন।

সত্য হলো এমনই এক স্তম্ভ,
যা কেউই ধ্বংস করতে পারে না।
এমনকি যদি সবাই মিলেও চেষ্টা করে,
এরপরেও তা ধ্বংস করা যায় না।

আর যদি দেখো তোমার শত্রুর সংখ্যার প্রসার,
তবে দৃঢ়তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো।
কারণ তাদের শক্তি ধোঁয়ার ন্যায় অসার।

তারা বাড়তে থাকে,
আর এরপর?
তারা মিলিয়ে যায়,
যেন চোখ তাদের দেখতেই ব্যর্থ হয়।

তাদের অধিক সংখ্যাকে ভয় করা ছেড়ে দাও,
যেহেতু তারা গুরুত্বহীন এবং মাছির মতো।
তোমরা কি একটা মাছি কে ভয় পাও?

আর গরুদের নেতা হয়ে
কখনো সন্তুষ্ট থেকো না,
ষাঁড়ের পালই হয় তাদের নেতা
যাদের নির্বোধ প্রকৃতি সবারই জানা।

আর তারা তোমার বিরুদ্ধে এগিয়ে আসবে যদি তারা চায়,
সুতরাং, সেক্ষেত্রে তোমার থেকে কাপুরুষতা বর্জিত
সুপুরুষের আচরণই শোভা পায়।

দৃঢ় থাকো এবং দ্বীনকে সমর্থন করো,
আর এসব ভুলে বসে থেকো না,
কারণ সুপুরুষদের সাহসিকতার যে বৈশিষ্ট্য,
তার সাথে এটা সামঞ্জস্যপূর্ণ না।

যদিও আল্লাহর মুজাহিদেরা থাকে যুদ্ধে নিয়োজিত
ন্যায়পরায়ণতা ও সৎকর্মের শক্তির দ্বারা,
পার্থিব শক্তির অহংকারের ফাঁদে জড়ানো ব্যতীত।

তারা তাদের সংখ্যাধিক্যের দ্বারা
কখনোই কোনো ভূখন্ড অর্জন করে নি,
বরং নিতান্তই নগণ্য সংখ্যার দ্বারা
সৃষ্টি করেছিল বিজয়ের বজ্রধ্বনি।

সুতরাং, যদি ইসলামের জিহাদের কাফেলা দেখতে পাও,
যার সাথে রয়েছে ন্যায়পরায়ণ দায়িত্বশীলগণ,
তবে তাতে যোগদান করো,
আর অস্থিরতা ও আলসেমী করো সম্পূর্ণ বর্জন।

হক্ব অবশ্যই সাহায্যপ্রাপ্ত হবে, তবে আরও হবে পরীক্ষিত,
কারণ এটাই পরম করুণাময়ের স্বরূপ।
সুতরাং, হয়ো না তুমি বিস্মিত।

এভাবেই আল্লাহর দল পৃথক হবে তাঁর শত্রুদের দল থেকে,
আর এ কারণেই সকল মানুষেরা থাকবে দুই দলে বিভক্ত।
এ কারণেই রাসূল (সাঃ) যুদ্ধ করেছিলেন কাফেরদের বিরুদ্ধে,
যখন থেকেই এই দলের সূচনা হয়েছিল ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত।

যাই হোক, সত্যের অনুসারীদের জন্য সবশেষে কল্যাণই লাভ হবে,
আর যদি তা এই দুনিয়ায় না হয়,
তবে অবশ্যই তারা পরবর্তীতে মহা পুরস্কার প্রদানকারীর থেকে তা পাবে।

আবু মুহাম্মদ আসিম আল-মাকদিসী

১২ শাবান, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হিজরতের ১৪১৪ বছর পর

শাইখ আবু মুহাম্মদ আসিম আল-মাকদিসীর (আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন) একটি মূল্যবান রিসালাহ

সেই মায়ের মতো হয়ো না যে তার সন্তানকে দ্বি-খণ্ডিত করতে সন্তুষ্ট!!!

অনুবাদ করেছেন: উস্তায আবু হাফসাহ (দাঃ বাঃ)

পরিবেশনায়: বালাকোট মিডিয়া

১৪৩৫ হিজরী মুতাবেক ২০১৩ ইংরেজি ১৭ই নভেম্বর

দ্বীনের বুঝ রাখে, শরীয়তের জ্ঞান রাখে, জিহাদ ও মুজাহিদীনদের প্রতি আগ্রহী, ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি ভালবাসা রাখে এমন কোন ব্যক্তি পাওয়া যাবে না, যে জিহাদ ও মুজাহিদদের দলে দলে বিভক্ত হওয়াকে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিবে। অথবা তাওহীদের দাওয়াত এবং তাওহীদের পথে কিতালের মাঝে বিবাদ করে, অথবা উপরোক্ত কোন একটিকে জিহাদ থেকে পৃথক করে, অথবা তাওহীদের সাহায্যকারী ও দাওয়াতের অনুসারীদেরকে অমুক-তমুকের অনুসারীতে বিভক্ত করে। বরং তারা হলো সৃষ্টির সবচেয়ে বড় জাহেল এবং দাওয়াত ও জিহাদের পথে মারাত্মক ক্ষতিকর। আল্লাহ তাআলা যে সম্পর্ক অটুট রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন তারা তা কর্তন করে। দ্বীনের সাহায্যকারীদেরকে তারা দলে-উপদলে বিভক্ত করতে প্রয়াস চালায়। তাদের কাছে তাওহীদের সেই বন্ধন যথেষ্ট হয় না যা পরিপূর্ণ ও যথার্থ!!

ইবনুল কায়্যিম (রহঃ) বলেন: "কোরআন-সুন্নাহ যার জন্য যথেষ্ট নয় আল্লাহ তাআলা তাকে যমানার নতুন নতুন ফিতনা থেকে রক্ষা করবেন না।

কোরআন-সুন্নাহ যার আরোগ্য হবে না, আল্লাহ তাআলা তার শরীর ও মনে কখনো শেফা দিবেন না।

কোরআন-সুন্নাহ যার জন্য যথেষ্ট হবে না, আল্লাহ (সুবঃ) তাকে স্বল্পতা ও বঞ্চনার মাঝে নিক্ষেপ করবেন।

নিশ্চয়ই আলোচনা হয় বড়দের সাথেই, ঐ নিচুদের সাথে নয় যারা হাইওয়ানের চেয়েও নিকৃষ্ট।"

এরা জিহাদের সাহায্যকারী ও সত্যিকার জিহাদ প্রেমিক হতে পারে না, বরং তারা হচ্ছে সেই মিথ্যার দাবিদার যালেম মহিলার মতো, যে সেই সন্তানের (যেটিকে সে নিজের বলে দাবি করেছিল) ব্যাপারে উদাসীন ছিল। অতঃপর সে ঐ সন্তানকে দ্বিখণ্ডিত করতে সম্মত হলো যার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। অথচ সে দাবি করলো যে, সেটি তার সন্তান। যদি সে তার দাবিতে সত্যবাদীই হতো তাহলে অবশ্যই সেই সন্তানের প্রতি সে সহানুভূতিশীল হতো। এবং সে সেই সন্তানের দেহকে দ্বিখণ্ডিত ও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করতে অস্বীকার করতো। এবং সে এ কথা মেনে নিতো যে, সন্তানটির সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই এবং সে তার মা নয়, এবং ঐ সন্তানের বিষয়টিতে তার কোন মাথাব্যথা নেই, অথবা সে মেনে নিতো যে, ঐ সন্তানের সাথে তার বা তার সাথে ঐ সন্তানের কোন সম্পর্ক নেই। যেমনটি তার দয়াশীল, স্নেহময়ী প্রকৃত মা করেছিল। কারণ, ঐ মহিলা চায় নি যে, তার সন্তানটি দ্বিখণ্ডিত হোক বা টুকরা টুকরা হোক।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, পাঠক সেই উপমাটি বুঝতে পেরেছেন যেই ঘটনার দিকে আমি ইঙ্গিত করছি, আর সেটি হলো, ঐ হাদীস যা ইমাম বুখারী (রহঃ) উনার হাদীস গ্রন্থ "কিতাবুল ফারায়েজে" এনেছেন "যখন একজন মহিলা সন্তান দাবি করে" নামক অধ্যায়ে। ঐ হাদীসে সুলাইমান আলাইহিস সালাম এবং সন্তান নিয়ে বিবাদে লিপ্ত দুই মহিলার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যাদের একজনের সন্তানকে বাঘে নিয়ে গিয়েছিল।

আমি এমন এক সময়ে এই রিসালাহটি লিখছি, যখন আমার কাছে এই সংবাদ পৌঁছেছে যে, কিছু লোক বারংবার সেই মিথ্যা দাবিদার মায়ের বেশভূষা ধারণ করছে, মিছে ক্রন্দনকারী দরদিনীর সাদৃশ্য অবলম্বন করছে।

আর যদি তারা উম্মতের এই দুরবস্থা এবং উম্মত ও তার দ্বীনের উপর শত্রুদের আগ্রাসনের কারণে নিজ আর্তনাদের ব্যাপারে সত্যবাদী হতো এবং উম্মতের জিহাদের অবস্থা ও তার উপর ঐক্যবদ্ধ হওয়াকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখতো, তাহলে তারা তাদের নিজেদের জন্য এই (যে অবস্থান তারা নিয়েছে) অবস্থানকে কখনোই মেনে নিতো না।

বরং তারা তাদের মতো হতো যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيَخۡشَوۡنَ رَبَّهُمۡ وَيَخَافُونَ سُوٓءَ ٱلۡحِسَابِ ﴿٢١﴾

আল্লাহ তাআলা যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে আদেশ করেছেন যারা তা অক্ষুন্ন রাখে ভয় করে তাদের রবকে এবং ভয় করে কঠোর হিসাবকে।[১]

সুতরাং, তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং সঠিক কথা বলে।

সিরিয়ার বিভিন্ন মুজাহিদীন জামাআতের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান স্পষ্ট এবং যার কাছে জিহাদের বিষয়টি গুরুত্ববহ তার প্রতি আমাদের নসিহা হচ্ছে:

সিরিয়ার মধ্যে আমাদের যে সকল মুজাহিদ ভাইরা তাওহীদের পতাকাকে বুলন্দ করছেন তাদের সকলকেই আমরা ভালবাসি ও সাহায্য করি। তাকেও আমরা ভালবাসি ও সাহায্য করি, যে দলে দলে বিভক্ত না করে তাওহীদের পতাকাকে প্রতিষ্ঠা ও সাহায্য করে।

তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে রয়েছে "জাবাহাতুন নুসরাহ" এর ভাইরা এবং "দাওলাতুল ইরাক ওয়াশ শামের" ভাইরা।

আমরা মুজাহিদীনদের দলে উপদলে বিভক্ত হওয়ার উপর সন্তুষ্ট নই, বরং এটা আমাদেরকে পীড়া দেয়।

তাই আমরা তাদেরকে আহবান করছি তাওহীদের একই পতাকাতলে একই আমীরের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য।

---

[১] সূরা রা'দ: ২১

আর এটাও যদি কঠিন হয় তাহলে অন্ততপক্ষে তারা একটিমাত্র মজলিসে শূরার ছায়াতলে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে, যা তদেরকে একত্রিত ও মতৈক্য করে দিবে। আমরা তাদের জন্য এই দুই অবস্থা ছাড়া তৃতীয় কোন অবস্থাতে সন্তুষ্ট নই। বরং আমরা আশা রাখি যে, সেই প্রতিটি দল তাদের সাথে মিলিত হবে যারা মূলনীতিতে এক। আর এটা আবশ্যক যে, সিরিয়াবাসী ভাইদেরকে সিরিয়ার জিহাদের ফ্রন্ট লাইনে বা নেতৃত্বে নিয়ে আসা।

প্রতিটি জ্ঞানবান ব্যক্তি জানে যে, আজকে আমরা সিরিয়ার যে কঠিন যুদ্ধে লিপ্ত আছি তার সমাধান দলে দলে বিভক্তির মাধ্যমে বা কোন একটি দলের পক্ষ থেকে সম্ভব নয়।

তাহলে এটা কিভাবে মেনে নেয়া যায় যে, মুজাহিদরা দলে দলে বিভক্ত থাকুক অথচ কাফেরা বিভিন্ন বর্ণের হওয়া সত্ত্বেও তারা মুজাহিদীনদের মোকাবেলায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করছে?

বিশেষকরে বাতেনিয়া (শিয়া), সলেবিয়া (ক্রুসেডার) ও আরবের বিভিন্ন মুরতাদ সংস্থাগুলো প্রত্যেকেই মুজাহিদদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এরা তাওহীদ ও জিহাদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে আগ্রাসন চালাচ্ছে।

মুজাহিদদের এক কাতারবন্দী হওয়া ছাড়া কাফেরদের এই ষড়যন্ত্র ও আগ্রাসন রুখা সম্ভব নয়।

আর এই ঐক্য মতবিরোধকে মিটিয়ে দিবে, আত্মিক শক্তিকে বৃদ্ধি করবে। এবং শাখাগত বা কম গুরুত্বপূর্ণ মাসলাহার (কল্যাণ) উপর জিহাদের সার্বিক মাসলাহাকে (কল্যাণ) প্রাধান্য দিবে। আর কম গুরুত্বপূর্ণ বা শাখাগত মাসলাহাগুলো বিজয় ও তামকিনের (কর্তৃত্বের) পর শীঘ্রই বাস্তবায়ন করা যাবে ইনশাআল্লাহ।

কেননা মুসলমানদের ঐক্যের মাধ্যমে কাফেররা ক্রুদ্ধ হয়, তাওহীদবাদীদের চক্ষু শীতল হয় এবং মুজাহিদদের কাতার শক্তিশালী ও দৃঢ় হয়।

মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِهِۦ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنۡيَٰنٞ مَّرۡصُوصٞ ٤

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ভালবাসেন যারা তাঁর পথে এক কাতারবন্দী হয়ে যুদ্ধ করে যেন তারা সীসাঢালা প্রাচীর।[২]

ভাইদের উদ্দেশ্যে কিছু নসীহা:

১। আমি রাসূল (সাঃ) এর শরয়ী রাজনীতির দিকে লক্ষ্য রাখার বিষয়টি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। বিশেষকরে মদীনায় মুসলমানদের ইসলামী রাষ্ট্রের প্রাথমিক পর্যায়ে, যখন মুসলমানরা শক্তিশালী ছিল না। তিনি (সাঃ) বিদ্যমান সকল সন্ধিচুক্তির প্রতি দৃষ্টি রাখতেন। এমনকি ইয়াহুদীদের সাথেও সন্ধি করেছেন। আর এই চুক্তি ইসলামী রাষ্ট্র শক্তিশালী হওয়া বা কাফেররা ভঙ্গ না করার আগ পর্যন্ত রক্ষা করেছেন। মুনাফিকদের কারো কারো কাছ থেকে কষ্ট পাওয়া সত্ত্বেও রাসূল (সাঃ) তাদের সাথে সংঘর্ষে জড়ান নি। বরং মুসলমানরা শক্তিশালী হওয়ার আগ পর্যন্ত তাদেরকে অব্যাহতি ও অবকাশ দিয়েছেন। আর অন্যদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন যাতে মানুষ এ কথা বলতে না পারে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ সাথীদের হত্যা করেন। মানুষদের নতুন ইসলামে প্রবেশের বিষয়টিও রাসূল (সাঃ) লক্ষ্য রাখতেন।

২। আমি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি......জাগতিক শক্তি ও উপাদান এর ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) এর লক্ষ্য রাখার বিষয়টি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওয়াক্কুলকারী, সবরকারী ও দৃঢ় বিশ্বাসীদের সর্দার হওয়া সত্ত্বেও শক্তিমত্তা ও দুর্বলতার প্রতি, প্রভাব ও শক্তির কমতির প্রতি লক্ষ্য রেখে কাজ করেছেন।

৩। জাহেলিয়াত থেকে লোকদের নতুন ইসলামে আসার কারণে তাদের অনেকের অন্তরে ইসলাম তখনো প্রোথিত হয়নি, এই বিষয়টিও তিনি লক্ষ্য রাখতেন। এসবগুলো বিষয়ই রাসূল (সাঃ) বিবেচনায় রেখে কাজ করেছেন।

---

[২] সূরা সফ: ৪

যদিও তিনি মুহাজির ও আনসারদের মাঝে গোত্রীয় চিন্তাধারাকে মিটিয়ে দিয়েছিলেন, তথাপি মানুষের মনে তাদের নেতাদের নের্তৃত্বের বিষয়টি যে গেঁথে ছিল সেটা তিনি খেয়াল রেখেছেন এবং বিভিন্ন ঘটনায় তাদের নেতাদের পরামর্শ গ্রহণ, ইত্যাদি ব্যাপারে তিনি উদাসীন ছিলেন না। আর সীরাতে এ ব্যাপারে প্রমাণাদি ভরপুর।

যে ব্যক্তি এ সকল স্তরগুলো খেয়াল রাখবে না, উপরোক্ত এসব বিবেচ্য বিষয়াদি মিটিয়ে দিতে তাড়াহুড়া করবে, এগুলো গুরুত্ব দিবে না, সে যেন কোন জিনিসকে তার যথার্থ সময়ের পূর্বে নিয়ে আসতে তাড়াহুড়া করলো।

সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার প্রতি দৃষ্টিপাত করেনি। ফলে অচিরেই সে লড়াইয়ের এই প্রাঙ্গনে দলে দলে বিচ্ছিন্ন হতে দেখবে। এবং একই সময়ে অসংখ্য দল বা গ্রুপের আবির্ভাব ঘটবে। আর এটা রাসূল (সাঃ) এর রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত নয়।

৪। তাই আমরা পছন্দ করি সিরিয়ার জিহাদের নের্তৃত্বে এবং সম্মুখভাগে তার নিজ দেশের তাওহীদবাদী ভাইরা চলে আসুক।

আর এতেই আমরা মাসলাহা (কল্যাণ) দেখতে পাচ্ছি। এজন্যে আমি আমার মুজাহিদ ভাইদের প্রতি জিহাদের বিভিন্ন মারেকাগুলো (যুদ্ধক্ষেত্র) উপমা হিসেবে পেশ করছি।

আর যারা এই জিহাদকে সাইকস-পিকট এর জাহেলী সীমান্তরেখার বিভাজনের সাথে জড়িত থাকার মিথ্যা দাবি তুলে উপরোক্ত বিষয়টি উপেক্ষা করে, আমরা তাদের কথার দিকে আকৃষ্ট হই না।

কস্মিনকালেও আমরা সিরিয়াকে এ ধরনের কোন কিছুর সাথে সম্পর্কিত করি না। বরং এটাকে আমরা সম্পর্কযুক্ত করি আল্লাহর কিতাবের সাথে। যেমনটি আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীদের প্রেরণের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রেখেছেন (অর্থাৎ, প্রত্যেক নবীকেই তার নিজ কওমের লোকদের থেকেই বানিয়েছেন)।

সুতরাং, নবীদের ক্ষেত্রেই যদি নিজ কওমের বিষয়টি লক্ষ্য রাখা হয় তাহলে তো অন্যদের ক্ষেত্রে এটি আরো অধিক প্রযোজ্য। অনুরূপভাবে আমরা এই বিষয়টিকে রাসূল (সাঃ) এর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার সাথে সম্পর্কযুক্ত করছি, যে ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) সচেতন ছিলেন। বিভিন্ন ঘটনায় বা ক্ষেত্রে তিনি এই বিষয়টি উপেক্ষা করেন নি।

৫। জিহাদের ইমারাহ, তামকিনের আগের ইমারাহ ও পরের ইমারাহ এর মধ্যে এবং "ইমারাতুল মুমিনীন" ও "তামকীনপ্রাপ্ত দাওলাত" এর মধ্যে রয়েছে সুস্পষ্ট পার্থক্য, যে ব্যাপারে আমাদের আরো সতর্ক হওয়া জরুরি। আর খেলাফত তো অনেক দূরের বিষয়।

সুতরাং, প্রতিটি জিনিসকে তার যথার্থ নাম ও প্রকৃত স্থানে রেখে তার সাথে আচরণ করা উচিত। বাস্তবিক শরয়ী নামে নামকরণ করে প্রতিটি বিষয়কে তার সঠিক স্থানে রাখা উচিত। তাহলে তার উপর এমন কিছু বর্তাবে না যা ওয়াজিব নয়, এমন কিছু প্রয়োগ হবে না যা প্রয়োগ হওয়ার নয়।

আমি আমার মুসলমান ভাইদেরকে সাধারণভাবে এবং দ্বীনের সাহায্যকারীদের বিশেষভাবে আহবান করছি সিরিয়াতে তাওহীদের ঝান্ডাকে সাহায্য করার জন্য। তাগুত শাসকবর্গ ও আগ্রাসী শত্রুদের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে সতর্কদৃষ্টি রাখার জন্য, যারা জিহাদের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত। যারা জিহাদ ও মুজাহিদদের বদনাম রটাচ্ছে। এসব কাফের শাসকদের মিথ্যা রটনাকে সত্যায়ন করা এবং তাদের বাতিলকে (ভ্রান্ত মতবাদসমূহ) সাহায্য করা থেকে সতর্ক হোন।

বিশেষভাবে আমি আমার তালেবে ইলম ভাইদেরকে এই বরকতময় পতাকাকে সাহায্য করার জন্য এবং একে রক্ষা করার জন্য আহবান করছি। আহবান করছি বাড়াবাড়ি অথবা কোন একদলের পক্ষপাত না করে বিভিন্ন ইসলামী দলগুলোকে ঐক্যের ক্ষেত্রে সাহায্য করার জন্য। কেননা পক্ষালম্বনকারী ব্যক্তি সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করতে পারে না।

তারা যেন জেনে রাখেন যে, তাদের মুজাহিদ ভাইয়েরা চায় যে, তারাও জিহাদে বের হোক এবং তারা তাদের সাহায্য কামনা করে। তারা আমার কাছে বারংবার এই আবেদন করেছে যে, আমি যেন এ বিষয়টি তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেই যে, মুজাহিদরা তালেবে ইলমদের সাহায্যের প্রতি তাকিয়ে আছে। তারা যেন তাদের দেহ, বল্লম, জিহ্বা, খঞ্জর ও কণ্ঠ দ্বারা সর্বাত্বকভাবে সাহায্য করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوٓا۟ أَنصَارَ ٱللَّهِ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্যকারী হও।[৩]

আমি এই রিসালাহ লিখেছি তাওহীদের ঝান্ডাকে সাহায্য করতে, জিহাদ ও মুজাহীদদের কল্যাণে, আমার নিকট তাদের নসীহা চাওয়ার প্রতি আগ্রহ দেখে।

তারা যদি আমার কাছে নাও চাইতো তথাপি এটা আমার উপর আবশ্যক ছিল এ ব্যাপারে কিছু লেখা। আর তারা যখন চাইলোই তখন তো বলার অপেক্ষা রাখে না।

তারা আমাকে জানিয়েছে যে, তারা আমাদের নসীহাকে গুরুত্ব দেয়। আমাদের দিক-নির্দেশনাকে উপেক্ষা করে না। তারা আমাদের লিখনীগুলোকে তাদের সৈনিকদের শিক্ষা দেয়।

---

[৩] সূরা সফ: ১৪

সুতরাং, আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদেরকে ও তাদেরকে কবুল করেন। মুজাহিদদের কাতারগুলোকে এক করে দেন। তাওহীদের ঝান্ডাকে শক্তিশালী করেন ও শিরকের পতাকাগুলোকে পদানত করে দেন। আমাদের দুশমনদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করেন। শত্রুদের কাঁধ ও গর্দানগুলোকে আমাদের বশে এনে দেন।

আমীন! ছুম্মা আমীন!!

লেখক

খাদেমুল মুজাহিদীন

আবু মুহাম্মদ আল মাকদিসী

১ মহরম, ১৪৩৫ হিজরী

সৌদি প্রশাসন এবং এর প্রতি ইবনে বাজ ও ইবনে উসাইমিনের দৃষ্টিভঙ্গি!

শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল মাকদিসি

প্রশ্নঃ

আসসালামু 'আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহ,

প্রশ্নকর্তাঃ আমার প্রথম চিঠির উত্তর প্রদানের জন্য আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন,

১) আমি আপনাকে একটি পরামর্শ প্রদান করতে চাই, ইনশা'আল্লাহ এটা আপনার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। আমার পরামর্শ হল, আপনি এবিষয়ে কোন আর্টিকেল কিংবা বই লিখুন যাতে, শারীয়াহ বাস্তবায়ন এবং যেসব সরকার শরীয়াহ বাস্তবায়ন করে না তাদের প্রতি অবস্থানের দিক থেকে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহহাবের রাহিমাহুল্লাহ সময়কালের প্রাথমিক সৌদি রাষ্ট্র ও বর্তমান সৌদি রাষ্ট্রের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়।

২) আমার আরও ইচ্ছা যে, আপনি আব্দুল 'আজিজ বিন স'উদের সেই পূর্বপুরুষদের ব্যাপারে আপনার অভিমত ব্যক্ত করবেন যারা ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহহাবের দাওয়াহ আন্দোলনের সাথে সহমত পোষণ করেছিলেন, আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন।

৩) এছাড়াও, আশা করি আপনি নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিবেনঃ
শারীয়াহ বাস্তবায়ন না করার কারনে শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহিম বিন আব্দুল লতীফ আলে-শায়খ রাহিমাহুল্লাহ সৌদি সরকারের বিরোধিতা করেছিলেন।
শায়খ ইবনে বাজ এবং শায়খ ইবনে উসাইমীন (আল্লাহ তাঁদের উপর রহম করুন) কি শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহিম বিন আব্দুল লতীফ আলে-শায়খ- এর রাহিমাহুল্লাহ এই অবস্থানের সাথে একমত পোষণ করেছিলেন?
আর শায়খ ইবনে বাজ ও শায়খ ইবনে উসাইমীন, আল্লাহ তাঁদের উপর রহম করুন, তারা কি সত্যিকার অর্থে যোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও নিজেদেরকে আলিমের আসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন?
ধৈর্য্যের সাথে আমার এই চিঠি পড়ার জন্য আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।
ওয়া 'আসসালামু 'আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহ।

উত্তরঃ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং শান্তি বর্ষিত হোক রসুলুল্লাহর ﷺ উপর।
সম্মানিত ভাই, আসসালামু 'আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ, আপনার চিঠি আমার হাতে এসে পৌঁছেছে।
চিঠিতে আপনি বলেছেন, "আমি আপনাকে একটি পরামর্শ প্রদান করতে চাই, ইন শা আল্লাহ এটা আপনার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে – আপনি এবিষয়ে কোন আর্টিকেল কিংবা বই লিখুন যাতে, শারীয়াহ বাস্তবায়ন এবং যেসব সরকার শরীয়াহ বাস্তবায়ন করে না তাদের প্রতি অবস্থানের দিক থেকে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহহাবের রাহিমাহুল্লাহ সময়কালের প্রাথমিক সৌদি রাষ্ট্র ও বর্তমান সৌদি রাষ্ট্রের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়।"
আপনার এরূপ নাসীহাহর জন্য আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। অন্যান্য কাজের সংখ্যাধিক্য ও তীব্রতা সত্ত্বেও আশা করছি আংশিকভাবে হলেও আপনি যা উল্লেখ করছেন আমি তা সম্পন্ন করতে পারবো।
ইতিমধ্যে এব্যাপারে আমরা আমাদের "আল-কাশিফ আলজালিয়াহ" ("প্রস্ফুটিত আলো") বইয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাবে উল্লেখ করেছি যে, আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত কাউকে আল সৌদ (সৌদ রাজপরিবার) কিংবা অন্য কোন গোষ্ঠীর কোন ব্যক্তিকে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত মনে করি না, যতক্ষণ না সে 'আমলের দ্বারা তার তাওহিদকে বাতিল করে দেয় অথবা কুফরী করে।
সম্মানিত ভাই, আল স'উদের প্রতি আমাদের শত্রুতা এবং তাদেরকে কাফের সাব্যস্তকরণে আমরা পূর্বেকার জাহিলী যুগের (প্রাক ইসলামি যুগ যেখানে গোত্র ও দুনিয়াবি স্বার্থপরতা ছাড়া মূল্যবোধ ও নীতি নৈতিকতার কোন বালাই ছিল ন্যায় কোন নীতির অনুসরণ করিনা।
জাহিলী যুগে মানুষের ন্যায় আমরা কোন জাহিলী হিসেবনিকেশের ভিত্তিতে, জাতীয়তাবাদ, গোত্রপ্রীতি কিংবা ইহলৌকিক সুখ সমৃদ্ধির ভিত্তিতে শত্রুতার মাপকাঠি নির্ধারণ করি না।
এব্যাপারে আমাদের অবস্থান রাফেজি এবং তাদের ন্যায় অন্যান্যদেরও মতোও না যারা – আল সৌদ পরিবারের প্রথমদিককার সদস্য, অর্থাৎ যারা শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব ও তার অনুসারীদের দাওয়াহ ও আন্দোলনে সাড়া প্রদান করেছিলেন এবং এবং আল স'উদের পরবর্তী সদস্য যারা মানব রচিত আইনকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, মানব রচিত আইনের পশ্চিমা রব্বদের প্রতি আনুগত্য স্থাপন করেছে ও মুসলিমদের বিপক্ষে কাফিরদের সাথে সহযোগিতার হাত মিলিয়েছিল – তাদের মাঝে কোন পার্থক্য করে না।
আমরা ওদের মত নই এবং আমরা যেন কখনোই ওদের মত না হই।
বরং, আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারের পর এই বিষয়ে অগ্রসর হই এবং স্পষ্টভাবে ঐসব কুফরি আমলের কথা উল্লেখ করি যা কাউকে কাফিরে পরিণত করে। যাতে করে বর্তমান সময়ে আল স'উদের যেসব সদস্যের ক্ষেত্রে এগুলো প্রযোজ্য না তারা এই (কুফরের) হুকুমের আওতা বহির্ভূত হতে পারে।
আমরা নিশ্চিত যে, আল সৌদ পরিবারের সদস্যদের মাঝে এমন মুসলিমকে খুজে পাওয়া যেতে পারে যিনি সত্য তাওহিদের অনুসারী।

তাই, যখনই আমরা আল স'উদের বর্তমান কিংবা পূর্ববর্তী কাউকে নিয়ে কথা বলব, কিংবা অন্য যেকোন গোষ্ঠীকে নিয়ে কথা বলবো আমাদের খারেজী কিংবা মূর্খদের মত ঢালাওভাবে কুফরের কথা বলবো না।
"আল-কাশিফ আল-জালিয়াহ"তে এবিষয়ে আমাদের আলোচনা একেবারে স্পষ্ট ছিল। এবং আমাদের আলোচনার লক্ষ্যবস্তু ছিল আল স'উদের ঐসমস্ত সদস্য, যারা স্থানীয়, রাষ্ট্রীয় কিংবা আন্তর্জাতিক যেকোন স্তরে গায়রুল্লাহ্‌র আইন জারি করেছে, কাফিরদের প্রতি আনুগত্যে আবদ্ধ হয়েছে কিংবা আহলে তাওহিদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য সহায়তা করেছে, বিশুদ্ধ তাওহিদ ও এর অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে অথবা কোন সুস্পষ্ট ও সংশয়াতীত কুফর আমল সম্পাদন করেছে।
এরা ছাড়া যারা ইসলামের ভিত্তি ও মূল বিদ্যমান আছে ধরে আছেন, তারা সৌদ পরিবারের কেউ হোক বা না হোক, তারা আমাদের ভাই হিসেবে গণ্য হবেন। এবং দায়িত্ব কর্তব্য ও অধিকারের দিক থেকে আমাদের ন্যায় সমমর্যাদার অধিকারী হবেন।
কেননা মুসলিম হিসেবে আমাদের নিয়্যাত, বুঝ, সিদ্ধান্ত এবং ফতোয়া সবকিছুর মূলভিত্তি হচ্ছে শরী'আহ, জাহেলিয়াত নয়। নিঃসন্দেহে, ঈমানের সবচেয়ে মজবুত ভিত্তিগুলো হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ্‌র রাহে ভালবাসা ও ঘৃণা করা এবং একমাত্র আল্লাহ্‌র রাহে বন্ধুত্ব ও শত্রুতা স্থাপন করা।
আমরা প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তিকে ভালবাসি এবং তার সাথে নিজেদের সম্পর্কিত করি যদিওবা বংশ কিংবা জন্মভূমির দিকে দিয়ে তারা আমাদের চেয়ে বহুদূরে অবস্থান করে। এবং কাফের ব্যক্তি বংশ, দেশ কিংবা এলাকার দিক থেকে আমাদের যতই নিকটবর্তী হোক না কেন আমরা তাদের ঘৃণা করি, এবং তাদের সাথে চিরশত্রুতা ও সম্পর্কছেদের ঘোষণা দিই।
আপনি আরো বলেছেন – আশা করি আপনি নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিবেনঃ
শারীয়াহ বাস্তবায়ন না করার কারনে শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহিম বিন আব্দুল লতীফ আলে-শায়খ রাহিমাহুল্লাহ সৌদি সরকারের বিরোধিতা করেছিলেন।
শায়খ ইবনে বাজ এবং শায়খ ইবনে উসাইমীন (আল্লাহ তাঁদের উপর রহম করুন) কি শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহিম বিন আব্দুল লতীফ আলে-শায়খ- এর রাহিমাহুল্লাহ এই অবস্থানের সাথে একমত পোষণ করেছিলেন?
আর শায়খ ইবনে বাজ ও শায়খ ইবনে উসাইমীন, আল্লাহ তাঁদের উপর রহম করুন, তারা কি সত্যিকার অর্থে যোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও নিজেদেরকে আলিমের আসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন?
আমার **উত্তর** হল – নিশ্চয়ই তারা তাত্ত্বিকভাবে বা নীতিগতভাবে একমত পোষণ করেন। শায়খ ইবন বায কিংবা শায়খ ইবন উসাইমীন, তারা কেউই আল্লাহ্‌র আইন ব্যাতীত অন্য কিছু দিয়ে শাসন করাকে সমর্থন করেন না। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে তারা আ'মভাবে সরকার কর্তৃক শরী'আহ বাস্তবায়ন না করার বিরোধিতা করেন।
কিন্তু যখন সৌদি সরকারের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে শরী'আহ বাস্তবায়ন না করার কারনে তাদের বিরোধীতার ব্যাপারে শায়খদের অবস্থান আমার কাছে স্পষ্ট না।
বরং আমরা তাদেরকে দেখি তাদের সর্বশক্তি এই সরকারের সমর্থনে নিয়োজিত করতে। আমি নিজ খেয়ালখুশিমতো তাদের উপর এই কথাগুলো আরোপ করছি না।
কারন একদিন তাদের সাথে আমাকেও আমাদের রবের সামনে দাঁড়াতে হবে (এবং আমি সেদিন এজন্য কৈফিয়ত দিতে বাধ্য থাকব) – বরং তাদের নিজেদের দেওয়া ফতোয়া (দ্বীনসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের মাসআলা) ও বক্তব্য থেকেই এটি প্রকাশিত হয়।
উদাহরণস্বরূপ, শায়খ ইবনে বাযের এই বক্তব্যের দিকে লক্ষ্য করুন-

> “এবং এই সৌদি সরকার একটি বরকতময় সরকার এবং এর শাসকরা হক্ক ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায়, মাজলুমের সহায়তায়, যালিমের প্রতিরোধে, শান্তি ও নিরাপত্তার প্রসার ও প্রতিষ্ঠায়, এবং জনগণের সম্মান ও সম্পদ রক্ষায় সর্বদা আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছে।”

আমি মনে করি সৌদি সরকারের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে প্রত্যেক সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তি সম্যক অবগত আছেন। এবং আমরা আমাদের বই “আল-কাশিফ” বইতে ওইসব আলোচনা উপস্থাপন করেছি যা তার এই উপরোক্ত বক্তব্যকে ভুল প্রমাণ করে।
যারা সৌদি সরকারের প্রকৃত বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত নন কিংবা দেখেও না দেখার ভান করে আছেন অথবা একে উপেক্ষা করছেন আমি তাদের সকলকে এ বইটি পড়ার পরামর্শ দেব।
আপনারা শায়খ বিন বাযের ঐ লেখাটিও দেখতে পারেন যা তিনি স্থায়ী কমিটির (আল লাজনাহ) নেতৃত্বস্থানীয় ‘উলামাদের সাথে সই করেছেন যেটিতে মুজাহিদ ভাইদের মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়েছিল (আল্লাহ তাদের উপর রহম করুন)।
তাদের উপর অভিযোগ আনা হয়েছিল যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ﷺ বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। অথচ বাস্তবতা হল কাফির হত্যার কারনে এই মুসলিম ভাইদের মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়েছিল। যদিও স্বাক্ষরকারীরা তা স্বীকার করে না।

> এই ভাইয়েরা আল্লাহর ও তাঁর রসূলের ﷺ বিরুদ্ধে না বরং অ্যামেরিকা ও তার দোসরদের বিরুদ্ধে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ﷺ পক্ষালম্বনে যুদ্ধ করছিলেন।
> উক্ত বিবৃতিতে আপনি সৌদি সরকারের প্রতি তাদের সমর্থন এবং জিহাদ ও মুজাহিদিনদের বিপক্ষে তাদের সুস্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ দেখতে পাবেন।
> তাদের এরূপ অবস্থানের আরেকটি উদাহরন হল শায়খ বিন বাযসহ স্থায়ী কমিটির অন্যান্যদের লিখিত একটি বিবৃতি যেখানে জুহাইমানের (জুহাইমান আল-উতায়বি) লেখাগুলোর ব্যাপারে সাধারন মুসলিমদের সতর্ক করা হয়েছে।
> অথচ এই সবগুলো লেখা জুহাইমানের অনুসারী কিছু তালিবুল ‘ইলম শায়খ বিন বাযকে পড়ে শুনিয়েছিলেন। তার অনুমোদন ও সম্মতি লাভের জন্য। এবং শায়খ বিন বাযের অনুমোদন ও সম্মতির পরই কেবল এই লেখাগুলো প্রকাশ করা হয়।
> বুদ্ধি ও বিবেচনা বোধসম্পন্ন যেকোন মানুষ এই লেখাগুলো পর্যালোচনার মাধ্যমে সেগুলোতে যা কিছু বলা হয়েছে তা সঠিক না ভুল তা যাচাই করে দেখতে পারেন। উল্লেখ্য, এর অর্থ এই না যে আমি তাদের (জুহাইমান ও তার অনুসারী, আল্লাহ তাদের উপর রহম করুন) সব লেখাকে সমর্থন করি।
> জুহাইমান ও তার অনুসারীরা নিজেরা সৌদি সরকার এবং এর সমর্থকদের মুরতাদ গণ্য করতেন না, এবং যারা এমন অবস্থান রাখতেন তাদের সাথে জুহাইমানদের মতপার্থক্য ছিল। এ বিষয়টিতে আমি জুহাইমান ও তার অনুসারীদের সাথে দ্বিমত পোষণ করি এবং তাদের অবস্থানকে সঠিক ও সমর্থনযোগ্য বলে মনে করি না। কিন্তু স্থায়ী কমিটি ও শায়খ বিন বায তো তাদের বিবৃতিতে এই বিষয়টির ব্যাপারে সাধারন মানুষকে সতর্ক করছেন না।

স্থায়ী কমিটি ও শায়খ বিন বায জুহাইমান ও তার অনুসারীদের কোন বিষয়টির ব্যাপারে সতর্ক করছেন? তাদের নেতা ও শাসকের (সৌদি বাদশাহ) প্রতি তাদের বাইয়্যাতকে (আনুগত্যের অঙ্গীকার) জুহাইমান বাতিল ঘোষণা করেছিলেন।
জুহাইমান ও তার সমর্থকদের এই অবস্থানকে স্থায়ী কমিটি ভুল ব্যাখ্যাপ্রসূত ও অত্যন্ত গর্হিত কাজ হিসেবে বিবেচনা করে। যারা জুহাইমান ও তার অনুসারীদের লেখা এবং সেসময়কার ঘটনাপ্রবাহের সময় উপস্থিত ছিলেন তারা সকলেই এ বিষয়ে ভালোভাবে অবগত আছেন।
স্থায়ী কমিটি তাদের বিবৃতিতে বলেছিলঃ
“কমিটির বিবেচনায় এটি একটি অন্যায়ে লিপ্ত সংগঠন। এর লেখাগুলো উদ্দেশ্য প্রণোদিত, বানোয়াট ও উস্কানিমূলক যা বিভ্রান্তি ও বিপথগামীতার বীজ বপন করে এবং এর ফলে সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তা, এবং দেশ ও সম্পদ ক্ষতি ও হুমকির মুখে।
মিথ্যা অভিযোগের মাধ্যমে এটি সরলপ্রাণ জনগণকে বোকা বানাচ্ছে যাতে, তারা এর অন্তর্নিহিত হীন উদ্দেশ্য বুঝতে ব্যর্থ হয়।

.

এবং কমিটি এব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছে ও এর প্রতি তীব্র আপত্তি জানাচ্ছে, এবং মুসলিমদেরকে এধরণের উদ্দেশ্য প্রণোদিত, বানোয়াট ও উস্কানিমূলক লেখা থেকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিচ্ছে।

.

পাশাপাশি, কমিটি মহান রাজা খালিদ বিন ‘আব্দুল ‘আজিজ (আল্লাহ তাকে নিরাপত্তা দান করুন, তাকে সত্যের উপর বহাল রাখুন এবং তাকে সকল প্রকার কল্যাণ প্রদানের মাধ্যমে সাহায্য করুন) ও তার সরকার কর্তৃক তাদের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড বন্ধ করার দরুণ আল্লাহ সুবহানুওয়া তা’আলার প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছে যে তিনি একে সম্ভবপর করেছেন এবং সেই সাথে আল্লাহর নিকট দু’আ করছে,
তিনি যেন আমাদের ও পৃথিবীর সকল দেশের মুসলিমদের সব ধরণের বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন, তাদের হক্কের ঝাণ্ডাতলে সমবেত করেন, তাদের শাসকদের সহায়তা করেন, ইসলামের মাধ্যমে তাদের শক্তিশালী ও সুরক্ষিত করেন এবং তাদের মাধ্যমে ইসলামকে সুরক্ষিত ও শক্তিশালী করেন।

.

আমরা আল্লাহর নিকট আরো দু’আ করছি, তিনি যেন তাদেরকে উত্তম সাহায্যকারী কর্মকর্তা কর্মচারী প্রদানের মাধ্যমে তাদের সহায়তা করেন, যারা ভাল কাজে পৃষ্ঠপোষকতা করবে, এর দিকে তাদের আহবান করবে ও স্মরণ করিয়ে দেবে।

.

আমরা চাইছি, তিনি যেন হক্ককে সমুন্নত করেন এবং মিথ্যা, অন্যায়, ঘৃণা, কপটতা ও বিদ্বেষকে দূরীভূত করেন, এমনকি যদিও তা অন্যায়কারীদের অপছন্দনীয়।
কমিটি সেনাবাহিনী, বুদ্ধি ও দূরদর্শিতাকে কাজে লাগিয়ে এই রাজবিদ্রোহের মূলোৎপাটনে,

> সরকারের মহান প্রচেষ্টার তারিফ করছে এবং এতে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে, যারা প্রত্যক্ষভাবে কিংবা শ্রম ও লেখনীর মাধ্যমে সহায়তা করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে।
> .
> এ তালিকায় সবচেয়ে উপরে আছেন তাদের মহান রাজা ও তার যুবরাজ, তার অনুগত প্রজা এবং সেনাবাহিনীর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।
> .
> আমরা আল্লাহ্‌র নিকট তাদের মৃতদের জন্য মাগফিরাত, রহমত ও মহা পুরস্কার কামনা করছি এবং তাদের জীবিতদেরকে আল্লাহ্‌ মহা পুরস্কার প্রদান করুন, পথপ্রদর্শন করুন এবং হক্বের উপর অবিচল রাখুন।"

আমরা আল্লাহ সুবহানুওয়া তা'আলার প্রতি সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হয়েছি কেননা, তিনিই সর্বোত্তম সাহায্যকারী। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ ও তার পরিবার এবং সাহাবাদের রদ্বিয়াল্লাহু আনহু উপর।"

কাজেই, সৌদি প্রশাসনের বিপক্ষে দণ্ডায়মান শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহিম বিন 'আব্দুল লতিফ আল আল-শায়খের অবস্থান এবং সুস্পষ্ট বিরোধিতা, যা তার সমগ্র ফতোয়া ব্যাপী প্রকাশিত হয়েছে, এর সাথে সৌদি সরকারের প্রতি শায়খ বিন বাযদের সাহায্য সমর্থন, আনুগত্য প্রদর্শন এবং প্রশংসা জ্ঞাপনের এই অতিরঞ্জনের সাথে, আমি কোন মিল খুঁজে পাই না।

এরকম আরো অসংখ্য উদাহরণ "আল-কাশিফ"এ আমরা উল্লেখ করেছি। আর মনে রাখবেন যে, শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহিমের সময় 'আব্দুল 'আজিজের দ্বারা কৃত কুফরের তুলনায় বর্তমানে তার বংশধরদের দ্বারা সংঘটিত দ্বীনবিরোধী কর্মকাণ্ড আরো ব্যাপক ও অতুলনীয় আকার ধারণ করেছে।

শায়খ ইবনে উসাইমীনের নিম্নোক্ত বক্তব্য ইনসাফ করার জন্য উল্লেখ করা হল। যেহেতু নীতিবান লোকেরা তাদের মতামতের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে উভয়দিকের যুক্তিই তুলে ধরে।

.

তিনি বলেনঃ

> "এবং একথা প্রমাণিত যে, সৌদি রাজ্য শরী'আহ্‌ প্রতিষ্ঠায় মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। আমরা বলছি না যে, এখানে শতভাগ শারীয়াহ্‌ দ্বারা শাসন করা হয়। এতে অবশ্যই অসংখ্য ত্রুটিবিচ্যুতি এবং কিছু অন্যায় রয়েছে, যদিও সুবিচারের তুলনায় অন্যায়ের পরিমাণ অতি নগণ্য।
> এবং এটা মোটেও শোভনীয় নয় যে, আমরা কেবলমাত্র দোষত্রুটিগুলো দেখবো এবং ভালো দিকগুলো একেবারে এড়িয়ে যাব।
> প্রত্যেকের উচিত ন্যায়পরায়ণ হওয়া,
> যেমনটা আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেনঃ *"হে মুমিনগণ! আল্লাহকে সাক্ষী রেখে তোমরা ন্যায়ের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাক। এমনকি যদি তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা, কিংবা তোমাদের আত্মীয়-স্বজনের ক্ষতির কারণ হয় তবুও।" (৪;১৩৫)*

> এবং তিনি বলেনঃ *"হে মুমিনগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্য দানে তোমরা অবিচল থাকবে। অন্যের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদের অন্যায়ের প্রতি প্ররোচিত না করে। ন্যায় বিচার কর, এটা তাক্বওয়ার অধিক নিকটবর্তী এবং আল্লাহকে ভয় কর।" (৫:৮)"*

শায়খ ইবনে উসাইমীন এখানে সরকারের সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন। এটি একটি দুর্লভ ঘটনা যা আমরা অস্বীকার বা এড়িয়ে যেতে পারি না। তারপরও, সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার ক্ষেত্রে শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহিমের অবস্থানের সাথে এর বিরাট ব্যবধান রয়ে যায়।

.

কেননা শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহিম মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত নানা আংগিকে মানব রচিত আইন প্রতিষ্ঠায় সরকারের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন।

.

অন্যদিকে শায়খ ইবনে উসাইমীনের বক্তব্যে বিষয়টিকে কিছু সাধারন ত্রুটিবিচ্যুতি, ভুল ও যুলুম হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে যেন এবং একে এমনভাবে চিত্রায়িত করা হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে তার পরে আগত মুসলিম শাসকদের ব্যাপারে যে ফিতনার কথা বলে গেছেন আজকের অবস্থা হচ্ছে তারই প্রতিচ্ছবি।

.

এবং রসুলুল্লাহ ﷺ এমতাবস্থায় আনসারদেরকে ধৈর্য্যাবলম্বনের আদেশ দিয়েছিলেন (আর তাই আমাদেরও ধৈর্য্যাবলম্বন করা উচিৎ)।

আর একারণেই শায়খ তার বিভিন্ন পুস্তক ও ফতোয়াতে বর্তমান যুগের শাসকদের দ্বারা সংঘটিত যেকোন প্রকারের ফিতনায় জনগণকে ধৈর্য্য অবলম্বন করতে ও তাদের বিরুদ্ধাচরণ হতে বিরত থাকার আদেশ করেছেন।

.

এছাড়াও তিনি তাদেরকে মুরতাদ ঘোষণা করা কিংবা তাদের ক্ষমতা থেকে অপসারণের লক্ষ্যে সাধিত সর্বপ্রকার প্রয়াসকে বাতিল সাব্যস্ত করেছেন এবং একে বিপদজনক আখ্যা দিয়েছেন।

চিঠির শেষ অংশে আপনি জানতে চেয়েছেন, "আর শায়খ ইবনে বাজ ও শায়খ ইবনে উসাইমীন, আল্লাহ তাঁদের উপর রহম করুন, তারা কি সত্যিকার অর্থে যোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও নিজেদেরকে আলিমের আসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন?"

আমি এধরণের কোন অভিযোগ আরোপ করব না এবং কেউ যদি তাদের 'ইলমের পরিধি (শাসকশ্রেণী সম্পর্কে তাদের মতামত এবং রাষ্ট্র ও নিজ দেশের শাসকশ্রেণীর প্রতি তাদের আনুগত্য ও বিরোধীদের প্রতি তাদের অবস্থান ব্যতীত) পর্যবেক্ষণ করেন, তবে তারা তাদেরকে শরী'আহর 'আলিম এবং সঠিক সালাফী ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত দেখতে পাবেন।

বহু মানুষ তাদের 'ইলম থেকে উপকৃত হয়েছেন (উপরে উল্লিখিত বিষয় বাদে) এবং আজকের বহু 'আলিম তাদের কাছ থেকে 'ইলম অর্জন করছেন করেছেন, আমি নিজেও তাদের মাঝে একজন।

তবে তার অর্থ এই নয় যে, আমরা উপরের উল্লেখিত বিষয়ে তাদের ভ্রান্ত ধ্যান ধারণার সাথে একমত পোষণ করব কিংবা তাদের এই ভ্রান্তিগুলোকে উপেক্ষা করা উচিত হবে। বরং, আমরা প্রত্যেক ভ্রান্ত অবস্থানকে তার তীব্রতা ও গুরুত্ব অনুসারে অস্বীকার ও বাতিল ঘোষণা করি।

যারা একে অত্যন্ত গর্হিত কাজ কিংবা বিপদজনক মনে করে এবং এই অজুহাতে আমাদের উপর ব্যক্তি আক্রমণ করে ও লোকদেরকে আমাদের লেখনী থেকে ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা করে, কিংবা এর মাধ্যমে তাগুতকে ও তাগুতের অনুসারীদের সন্তুষ্ট করতে চায় – তাদের কথা ও প্রচেষ্টাতে আমরা বিচলিত নই।

কেননা আমরা আমাদের রব, আল্লাহ্ সুবহানুওয়া তা'আলার আদল ও ইনসাফের উপর সন্তুষ্ট, নিশ্চয়ই তিনি আমাদের অন্তরে লুকায়িত গোপন বিষয়সমূহ সম্পর্কে সম্যক অবগত।
শীঘ্রই এক নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হবার পর আমরা সকলে আমাদের রবের সামনে সমবেত হব, আর সেদিন আমাদের মধ্যকার সমস্ত দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত অবসান ঘটবে।

.

দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ ও তার পরিবার এবং সাহাবাদের রদ্বিয়াল্লাহু আনহু উপর।

আপনার ভাই,

আবু মুহাম্মাদ আল-মাক্বদিসী

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

‘আর সুস্পষ্টভাবে পৌঁছিয়ে দেয়াই আমাদের দায়িত্ব’।(সূরা ইয়াসীনঃ১৭)

বর্তমান মুসলিম দেশসমূহের শাসকবর্গ ও তাদের শাসন

(সংশয় নিরসন)

মূল

শায়খ আবু মুহাম্মদ আসেম আল-মাকদিসী

অনুবাদঃ ইবনে উসামা

সহযোগিতায়ঃ আসেম, নাসরুল্লাহ ও মুসআব

সম্পাদকঃ আবু বকর সিদ্দিক

সরলপথ পাবলিকেশন্স

পদ্মা টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা

অনুবাদকের ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্যে। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবাগণের উপর। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মানবতার মুক্তির সনদ। আর ইসলামের মূল ভিত্তি হল একটি কালেমার উপর لا إله إلا الله আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। এ কালিমাকে যে অন্তরে বিশ্বাস করবে, মুখে স্বীকার করবে, কাজে প্রকাশ করবে, সেই মুসলিম। সে যেমন স্বীকার করে ইবাদাত শুধু এক আল্লাহর জন্যে, তেমনি ভাবে তাকে এটাও স্বীকার করতে হবে , বিধান দানের ক্ষমতা শুধু তারই। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সৃষ্টিকর্তা মানা যেমন কুফর তেমনি কাউকে বিধানদাতা মানাও এর ব্যতিক্রম নয় ।

কিন্তু আক্ষেপ! শত আক্ষেপ!! এই সর্বগ্রাসী শিরক আজ পুরো মুসলিম বিশ্বকে গ্রাস করে নিয়েছে। মুসলিমরা আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা স্বীকার করে, কিন্তু বিধানদাতা মানে অন্যকে। চৌদ্দশ বছরের মধ্যে এ এক শতাব্দি যাতে পুরো বিশ্বে একটি রাষ্ট্রেও নেই ইসলামী হুকুমাত। অধিকাংশ মুসলিম জনগণই এ জঘন্য শিরকে লিপ্ত। এ করুন পরিস্থিতিতে কিছু আলেম এ ফিৎনার মুকাবেলায় দাড়িয়ে গেলেন এবং মানুষকে বুঝাতে লাগলেন, আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজের পক্ষ থেকে আইন প্রণয়ন করা কুফরী। কেউ যদি তা করে তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে, সুতরাং কাউকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা যাবে না। সকলের জন্যে অপরিহার্য এই জঘণ্য শিরক থেকে বেঁচে থাকা।

কিন্তু হক্ব যেখানে থাকবে বাতিল তো থাকবেই। এই আলেমদের বিরুদ্ধে দাড়িয়ে গেল একদল দরবারী আলেম। আর এই শাসকদের পক্ষ নিয়ে বলতে লাগল এদের কুফর বড় কুফর নয় বরং ছোট কুফর, এরা অজ্ঞ, এরা কালিমা পাঠ করে ইত্যাদি। এ ধরনের আরো নানা সংশয় সৃষ্টি করতে লাগল, আজ পর্যন্ত যার ধারাবাহিকতা অব্যাহত।

যে সমস্ত আলেমে দ্বীন এই শিরকের ব্যাপারে সোচ্চার তাদের অন্যতম একজন হলেন আবু মুহাম্মাদ আসেম আল মাকদিসী (ফাক্কাল্লাহু আসরাহু)। যিনি এই শিরক বর্জনের দাওয়াত সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং

দরবারী আলেম কর্তৃক রটানো সংশয়গুলো কোরআন ও হাদীস দ্বারা নিরসন করেছেন। আজ পর্যন্ত যিনি জর্ডান তাগুত সরকারের জিন্দান খানায় বন্দী। এই বিজ্ঞ আলেম কর্তৃক রচিত একটি কিতাব আমার হাতে আসে, বইটির নাম:

كشف شبهات المجادلين عن عساكر الشرك و أنصار القوانين

(বিধানদাতাদের সাহায্যকারী ও মুশরিক সৈনিকদের পক্ষে বিতর্ককারী কর্তৃক সৃষ্ট সংশয় সমূহ নিরসন)। ভূমিকা পড়ে জানতে পারলাম বইটি কারাগারে বসে লেখা। পড়ে দেখলাম এর মধ্যে তাগুত্ শাসক ও তাদের কুফরী শাসন সম্পর্কে প্রচলিত সকল সংশয়ের নিরসন কোরআন ও হাদীস দ্বারা সুন্দর ভাবে তুলে ধরা হয়েছে ।

আর বাংলা ভাষায় এধরনের একটি বইয়ের খুবই প্রয়োজনীয়তা ছিল। কেননা আমার জানামতে এবিষয়ে এত সুন্দর বই এর পূর্বে বাংলা ভাষায় লিখা হয়নি, সাথে সাথে ভাই আবু মুসাআব সহ আরো অনেকে বইটি অনুবাদের জন্যে পিড়াপিড়ি করছিল। ফলে আল্লাহ তাআলার নামে অনুবাদ শুরু করলাম। কাজটি যদিও সহজ ছিল না, কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আমার একান্ত মুখলিছ সাথীদের সহযোগীতায় অল্প কিছুদিনের মধ্যে অনুবাদের কাজ শেষ হল। যদি সাথীদের সহযোগীতা না হত তাহলে একার পক্ষে কাজটি শেষ করা কষ্টসাধ্য হত। তাই তাদেরকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে মোবারকবাদ জানাই। আল্লাহ তাদের উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন।

-ইবনে উসামা

সম্পাদকের ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি। তাঁরই সাহায্য কামনা করি। তাঁরই কাছে ক্ষমা চাই। আমাদের নফ্‌সের সকল অনিষ্টতা এবং আমাদের সকল কর্মের ভুল ভ্রান্তি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁরই বান্দা এবং রাসূল।

আমরা মুসলিম। আমাদের দ্বীন ইসলাম। সামাজিক জীব হিসেবে সমাজের হাজারো মানুষের সাথে আমাদের বসবাস। আমাদের সমাজের মানুষেরা প্রতিদিনই হাজারো শিরক কুফরে লিপ্ত হচ্ছে নিজের অজান্তেই। এ যেন রাসূলের (সাঃ) ঐ কথার বাস্তবায়ন যে, এমন এক সময় আসবে যখন মানুষ সকালে মুসলিম হবে; তো বিকালে হবে কাফের। আবার বিকালে মুসলিম হবে; তো সকালে হবে কাফের। মুসলিম হিসাবে এই সমাজের অজ্ঞ মানুষদের ইসলামের দাওয়া করা আমাদের অন্যতম ফরয দায়িত্ব। এই দাওয়ার কাজ করতে গিয়ে দেখলাম অনেকেই আজ এই দাওয়ার ময়দানে কাজ করছে। যারা আমাদের সমাজে কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক দাওয়ার কাজ করছেন তাদের অনেককেই দেখা যাচ্ছে শাসকদের বিধান রচনার কুফর; বড় কুফর না ছোট কুফর তা নিয়ে সংশয়ে আছেন।

অনেকেই তাগুত সরকারের পক্ষে সহীহ হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা দ্বারা মুসলিম প্রমাণ করার অপচেষ্টায় লিপ্ত। ভয়ের বিষয় হচ্ছে এই ভ্রান্তি কিন্তু আক্বীদায়। এ এমন এক ভ্রান্তি যার কারণে মানুষের ঈমান পর্যন্ত চলে যাচ্ছে। 'তাওহীদ আল হাকেমিয়ার' মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অনেকেই বিদআত বলে পাশ কাটাতে চান। অনেকেই বলতে শুনেছি 'তাওহীদ আল হাকেমিয়্যাহ' নাকি খারেজীদের আবিষ্কার। আসলে যদি এটি বিদআত হয় তবে রুবুবিয়্যাহ সংক্রান্ত তাওহীদ, উলুহিয়্যাহ সংক্রান্ত তাওহীদ, আসমা ওয়াস সিফাহ সংক্রান্ত তাওহীদ সবগুলোই বিদআত হবে। এমন কি তাওহীদ পরিভাষাটিও। কেননা কুরআন ও হাদীসে এই পরিভাষাগুলোর ব্যবহৃত হয়নি। মূল কথা হচ্ছে, এইগুলোকে শাখা-প্রশাখা করে আল্লাহর এককত্বকে

তখনই বুঝানো শুরু হয়েছে, যখন থেকে মানুষ বিভিন্ন ফেরকা বানিয়ে নানা ভাবে ইসলামি আক্বীদা পরিবর্তনের চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। আমাদের বর্তমান সমাজে প্রচলিত সবচেয়ে বড় কুফর হচ্ছে বিধান প্রণয়নের কুফর। আর এটাকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করার জন্যই আমরা 'তাওহীদ আল হাকেমিয়্যাহ' কে রুবুবিয়্যাহ সংক্রান্ত তাওহীদ, উলুহিয়্যাহ সংক্রান্ত তাওহীদ, আসমা ওয়াস সিফাহ সংক্রান্ত তাওহীদ থেকে আলাদা করে বুঝানোর চেষ্টা করি। মূলত: এই 'তাওহীদ আল হাকেমিয়্যাহ' ; রবুবিয়্যাহ, উলুহিয়্যাহ আর আসমা ওয়াস সিফাহরই অন্তর্ভূক্ত। এই বিষয়ে এখনো পর্যন্ত বাংলায় ভালো কোন লেখা না থাকায় আমরা কলম ধরার কাজটি শুরু করি। এমনই সময়ে আমার হাতে এসে পরে শায়খ মাকদিসীর এই বইটির আরবি কপি। সাথে সাথে আরবিতে পারদশী আমার সাথি ভাইদের বইটি দিয়ে অনুবাদ করতে অনুরোধ করি।
অনুবাদ শেষ হয়ে গেলে এই বইটির সম্পাদনার কাজ করার সুযোগ আমার মত অধমের কাছে এসে পরে। এই বইয়ের যেসব অংশ বুঝতে কঠিন হতে পারে, সে সকল অংশে আমরা টিকা লাগিয়ে অথবা ব্র্যাকেটের ভিতরে উদাহরণ দিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করেছি। ইনশাআল্লাহ পাঠকদের বুঝতে কষ্ট হবে না বলে আসা রাখি।

যতদূর সম্ভব সহজ ভাষা ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি। আর মূল বইয়ের সকল হাদীস তাহক্বীক করে আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। লেখায় কোন ভুল ত্রুটি হয়ে গেলে ক্ষমার চোখে দেখবেন বলে আসা রাখি। হে আল্লাহ আপনি আমাদের এই চেষ্টা কবুল করুন। আমাদের হক্ব ও বাতিলের পার্থক্য বুঝতে সাহায্য করুন। তাগুত ও তাদের সহকারীদের ইসলাম বুঝার ও সকল কুফরি থেকে তওবাহ করে পরিপূর্ণ ইসলামে প্রবেশ করার তাওফিক দিন। আমীন।

-আবু বকর সিদ্দীক

সূচীপত্র:

আল্লাহর বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক বিধান রচনা করা ও বিচারকগণের এই মানবরচিত আইন দ্বারা ফয়সালা করা একটি কুফরী কাজ

শাসকদের আল্লাহর বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক বিধান রচনা করা ও বিচারকগণের এই মানবরচিত আইন দ্বারা ফয়সালা করা একটি কুফরী কাজ। কিন্তু এই কুফর বড় কুফর না ছোট কুফর তা নিয়ে কিছু জ্ঞানপাপী দরবারী আলেম সংশয় সৃষ্টি করছে। এই সংশয়গুলোর সঠিক জবাব না জানার কারণে সাধারণ মুসলিমরা তো বিভ্রান্ত হচ্ছেই এমনকি অনেক দ্বায়ী ভাইদেরকেও বিভ্রান্তিতে ফেলে দিচ্ছে। এই সংশয়গুলো ও তার জবাব নিম্নে এক এক করে তুলে ধরা হল।

প্রথম সংশয়:

শাসকদের বিধান রচনার কুফর বড় কুফর[১] না ছোট কুফর[২]?

শাসকদের আল্লাহর বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক বিধান রচনা করা হচ্ছে একটি বড় কুফর। আমাদের সাথে দ্বিমত পোষণকারী কিছু লোক আছেন, যারা আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ণকারী তথাকথিত মুসলিম শাসকদের পক্ষাবলম্বন করে বলে থাকেন, "তোমরা যে মূলনীতির উপর ভিত্তি করে মুসলিম শাসকগণ এবং তাদের সাহায্যকারী সাংবাদিকদল, তাদের রক্ষাকারী সৈন্যদল ও তাদের পক্ষাবলম্বনকারী অন্যান্যদের কাফের বলে ঘোষণা দাও, সে মূলনীতিতে আমরা তোমাদের সাথে একমত নই। কেননা এই শাসকদের কুফরী আমাদের মতে ছোট কুফর। বড় কুফর (যা কোন ব্যক্তিকে ইসলামের

---

[১] বড় কুফর ঃ যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়, তার থেকে ইসলামের নিরাপত্তা বিধান উঠে যায়। যেমন: আল্লাহর বিধান পরিবর্তন করা।

[২] ছোট কুফর ঃ এটা বড় কুফরের বিপরীত, অর্থাৎ তা কোন মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে না তবে তা অনেক অনেক বড় গুনাহ। যেমনঃ কোন নির্দোষ মুসলিম কে সেচ্ছায় হত্যা করা।

গন্ডি থেকে বের করে দেয়) নয়।" আর তাদের দাবি হচ্ছে, এ মতের প্রবক্তা ছিলেন কুরআনের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকারী ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)।

আমাদের জবাবঃ দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে কিছু মানুষের মতানৈক্য থাকে। তবে তার একটি সীমারেখা আছে। যদি তা হয় শাখাগত বিষয়ে তবে তা মেনে নেয়া যায়। (উদাহরণস্বরূপ ৫ ওয়াক্ত সালাত যে ফরয এটি একটি মূল বিষয়। এতে মতভেদ হতে পারে না। কিন্তু সালাতের মধ্যে 'রফউল ইয়াদাইন' করা অথবা না করা এ নিয়ে মতভেদ থাকতেই পারে কারণ এটি শাখাগত বিষয়।) আলেমগণ বলেন, শাখাগত মাসআলায় মতানৈক্য সম্ভাব্য এবং স্বাভাবিক। কেননা অনেক ক্ষেত্রেই এ মতানৈক্য সৃষ্টি হয় কোন একটি হাদীস সহীহ বা যয়ীফ বলে রায় দেয়ার ক্ষেত্রে মতানৈক্য থাকার কারণে। অথবা কোন হাদীস ফক্বীহ পর্যন্ত না পৌছার কারণে বা এ ধরণের অন্য কোন সমস্যা থাকার কারণে। আর যদি এ মতভেদ হয় দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে, তবে তা কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না। তারপরও কেউ মতানৈক্য তুলতে পারে; তবে তার অর্থ এই নয় যে, সত্যের সন্ধান না করেই অন্ধ ভাবে কোন এক মতের অনুসরণ করতে হবে। সত্য তো একটিই, একাধিক হতে পারে না। আল্লাহ (সুবঃ) বলেন,

فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ

অর্থ: 'সত্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর বিভ্রান্তি ছাড়া আর কি অবশিষ্ট থাকে।' [সূরা ইউনুস: ৩২]

অপর স্থানে আল্লাহ (সুবঃ) বলেন:

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

অর্থ: 'এটা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হত তবে তারা এর মধ্যে বহু অসঙ্গতি পেত।' [সূরা নিসা: ৮২]

সুতরাং দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে মতানৈক্য, বিশেষ করে তাওহীদ, রিসালাত, শিরক, ঈমান ও কুফরের মত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতানৈক্য কোন ভাবেই মেনে নেয়া যায় না। কোন ব্যক্তির জন্য এটি কোন ভাবেই বৈধ্য হবে না যে, এ ধরণের মতানৈক্যকে অজুহাত হিসেবে পেশ করে, এটিকে (মতানৈক্যকে) মুরতাদ ও মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন বা তাদের থেকে সাহায্য গ্রহণের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করবে। আর এ কাজটি যদি হয় সন্তুষ্টচিত্তে তবে তা হবে চূড়ান্ত পর্যায়ের অবৈধ। বরং অত্যাবশ্যক হলো যে

সকল মাসআলার উপর ঈমানের মূল ভিত্তি রয়েছে সেগুলোর মাঝে বিদ্যমান মতানৈক্যের সমাধান করা এবং সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। কেননা আল্লাহ (সুবঃ) বলেন:

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

অর্থ: 'তবে কি তোমরা মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে উদ্দেশ্যহীন ভাবে এমনিই সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না।' [সূরা মু'মিনুন: ১১৫]

আর তিনি কোন বিষয় কুরআন মাজিদে আলোচনা ব্যতিরেকে ছেড়ে দেননি। যেমন তিনি (সুবঃ) বলেছেন,

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

অর্থ:- 'আমি কিতাবে কোন ত্রুটি রাখিনি।' [সূরা আনআম: ৩৮]

সুতরাং সকল কল্যাণকর বিষয়ে আল্লাহ (সুবঃ) আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন এবং তাতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। সকল মন্দ বিষয় জানিয়ে দিয়েছেন এবং তা থেকে সতর্ক করেছেন।

বর্তমানকালের শাসকদের বিভিন্ন কর্মকান্ডের দ্বারা তাদের কাফের হওয়া সুস্পষ্ট। আর কুফর হলো দ্বীনের মৌলিক বিষয়ের একটি অন্যতম দিক। যে ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন ও তাওহীদকে বুঝেছে তার নিকট এ সকল আল্লাহদ্রোহী শাসকদের কুফরের বিষয়টি দিবালোকের চেয়েও স্পষ্ট। কিন্তু এতে আশ্চর্য্যের কিছু নেই, যে ব্যক্তির চোখে পর্দা রয়েছে দ্বী-প্রহরের সূর্য্যও তার দৃষ্টিগোচর হবে না।

ইনশাআল্লাহ সামনে আমরা চেষ্টা করবো তাওহীদের পথ্য দ্বারা চোখের পর্দাকে সরিয়ে দিতে ও ঐশী আলো দ্বারা সকল আঁধার দূর করতে।

প্রথমত আমাদের জানা উচিৎ, এই সমস্ত আল্লাহদ্রোহী শাসকদের কে শুধুমাত্র একটি নীতির উপর ভিত্তি করে কাফের বলা হচ্ছে না। ফলে তাদেরকে ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) এর বাণী كفر دون كفر 'এই কুফর সেই পর্যায়ের কুফর নয়' এর অপব্যাখ্যা দ্বারা রক্ষা করা সম্ভব নয়। বরং তাদের এই কুফরী অনেকগুলো মূলনীতির উপর ভিত্তি করে সাব্যস্ত হয়েছে। যার প্রত্যেকটি তাদেরকে স্পষ্ট কাফের হিসেবে সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট। ঐ সকল কারণসমূহ থেকে শুধুমাত্র ছয়টি কারণ এখানে উল্লেখ করা হল।

কুফরীর প্রথম কারণ:

কালিমার প্রথম দাবী 'তাগুতকে[৩] বর্জন' না করার কারণে তারা কাফের।

---

[৩] **ইমাম ইবনে জারীর তাবারী বলেন:** ঐ সকল আল্লাহদ্রোহী যারা আল্লাহর নাফরমানীতে সীমালংঘন করেছে এবং মানুষ যাদের আনুগত্য করে। সে মানুষ, জ্বীন, শয়তান, প্রতীমা, বা অন্য কিছুও হতে পারে।(তাফসীরে তাবারী : ৩/২১)

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন: আল্লাহ ছাড়া যাদের আনুগত্য করা হয় তারাই ত্বা-গুত। (মাজমুআতুল ফাতাওয়া : ২৮/২০০)

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব: ত্বা-গুত হচ্ছে ঐ সকল মা'বুদ, লিডার, মুরুব্বী, আল্লাহর পরিবর্তে যাদের আনুগত্য করা হয় এবং তারা এতে সন্তুষ্ট। (মাজমুআতুত তাওহীদ : পৃ:৯)

ইমাম কুরতুবী (রহ:) বলেন: ত্বা-গুত হচ্ছে গণক, যাদুকর, শয়তান এবং পথভ্রষ্ট সকল নেতা। (আল জামে লি আহকামিল কুরআন : ৩/২৮২)

ইবনুল কাইয়্যিম বলেন: তাগুত হচ্ছে ঐ সকল মা'বুদ, লিডার, মুরুব্বী যাদের আনুগত্য করতে গিয়ে সীমালংঘন করা হয়। আল্লাহ এবং তার রাসূল কে বাদ দিয়ে যাদের কাছে বিচার-ফয়সালা চাওয়া হয় অথবা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করা হয়। অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন দলীল-প্রমাণ ছাড়া আনুগত্য করা হয়। অথবা আল্লাহর আনুগত্য মনে করে যে সকল গাইরুল্লাহর ইবাদত করা হয়। এরাই হল পৃথিবীর বড় বড় তাগুত। তুমি যদি এই তাগুতগুলো এবং মানুষের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য কর তবে বেশীর ভাগ মানুষকেই পাবে, যারা আল্লাহর ইবাদতের পরিবর্তে তাগুতের ইবাদত করে। আল্লাহ এবং তার রাসূলের কাছে বিচার-ফয়সালা চাওয়ার পরিবর্তে তাগুতের কাছে বিচার-ফয়সালা নিয়ে যায়। আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করার পরিবর্তে তাগুতের আনুগত্য করে। (এ'লামুল মুওয়াক্কীঈন : ১/৫০)

ইমাম আব্দুর রহমান বলেন: আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করা হয়, যারা বাতিলের দিকে আহ্বান করে এবং বাতিলকে সজ্জিত-মন্ডিত করে উপস্থাপন করে, আল্লাহর এবং তার রাসূলের আইন বাদ দিয়ে মানব রচিত আইন দ্বারা বিচার-ফয়সালা করার জন্য যাদেরকে নিয়োগ করা হয়েছে। এমনিভাবে গণক, যাদুকর, মূর্তিপূজকদের নেতা যারা কবরপূজার দিকে মানুষকে আহ্বান করে, যারা মিথ্যা কেচ্ছা-কাহিনী বর্ণনা করে মাজারের দিকে মানুষকে আকৃষ্ট করে। এরা সকলই তাগুত। এদের লিডার হচ্ছে শয়তান। (আদদুরারুস সানিয়্যাহ : ২/১০৩)

তাওহীদের সাক্ষ্যপ্রদানের মূল ভিত্তি হল দুটি। যার একটি অপরটি ব্যতীত কোনই
কাজে আসে না। বরং তাওহীদের কালেমাকে মেনে নেয়া এবং তার সত্যায়নের জন্য উভয়টি একইসাথে থাকা অত্যাবশ্যক। তার একটি হচ্ছে সকল বাতিল ইলাহ তথা গাইরুল্লাহকে প্রত্যাখ্যান (لا الــه) আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে একমাত্র আল্লাহকে ইলাহ হিসাবে গ্রহণ তথা সত্যায়ন (إلا الله) যেমনটি আল্লাহ (সুবঃ) বলেছেন:

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى

অর্থ:- 'অতঃপর যে ব্যক্তি তাগুত কে অস্বীকার করল এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনল, সে এক মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরল।' [সূরা বাক্বারাঃ ২৫৬]
উক্ত আয়াতে الكفر بالطاغوت 'তাগুতকে অস্বীকার' থেকে প্রথম ভিত্তি لا الــه এবং الايمان بــالله 'আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস' থেকে দ্বিতীয় ভিত্তি إلا الله এর সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল।
অতএব, যে ব্যক্তির মাঝে এই দুইটি ভিত্তির সমন্বয় ঘটল না, সে শক্ত হাতলকে মজবুত ভাবে আঁকড়ে ধরল না। ফলে সে হবে মুওয়াহ্হিদদের কাতার বহির্ভূত এক ব্যক্তি। আমরা যদি তাদের (দরবারী আলেমদের) দাবি মেনে নেই যে, এ সমস্ত শাসকবর্গ (যারা আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে বিধানদাতা হিসেবে অংশীদার সাব্যস্ত করে এমনকি কখনও কখনও তারা নিজেরাও আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের বিরোধী বিধান রচনা করে তাগুতে পরিণত হয়।) যদিও তারা তাওহীদের দ্বিতীয় ভিত্তি الايمان بالله (আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস) আনয়ন করেছে তাও তারা আল্লাহর এককত্বে বিশ্বাসীদের কাতারে শামিল

মুহাম্মাদ হামেদ আল-ফক্বী বলেন: আল্লাহর একনিষ্ঠ ইবাদত করা হতে যারা মানুষকে বিরত রাখে এবং আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করা হয় (চাই সে জ্বিন, মানুষ, গাছ, পাথর যাই হোক না কেন)। এমনিভাবে যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানকে বাদ দিয়ে মনগড়া আইনে হুদদ, কেসাস, যিনা-ব্যভিচার, মদ এবং সুদ ইত্যাদির বিচার-ফয়সালা করে। (হাশিয়া ফতহুল মুজিদ : পৃ: ২৮২)

হতে পারবে না। কেননা অপর একটি আবশ্যকীয় ভিত্তি এখনো বাকি রয়ে গেছে তা হল الكفربالطـاغوت। 'তাগুতকে অস্বীকার'। আর আল্লাহ (সুবঃ) الايمان بالله। 'আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস' এ রুকনের পূর্বে তা উল্লেখ করেছেন।

الكفربالطاغوت। 'তাগুতকে অস্বীকার' করা ব্যতীত الايمان بـالله। 'আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস' তৎকালীন মক্কার কাফের কুরাইশদের ঈমানের মতই। কেননা মক্কার কাফের কুরাইশরা আল্লাহ (সুবঃ) এর প্রতি বিশ্বাস রাখত কিন্তু তাগুতকে বর্জন করত না। (তারা আল্লাহকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছিল ঠিকই কিন্তু আল্লাহর ইবাদাতের পাশাপাশি তারা মূর্তিরও ইবাদাত করত। মোটকথা তারা একমাত্র ইলাহ হিসাবে আল্লাহকে মেনে নেয় নি। তারা আল্লাহর বিধানসমূহকে নিজেদের জন্য গ্রহণ করে নি। তারা আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য/ইতাআত করেনি।) আর এটি জানা কথা, এই ঈমান মক্কার কাফের কুরাইশদের কোন কাজে আসেনি। তাদের জান-মালকে রক্ষা করতে পারেনি। বরং আল্লাহর প্রতি ঈমানের সাথে শর্তযুক্ত ছিল তাগুতকে অস্বীকার করা, তাগুতের সাথে সকল সম্পর্কচ্ছেদ করা। এর পূর্বে শিরক মিশ্রিত ভেজাল ঈমান তাদের পার্থিব জগতের এবং পরকালের কোন বিধানের ব্যাপারে সামান্যতম উপকারেও আসেনি। আল্লাহ (সুবঃ) বলেন:

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ

'তাদের অধিকাংশ আল্লাহ কে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও মুশরিক।' [সূরা ইউসুফ: ১০৬]

আর শিরক হল ঈমানকে নষ্টকারী এবং নেক আমল ধ্বংসকারী।
আল্লাহ (সুবঃ) বলেন:

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

অর্থ: 'যদি তুমি শিরক কর তাহলে তোমার সকল কর্ম নিষ্ফল হবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে।' [সূরা যুমার: ৬৫]

সকলের জানা আছে এসমস্ত শাসকেরা পাশ্চাত্যের তাগুতদেরকে (ব্রিটিশ সরকার, আমেরিকান সরকার, কানাডিয়ান সরকার ইত্যাদি যারা ইসলামী আইন বাস্তবায়নকারী এবং বাস্তবায়নকামী জনতার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত।) এবং প্রাচ্যের তাগুতদেরকে (ভারত সরকার, চীন সরকার, জাপান সরকার ইত্যাদি।) অস্বীকার করে না। তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে না। বরং এরা

তাদেরই আস্থাভাজন ও তাদেরকেই ভালবাসে এবং ঝগড়া-বিবাদে তাদের নিকট মামলা দায়ের করে। তাদের রাষ্ট্রীয় নিয়ম অর্থাৎ কুফরী বিধান সমূহকে পছন্দ করে। তাদের সৃষ্ট আন্তর্জাতিক কুফরী সংস্থা (ট.ঘ.) জাতিসংঘের অপবিত্র ছায়ায় আশ্রয় নেয়।

এভাবে আরবী (এরাবিয়ান তথা আরবে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকারী শাসকেরা যারা কাফেরদের কাছে আল্লাহর এককত্বে বিশ্বাসী মুসলিমদের এবং ইসলামী খিলাফতকামী মুসলিমদের তুলে দেয় কঠোর নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করার জন্য।) তাগুতরা এবং তাদের নীতি সমূহ আন্তর্জাতিক কুফরী সংস্থা জাতিসংঘের নীতির মতই। আর এরা, এ সকল তাগুতদেরকেই ভালবাসে এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে। আর তাদের এমন গোলামে পরিণত হয়েছে যে, কোন বিষয়েই মনিবের অবাধ্য হয় না এবং শিরক, কুফর সকল কাজেই মনিবের শক্তি জোগায়। চোখে পর্দা থাকার কারণে কারো কারো নিকট এই সমস্ত শাসকদের তাগুত হওয়ার বিষয়টি যদিও সংশয়যুক্ত কিন্তু প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য কাফেরদের তাগুত হওয়ার ব্যাপারে কারো সামান্যতম সংশয় নেই। (কাউকে যদি আল্লাহ অন্ধ করে দেন তাহলে ভিন্ন কথা।) এ সত্ত্বেও তাদেরকে বর্জন করাতো দূরের কথা বরং এ শাসকরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে দৃঢ় করতে সদা সচেষ্ট। এমনকি তাদের সাথে জাতিসংঘ নামের কুফরী সংঘ চুক্তিতেও আবদ্ধ। ফলে কোন সমস্যা দেখা দিলে এরা জাতিসংঘের কুফরী আদালতে মামলা দায়ের করে।

অতএব তারা তাওহীদের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি الكفربالطــاغوت। (তাগুতকে অস্বীকার) পূর্ণ করেনি। সুতরাং কিভাবে তারা মুসলমান হতে পারে? তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নেয়া হয়, তারা তাওহীদের দ্বিতীয় ভিত্তি الايمــان بـــالله। (আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস) পূর্ণ করেছে। কিন্তু অপরদিকে তারা নিজেরাই তাগুত সেজে বসে আছে। ফলে আল্লাহকে ব্যতিরেকে তাদের ইবাদাত করা হচ্ছে। কারণ তারা মানুষের জন্য এমন সব আইন প্রণয়ণ করছে যার অধিকার আল্লাহ (সুবঃ) কোন মাখলুককে দেননি। উপরন্তু তারা মানুষদেরকে সেদিকে আহ্বানও করছে এবং তাদের সংবিধান মানতে বাধ্য করছে। (যার আলোচনা ইনশাআল্লাহ সামনে আসছে।)

কুফরীর দ্বিতীয় কারণ:

আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন এবং শরীয়াত নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করার কারণে তারা কাফের।

তারা আল্লাহর দ্বীন এবং শরীয়াত নিয়ে বিদ্রুপকারীদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে তারা (বিদ্রুপকারীরা) পত্রিকা, রেডিও, টি.ভি. এবং অন্যান্য স্বাধীন সংবাদ সংস্থার মাধ্যমে দ্বীনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রকাশ্য এবং আকার ইঙ্গিতে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করছে। আর এ কুলাঙ্গার শাসকবর্গরা এ মাধ্যমগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করছে (আমরা প্রায়ই দেখতে পাই সমাজে যারা রাসূল (সাঃ) কে নিয়ে ঠাট্টা করে, ইসলাম নিয়ে মসকরা করে তাদেরকে শাসকবর্গরা নিরাপত্তা দিয়ে থাকেন)। সাথে সাথে তাদের স্ব-রচিত আইন এবং সেনাবাহিনী দ্বারা এদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এ নাস্তিক মুরতাদদের আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে দিচ্ছে।

আল্লাহ (সুবঃ) বলেন:

قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ (٦٦)

অর্থ: 'বল! তোমরা কি এক আল্লাহ, আল্লাহর আয়াত ও তার রাসূলকে নিয়ে বিদ্রুপ করছিলে? অজুহাত দেখিওনা তোমরা ঈমান আনার পরে কুফরী করেছ।' [সূরা তাওবা: ৬৫,৬৬]

এই আয়াতগুলো ঐসকল লোকের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে যারা ছিল মুসলিম। তারা সালাত আদায় করতো, সিয়াম পালন করতো ও যাকাত দিত এমনকি তারা মুসলিমদের সাথে এক বড় জিহাদেও অংশগ্রহণ করেছিল। ইহা সত্ত্বেও যখন তারা কুরআন পাঠকারী সাহাবীদের ব্যাপারে উপহাস মূলক কথা বলল, তখন আল্লাহ (সুবঃ) তাদেরকে কাফের বলে ঘোষণা করলেন:

قال الزبير : وهو الذي شهد عليه الزبير بهذا الكلام و وديعة بن ثابت بن عمرو بن عوف وهو الذي قال : إنما كنا نخوض ونلعب وهو الذي قال : مالي أرى قرآنا هؤلاء أرغبنا بطونا وأجبننا عند اللقاء

যুবায়ের (রাঃ) বলেন, আর তিনি একথা বলার সময় উপস্থিত ছিলেন, ওদিয়া ইবনে ছাবেত বিন আমর বলল, আমরা শুধুমাত্র তোমাদের সাথে হাসি ঠাট্টা

করছি এবং সে আরো বলল, হায়! কি হল যে, এই কোরআন পাঠকারীরা দেখি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে খাদ্যের প্রতি বেশী উৎসাহী, আর শত্রুর মোকাবেলায় সবচেয়ে বেশী ভীরু।
[তাবারানীর মুজামুল কাবীর :৩০১৭; প্রত্যেক রাবী আলাদা আলাদা ভাবে সিকাহ, তবে সনদটি গারীব। মোটকথা হাদীসটি হাসান স্তরের তাই গ্রহণযোগ্য।]
তাহলে ঐ সমস্ত লোকের ব্যাপারে চিন্তা করুন যাদের অন্তরে আল্লাহর বিধানের প্রতি সামান্যতম শ্রদ্ধাবোধ নেই বরং তাকে হাসি-তামাসার বস্তুরূপে গ্রহণ করেছে। নিজেদের পিছনে অবহেলা ভরে ছুঁড়ে মেরেছে। আর সবচেয়ে ভয়ানক বিষয় হলো তারা আল্লাহর কুরআনকে তথা কুরআনের বিধি-বিধানকে তাদের স্বহস্তে রচিত আইন-কানুনের নিচে অবস্থান দিয়েছে। কুরআনের আদেশ ও নিষেধ সমূহকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ইয়াহুদী-খৃষ্টান ও নাস্তিকদের সাথে সলাপরামর্শ করে রদ করছে (তারা বলে কুরআনের বিধান গুলো নাকি মানবতাবিরোধী ও বর্বর)। কিতাবুল্লাহ এর সাথে এর চেয়ে বড় উপহাস ও ঠাট্টা আর কী হতে পারে?

কুফরীর তৃতীয় কারণ:

তারা প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা রাখার কারণে এবং বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সাহায্য করার কারণে কাফের।

এই সমস্ত শাসকরা কাফেরদের সাথে পারস্পারিক সাহায্য চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এবং মুওয়াহ্হীদ (আল্লাহর এককত্বে বিশ্বাসী) মুসলমানদের কে জঙ্গী ও চরমপন্থী আখ্যা দিয়ে উক্ত চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সংবাদ কাফেরদের সাথে আদান-প্রদান করে এবং মুসলিম মুজাহিদদের গ্রেফতার করে তাগুত সরকারদের হাতে অর্পণ করে। আল্লাহ (সুবঃ) বলেন:

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ

অর্থ: 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদেরকে বন্ধু বানাবে, সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে।' [সূরা মায়িদা: ৫১]

একারণেই শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব نواقض الاسلام (নাওয়াক্বিযুল ইসলাম) নামক গ্রন্থে বলেন, ঈমান নষ্ট হওয়ার ৮নং কারণ হলো মুশরিকদের সাহায্য সহযোগিতা করা।

তার দৌহিত্র সুলাইমান বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব তার حكم موالاة اهل الاشـــتراك (হুকমু মুওয়ালাতি আহলিল ইশতিরাক) নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ (সুবঃ) বলেন:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

অর্থ:- 'তুমি কি মুনাফিকদেরকে দেখোনি যারা আহলে কিতাবের মধ্য হতে তাদের কাফির ভাইদেরকে বলে, 'তোমাদেরকে বের করে দেয়া হলে আমরাও তোমাদের সাথে অবশ্যই বেরিয়ে যাব এবং তোমাদের ব্যাপারে আমরা কখনোই কারো আনুগত্য করব না। আর তোমাদের সাথে যুদ্ধ করা হলে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব। আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা মিথ্যাবাদী।' [সূরা হাশর: ১১]

এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে, এমন কিছু মানুষের ব্যাপারে, যারা বাহ্যিক ভাবে ইসলামকে প্রকাশ করত। একজন ব্যক্তি মুসলিম কি কাফের তার প্রমাণসরূপ তাদের বাহ্যিক প্রকাশকেই গ্রহণ করা হত। কেননা মুসলমানদের প্রতি হুকুম ছিল বাহ্যিকতার বিচার করার। কিন্তু যখন তারা সাহাবীগণের বিরুদ্ধে ইয়াহুদীদের সাহায্য করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হলো (যদিও আল্লাহ (সুবঃ) জানতেন তাদের চুক্তিতে তারা মিথ্যাবাদী) তখন আল্লাহ (সুবঃ) ইয়াহুদীদেরকে তাদের ভাই বলে আখ্যা দিলেন। আর এ চুক্তিই ছিল তাদের কুফরীর কারণ। [হুকমু মুওয়ালাতি আহলিল ইশতিরাক]

অতএব ঐসমস্ত শাসকদের পরিণতি আরো কত করুণ, যারা প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের আইন প্রণয়ণকারী মুশরিকদের সাথে পরস্পর সাহায্য চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এবং তাওহীদে বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে ও তাদেরকে আপন মনিবদের (আমেরিকা, ব্রিটেন ও অন্যান্য কাফের রাষ্ট্রের সরকারের) হাতে অর্পণ করে। কোন সন্দেহ নেই, অবশ্যই তারা এই হুকুমের অন্তর্ভূক্ত হবে।

কুফরীর চতুর্থ কারণ:

আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে গণতন্ত্রকে দ্বীনরূপে গ্রহণ করার কারণে তারা কাফের।

আল্লাহ (সুবঃ) বলেছেন:

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

'নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন কেবল ইসলামই'। [সূরা আল ইমরান: ১৯] ইসলাম হল আল্লাহর দ্বীনে হক্ব, যা দিয়ে তিনি মুহাম্মদ (সাঃ) কে প্রেরণ করেছেন। আর গণতন্ত্রের প্রবর্তক হল গ্রীকরা। নিঃসন্দেহে না এটা আল্লাহ্ প্রদত্ত, না সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ্ (সুবঃ) বলেন:

فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ

'সত্য ত্যাগ করার পর বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কী থাকে'। [সূরা ইউনুস: ৩২] আর এসকল লোকেরা সর্বদাই প্রকাশ্য ভাবে ঘোষণা করছে যে, তাদের একমাত্র পছন্দ ও গর্বের বিষয় গণতন্ত্র, ইসলাম নয়।

গণতন্ত্র ও ইসলাম এ দুটি পরিপূর্ণ ভিন্ন বিষয়। দুটিকে একত্র করা কিছুতেই সম্ভব নয়। আল্লাহ্ (সুবঃ) একমাত্র খালেছ ইসলামকেই কবুল করবেন। আর ইসলাম ঘোষণা দিয়েছে :

إِنِ الْحُكْمُ إِلا للهِ

'বিধানদাতা একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন।'[সূরা আনআম:৫৭,সূরা ইউসুফ:৪০]

আর গণতন্ত্র হল একটি শিরক ও কুফর মিশ্রিত জীবন বিধান। যা আল্লাহ্ কে বাদ দিয়ে বিধি-বিধান এবং আইন প্রণয়নকারী জনগণকে সাব্যস্ত করে।[যেমন বাংলাদেশ সংবিধান ৭/ক ধারা হল 'সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ' বা 'সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ'।] আর আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এমন মানুষের আ'মাল কখনোই গ্রহণ করবেন না এবং তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না যে কুফরকে গ্রহণ করে আবার ইসলামেরও দাবী করে, শিরকও করে আবার তাওহীদেরও বুলি আওড়ায়। বরং কোন ব্যক্তির ইসলাম ও তাওহীদ ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে না এবং সঠিক বলে গণ্য হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে সত্যনিষ্ঠ দ্বীন ইসলাম ব্যতীত অন্য সকল দ্বীনকে অস্বীকার না করে

এবং সকল শিরক ও কুফর থেকে মুক্ত না হয়। কুরআনুল কারীমে বর্ণিত হয়েছেঃ

إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (٣٧) وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ (٣٨)

অর্থ: 'নিশ্চয়ই আমি পরিত্যাগ করেছি সে কওমের ধর্ম যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না এবং যারা আখিরাতকে অস্বীকারকারী। 'আর আমি অনুসরণ করেছি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবের ধর্ম। আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করা আমাদের জন্য সঙ্গত নয়।' [সূরা ইউসুফ: ৩৭, ৩৮]

এবং সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আছে রাসূল (সাঃ) বলেছেন:

عَنْ أَبِى مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ . (صحيح مسلم)

অর্থ: 'আবি মালিক (রা.) তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ বলল এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য সকল উপাস্য কে অস্বীকার করল সে তার মাল সম্পদ, রক্ত এবং হিসাব কে আল্লাহর কাছ থেকে নিরাপদ করে নিল। [সহীহ মুসলিমঃ কিতাবুল ঈমান: ৩৭-(২৩)]

অন্য রেওয়াতে বর্ণিত হয়েছে مَنْ وَحَّدَ اللَّهَ 'যে আল্লাহকে এক বলে মেনে নিল' [সহীহ মুসলিম: কিতাবুল ঈমান: ৩৮-(২৩)]

দ্বীন বা জীবন বিধান বলতে শুধুমাত্র ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান ধর্মকে বুঝায় না বরং গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র বা এধরণের মানব রচিত যত জীবন বিধান আছে সব গুলোই এর অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং আবশ্যক হল এ ধরণের সকল মিথ্যা ধর্ম এবং বাতিল মতবাদ থেকে নিজেকে পবিত্র রাখতে হবে, যাতে আল্লাহ তার থেকে দ্বীন ইসলামকে কবুল করে।

যেমনিভাবে আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে এই বৈধতা বা সম্ভবনা নেই, কোন মানুষ 'খৃষ্ট মুসলমান' বা 'ইয়াহুদী মুসলমান' হবে তেমনিভাবে আল্লাহ (সুবঃ) এটাও পছন্দ করেন না যে, কোন ব্যক্তি গণতন্ত্রী মুসলমান হবে। কেননা ইসলাম

হল আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন আর গণতন্ত্র হল একটি কুফরী মতবাদ। আল্লাহ (সুবঃ) বলেন:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

অর্থ:'আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন চায়, তার কাছ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'[সূরা আল ইমরান:৮৫]

আর যদি কোন ব্যক্তি ইসলাম কে ছেড়ে দেয় এবং ইসলামের সীমারেখা, বিধি-বিধান অবজ্ঞা করে এবং গণতন্ত্রকে পছন্দ করে ও তার আইন-কানুন ও সীমারেখাকে গ্রহণ করে তাহলে তার অবস্থা কতই না শোচনীয়।

কুফরীর পঞ্চম কারণ:

তারা নিজেদেরকে এবং তাদের শাসকদেরকে আল্লাহর সমতুল্য সাব্যস্ত করার কারণে কাফের।

যে দ্বীনকে (জীবন বিধানকে)তারা নিজ দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করেছে এটাই তাদের নিকট আল্লাহর (সুবঃ) চেয়ে অধিক সম্মানি। তাইতো আল্লাহর বিধান সমূহকে পরিত্যাগ করেছে এবং তা দেয়ালের পিছনে ছুড়ে মেরেছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের বিরোধীতা করে বা বিপক্ষে যায় এবং এর ব্যাপারে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে ও যুদ্ধে অবস্থান নেয় সে-ই তাদের প্রিয় পাত্রে পরিণত হয়। তাকে নিজেদের আইন দ্বারা রক্ষা করে। সে মুরতাদ হওয়া সত্ত্বেও মানব অধিকার, বাক স্বাধীনতা ইত্যাদি মুখরোচক শেস্নাগান তুলে তার জন্যে সাফাই গাওয়া হয়।

আর যদি কেউ তাদের নিয়মের বিরোধীতা করে এবং তাদের বিধি-বিধান কে তিরস্কার করে। তাদের শাসকদের বিপক্ষে দাড়ায়, তাহলে হয়তো তাকে তাদের রোষানলে পতিত হয়ে জীবন হারাতে হয়। অথবা তাকে বন্দি করে রাখা হয়।

পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ (সুবঃ) এবং তার রাসূল (সাঃ) কে অথবা ইসলামকে গালি দেয়। অতঃপর যদি তাকে আদালতে নেওয়া হয় তাহলে তার বিচার হয় বে-সামরিক আদালতে এবং তার শাস্তি হয় দু-মাস। এর বিপরীতে কেউ যদি তাদের বানানো ইলাহ বা রব তথা প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী এবং

তাদের দোসরদের গালি দেয় তাহলে তার বিচার হয় উচ্চ আদালতে এবং কমপক্ষে তার শাস্তি হয় তিন বছর।

যদি আল্লাহ (সুবঃ) এর জন্য তাদের সামান্যতমও সম্মানবোধ থাকতো তাহলে তারা নিজেদেরকে এবং তাদের শাসকদেরকে আল্লাহর (সুবঃ) সমতুল্য করতনা। উপরন্তু তারা এর চেয়ে আগে বেড়ে তাদের রবদেরকে (শাসকদেরকে) আল্লাহর চেয়ে বেশী সম্মান করে। প্রথম যুগের মুশরিকরাও তাদের শরীকদের কে আল্লাহর ন্যায় ভালবাসত এবং তারা তাদের রবদেরকে (সমাজপতিদের) বিধান প্রণয়ন, সম্মান প্রদান ও ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সমতুল্য সাব্যস্ত করত। আল্লাহ (সুবঃ) বলেন:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ

অর্থ: 'এবং মানুষের মাঝে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে এমনভাবে অংশীদার সাব্যস্ত করে যে, তাদেরকে তারা ভালবাসে আল্লাহকে ভালবাসার মত'।[সূরা বাক্বারা: ১৬৫]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে:

تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (৯৭) إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (৯৮)

অর্থ: 'আল্লাহর কসম! আমরাতো সেই সময় স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে লিপ্ত ছিলাম। যখন আমরা তোমাদেরকে রাব্বুল আলামীনের সমকক্ষ মনে করতাম'। [সূরা শুআ'রা: ৯৭,৯৮]

আর আমাদের সময়ের মুশরিকরা তাদের চেয়ে অধিক ধৃষ্টতা দেখিয়েছে এবং তাদের রবদেরকে আল্লাহর উপর স্থান দিয়েছে। (তারা যা কিছু বলে আল্লাহ তাআলা তার অনেক উর্ধে)। তাদের আইন-কানুন এবং অবস্থা সম্পর্কে যার সামান্য অবগতি রয়েছে সে এ ব্যাপারে কোন আপত্তি তুলতে পারেনা।

সামনের আলোচনা থেকে পাঠকগণ বুঝতে পারবেন যে, তাদের নিকট প্রধান বিধানদাতা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নন, বরং তারা যাদের প্রণীত আইনের অনুসরণ করে সে সকল তাগুতই হল তাদের মূল ইলাহ। যাদেরকে তারা ভালবাসে এবং আল্লাহর চেয়ে বেশী সম্মান করে। যাদের জন্য এবং যাদের বিধি-বিধানের জন্য তারা লড়াই করে, প্রতিশোধ গ্রহণ করে এমনকি তা বাস্ত বায়নের জন্য সব ধরণের কষ্ট স্বীকারে সদা প্রস্তুত থাকে। যদি আল্লাহর দ্বীন ধ্বংস হয়ে যায় এবং তার শরীয়াতকে গালি দেওয়া হয় তাহলে তারা সামান্য প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করে না। (বর্তমান সময়ের বাস্তব চিত্রই যার বড় প্রমাণ)

কুফরীর ষষ্ঠ কারণঃ

আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে বিধান রচনা করার কারণে তারা কাফের।

নিজেদের পক্ষ থেকে আইন প্রণয়ন এটা বর্তমান সময়ের একটি সর্বগ্রাসী শিরক। যার প্রচলন ঘটিয়েছে এই কুলাঙ্গার শাসকবর্গ এবং মানুষদেরকে তার দিকে আহ্বান করছে। প্রতিনিয়ত এ কাজে সদস্য হতে এবং অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করছে। তারা তাদের সংবিধানে আল্লাহর তাওহীদ এবং সঠিক দ্বীনের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করছে। আর সংবিধান তাদেরকে সকল বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দিয়ে থাকে। [বাংলাদেশের সংবিধানের ১ম অনুচ্ছেদে ৭ এর (ক) ধারায় উল্লেখ আছে "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীনে ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে"।]

যেমন জর্ডানের সংবিধানের ২৬ এর (ক) ধারা হল:

السلطة التشريعية تناط بالملك واعظاء مجلس الامة

"আইন প্রণয়নের ক্ষমতা বাদশা এবং জাতীয় পরিষদের সদস্যদের হাতে ন্যস্ত থাকবে।"

সংবিধানের ২৬ এর (খ) ধারায় আছে:

تمارس السلطة التشريعية صلاحيتهاوفقا لمواد الدستور

"আইন প্রণয়নের ক্ষমতা তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যখন তা সংবিধানের মূলনীতি অনুযায়ী হবে।"

আল্লাহ (সুবঃ) মুশরিকদের ধিক্কার দিয়ে বর্ণনা করেছেন:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ

অর্থ: 'তাদের জন্য কি এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদের জন্য দ্বীনের বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি।' [সূরা শু'রা : ২১]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে:

أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

অর্থ: 'ভিন্ন ভিন্ন বহু রব শ্রেয়, নাকি ঐ এক আল্লাহ যার ক্ষমতা সর্বব্যাপী' [সূরা ইউসুফ: ৩৯]

আল্লাহ শুধু একটি মাসআলায় মুশরিকদের অনুসরণ করার ব্যাপারে বলেছেন:

وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

'আর তোমরা যদি তাদের অনুসরণ কর তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা মুশরিকে পরিণত হবে' [সূরা আনআম: ১২১]

এ কথা স্পষ্ট যে, তারা আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে বড় শিরক করেছে। জর্ডানের সংবিধানে উল্লেখ আছে:

ان الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي من مصادرالتشريع

'আইন প্রণয়নের উৎস সমূহ থেকে প্রধান উৎস হল ইসলামী শরীয়াত।'[৪]

অর্থাৎ তারা আইন প্রণয়নে আল্লাহর একক ক্ষমতায় বিশ্বাসী নয়। বরং আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তাদের ছোট বড় অনেক উৎস রয়েছে। আর ইসলামী শরীয়াত হল এ সমস্ত উৎসের একটি।

সারকথা হল : তাদের জন্য বিধানদানকারী অনেক প্রভূ রয়েছে, তাদের মধ্য থেকে কেউ বা প্রধান আবার কেউ বা ছোট। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হলেন এসব প্রভুদের মধ্য থেকে একজন। (তারা যা মিথ্যা বলে আল্লাহ (সুবঃ) তার থেকে অনেক উর্ধ্বে)

এই শাসকদের বিধি-বিধান সম্পর্কে যিনি অবগত তিনি অবশ্যই জেনে থাকবেন, তাদের মধ্যে একজন প্রধান থাকে। যার অনুমোদন ব্যতীত কোন আইন পাশ হয় না বা বাতিল হয় না। এই তাগুত-ই হল তাদের প্রধান বিধানদাতা তথা রব। চাই সে কোন বাদশা হোক বা প্রধানমন্ত্রী হোক বা প্রেসিডেন্ট হোক অথবা হোক কোন আমীর।

যদি আসমানে অবস্থিত মহান রবের বিধান থেকে কোন কিছুর প্রস্তাব পেশ করা হয়, তাহলে তাদের মনোনীত পৃথিবীর এই মিথ্যা রবের সন্তুষ্টি এবং

---

[৪] আর বাংলাদেশের সংবিধানের ১ম অনুচ্ছেদে ৭ এর (খ) ধারায় উল্লেখ আছে, "জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্য হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।" (সুতরাং দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশ সংবিধানে আইনের প্রধান উৎস হিসাবে তো দূরের কথা, শাখা উৎস হিসাবে ইসলামী শরীয়াত নেই।)

অনুমোদন ব্যতীত তা বাস্তবায়ন হয় না। যদি সে অনুমোদন না করে তাহলে তা বতিল বলে গণ্য হয়।

আর এদের কুফর কুরাইশ কুফ্ফারদের কুফরের চেয়েও জঘন্যতম। কেননা তারা আল্লাহর সাথে একাধিক 'ইলাহ' এবং বহু রবের শরীক করতো, আর এ শিরক ছিল শুধু ইবাদাত তথা রুকু, সিজদার মাঝে সীমাবদ্ধ। পক্ষান্তরে এই তাগুতরা আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করে সকল বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে। যার দুঃসাহস তৎকালিন মুশরিকরাও দেখাতে পারেনি। ফলে এদের শিরক হল অত্যাধিক জঘন্য ও ঘৃণিত। কেননা কুরাইশের মুশরিকরা আল্লাহ (সুবঃ) কে তাদের সবচেয়ে বড় এবং মহান রব হিসেবে গ্রহণ করেছিল। বরং তাদের বিশ্বাস ছিল তারা এ সমস্ত মূর্তির পূজা করে যাতে করে এরা তাদেরকে আসমানে অবস্থিত মহান রব আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকটবর্তী করে দেয়।

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى

'আমরা কেবল এজন্যই তাদের ইবাদাত করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে।'[সূরা যুমার: ৩]

তাদের কেউ কেউ আবার হজ্জের সময় তালবিয়া পাঠ করত:

لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ إِلاَّ شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ

অর্থ: 'হে আল্লাহ আমি উপস্থিত। তোমার কোন শরীক নেই কিন্তু একজন যার মালিক তুমি স্বয়ং এবং তার মালিকানাধীন সবকিছুর অধিকার তোমারই।' [সহীহ মুসলিম: কিতাবুল হাজ্জ: ২২-(১১৮৫)]

এই সমস্ত মুশরিকরা এ কথা স্বীকার করে যে, আল্লাহ (সুবঃ) রিযিক দান করেন। তিনিই মৃতকে জীবিত করেন। তিনিই আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, ফসল উৎপন্ন করেন, সুস্থতা দান করেন। যাকে চান পুত্র সন্তান দান করেন আর যাকে চান কন্যা সন্তান। অথবা কাউকে উভয়টা দিয়ে থাকেন কিংবা কাউকে বন্ধ্যা বানান।

এগুলোর কোনটির ক্ষমতা তাদের বাদশা বা সরকারের নেই। কিন্তু বর্তমান শাসকদের সাহায্যকারী সাংবাদিক, সৈনিক সহ অন্যান্য সরকারী আমলাদের বিশ্বাস হলো আইন প্রণয়ন করা এবং বিধি-বিধান প্রবর্তনের ক্ষমতা তাদের এই সমস্ত শাসক বা রবদের আছে। আর এই তাগুত গুলোই হল তাদের জমিনের ইলাহ। এরা শিরকের ক্ষেত্রে কুরাইশ কুফ্ফারদের মতই। কিন্তু এরা

এইসব ইলাহদের আদেশ নিষেধ এবং আইন কানুনকে আল্লাহর বিধি-বিধানের চেয়ে বেশী সম্মান করে থাকে। সুতরাং ঐ ব্যক্তির জন্য ধ্বংস যে আবু জাহেল এবং আবু লাহাবের চেয়েও নিকৃষ্টতম কাফের।

জেনে রাখা উচিৎ! এই সমস্ত লোকদের কুফর এবং শিরকের আরো অনেক কারণ রয়েছে। আমরা যদি সবগুলি এখানে উল্লেখ করি তাহলে লেখা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে।

কুফরীর প্রায় সকল কারণ তাদের মধ্যে বিদ্যমান। বরং এই ক্ষেত্রে তারা অনেক আগে বেড়েছে। কিন্তু যা আলোচনা হলো তা-ই সত্য সন্ধানীর জন্য যথেষ্ট। তবে আল্লাহ (সুবঃ) যদি কারো অন্তরে মহর অংকিত করে দেন আর তার সামনে পাহাড় সমান প্রমাণ পেশ করা হয় তাহলে সেটা তার কোন কাজে আসবে না। তথাপি সে সত্য অনুসন্ধান করবে না।

এই অধ্যায়গুলোতে আমরা যা বুঝাতে চেয়েছি তা হলো এই সমস্ত লোকদের কুফরী শুধুমাত্র এক কারণে নয় যা কোন ব্যক্তি বিশেষের উক্তি বা সংশয়কে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে। বরং তারা শিরক ও কুফরের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত।

তাদের যুক্তি খন্ডন:

ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) এর মতের সঠিক ব্যাখ্যা:

আলী (রাঃ) এবং মুওয়াবিয়া (রাঃ) এর মধ্যে মতপার্থক্য এবং ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের অবসান ঘটানোর জন্য উভয় পক্ষ থেকে একজন করে সালিস নির্ধারণ করা হল। তখন খারেজীরা ক্ষেপে উঠলো এবং বলতে লাগল حكمتم الرجال 'তোমরা মানুষদেরকে বিচারের ভার দিয়েছো' অতঃপর এই আয়াত পাঠ করতে লাগল

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে ফায়সালা করে না তারা কাফের।" তখন ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন, كفر دون كفر 'এটা সে পর্যায়ের কুফর নয়'।

আমাদের এই অধ্যায়গুলোতে সবচেয়ে বেশী অনুধাবন করার বিষয় হল আমরা এখানে যে শিরক ও কুফরের কথা বলেছি, তা হলো আল্লাহর আইনের পরিবর্তে নিজের পক্ষ থেকে আইন প্রণয়ন করা এবং সে আইনেই বিচার

পরিচালনা করা। আমাদের কথার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের অনুসারী কোন মুসলিম শাসক কোন বিচার কার্যে ইসলামী শরীয়তের সঠিক বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্বীয় প্রবৃত্তির তাড়নায় কোন শিথিলতা করে ফেললে সে সাথে সাথে কাফের হয়ে যাবে। (বিষয়টি ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করা জরুরী)

আর ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে যে উক্তিটি (كفر دون كفر) বর্ণিত আছে বলে উল্লেখ করা হয়, [৫] তার সম্পর্ক হল এই দ্বিতীয় পর্যায়ের শাসকদের সাথে। আর প্রথম পর্যায়ের শাসকদের (যাদের শিরকের আলোচনা পূর্বে সবিস্তারে উদ্ধৃত হয়েছে) বিষয়ে ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর সাথে খারেজীদের কোনই মতানৈক্য হয়নি। কেননা সে জামানায় মুসলমানদের এমন একজন শাসকও ছিলেন না যিনি আল্লাহর সাথে সাথে নিজেকেও আইন প্রণয়নের অধিকারী হিসেবে দাবি করার মত দুঃসাহস দেখাতে পারেন। অথবা কোন একটি বিষয়ে নিজের পক্ষ থেকে কোন বিধান প্রণয়নের কথা ভাবতে পারেন। কেননা এটা তাদের নিকট সর্বসম্মতিক্রমে বড় কুফর ছিল (যা কোন মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়)।

আর ইবনে আব্বাস (রাঃ);

---

[৫] মুসতাদরাকে হাকেম এর বর্ণনাটিতে আল হাকিম বর্ণনা করেন, আলী বিন হারব থেকে , তিনি সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ থেকে, তিনি হিশাম বিন হুজাইর থেকে, তিনি তাউস থেকে বণর্না করেন যে, ইবনে অব্বাস বলেছেন, 'এটা ঐ কুফর নয় যেদিকে তোমরা ঝুকে পড়ছ (বুঝাতে চাচ্ছ), "আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সেই অনুযায়ী যারা ফায়সালা করে না তারা কাফির" হচ্ছে ছোট কুফর বড় কুফর নয় [কুফর দুনা কুফর]'। [আলমুস্তাদরাকে হাকেম, ভলিয়ম :২, পৃ:৩১৩]

হাদীসটির বিশুদ্ধতা ঃ যদিও আল হাকেম উক্ত হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন; কিন্তু সত্যতা হল এই যে, ইমাম আহমাদ, ইয়াহইয়া ইবনে হুযাইর এবং আরও অনেকে হিশাম ইবনে হুযাইরকে 'যাঈফ' বলেছেন (দেখুন তাহযীব আত তাহযীব, খন্ড:৬/২৫)। ইবনে আদিও তাকে 'যাঈফ' বণর্নাকারীদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন এবং আল উকাইলীও একই কথা বলেছেন (আয যুআফা আল কাবীর ,খন্ড ৪/২৩৮)। সুতরাং এই হাদীসটিকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করা যাবে না এবং এই একই রাবী হিশাম বিন হুযাঈর এর কারণেই প্রায় একই হাদীসের আরেকটি বণর্না যা ইবনে কাসীর উল্লেখ করেছেন (তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, খন্ড ২/৬২) সেটিও 'যাঈফ' এবং দলীল হিসাবে অগ্রহণযোগ্য।

وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

'আর তোমরা যদি তাদের অনুসরণ কর তাহলে নিশ্চয় তোমরা মুশরিকে পরিণত হবে'। [সূরা আনআম: ১২১] এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ উল্লেখ করে বলেন, এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে কোন একটি বিধানে মুশরিকদের অনুসরণ করার ব্যাপারে। [তানবীরুল মিক্ববাস মিন তাফসীরি ইবনে আব্বাস: ১/১৫৩]

সেই জামানার খারেজীরা যে বিষয় নিয়ে কোন্দল সৃষ্টি করেছিল তা যদি حكم তথা বিচার পরিচালনাকে تشـــريع তথা আইন প্রণয়নের অর্থে নিত, তাহলে ইবনে আব্বাস (রাঃ) কিছুতেই আইন প্রণয়নকে كفــر دون كفر বলতেন না। আর এটা বলা কিভাবেই বা তার পক্ষে বলা সম্ভব? কারণ তিনি তো ছিলেন কুরআনের উত্তম ব্যাখ্যাকারী।

বরং ঐ জামানার খারেজীরা,

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে ফায়সালা করে না তারাই কাফের।"[সূরা মায়িদা: ৪৪]

এই আয়াতটি সাহাবায়ে কিরামের কিছু ইজতিহাদী বিষয়কে ভুল সাব্যস্ত করে ব্যবহার করত।

তার একটি দৃষ্টান্ত হল যখন আলী (রাঃ) এবং মুওয়াবিয়া (রাঃ) এর মধ্যে মতপার্থক্য এবং ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের অবসান ঘটানোর জন্য উভয় পক্ষ থেকে একজন করে সালিস নির্ধারণ করা হল। তখন খারেজীরা ক্ষেপে উঠলো এবং বলতে লাগল حكمتم الرجــال 'তোমরা মানুষদেরকে বিচারের ভার দিয়েছো' অতঃপর এই আয়াত পাঠ করতে লাগল:

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে ফায়সালা করে না তারাই কাফের।"

এবং তারা দাবি করত যে ব্যক্তিই বিচার পরিচালনার ক্ষেত্রে সামান্য কমবেশী করল, তার ব্যাপারেই বলা যাবে যে, সে আল্লাহর বিধান মোতাবেক বিচার পরিচালনা করল না সুতরাং সে কাফের। তাই তারা নিযুক্ত উভয় বিচারক

এবং তাদের বিচারের ব্যাপারে যারা সন্তুষ্ট ছিল সকলকে কাফের বলে ঘোষণা করল। এমনকি আলী (রাঃ) এবং মুওয়াবিয়া (রাঃ)-কেও কাফের বলতে লাগল (নাউযুবিল্লাহ)। আর এটাই ছিল খারেজীদের ইসলামের গন্ডি থেকে বের হওয়ার প্রথম কারণ। আর এ কারণেই তাদের প্রথম ফেরকাকে محكمة 'মাহকামাহ্' বলা হয়।

এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) তাদের সাথে আলোচনা পর্যালোচনা করলেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) ছিলেন যাদের অন্যতম। তিনি তাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন, এই বিচারক নির্ধারণ মুসলমানদের মাঝে বিবাদ মিটানোর জন্য। এটাতো আল্লাহর বিধান ব্যতিরেকে এমন বিচার পরিচালনার জন্য নয় যাকে কুফরী বলা যায়। এবং তিনি প্রমাণ স্বরূপ কুরআনের আপর একটি আয়াত পেশ করলেন যা অবতীর্ণ হয়েছে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ মেটানোর জন্য।

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا

"আর যদি তোমরা তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের আশঙ্কা কর তাহলে স্বামীর পরিবার থেকে একজন বিচারক এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন বিচারক পাঠাও।" [সূরা নিসা: ৩৫]

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার বিবাদ মিটানোর জন্য যদি বিচারক নির্ধারণ বৈধ হয় তাহলে মুহাম্মদ (সাঃ) এর উম্মতের মাঝে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য কেন বৈধ হবে না?

ইতিহাসে উল্লেখ আছে এভাবে তিনি আরো দলিল পেশ করেন। এবং তিনি বলেন এই বিষয়টিকে (যদিও তার মাঝে কিছু ভুল-ভ্রান্তি ও সত্যবিচ্যুতি হয়েছে) তোমরা যে ধরণের কুফর মনে করছ এটা সে ধরণের বড় কুফর নয়। আর এ কথার উপর ভিত্তি করেই كفر دون كفر বাক্যটিকে ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়। এ ঘটনার পর তাদের একদল ভুল বুঝতে পেরে সত্য পথে ফিরে আসে। অপর দল আপন অবস্থায় অটল থাকে। অতঃপর আলী (রাঃ) এবং সাহাবায়ে কিরাম তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

সুতরাং একটু ভেবে দেখুন! আল্লাহর সাথে নিজেকেও বিধানদাতা বানানো, আল্লাহর বিধানকে পরিবর্তন করা, গাইরুল্লাহকে বিধানদাতা হিসেবে গ্রহণ করা, গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র অথবা অন্য কোন তন্ত্র-মন্ত্রকে দ্বীনরূপে গ্রহণ করা

আর অন্য দিকে সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) এবং খারেজীদের মাঝে যে বিষয়ে মতানৈক্য হয়েছে এবং সাহাবায়ে কিরাম তাদের সাথে কথা বলে তাদের দাবিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন ও ছোট কুফর বলে ঘোষণা দিয়েছেন এই দুই বিষয়ের মাঝে আদৌ কি সামান্যতম মিল আছে? **তাহলে সাহাবায়ে কিরামের এই ঘটনার দ্বারা বর্তমান সময়ে দলিল পেশ করে এই সমস্ত স্পষ্ট এবং জঘন্য কাফেরদের পক্ষে কেন সাফাই গাওয়া হচ্ছে?**

সারকথা হলঃ আল্লাহ (সুবঃ) এর বাণীঃ

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে ফায়সালা করে না তারাই কাফের।" এটা দুই ধরণের কুফরকে শামিল করেঃ বড় কুফর ও ছোট কুফর। ইসলামী শরীয়ার অনুসারী মুসলিম শাসক যদি জুলুম অথবা অন্যায়ভাবে বিচার পরিচালনা করে তাহলে তা ছোট কুফর। আর যদি নিজের পক্ষ থেকে আইন প্রণয়ন করে তাহলে তা হবে স্পষ্ট বড় কুফর।

আর এ কারণেই সালাফে সালেহীনগণ এই আয়াতকে যখন প্রথম ক্ষেত্রে (অর্থাৎ জুলুম ও অন্যায়ের ক্ষেত্রে) ব্যবহার করতেন তখন এটাকে ছোট কুফরের অর্থে ব্যবহার করতেন। আর যখন দ্বিতীয় ক্ষেত্রে (অর্থাৎ আইন প্রণয়ন ও আইন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে) প্রমাণ পেশ করতেন তখন এটাকে স্বাভাবিক তথা বড় কুফরের অর্থে গ্রহণ করতেন। যদিওবা এই আয়াতের মূল অর্থ হল বড় কুফর। কেননা এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল ইহুদীদের সম্পর্কে যখন তারা আল্লাহর আইন বাদ দিয়েছিল এবং নিজেদের তৈরী আইনের উপর ঐক্যমত পোষন করেছিল। আর তাদের এই কাজ ছিল প্রকাশ্য বড় কুফর যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। এই বিষয়টিতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। যেমনটি সহীহ মুসলিমে আছেঃ

مُرَّ عَلَى النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– بِيَهُودِىٍّ مُحَمَّمًا مَجْلُودًا فَدَعَاهُمْ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ « هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِى فِى كِتَابِكُمْ ».

قَالُوا نَعَمْ. فَدَعَا رَجُلاً مِنْ عُلَمَائِهِمْ فَقَالَ « أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ الَّذِى أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِى فِى كِتَابِكُمْ ». قَالَ لاَ وَلَوْلاَ أَنَّكَ نَشَدْتَنِى بِهَذَا لَمْ أُخْبِرْكَ نَجِدُهُ الرَّجْمَ وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِى أَشْرَافِنَا فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ وَإِذَا

أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ قُلْنَا تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ ». فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ) إِلَى قَوْلِهِ (إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ) يَقُولُ ائْتُوا مُحَمَّدًا -صلى الله عليه وسلم- فَإِنْ أَمَرَكُمْ بِالتَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ فَخُذُوهُ وَإِنْ أَفْتَاكُمْ بِالرَّجْمِ فَاحْذَرُوا. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) فِي الْكُفَّارِ كُلُّهَا

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার জিনার অপরাধে দন্ডপ্রাপ্ত কালিমাখা এক ইয়াহুদীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন রাসূল (সাঃ) ইয়াহুদীদেরকে ডাকলেন এবং বললেন তোমাদের কিতাবে কি জিনার শাস্তি এটাই আছে? তারা বলল হ্যাঁ! অতঃপর রাসূল (সাঃ) তাদের একজন আলেমকে ডাক দিয়ে বললেন, তোমাকে ঐ সত্তার শপথ করে বলছি যিনি মুসা (আঃ) এর উপর তাওরাত অবতীর্ণ করেছেন, তোমরা কি তোমাদের কিতাবে জিনার শাস্তি এমনটিই পেয়েছ? সে বলল, আল্লাহর শপথ! আপনি যদি আমাকে শপথ না দিতেন তাহলে আমি আপনাকে বলতাম না, আমরা আমাদের কিতাবে জিনার শাস্তি পেয়েছি 'রজম' (প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা)। কিন্তু আমাদের মর্যাদাশীল ব্যক্তিরা অহরহ জিনায় জড়িয়ে পড়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে আমাদের মধ্য থেকে যখন কোন মর্যাদাবান লোক জিনা করত আমরা তাকে ছেড়ে দিতাম। আর কোন সাধারণ লোক জিনা করলে আমরা তার উপর 'হদ' (দন্ডবিধি) কায়েম করতাম। পরবর্তীতে আমরা এ বিষয়ে পরস্পরে পরামর্শ করলাম। যে, আসুন আমরা জিনার জন্য এমন একটি বিধান প্রণয়ন করি যা বিশিষ্ট সাধারণ সকল মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। তখন কালি মাখা এবং দোররা মারার ব্যাপারে আমাদের ঐকমত হয়। এতদশ্রবণে রাসূল (সাঃ) বললেন, হে আল্লাহ আমিই সর্বপ্রথম তোমার এমন আদেশকে জীবিত করেছি যে আদেশকে তারা শেষ করে ফেলেছিল। তখন আল্লাহ (সুবঃ) অবতীর্ণ করেন:

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (والظالمون, والفاسقون)

"যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে ফায়সালা করে না তারাই কাফের"[৬] (যালেম[৭] ও ফাসেক[৮])। এ সবগুলো আয়াত কাফেরদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়। [সহীহ মুসলিম: কিতাবুল হুদূদ: ২৮-(১৭০০)]
যদি খারেজীরা এই আয়াতকে এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করত যে ইয়াহুদীদের মত আল্লাহর আইনকে পরিবর্তন কিংবা বর্জন করে নিজেদের রচিত আইন দ্বারা বিচার ফায়সালা করে তাহলে আব্বাস (রাঃ) সহ অন্য সাহাবায়ে কিরাম কিছুতেই তাদের এই সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করতেন না এবং এই আয়াতের আসল অর্থই বর্ণনা করতেন। অন্য কোন ব্যাখ্যার দিকে যেতেন না। আসল ব্যাপার হল সেই যামানায় এ ধরণের বড় কুফর অর্থাৎ আল্লাহর আইনকে পরিবর্তন করে মানব রচিত আইনে বিচার পরিচালনার অস্তিত্বই ছিলনা। কারণ যদি এর অস্তিত্ব থাকতই তাহলে তারা এর প্রমাণ স্বরূপ শুধু এই একটি আয়াত কেন বরং এর চেয়ে বেশী স্পষ্ট ও অধিক উপযোগী একাধিক আয়াত পেশ করত। (যে সমস্ত আয়াতের ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই।) যেমন আল্লাহ (সুবঃ) বলেন:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ

অর্থ: 'তাদের কি এমন শরীক আছে যারা তাদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের যার অনুমতি আল্লাহ দেননি।' [সূরা শু'রা : ২১]

وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

আর শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে প্ররোচনা দেয়, যাতে তারা তোমাদের সাথে বিবাদ করে। আর যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তবে নিশ্চয় তোমরা মুশরিক। [সূরা আনআম: ২১]

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ

অর্থ: 'যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন কবুল করতে চাবে তার থেকে তা কবুল করা হবে না।'[আল ইমরান: ৮৫]

---

[৬] সূরা মায়িদা: ৪৪।
[৭] সূরা মায়িদা: ৪৫।
[৮] সূরা মায়িদা: ৪৭।

এ সকল স্পষ্ট ও অকাট্য আয়াতকে এই জন্য দলিল হিসেবে পেশ করে নাই যে, আলোচ্য আয়াতগুলোর কোন একটি বিষয়ও সাহাবায়ে কিরামের সময় বিদ্যমান ছিল না।

সুতরাং সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) খারেজীদের উত্তরে যে কথা বলেছিলেন তা এই জামানার কুফর ও শিরক নিমজ্জিত শাসনের পক্ষে প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা নিতান্তই অযৌক্তিক ও অজ্ঞতার পরিচায়ক। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি এই কাজটি করে তাহলে সে সত্যকে মিথ্যার চাদরে ঢেকে ফেলার অপচেষ্টা চালালো এবং আলোকে আঁধারে পরিণত করার ব্যর্থ চেষ্টায় লিপ্ত হল। বরং (কা'বার রবের শপথ!) সে এক ভয়ানক অপরাধ করল।

ভাবার বিষয় হল, খারেজীরা সাহাবায়ে কিরামের যে বিষয়টি নিয়ে সমালোচনা করেছিল সেটি এবং বর্তমান শাসকদের অবস্থা এক নয়। বরং উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি উভয় বিষয়কে এক মনে করে, তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় সাহাবায়ে কিরামের বিষয়টি এবং এই সমস্ত শিরক দুটি একই মাপের। আর সাহাবায়ে কিরামকে তাদের সমমাপের মনে করা মানে সাহাবায়ে কিরামকেও তাদের মত কাফের ভাবা (নাউযুবিল্লাহ)। আর যে ব্যক্তি সাহাবায়ে কিরামদের তাকফীর করবে সে নিজেই কাফের হয়ে যাবে। কেননা সাহাবায়ে কিরামের প্রতি আল্লাহ (সুবঃ) সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এটা কুরআনের স্পষ্ট আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং ঐ সমস্ত শাসকদের শিরকসমূহ থেকে কোন একটিকেও যদি সাহাবায়ে কিরামের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করা হয় তাহলে তা কুরআনের স্পষ্ট আয়াতকে অস্বীকার করা হবে অথবা আল্লাহর ব্যাপারে বলা হবে যে, তিনি কাফেরদের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়েছেন! আর এই সবগুলোই কুফরী।

সুতরাং হে মুমিনগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। এবং সাহাবায়ে কিরামের কাজকে এই জামানার কাফেরদের সাথে তুলনা করে নিজেদের কে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না।

দ্বিতীয় সংশয়:
তারা তো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করে।

তারা বলে: কিরূপে তোমরা আইন প্রণয়নকারী শাসকবৃন্দ ও তাদের সাহায্যকারী সমস্ত সৈনিক, নিরাপত্তাবাহিনীর সদস্য ও অন্যদেরকে কাফের ঘোষণা দাও? আর এ কারণে তোমরা তাদেরকে সালাম পর্যন্ত দাওনা, তাদের সাথে কাফের সূলভ আচরণ কর। অথচ তারা সাক্ষ্য দেয় لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।' তোমাদের কাছে কি উসামা (রাঃ) এর ঘটনা পৌছেনি?

উসামা বিন যায়েদ ইবনে হারিসা (রাঃ) বলেন যে, রাসূল (সাঃ) জুহায়না গোত্রের হুরাকা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে আমাদের পাঠালেন। আমরা খুব ভোরে সে সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ করলাম এবং আমরা তাদের পরাজিত করলাম। আমি এবং একজন আনসার এক ব্যক্তির পিছু নিলাম। আমরা যখন তাকে ঘিরে ফেল্লাম তখন সে لا إلـه إلا الله বলল, আনসার তার মুখে কালিমা শুনে নিবৃত হলেন। কিন্তু আমি তাকে বল্লম দ্বারা এমন আঘাত করলাম যে, তাকে মেরেই ফেল্লাম। আমরা যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে ফিরে এলে নাবী (সাঃ) এর নিকট এ খবরটি পৌছলো। তিনি আমাকে ডেকে বললেন ঃ হে উসামা ! তুমি কি তাকে لا إله إلا الله বলার পরেও হত্যা করে ফেলেছ? আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে ব্যক্তিতো আত্মরক্ষার জন্যে এ কথা বলেছিল। রাসূল (সাঃ) আবার বললেনঃ তুমি কি তাকে لا إلـه إلا الله বলার পরে হত্যা করেছ? এভাবে রাসূল (সাঃ) বার বার আমার প্রতি একথা বলতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত আমার মনে এ আকাঙ্ক্ষা উদয় হলো যে, হায়! আজকের এ দিনের আগে আমি ইসলাম গ্রহণ না করতাম। [সহীহ মুসলিম: কিতাবুল ঈমান: ১৫৯-(৯৬)]

আর আল্লাহ (সুবঃ) এরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا

অর্থ: 'হে মুমিনগণ, তোমরা যখন আল্লাহর পথে বের হবে তখন তোমরা পরীক্ষা করবে, আর তোমাদের কেহ সালাম করলে তাকে তোমরা বল না যে তুমি মুমিন না'। [নিসা :৯৪]
এমনিভাবে হাদীসে এরশাদ হয়েছে:

من مات و هو يشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنة

অর্থ: 'যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল আর সে সাক্ষ্য দিত আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'। [মুসনাদে আহমাদ সহীহ সনদে: ২২০০৩; তাবারানী ৭৯/২০; নাসাঈ: ১১৩৪; ইবনে খুজায়মা: ২/৭৮৭]
এমনিভাবে হাদীসে এক ব্যক্তির ব্যাপারে এসেছে, যে কিয়ামত দিবসে ৯৯ টি গোনাহের খাতা বহন করে আনবে আর সে নিজেকে ধ্বংস প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত ভাববে। এই খাতা গুলোকে لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ লিখিত একটি চিরকুটের সাথে ওজন দেয়া হবে। অতঃপর চিরকুটের পাল্লাই ভারি হবে। [সুনানে ইবনে মাজা: ৪৩০০, তিরমিযী: ২৬৩৯; সনদ: সহীহ]
আরো এক হাদীসে এসেছে,

يسري على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية و يبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير و العجوز الكبيرة يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها قال صلة بن زفر لحذيفة فما تغني عنهم لا إله إلا الله و هم لا يدرون ما صيام و لا صدقة و لا نسك ..... فقال : يا صلة تنجيهم من النار

"হুযাইফা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন কোন এক রাত্রিতে কিতাবুল্লাহকে উঠিয়ে নেয়া হবে, তার থেকে একটি আয়াতও জমিনে অবশিষ্ট থাকবে না। বৃদ্ধ মানুষের একটি দল থাকবে যারা জানবে না যে, সিয়াম কী জিনিস, সদকা কী জিনিস আর কুরবানীই বা কী জিনিস। তারা বলবে আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে এই কালিমা (لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰـه) এর উপর পেয়েছি, তাই আমরা এই কালিমা পাঠ করি। সেলাহ (হাদীস বর্ণনাকারী) (রহঃ) জিজ্ঞাসা করলেন لَا إِلَهَ إِلَّـا اللّٰـه তাদের কী উপকারে আসবে ? অথচ তারা জানে না সালাত কী জিনিস,সাদাকা কী জিনিস, কুরবানী কী জিনিস! হযরত

হুযাইফা (রাঃ) উত্তরে বললেন, হে সেলাহ! 'কালিমা তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবে।" [মুসতাদরাকে হাকেম: ৮৬৩৫; হাকেম বলেন ইমাম মুসলীমের শর্তানুসারে সহীহ; ইমাম যাহাবী সনদের ব্যাপারে চুপ থেকেছেন।]

আমাদের জবাব: আল্লাহ (সুবঃ) ইরশাদ করেন:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ

অর্থ: 'তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যার কিছু আয়াত 'মুহকাম' এইগুলি কিতাবের মূল আর অন্যগুলি 'মুতাশাবিহ' যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে শুধু তারাই ফিতনা এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে মুতাশাবিহাতের অনুসরণ করে। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে আমরা ইহা বিশ্বাস করি" [আল ইমরান :৭]

সুতরাং আল্লাহ (সুবঃ) স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছেন: তিনি মানুষের জন্য প্রেরিত শরীয়তে কিছু মুহকাম আয়াত (স্পষ্ট আয়াত) দিয়েছেন- যার উপর শরীয়তের মূল ভিত্তি। মতবিরোধের সময় তার (মুহকাম আয়াত) থেকেই ফয়সালা গ্রহণ করতে হবে। এর বিপরীতে রয়েছে কিছু মুতাশাবিহ আয়াত (অস্পষ্ট আয়াত) যেগুলোর অর্থ একাধিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকার কারণে প্রমাণের ক্ষেত্রে অস্পষ্ট। যার অর্থ আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানেনা। এ ধরণের আয়াতের দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্য হলো বান্দাদেরকে পরীক্ষা করা যে, তারা কোন আয়াতগুলোর অনুসরণ করে।

অতএব যারা ভ্রান্তিবিলাসে মত্ত এবং পথভ্রষ্ট তারা এই মুতাশাবিহ আয়াত সমূহের অনুসরণ করে, আর মুহকাম আয়াত সমূহ ছেড়ে দেয়। যাতে করে তারা এই আয়াতগুলোর অপব্যাখ্যা দিতে পারে এবং মানুষের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়াতে পারে।

যারা সত্যের অনুসারী ও মজবুত ইলমের অধিকারী তারা মুতাশাবিহ আয়াত সমূহকে মুহকামের উপর ন্যস্ত করেন। কেননা মুহকাম আয়াত হলো কিতাবুল্লাহ্র মূল অংশ এবং এর উপরই তার ব্যাখ্যার ভিত্তি।

ইমাম শাত্বিবী (রহঃ) তার "আল ই'তেসাম" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন, এই নিয়মটি শুধুমাত্র কিতাবুল্লাহ্‌র জন্যই নয়, বরং ইহা হাদীস ও সীরাতে রাসূল (সাঃ) এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কারণ এমন কিছু হাদীস এবং ঘটনা বর্ণিত আছে যাতে বলা হয়েছে বা যা সংঘঠিত হয়েছে বিশেষ কোন পরিস্থিতিকে সামনে রেখে (যে হাদীসগুলো মুতাশাবিহ এর পর্যায়ে)।

সুতরাং এমন কোন হাদীসকে যদি গ্রহণ করা হয়, আর তার সাথে সম্পর্কিত অথবা তার মূল অর্থ ব্যাখ্যাকারী অপর হাদীসকে (যা মুহকামের পর্যায়ে) ছেড়ে দেয়া হয়। তাহলে এটা মুহকামকে বাদ দিয়ে মুতাশাবিহ গ্রহণ করার মতই হবে।

এমনিভাবে কোন ব্যক্তি যদি কোন "আ'ম"কে তার "মুখাসসিস"(মুখাসসিস / মুকায়্যিদ: ঐ বিষয়কে বলা হয় যার দ্বারা আ'ম তথা ব্যাপক ভাবে উল্লেখিত বিষয়কে শর্তযুক্ত করা হয়।) ব্যতিরেকে অথবা কোন "মুত্বলাক্ব"কে (আ'ম/ মুত্বলাক্ব ঃ ঐ বিষয় যাকে কোন ধরণের শর্ত ছাড়া ব্যাপকতার সাথে উল্লেখ করা হয়।)তার "মুকায়্যিদ" ব্যতিরেকে গ্রহণ করে অথবা অনেকগুলো মূলনীতি থেকে তার ইচ্ছামত এক-দুটি গ্রহণ করে তাহলে এটা এমন হবে যে, পরস্পর অপরিহার্য দুটি বিষয়ের মধ্য হতে একটিকে গ্রহণ ও অপরটিকে বর্জন করা হল।

উল্লেখিত সবগুলো বিষয়, মুহকাম কে বাদ দিয়ে মুতাশাবিহ গ্রহণ করার নামান্তর। আর যে ব্যক্তি এরূপ কাজ করল সে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আল্লাহর ব্যাপারে চরম মিথ্যাচার করল এবং শরীয়াত যা বলেনি তা শরীয়াতের সাথে যুক্ত করে দিল।

অথচ তার উপর জরুরী ছিল আল্লাহ ও তার রাসূলের (সাঃ) এর সকল কথার প্রতি বিশ্বাস রাখা এবং সবগুলো গ্রহণ করা ও পরিপূর্ণ ভাবে মেনে চলা।

কেননা নিজের মনমত যা হয় তা মেনে নিয়ে বাকি গুলোকে ছেড়ে দেয়া, পথভ্রষ্টদের রীতি এবং অধিকাংশ ভ্রান্তদের ভ্রান্তির কারণ।

কেননা খারেজীরা ঐ সময় ভ্রান্ত হয়েছে যখন তারা কিছু 'নস' (আয়াত এবং হাদীস) কে গ্রহণ করেছে এবং কিছু নস কে ছেড়ে দিয়েছে। তারা আল্লাহ তা'আলার এই আয়াতকে গ্রহণ করেছে,

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

অর্থ: 'আর যদি কেউ আল্লাহ্ ও তার রাসূলের (সাঃ) অবাধ্য হয়, আর তাঁর নির্ধারিত সীমালংঘন করে, তিনি তাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করবেন, সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং তার জন্যে অপমানজনক শাস্তি রয়েছে। [নিসা :১৪]

এই আয়াতের ভিত্তিতে তারা, যে ব্যক্তিই কবিরা গুনাহ করত, তাকেই অমুসলিম ঘোষণা করত। অথচ ইহা হলো একটি 'আ'ম' আয়াত, যার সঠিক মর্ম তার 'মুখাসসিস' ছাড়া অনুধাবন করা সম্ভব নয়। তার মুখাসসিস হলো অপর একটি আয়াত,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

অর্থ: "নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমা করেন না তাঁর সাথে শরীক করাকে এবং এ ছাড়া যাকে চান ক্ষমা করেন। আর যে আল্লাহর সাথে শরীক করে সে তো ঘোর পথভ্রষ্টতায় পথভ্রষ্ট হল।" [নিসা :১১৬]

এই আয়াতের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে তারা শুধু প্রথম আয়াতের ভিত্তিতে বিধান বর্ণনা করেছে, ফলে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।

এমনিভাবে মুরজিয়ারা পথভ্রষ্ট হয়েছে শুধু ঐ সমস্ত 'নস' (আয়াত ও হাদীস) কে গ্রহণ করার কারণে যেগুলোতে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

যেমন: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة অর্থ: "যে ব্যক্তি لا اله الا الله পাঠ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে" [তিরমিজী: ২৬৩৮; মুসনাদে আহমাদ: ২২২০৩; সনদ: হাসান]

তাই তারা আমলের ব্যাপারে চরম অবহেলা করেছে এবং ভেবেছে যে, কোন ব্যক্তি মুসলিম হওয়া এবং জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য শুধু কালিমা পাঠ করাই যথেষ্ট। যদিও সে (যারা শুধু মুখে কালেমা উচ্চারণ করাকে ঈমানের জন্য যথেষ্ট মনে করে) কালিমার শর্ত সমূহ বাস্তবায়ন এবং তার দাবি সমূহ পূরণ করে না; এমনকি যদিও তা তার জন্য সম্ভব ছিল এবং তার সাধ্যের মধ্যেই ছিল।

অথচ উলামায়ে কেরাম শর্তগুলো ও দাবিগুলো সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। যেমন ইমাম বুখারী (রহঃ) সহীহ বুখারীতে ওহাব বিন মুনাব্বাহ এর বরাতে উল্লেখ করেন,

وقيل لوهب بن منبه أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة ؟ قال بلى ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك

"ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ কে বলা হল لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّــه কি জান্নাতের চাবি না? তিনি বললেন হ্যাঁ! সকল চাবির জন্য দাঁত আবশ্যক, যদি তুমি দাঁত যুক্ত চাবি নিয়ে আস, তাহলে তোমার জন্য (জান্নাত) খুলে যাবে অন্যথায় নয়।" [সহীহ বুখারীর ১২৩৭ নং হাদীসের ভূমিকা]

কালিমার দাঁত হলো তার শর্ত সমূহ পূর্ণ করা এবং এই দাঁতকে বিনষ্ট করে এমন কাজ থেকে বিরত থাকা ।

কেননা যে ব্যক্তি দ্বীন-ইসলামের হাকীকত অর্থাৎ অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে পেরেছে সে নিশ্চিত ভাবে জানে যে, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّــه দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তার মাঝে নিহিত অর্থ {الكفر بالطاغوت} "তাগুতকে অস্বীকার" ও {الإيمان بـــالله} "আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস" ।

সুতরাং কালিমার অন্তর্নিহিত অর্থের প্রতি লক্ষ্য করা ও তার দাবিগুলো পূর্ণ করা এবং তার বিপরীতমূখী জিনিস থেকে বিরত থাকা ব্যতীত শুধুমাত্র মুখে উচ্চারণ করা আল্লাহর উদ্দেশ্য নয়। তাইতো আল্লাহ পাক এরশাদ করেন فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّــه অর্থ: "তুমি জেনে রাখ তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই"। [সূরা মুহাম্মাদ:১৯](এই আয়াতে জানার কথা বলা হয়েছে।)

তিনি আরো এরশাদ করেন: إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ "তবে তারা ছাড়া যারা জেনে–শুনে সত্য সাক্ষ্য দেয়" [সূরা যুখরুফ :৮৬]

(এখানেও জেনে-বুঝে সাক্ষ্য দেয়ার কথা বলা হয়েছে।)

এমনিভাবে হাদীসে এসেছে:

من مات و هو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة

অর্থঃ 'যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল, আর সে জানত; আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে ।' [মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন লিল হাকেম: ২৪২; সনদ: সহীহ]

উল্লেখিত হাদীসে এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, শুধু উচ্চারণ নয় বরং অর্থ জানা এবং বিশ্বাস করা কালিমার জন্য শর্ত।

আর এই কালিমার অর্থ দুটি জিনিসকে অন্তর্ভূক্ত করে এক. আল্লাহর এককত্বকে মেনে নেয়া। দুই. আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল উপাস্য কে বর্জন করা। ইমাম নববী (রহঃ) এই কালিমার উপর সহীহ মুসলিমে একটি অধ্যায় বিন্যাস করেছেন তা হলো- باب من مات علي التوحيد دخل الجنة "অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাওহীদের উপর মৃত্যুবরণ করল, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

এখানে আমাদের লক্ষণীয় বিষয় হল যে, তিনি من قال "যে বলল" বলেননি, বরং তিনি বলেছেন من مات علي التوحيد "যে তাওহীদের উপর মৃত্যুবরণ করল"। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল তাওহীদকে নিশ্চিতভাবে বাস্তবায়ন করা, যে তাওহীদ এই কালিমার অর্থের মধ্যে নিহিত আছে।

কালিমার হক গুলো আদায় না করে এবং তার বিপরীতমুখী বিষয় সমূহ থেকে বিরত না থেকে শুধুমাত্র মুখে উচ্চারণ করা কালিমার উদ্দেশ্য নয়। যেমন বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সাঃ) মুআয (রাঃ) কে ইয়ামানে পাঠানোর সময় অসিয়ত করেছিলেন এবং দাওয়াতের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়ে, বলেছিলেন:

فليكن اول ما تدعوهم الي ان يوحدوا الله

"সর্বপ্রথম তুমি তাদেরকে দাওয়াত দিবে তারা যেন তাওহীদকে স্বীকার করে নেয়।"

[সহীহ মুসলীম ৩১-(১৯) তাওহীদ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স; সহীহ বুখারী:৭৩৭২]

এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, কালিমার অর্থ হলো গ্রহণ ও বর্জন। শুধু মাত্র মুখে উচ্চারণ নয়।

সুতরাং এই সমস্ত মুসলিম বেশধারী তাগুতদের সৈনিক ও অন্যান্য সাহায্যকারী, যারা এই তাগুতদেরকে অস্বীকার করাতো দূরের কথা বরং তাগুতদের সাহায্য করে, তারা মুসলিম হতে পারে না।

তাই তারা যদি এই শিরকের উপরেই মারা যায় তাহলে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। যদিও তারা হাজার বার মুখে لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ উচ্চারণ করে।

মুসায়লামাতুল কাযযাবের অনুসারীরা لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ বলতো, সালাত আদায় করতো, সিয়াম পালন করতো। মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর নাবী ও রাসূল এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করত। কিন্তু তারা শুধুমাত্র রাসূলের রিসালাতের সাথে

অপর এক ব্যক্তিকে শরীক করতো, ফলে তারা কাফের হয়ে গেছে। তাদের রক্ত ও সম্পদ মুসলিমদের জন্যে হালাল হয়ে গেছে। কালিমা পাঠ তাদের কোনই উপকারে আসেনি। একটি মাত্র কারণ ছিল, আর তা হলো রাসূলের রিসালাত ও নবুওয়্যতে অপর একজনকে অংশীদার করা। তাহলে ঐ ব্যক্তির অবস্থা কী হবে যে মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সৃষ্টিকর্তার সাথে অপর কাউকে শরীক করে?

উল্লেখিত আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম, কালিমা শুধু মুখে উচ্চারণই যথেষ্ট হবে না বরং তার অর্থ জানতে হবে ও শর্ত মানতে হবে।

বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম কালিমার শর্ত সমূহ উল্লেখ করেছেন এবং এর প্রমাণগুলো পেশ করেছেন। যাতে কোন মুসলিম এটাকে শুধুমাত্র মুখে উচ্চারণের বাক্য না ভাবে।

শর্তগুলো এই:

(১) কালিমার দাবিগুলো জানা থাকা অর্থাৎ গ্রহণীয় ও বর্জনীয় বিষয়গুলো জানা থাকা।

(২) কালিমার দাবিগুলো অবনত মস্তকে মেনে নেয়া ।

(৩) মুখে উচ্চারণ করা এবং অন্তরে বিশ্বাস করা।

(৪) সব ধরণের শিরক থেকে মুক্ত হয়ে শুধুমাত্র এক আল্লাহর জন্য আমল করা।

(৫) কালিমার দাবিগুলোর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখা এবং এতে কোন সংশয় না রাখা।

(৬) কালিমার শর্তপূরণকারী এবং তদানুযায়ী আমলকারীর প্রতি আন্তরিক ভালবাসা রাখা। কালিমার বিরোধীতাকারীদের প্রতি ঘৃণা রাখা।

(৭) কালিমার সব দাবি মুখে ও অন্তরে গ্রহণ করে নেয়া এবং যারা এই কালিমা কে অস্বীকার করে এবং বিরোধিতা করে তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা।

এই অধ্যায়ের শুরুতে প্রতিপক্ষের উল্লেখিত দ্বিতীয় হাদীস:

من مات و هو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এই কথা সাক্ষ্য দিয়ে মৃত্যুবরণ করল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" [মুসনাদে আহমাদ :১৬৪৮৩ : সনদ সহীহ]

এর জবাবে আমরা বলব: এই হাদীসটির সঠিক অর্থ বুঝার জন্য তাকে কিতাবুল্লাহর নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয়ের সাথে মিলাতে হবে। কেননা হাদীসের যে অর্থ তারা গ্রহণ করেছে তা কিতাবুল্লাহর সাথে সাংঘর্ষিক। আয়াতদ্বয় হলো :

এক.

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا

অর্থ: "অতএব, যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে মজবুত রশি আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয়। [সূরা বাক্বারা: ২৫৬]

দুই.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

অর্থ: "নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমা করেন না তাঁর সাথে শরীক করাকে এবং এ ছাড়া যাকে চান ক্ষমা করেন। আর যে আল্লাহর সাথে শরীক করে সে তো ঘোর পথভ্রষ্টতায় পথভ্রষ্ট হল।" [সূরা নিসা: ১১৬]

সুতরাং কোন মুশরিক যদি হাজার বার لا إلــه إلا الله পাঠ করে এবং তার অর্থকে অনুধাবনও করে, কিন্তু শিরক করে এবং তাগুতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে কখনো ক্ষমা করবেন না। এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। যেমন তিনি বলেছেন

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ

"অর্থ: নিশ্চয় যে আল্লাহর সাথে শিরক করবে,আল্লাহ তা'আলা তার উপর জান্নাত হারাম করবেন। আর তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম।" [মায়েদা ৫:৭২]

এ বিষয়ে অন্য হাদীসগুলোও আমাদের জানা থাকা উচিৎ । তাহলে প্রকৃত অবস্থা বুঝতে সহজ হবে। হাদীসে এসেছে:

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ لاَ يَلْقَى اللَّهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فِيهِمَــا إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ (صحيح مسلم)

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি আল্লাহর রাসূল"। যে ব্যক্তি এই দুই সাক্ষ্য প্রদান করে

আল্লাহর সাথে এমতাবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, সে এ ব্যাপারে সন্দিহান ছিল না, তাহলে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।" [সহীহ মুসলিম: কিতাবুল ঈমান: ৪৪-(২৭)]
অপর হাদীসে এসেছে:

ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار

"অর্থ যে ব্যক্তি সত্য হৃদয়ে সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল' আল্লাহ তার জন্যে জাহান্নামকে হারাম করে দিবেন।" [সহীহুল বুখারী :১২৮ আ.প্র.১২৫,ই.ফা.১৩০[১]]
এ ধরণের আরো অন্যান্য হাদীসেও বিষয়টি পুরোপুরিভাবে স্পষ্ট রয়েছে। আর এভাবেই সকল নস (আয়াত ও হাদীস) এর সমন্বয়ে দ্বীন বুঝে আসে, ইলম অর্জিত হয় এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও ইচ্ছা জানা যায়।
এ কারণেই ইমাম নববী (রহঃ) এধরণের (من مات و هو يشهد) হাদীসের ব্যাখ্যায় কতিপয় আলেমের মতামত ব্যক্ত করেছেন।
'হাসান বসরী (রহঃ) এর মত হলো: এই হাদীসগুলো 'মুজমাল' তথা সংক্ষিপ্ত যার ব্যাখ্যা আবশ্যক। উক্ত হাদিসে উদ্দেশ্যিত ব্যক্তি হলো সে, যে কালিমা মুখে উচ্চারণ করবে তার হক্ব আদায় করবে এবং তার আবশ্যকীয় বিষয়গুলো পালন করবে।'
'ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন: এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ ব্যক্তি যে, তাওবা ও রোনাজারীর সময় এই কালিমা পাঠ করে এবং তার থেকে ঈমান বিনষ্টকারী কোন কথা বা কাজ প্রকাশ পাওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে।'
আমরা পূর্বোক্তি আলোচনার দ্বারা বুঝতে পেরেছি যে, তাওহীদের মূল ভিত্তি হল الكفر بالطاغوت (তাগুত্বকে অস্বীকার করা) ও الإيمان بـالله (আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন) এবং এই কালিমার যাবতীয় শর্তসমূহ পূরণ করা। অতএব হাদীসে বেতাকার (চিরকুটের হাদীস) সঠিক ব্যাখ্যা বুঝার জন্য সেটাকে আল্লাহর স্পষ্ট আয়াতের সাথে মিলাতে হবে।
আল্লাহ পাক এরশাদ করেন,

---

[১] আ.প্র. অর্থ আধুনিক প্রকাশণীর সহীহুল বুখারী আর ই.ফা. অর্থ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর সহীহুল বুখারী।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

অর্থ: "নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমা করেন না তাঁর সাথে শরীক করাকে এবং এ ছাড়া যাকে চান ক্ষমা করেন। আর যে আল্লাহর সাথে শরীক করে সে তো ঘোর পথভ্রষ্টতায় পথভ্রষ্ট হল।" [সূরা নিসা: ১১৬]

অতএব সে যে ৯৯ টি খাতা নিয়ে এসেছিল সেগুলো কিছুতেই কুফুর বা শিরক ছিল না বরং অন্য কোন গুনাহ ছিল। কেননা শিরককারীকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন না এবং জান্নাত তাদেরে জন্যে হারাম। কারণ এই সমস্ত রেজিষ্টারের মধ্যে কোন একটি গুনাহ যদি ঈমান বিধ্বংসী হত তাহলে তার বেতাকা তথা চিরকুটের ওজন ভারী হত না এবং ঐ ব্যক্তি নাজাতও পেত না। কারণ তার এই চিরকুট তখন সঠিক তাওহীদের হত না, বরং এটা হত মুখ নিসৃত একটি বাক্য মাত্র। যার অর্থের দিকে লক্ষ্য করা হয়নি এবং তার দাবিও পূর্ণ করা হয়নি।

এই সমস্ত রেজিষ্টারের মধ্যে যদি গাইরুল্লাহর জন্য ইবাদাত এবং আল্লাহর সাথে বিধানদাতা সাব্যস্ত করা অথবা বিধানদাতাকে সাহায্য করা, তাদের সাথে ভালোবাসা রাখা, দ্বীন-ধর্মকে কটাক্ষ করা এবং দ্বীনের মুজাহিদগনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত কোন অপরাধ থাকে তাহলে এই চিরকুট কোন কাজেই আসবে না কেননা এই সকল অপরাধ মানুষকে ব্যর্থ-বিফল করে দেয় এবং তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব করে দেয়। বরং এই রেজিষ্টার সমূহ ছিল শিরক ব্যতীত অন্যান্য গুনাহ যা তাওহীদ বিনষ্টকারী নয়।

উক্ত হাদীসে তাওহীদের গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বুঝানো হয়েছে এবং এটাই বুঝানো হয়েছে, যে ব্যক্তি তাওহীদ কে মেনে নিবে এবং স্বীয় প্রভূর সন্তুষ্টি অনুযায়ী সে তার শর্তগুলো পূরন করবে। আল্লাহ (সুবঃ) তার বাকি সব গুনাহ ক্ষমা করবেন। হাদীসে কুদসীতে এই বিষয়টি আরো স্পষ্ট ভাবে বর্ণিত আছে:

يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة

"হে আদম সন্তান! তোমরা যদি দুনিয়া সমান গুনাহ নিয়েও আমার কাছে আস অতঃপর আমার সাথে সাক্ষাৎ কর এমতাবস্থায় যে, তোমরা আমার

সাথে কাউকে শরীক করনি, তাহলে আমি তোমাদেরকে তার সমপরিমাণ মাগফিরাত দান করব।"[সুনানে তিরমিযী: ৩৫৪০; সিলসিলাতুস সাহীহাহ লি আলবানী: ২৮০৫; সনদ: সহীহ]

উল্লেখিত হুযাইফা (রাঃ) এর হাদীসটি (....... يسري على كتاب الله في ليلـــة) যদি সহীহ হয়[১০], তাহলে এর উদ্দেশ্য হবে, ঐ সমস্ত লোক যারা এই কালিমা ব্যতীত শরীয়তের অন্যান্য জিনিস সম্পর্কে বে-খবর। সে এই কালিমার শর্তগুলো পূর্ণ করবে এবং আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না। (কেননা আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন না যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে) তাহলে তারা তাওহীদে বিশ্বাসীদের মধ্যে গন্য হবে। আর তারা যে সালাত, যাকাত, কুরবানী ইত্যাদী আদায় করেনি এ জন্য আল্লাহর নিকট ওযর পেশ করবে কেননা প্রমাণ ছাড়া শরীয়াত বুঝা সম্ভব নয়, অথচ হাদিসে উল্লেখ আছে, তাদের সময় কিতাবুল্লাহ কে উঠিয়ে নেয়া হবে, ফলে তার একটি আয়াতও বাকী থাকবে না। আর কিতাবুল্লাহ হল এমন এক হুজ্জত (প্রমাণ) যাকে আল্লাহ (সুবঃ) অবতীর্ণ করেছেন মানুষদেরকে সতর্ক করার জন্য। আল্লাহ (সুবঃ) বলেছেন:

وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ

অর্থ: 'আর এ কুরআন আমার কাছে ওহী করে পাঠানো হয়েছে যেন তোমাদেরকে ও যার কাছে এটা পৌছবে তাদেরকে এর মাধ্যমে আমি সতর্ক করি।' [সূরা আন'আম: ১৯]

সুতরাং যার নিকট কুরআন পৌছবে তার আর কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না। আর যার নিকট কুরআন পোঁছবে না সে শরীয়ার শাখাগত বিষয়ে অক্ষম বিবেচিত হবে কিন্তু সে তাওহীদের মৌলিক বিষয়ে অক্ষম সাব্যস্ত হবে না। কেননা তাওহীদ এমন একটি বিষয় আল্লাহ যার জন্য অনেক প্রমাণ পেশ করেছেন। আর এ জাতীয় লোকদের অবস্থা হবে যায়েদ বিন আমর বিন নুফাইল এর ন্যয়। তার নিকট কোন নবী না আসা সত্ত্বেও তিনি একজন একনিষ্ঠ মুসলিম ছিলেন। কেননা তিনি তাওহীদের মৌলিক দাবি সমূহ পূর্ণ করেছিলেন এবং ইব্রাহীম (আ:) এর শরীয়াতের অনুসারী ছিলেন। ইবনে ইসহাক বর্ননা করেন, তিনি বলতেন "হে আল্লাহ আমি যদি তোমার

---

[১০] হাকেম বলেন: ইমাম মুসলিমের শর্তে হাদীসটি সহীহ।

ইবাদাতের সর্বোত্তম পদ্ধতি জানতাম তাহলে সে ভাবেই তোমার ইবাদাত করতাম কিন্তু আমি তা জানি না।" [ফাতহুল বারী ইবনে হাজার ২১/২১৮]
শরীয়তের বিস্তারিত বিষয়সমূহ যে গুলো রাসূল (সাঃ) এর মাধ্যম ছাড়া জানা সম্ভব নয়, সেগুলোর ক্ষেত্রে ওযর গ্রহণ করা হবে। কেননা সে তো জানেই না সালাত কী জিনিস? যাকাত কী জিনিস? এ কারণে এগুলোর ক্ষেত্রে অক্ষমতা গ্রহণযোগ্য হবে।
কিন্তু তাওহীদের বিষয়টি ব্যতিক্রম। তাওহীদের মৌলিক দাবি পূর্ণ করা ছাড়া মুক্তি নেই। কেননা তাতো বান্দার প্রতি আল্লাহর প্রথম দাবী। আর এ কারণেই তিনি সমস্ত রাসূলকে প্রেরণ করেছেন এবং এর উপর অনেক প্রমাণ পেশ করেছেন, কিন্তু মুহাদ্দিসীনে কিরামের মত অনুযায়ী: تنجيهم من النار এই উক্তিটি রাসূল (সাঃ) এর নয়। আর কতিপয় মুহাক্কিক আলেমের মতে এই হাদীসটি সহীহ নয়। কেননা হাদীসটির রাবি আবু মুয়াবিয়া খাজেম আজ-জারির ছিল 'মুদাল্লিস' (উস্তাদের নাম গোপনকারী)। আর আ'মাশ ছাড়া অন্যান্যদের থেকে তার বর্ণিত হাদিসগুলো 'যাঈফ' (দুর্বল)। আর এটা সে আ'মাশ ব্যতীত অন্যান্যদের থেকে বর্ননা করেছে, তা ছাড়া সে ছিল কঠোর মুরজিয়া[১১]। যেমনটি ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) ও অন্যান্য

---

[১১] মুরজিয়া একটি বাতিল ফেরকা। এদের আক্বীদা সমূহের মধ্যে রয়েছেঃ

কেবল আল্লাহ এবং রাসূলের মা'রেফাতের (পরিচয়) নামই ঈমান। আমল ঈমানের মূলতত্ত্বের পর্যায়ভূক্ত নয়। ঈমানের সাথে কোন পাপাচার মানুষের ক্ষতি করতে পারে না। এ চিন্তাধারার কাছাকাছি আর একটি দৃষ্টিভঙ্গি এই ছিল যে, ভাল কাজের নির্দেশ এবং খারাপ কাজে নিষেধ এর জন্য যদি অস্ত্র ধারণের প্রয়োজন দেখা দেয়; তা হলে এটা একটা ফেতনা। সরকারের যুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে মুখ খোলা জায়েয নয়। আল্লামা আবু বকর জাসসাস এ জন্য অত্যন্ত কঠোর ভাষায় অভিযোগ করে বলেন, এসব চিন্তা যালেমের হাত সুদৃঢ় করেছে। অন্যায় এবং ভ্রান্তির বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রতিরোধ শক্তিকে মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। মুরজিয়ারা 'আমলের দিক দিয়ে ইসলামকে পঙ্গু করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়ে প্রকাশ করল যে; সালাত, সিয়াম, যাকাত ইত্যাদি ইসলামী আদেশ সংক্রান্ত আমল সমূহের সাথে ঈমানের কোনই সম্পর্ক নেই। এসব কর্মের দ্বারা ঈমান বাড়ে না। অনুরূপ ব্যভিচার, মদ্যপান, জুয়া, চুরি ইত্যাদি অন্যায় কাজে ঈমান কমে যায় না। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে স্বীকার করার পর কোন গোনাহই মানুষের জন্য ক্ষতিকর

মুহাদ্দিসীনে কেরাম বর্ণনা করেছেন, আর এটা হল ঐ হাদীস যার দ্বারা কঠোর মুরজিয়ারা প্রমাণ পেশ করে থাকে। আর উলামায়ে কিরাম বেদআতীদের এমন বর্ননাকৃত হাদিস গ্রহণের ক্ষেত্রে সর্তক করেছেন যা দ্বারা তারা তাদের বেদআতী কাজে সাহায্য গ্রহণ করে। আর এই হাদীস দ্বারা মুরজিয়ারা তাদের মতের পক্ষে সাহায্য গ্রহণ করে, সাথে সাথে এই হাদীসটি 'যয়ীফ' এবং 'মুদাল্লাস' (মুদাল্লিসঃ ঐ হাদীস বর্ণনা কারী যে তার পূর্বের রাবীর নাম গোপন করে।)।

আর উসামা (রাঃ) এর হাদীসটি ("লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা সত্ত্বেও তুমি তাকে হত্যা করলে?") ছিল ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যে যুদ্ধের ময়দানে ইসলাম গ্রহণ করেছে, আর ইসলামের نواقض (যা ঈমান নষ্ট করে দেয়) থেকে কোন একটি তার থেকে প্রকাশ পায়নি। এই পরিস্থীতিতে তাকে হত্যা করা বৈধ ছিলনা। কেননা লোকটা ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তার থেকে ঈমান বিনষ্টকারী কোন জিনিস প্রকাশ না পাওয়া পযর্ন্ত তাকে হত্যা না করা আবশ্যক ছিল। আর এ কারণেই ইমাম নববী (রহঃ) সহীহ মুসলিমে باب تحريم قتل الكافر بعد قوله لا اله الا الله (কোন কাফের 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করার পর তাকে হত্যা করা হারাম) এই শিরোনামে একটি অধ্যায় এনেছেন। কিন্তু ভালভাবে জেনে রাখা উচিত, সে যদি পরবর্তীতে এই কালিমার উপর অটল না থাকে। এই কালিমার মৌলিক দাবিগুলো পূর্ণ না করে এবং তার نواقض (যা ঈমান ধ্বংস করে দেয়) থেকে বিরত না থাকে, তাহলে সে মুসলিম বলে গণ্য হবে না। বরং তাকে হত্যা করা বৈধ হবে। সতরাং উভয় বিষয়ে পার্থক্য অনুধাবন করা উচিত। আর হাদীসে উল্লেখিত ব্যক্তি হত্যা করার পূর্বমূহুর্তে ইসলাম গ্রহণ করেছে। আর তার থেকে কোন نواقض

নয়। মুরজিয়ারা এভাবে শরীয়াতের অনুশাসন বাতিল করে ঈমান কেবল মুখে মুখে উচ্চারণ ও মনে বিশ্বাস করাই যথেষ্ট বলে প্রচার করে। এভাবে এরা ইসলামের বিধিনিষেধ পালনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট শিথিলতা ও সুবিধার আমদানী করল। ইমাম ইবনুল জাওযী (রহঃ) তাদের (মুরজিয়া) আক্বীদা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ তাদের বিশ্বাস কালেমা শাহাদাত একবার পাঠ করার পর যত প্রকার অন্যায় করুক ঐ অন্যায়ের শাস্তি ভোগের জন্য আদৌ জাহান্নামে প্রবেশ করতে হবে না।

(ঈমান বিনষ্টকারী কোন কথা বা কাজ বা বিশ্বাস) পাওয়া যায়নি। সে তো এমন ব্যক্তি ছিলনা যে বছরের পর বছর নিজেকে মুসলিম দাবি করে আসছে অথচ সে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত। আর বিপরীতে তাগুত ও তাগুতের বন্ধুদের সাথে এবং তাগুতের বিধানদাতাদের সাথে বন্ধুত্বের বাধনে আবদ্ধ। কেননা এই ব্যক্তি যদি হাজার বার لا إله إلا الله বলে তাহলেও এই কালিমা তার সামান্য উপকারে আসবে না, যতক্ষণ না সে কুফুর ও শিরক ছেড়ে দেয় এবং যে সব তাগুতের সে অনুসরণ করে, বন্ধুরূপে গ্রহণ করে ও যার রক্ষক হিসাবে নিয়োজিত, সে সব তাগুতের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে। আর এটাই হল কালিমার মূল দাবি। যা আমাদের তাকফীরকৃত ব্যক্তিরা পালন করছে না।
আল্লাহর বানী-

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا

"আর যে ব্যক্তি তোমাদেরকে সালাম দেয় তোমরা তাকে বলবে না তুমি মুমিন নও"। [সূরা নিসা: ৯৪]
এই আয়াতের শানে নুযুলঃ হাদীসে আছে, যুদ্ধের সময় একবার সাহাবাগণ (রাযিঃ) একজনকে আক্রমণ করতে গেলে সে ভয়ে তার কাছে যা কিছু ছিল সব সাহাবীদের দিয়ে কালিমা পড়ে ফেলল। সাহাবাগণ (রাযিঃ) তখন লোকটাকে হত্যা করল, তারা ভেবে ছিল লোকটা তাদের ভয়ে কালিমা পড়েছে। আল্লাহ তা'আলা তখন বিষয়টি যে তার অপছন্দনীয় এটা জানিয়ে উক্ত আয়াত নাযিল করেন।
কোন ব্যক্তি যদি নিজেকে মুসলিম দাবি করে, আর তার মাঝে ইসলামের বিপরীত কোন কিছু না পাওয়া যায় তাহলে তার বাহ্যিক অবস্থার উপর বিচার করা উচিত। কিন্তু যখন প্রকাশ পাবে সে মুসলিম দাবি করে, এর সাথে সাথে অন্য কুফুরিও করে তাহলে তার ইসলাম গ্রহণযোগ্য হবে না। যতক্ষন না সে এই সকল জিনিস থেকে মুক্ত হয় এবং একনিষ্ঠ ভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দ্বীনকে গ্রহণ করে। এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতের পুর্বে ও পরে বলেছেন। فتبينوا অর্থাৎ তোমরা অনুসন্ধান কর।

তৃতীয় সংশয়:

তারা তো সালাত কায়েম করে সিয়াম পালন করে।

তারা বলে: এসব সৈন্য এবং সরকারী কর্মচারীদেরকে তোমরা কিভাবে কাফের বল? অথচ তাদের কেউ কেউ সালাত কায়েম করে, সিয়াম পালন করে এবং হজ্জ আদায় করে। আর তারা প্রমাণ স্বরূপ সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীস পেশ করে। যাতে জালিম শাসকের আলোচনা করা হয়েছে। কেননা সাহাবায়ে কিরাম বলেছিলেন:
أَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ 'আমরা কি তাদের সাথে যুদ্ধ করব না' রাসূল (সাঃ) বললেন,
لاَ مَا صَلَّوْا 'না! যতক্ষণ সালাত আদায় করে' [সহীহ মুসলিম: কিতাবুল ইমারাহ:৬২-(১৮৫৪)]

আমাদের জবাব: পাঠক পূর্বে জেনেছেন আল্লাহ (সুবঃ) যে দ্বীন দিয়ে সমস্ত নবী রাসূলকে প্রেরণ করেছেন তা হল তাওহীদ, আর এই তাওহীদ সকল আমল এবং ইবাদাত কবুল হওয়ার জন্য প্রধান শর্ত। সুতরাং এই শর্ত পূরণ করা ব্যতীত আমল কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হবে না। সাথে সাথে আরো একটি শর্ত আবশ্যক তা হলো রাসূল (সাঃ) এর অনুসরণ। সুতরাং উভয় শর্ত পাওয়া না গেলে কোন আমলই গ্রহণযোগ্য হবে না।

তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কাফেরদের অনেক আমলের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, এগুলো তিনি কবুল করবেন না। বরং সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধুলিকনায় পরিণত করবেন। কেননা এসব আমলে তাওহীদ ও রাসূল (সাঃ) এর অনুসরণ বিদ্যমান ছিল না। যেমন আল্লাহ (সুবঃ) বলেন:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ

অর্থ: 'যারা কফের তাদের আমল মরুভূমির মরীচিকা সাদৃশ্য'। [সূরা নূর: ৩৯]

এমনিভাবে হাদীসে কুদসীতে আছে, মুহাম্মদ (সাঃ) বলেন: আল্লাহ (সুবঃ) বলেছেন:

أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ

"আমি সকল শরীকদের থেকে এবং তাদের শিরক থেকে অমুখাপেক্ষী। যে ব্যক্তি কোন আমলে আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করে, আমি তাকে ও তার শিরককে পরিত্যাগ করি।" [সহীহ মুসলিম : কিতাবুয যুহুদ ওয়ার রকায়েক: ৪৬-(২৯৮৫)]

আর উলামায়ে কিরাম এই হাদীসটিকে ছোট শিরকের ব্যাপারে প্রমাণ হিসেবে পেশ করে। সুতরাং যদি ছোট শিরকের উপর এতবড় ধমকি আসে তাহলে বড় শিরকের পরিণাম কত ভয়াবহ হবে।

আর নিঃসন্দেহ সালাত, সিয়াম ও হজ্জ সহীহ হওয়া এবং আল্লাহর নিকট কবুল হওয়ার জন্য সর্বপ্রথম শর্ত তাওহীদ।

ইসলামে প্রবেশের একমাত্র মাধ্যম হল তাওহীদের কালিমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" তাওহীদের স্বীকারোক্তি ব্যতীত অন্য কোন ইবাদাত যথা: সালাত, সিয়াম ইত্যাদি দ্বারা ইসলামে প্রবেশ সম্ভব না। কিন্তু আলেমগণ সালাত আদায়কারীকে মুসলমান হিসেবে গণ্য করে থাকেন এই জন্য যে, সালাত তাওহীদেরই অন্তর্ভূক্ত একটি ইবাদাত। স্বাভাবিক ভাবে তাওহীদে বিশ্বাসীরাই সালাত আদায় করে থাকেন। কেননা তাওহীদই সালাত সহীহ ও কবুল হওয়ার জন্য প্রধান শর্ত।

যে ব্যক্তি তাওহীদের মৌলিক দুটি বিষয় (১) তাগুতকে অস্বীকার (২) আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসকে বাস্তবায়ন করা ব্যতীত তার কোন আমল ও ইবাদাত গ্রহণযোগ্য হবে না।

যে ব্যক্তি তাগুতের আনুগত্য পরিত্যাগ করবে না এবং তাগুতকে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকবে না, বরং প্রকাশ্য শিরকে লিপ্ত থাকবে আবার সালাতও আদায় করবে। তাহলে তার সালাত গ্রহণযোগ্য হবে না এবং তাকে মুসলমান বলা যাবে না। আর এ বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ হল মহান আল্লাহর বাণী :

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

অর্থ:- 'তুমি যদি শিরক কর, তবে তোমার সমস্ত কর্ম নিষ্ফল হবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে'।[সূরা যুমার : ৬৫]

এমনিভাবে আল্লাহ (সুবঃ) অপর আয়াতে বলেন:

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"তারা যদি শিরক করত তাহলে তাদের সমস্ত কর্ম নিষ্ফল হয়ে যেত"। [সূরা আনআম: ৮৮]

তাই আল্লাহ (সুবঃ) এর সাথে শিরক পরিত্যাগ করা অর্থাৎ তাগুতের আনুগত্য করা থেকে বিরত থাকা, এবং আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাদেরকে সহযোগীতা না করা, আমল কবুল হওয়ার জন্য সর্বপ্রথম শর্ত। আর এটাই আল্লাহ (সুবঃ) সর্বপ্রথম তার বান্দাদের প্রতি ফরয করেছেন। ইহা ব্যতীত সকল আমল অনর্থক।

অথচ এসব সৈন্যরা তাগুতকে অস্বীকার করার পরিবর্তে তাদেরকে সাহায্য করে এবং তাদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। তাদের কুফরী আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের পৃষ্ঠপোষকতা করে। সুতরাং তাদের সালাত, সিয়াম ও অন্য সকল নেক আমল গ্রহণযোগ্য হবে না। যতক্ষণ তারা এগুলো কবুল হওয়ার যেসব শর্ত আছে তা পূর্ণ না করবে। আপনি যদি দেখেন যে, কেউ অজু ছাড়া সালাত আদায় করছে তাহলে তার সালাত আপনার দৃষ্টিতে কি গ্রহণীয় হবে? না তার মুখে ছুড়ে মারা হবে? এ ব্যাপারে হয়তো কোন ব্যক্তিই দ্বিমত পোষণ করবে না যে, তার সালাত কবুল হবে না।

তাহলে হে আল্লাহর বান্দা! আপনি একটু চিন্তা করুন! সালাত সহীহ হওয়ার জন্য পবিত্রতা শর্ত। তাই পবিত্রতা ছেড়ে দেওয়ার কারণে তার সালাত বাতিল হচ্ছে। তাহলে আমল কবুলের প্রধান শর্ত তাওহীদ ও তাগুতের অস্বীকার ছেড়ে দেওয়ার দ্বারা তার সালাত কিভাবে কবুল হতে পারে? আর তাই আল্লাহ (সুবঃ) আদম সন্তানদের উপর সালাতও তার শর্ত সমূহ শিক্ষা করার পূর্বে তাওহীদ শিক্ষা করা এবং তদানুযায়ী আমল করা ফরয করেছেন। সাহাবায়ে কিরামের উপর সর্বপ্রথম মক্কায় তাওহীদ ফরয হয়েছিল। সবার জানা আছে সাহাবায়ে কিরাম মক্কায় নির্যাতিত হয়েছেন, বিপদগ্রস্ত হয়েছেন, কষ্ট সহ্য, করেছেন, বাধ্য হয়ে শেষে হিজরত করেছেন, শুধুমাত্র তাওহীদের জন্য। সালাত, যাকাত বা অন্য কোন ফরয ইবাদতের জন্য তাদের সম্প্রদায় তাদেরকে নির্যাতন করেনি। বরং সেগুলো তখন ফরযই হয়নি। তাদেরকে সর্বপ্রথম তাওহীদের দাবি পূর্ণ করতে বলা হয়েছে। কেননা অন্যান্য ইবাদাত তাওহীদ ছাড়া গ্রহণযোগ্যই হবে না।

তাই রাসূল (সাঃ) ও সাহাবায়ে কিরাম সর্বপ্রথম মানুষদেরকে তাওহীদকে গ্রহণ ও তাগুতকে বর্জনের দিকেই আহ্বান করেছেন। আল্লাহর শপথ! তারা তাওহীদের দিকে আহ্বানের পূর্বে মানুষদেরকে সালাত, সিয়াম বা অন্যান্য বিধানের দিকে আহ্বান করেননি।

আপনি মু'আজ বিন জাবাল (রাযিঃ) সম্পর্কে সহীহ বুখারী ও মুসলিমের বর্ণিত হাদীসটি পাঠ করুন। যে হাদীসে রাসূল (সাঃ) তাঁকে ইয়ামেনে পাঠানোর সময় দাওয়াতের নিয়ম ও পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন।

و حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى نَحْوِ

أَهْلِ الْيَمَنِ قَالَ لَهُ إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا صَلَّوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ

"তুমি আহলে কিতাবের একটি সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ। সর্বপ্রথম তুমি তাদেরকে আল্লাহর এককত্বের দিকে আহ্বান করবে। যদি তারা আল্লাহর এককত্বকে মেনে নেয় তাহলে তুমি তাদেরকে জানাবে যে, আল্লাহ (সুবঃ) তাদের উপর দৈনিক পাঁচবার সালাত ফরয করেছেন। তারা যদি সালাত আদায় করে তখন তুমি তাদেরকে জানাবে আল্লাহ (সুবঃ) তাদের মালের উপর যাকাত ফরয করেছেন যা তাদের ধনীদের থেকে নিয়ে গরীবদেরকে দেয়া হবে।" [সহীহ বুখারীঃ ৭৩৭২]

সুতরাং আবশ্যক হল মানুষদেরকে সর্বপ্রথম তাওহীদের মাধ্যমে ইসলামের দিকে আহ্বান করা। সালাতের মাধ্যমে নয়। তারা যদি তাওহীদকে স্বীকার করে তাহলে সালাত, যাকাত ও অন্যান্য বিধানের দিকে আহ্বান করা হবে।

যে তাওহীদকে গ্রহণ করল তার থেকে সালাত ও অন্যান্য ইবাদাত গ্রহণ করা হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি তাওহীদ ব্যতিরেকে ইসলামের অন্যান্য বিধান আকড়ে ধরল তার কোন আমল গ্রহণ করা হবে না।

কেননা আল্লাহ (সুবঃ) শুধুমাত্র তাওহীদের এই নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, তা এমন হাতল যা ছিন্ন হবার নয়। আল্লাহ (সুবঃ) বলেনঃ

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا

অর্থঃ 'দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই। নিশ্চয় হিদায়েত স্পষ্ট হয়েছে ভ্রষ্টতা থেকে। অতএব, যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয়। [সূরা বাক্বারাঃ ২৫৬]

আর এ কারণেই অনেককে বাহ্যিকভাবে অনেক ইবাদাত করতে দেখা যায়, কিন্তু কিয়ামতের দ্বীন তার ইবাদাত তার মুখে ছুড়ে মারা হবে আর তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ (২) عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ (৩)

অর্থ: 'সেদিন অনেক চেহারা হবে অবনত। কর্মক্লান্ত, পরিশ্রান্ত'। [সূরা গাশিয়া: ২,৩]

অতঃপর তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম:

تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً

অর্থ: 'তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে'। [সূরা গাশিয়া: ৪]

সকল ইবাদাত ও সৎ কাজ সব বিক্ষিপ্ত ধুলিকণায় পরিনত হবে। কেননা সে একনিষ্ঠ মুসলিম ছিল না।

জালিম শাসক সম্পর্কে হাদীসটির ব্যাখ্যা: রাসূল (সাঃ) জালিম শাসকদের সাথে যুদ্ধ করতে নিষেধ করেছেন যতক্ষণ তারা আমাদের মাঝে সালাত প্রতিষ্ঠা করে। উক্ত হাদীসে তাওহীদ ব্যাতিরেকে শুধু সালাত উদ্দেশ্য নয়। বরং এখানে ইঙ্গিত হল সালাতের সাথে সাথে তাওহীদকেও প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এর দলিল হল অন্যান্য হাদীস। যা এই হাদীসের ব্যাখ্যাকারী যেগুলোতে সালাত ও যাকাতের পূর্বে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছে। যেমন বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থে উল্লেখিত, একটি হাদীসে এসেছে:

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمُوا مِنِّى دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

অর্থ: 'আমাকে ক্বিতালের (যুদ্ধের) আদেশ দেয়া হয়েছে যতক্ষণ না মানুষ সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। এবং মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল। অতঃপর সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়। তারা যখন এগুলো করবে তখন আমার থেকে তাদের জান ও মাল নিরাপদ থাকবে। কিন্তু অন্য কোন হক্বের (কাউকে হত্যা করলে তাকেও হত্যা করা হবে, বিবাহিত হওয়া সত্ত্বে জিনা করলে রযম করা হবে) কারণে। এবং তাদের (অন্তরের) হিসাব হবে আল্লাহর নিকট। [সহীহুল বুখারী :২৫; সহীহ মুসলিম: কিতাবুল ঈমান :৩৬-(২২)]

লক্ষ্য করুন! উক্ত হাদীসে ক্বিতালের সর্বপ্রথম মাপকাঠি বানানো হয়েছে তাওহীদকে। আর অন্য হাদীসে যে সালাতের কথা বলা হয়েছে তার উদ্দেশ্য হল সালাত হতে হবে তাওহীদের সাথে। কেননা তাওহীদ ব্যতীত সালাতের কোন মূল্য নেই। যেমন অপর আয়াতে আল্লাহ (সুবঃ) বলেন:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ

অর্থ: 'অবশ্য যদি তারা তওবা করে ও সালাত কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে তাহলে তোমরা তাদের পথ ছেড়ে দিবে'। [সূরা তওবা: ৫]

فَإِنْ تَابُوا অর্থাৎ যদি তারা শিরক ও কুফর থেকে তওবা করে। এবং গাইরুল্লাহর ইবাদাত ছেড়ে দেয় ও তাওহীদ গ্রহণ করে। অতঃপর সালাত আদায় করে এবং যাকাত দেয় তাহলে তাদের জান ও মাল রক্ষা পাবে।

কিন্তু কুফর ও শিরক থেকে তওবা না করে বা তাওহীদে বিশ্বাসী না হয়ে সালাত কায়েম করলে তা মুসল্লির কোন কাজেই আসবে না। রাসূল (সাঃ) এর জামানায় অনেক ঈমানদার শুধু একটি কথার কারণে কাফের ও মুরতাদ হয়ে গেছে।

তার একটি দৃষ্টান্ত পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। যে সব ব্যক্তি রাসূল (সাঃ) এর সাথে 'গাযওয়ায়ে তাবুক' এর মধ্যে অংশগ্রহণ করেছিল। তারা সালাত আদায় করত তথাপি তাওহীদ বিনষ্টকারী বিষয় সমূহ হতে একটি বিষয় পাওয়া যাওয়ার কারণে তারা কাফের হয়ে গিয়েছে। আর তা হলো কুরআন পাঠকারীদের ব্যাপারে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা। আল্লাহ (সুবঃ) তাদের সম্পর্কে বলেন: لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ অর্থ: 'অজুহাত দেখাবে না তোমরা ঈমান আনার পর কুফরী করেছ'। [সূরা তওবা: ৬৬]

এ জন্যই ফিক্হের কিতাবে حكم المرتد (মুরতাদের বিধান) সম্পৃক্ত একটি অধ্যায় থাকে।

ফিক্হের কিতাবে মুরতাদের সংজ্ঞা বলা হয়েছে: 'মুরতাদ হল ঐ ব্যক্তি যে ইসলাম গ্রহণের পর কোন কথা, কাজ বা বিশ্বাসের কারণে কাফের হয়ে যায়। এ কারণেই ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) ইয়াসিক (তাতারী কর্তৃক প্রণিত একটি সংবিধান) এর অনুসারীদের কাফের বলে ফতওয়া দিয়েছেন। যেমন তিনি তাদের সাহায্যকারী ও সৈনিকদের কাফের ফাতওয়া দিয়েছেন। [আল মুজাল্লাদ]

এসব বিধানদাতাদের সহযোগীরা প্রকাশ্য শিরকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। তাগুত ও বিধানদাতাদেরকে মুওয়াহ্হিদদের বিরুদ্ধে সাহায্য করে। আর এটা ইসলাম থেকে খারিজ হওয়ার অন্যতম একটি কারণ। সুতরাং প্রকাশ্য সালাত আদায় কোন কাজেই আসবে না এবং কোন উপকার করবে না যতক্ষণ তাদের মাঝে এই কারণ বিদ্যমান থাকে।

চতুর্থ সংশয়:

যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে তাকফীর করে সে কুফরী করে।

তারা বলে: 'তাকফীর' একটি স্পর্শকাতর বিষয়, কেননা রাসূল (সাঃ) বলেছেন: من كفر مسلما فقد كفـــر অর্থ: "যে কোন মুসলিম কে "তাকফীর" করল সে কুফরী করল" বরং তাদের মধ্যকার কিছু মূর্খ লোক বলে, যে ব্যক্তি কাফের পিতা-মাতার গর্ভে জন্ম নিয়েছে, তাকে ছাড়া অন্য কাউকে "তাকফীর" করা বৈধ নয়।

আমাদের জবাব: সব ধরণের "তাকফীর" ভয়ানক ও দোষনীয় নয়। তবে শরয়ী প্রমাণ ব্যতীত, শুধু মাত্র গোড়ামি ও কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করে কোন মুসলিমকে "তাকফীর" করা ভয়ানক বিষয়। যেমনিভাবে সকল বিশ্বাস প্রশংসনীয় নয়, তেমনিভাবে সকল অবিশ্বাসও দোষনীয় নয়।

যে বিষয়ে বিশ্বাস রাখা আবশ্যক তা হল "আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস" আর যে বিষয়ে বিশ্বাস রাখা নিষিদ্ধ ও শিরক তা হল তাগুতের প্রতি বিশ্বাস। তেমন ভাবে যে বিষয়ে অবিশ্বাস রাখা আবশ্যক ও প্রশংসনীয় তা হল তাগুতের প্রতি অবিশ্বাস। আর যে বিষষ অবিশ্বাস করা নিকৃষ্ট ও নিন্দনীয় তা হল আল্লাহ তা'আলা ও তার দ্বীন এবং তার আয়াত সমূহের প্রতি অবিশ্বাস।

সুতরাং যেমনিভাবে কোন মুসলিমকে শরয়ী দলীল ব্যতীত "তাকফীর" করা ভয়ানক বিষয়, তেমনিভাবে কোন মুশরিক বা কাফেরকে মুসলিম বলে ঘোষনা করা এবং তার সাথে ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব রাখাও ভয়ানক বিষয় ও ফিতনার কারণ। যেমন আল্লাহ (সুবঃ) বলেছেন:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

অর্থ: "আর যারা কুফরী করে, তারা একে অপরের বন্ধু। যদি তোমরা তা না কর, (মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব ও কাফেরদের সাথে শত্রুতা) তাহলে জমিনে ফিতনা ও বড় ফাসাদ হবে।" [সূরা আনফাল: ৭৩]

আর উপরোক্ত হাদীসটি যে শব্দে উল্লেখ করা হয়েছে সে শব্দে রাসূল (সাঃ) থেকে কোন হাদীস বর্ণিত নেই। কেননা প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যে কোন মুসলিমকে কাফের বলবে সে কাফের হয়ে যাবে, এমনটি নয়। বিশেষ ভাবে যাকে তাকফীর করা হয়েছে সে যদি এমন কাজ করে, যাকে আল্লাহ তা'আলা

ও তার রাসূল (সাঃ) কুফর বলে সাব্যস্ত করেছেন। আর যে বলে মুসলিম কখনো কাফের হয় না তার একথা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা লোক দেখানো মুসলিমদের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

এক.

لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

অর্থ: "তোমরা ওযর পেশ করো না। তোমরা তোমাদের ঈমানের পর অবশ্যই কুফরী করেছ।" [সূরা তাওবা: ৬৬]

দুই.

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ

অর্থ: "নিশ্চয় যারা হিদায়াতের পথ সুস্পষ্ট হওয়ার পর তাদের পৃষ্ঠপ্রদর্শনপূর্বক মুখ ফিরিয়ে নেয় (মুরতাদ হয়ে যায়), শয়তান তাদের কাজকে চমৎকৃত করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দিয়ে থাকে।"[সূরা মুহাম্মদ: ২৫]

তিন.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

অর্থ: "হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার দ্বীন থেকে ফিরে যায় তাহলে অচিরেই আল্লাহ এমন কওমকে আনবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুমিনদের উপর বিনম্র এবং কাফিরদের উপর কঠোর হবে। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে এবং কোন কটাক্ষকারীর কটাক্ষকে ভয় করবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি তাকে তা দান করেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।" [সূরা মায়েদা: ৫৪] এধরণের আরো অনেক আয়াত আছে।

যদি কোন মুসলমান কুফরীর কারণে মুরতাদ না হয়, তাহলে ইসলামী ফিক্‌হের কিতাব সমূহে মুরতাদের বিধান কেন বর্ণনা করা হয়েছে? হাদীসে আছে: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ অর্থ: "যে ধর্ম (ইসলাম) পরিত্যাগ করে তাকে তোমরা হত্যা কর।"[সহীহ বুখারী: ৩০১৭, ৬৯২২, ৭৩৬৮, সুনানে আবু দাউদ: ৪৩৫৩]

আর পূর্বের হাদীসের মূল শব্দ হল:

أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لأَخِيهِ يَا كَافِرُ. فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قَـالَ وَإِلاَّ رَجَعَـتْ عَلَيْهِ

অর্থ: "যে ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভাইকে বলল হে কাফের! তাহলে এটা দুইজনের একজনের উপর বর্তাবে। যাকে বলা হয়েছে সে যদি এমনটিই হয় তাহলে তো হল, অন্যথায় এটা যে বলেছে তার দিকেই ফিরে আসবে।"[সহীহ মুসলিম: কিতাবুল ঈমান :১১১-(৬০)]

সতরাং রাসূল (সাঃ) এর বানী إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ অর্থাৎ 'সে যদি তার কথানুযায়ী হয়' প্রমাণ বহন করে, যে মুসলিমের মাঝে কুফরী প্রকাশ পায়, আর তার মধ্যে তাকফীর কে নিষেধকারী অন্য কোন জিনিস পাওয়া না যায়, তাহলে তাকে 'তাকফীর" করা বৈধ।

কোন ব্যক্তি বড় কুফর করলেই কাফের হয়ে যায় না। বরং তার সাথে শর্তযুক্ত হল তার মাঝে কুফর প্রতিরোধকারী অন্য কোন কারণ বিদ্যমান না থাকা। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি কুফরী কাজে লিপ্ত থাকার কারণে তাকে তাকফীর করা হয় । অতঃপর প্রকাশ পায় তার মাঝে তাকফীর প্রতিহতকারী অপর কোন কারণ বিদ্যমান ছিল। তাহলে এই কুফর তাকফীরকারী ব্যক্তির দিকে ফিরে আসবে না। কেননা এ ব্যাপারে সে অজ্ঞ ছিল।

যেমনটি ঘটেছিল উমর (রাঃ) এর ব্যাপারে কেননা তিনি হতেব (রাযিঃ) এর ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) কে বলেছিল: دَعْنِي أَضْـرِبْ عُنُـقَ هَـذَا الْمُنَـافِقِ "হে রাসূলুল্লাহ আমাকে অনুমতি দিন আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই। [সহীহ বুখারী:৪২৭৪]

রাসূল (সাঃ) বললেন, হাতেব আবু বালতা (রাঃ) কাফের হয়নি। তিনি উমর (রাঃ) কে একথা বলেননি যে, তুমি কাফের হয়ে গেছ, কেননা তুমি একজন মুসলমানকে মুনাফিক বলেছ এবং তাকে হত্যা করা বৈধ্য ভেবেছ। আর যে মুসলিমকে তাকফীর করে তাহলে সেও কাফের হয়ে যায়। যেমন তারা ধারণা করে।

ইবনে কাইয়ুম (রহঃ) তার কিতাব যাদুল মা'আদ এর মধ্যে এই অর্থের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

সুতরাং বুঝা গেল কোন মুসলিমকে কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় বা গোঁড়ামি করে তাকফীর করা নিন্দনীয়। আর উলামায়ে কেরাম উল্লেখিত হাদীসের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন:

(এক) কেউ যদি ইসলাম ধর্ম ও তাওহীদ কে কুফর বলে, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে।

(দুই) কেউ যদি মুসলিমদের তাকফীর করাকে সহজ, ও স্বাভাবিক ভাবে, তাহলে সে এই হাদীসের উদ্দেশ্য হবে। এ ধরণের আরো অন্যান্য ব্যাখ্যা রয়েছে।

ইমাম নববী (রহঃ) "শরহে সহীহ মুসলিমে এ ধরণের আরো কয়েকটি দিক উল্লেখ করেছেন, উলামায়ে কেরাম এই হাদীসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করেননি। বরং অন্য অর্থ গ্রহণ করেছেন। কেননা এর বাহ্যিক অর্থ "ঈমান ও কুফর" এর অধ্যায়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহের মূলনীতির বিপরীত। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

অর্থ: "নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমা করেন না তাঁর সাথে শরীক করাকে এবং এ ছাড়া যাকে চান ক্ষমা করেন। আর যে আল্লাহর সাথে শরীক করে সে তো ঘোর পথভ্রষ্টতায় পথভ্রষ্ট হল।" [সূরা নিসা :১১৬]

আর এটা স্পষ্ট যে কোন মুসলিমকে কোন পার্থিব স্বার্থের কারণে অথবা কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় গালি দেয়া এবং কাফের বলা এমন শিরক নয় যা মুসলিমকে ইসলাম থেকে খারেজ করে দেয়। এ কারণেই উক্ত হাদীসকে অন্য "নসের" সাথে মিলানো হয়েছে এবং তার আলোকে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

আর যদি বলা হয় এই হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হল ঐ ব্যক্তি যে মুসলিমদের তাকফীর করে; তাদের সাথে ও তাদের তাওহীদের সাথে শত্রুতাবশতঃ এবং তারা তাগুতকে বর্জন করার করণে। আর একারণে তাদেরকে খাওয়ারেজ বলে এবং তাদের শত্রুদেরকে সাহায্য করে।

তাহলে এই হাদীসের অন্য অর্থ নেয়ার প্রয়োজন হবে না। কেননা এটা নিঃসন্দেহ কুফরী।

আর ঐ মূর্খ লোকের কথা, যে বলেছিল শুধুমাত্র কাফের পিতা-মাতার গর্ভে জন্ম নিলেই তাকে কাফের বলা যাবে। তার এই মত একেবারে অগ্রহণযোগ্য। আর তার কথা এটা প্রমাণ করে যে, সে দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। কেননা এর অর্থ হয় মুসলিম কখনো কাফের হয় না। আর এ ব্যাপারে মুতাকাদ্দিমীনদের মধ্য থেকে কোন আলেম তো দূরের কথা কোন জাহেলও বলেনি।

পঞ্চম সংশয়:
তারা তো দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ।

তারা বলে: এসব সৈন্যরা অজ্ঞ। তাদের প্রয়োজন এমন ব্যক্তিদের যারা তাদেরকে শিক্ষা দিবে, সৎপথে আহ্বান করবে এবং সকল বিষয় তাদের কাছে স্পষ্টভাবে তুলে ধরবে। তারাতো জানে না তাদের প্রধানরা তাগুত। আর আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতা করা কুফরী। তাই তারা কাফের হবে না।

আমাদের জবাব: হ্যাঁ! এই সমস্ত সৈন্য এবং অন্যান্যদের দাওয়াত দেয়া অবশ্যই প্রয়োজন। যেমন আল্লাহ (সুবঃ) বলেন:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

অর্থ: 'তার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে আল্লাহর দিকে ডাকে, সৎকর্ম করে এবং বলে আমি একজন মুসলমান'। [সূরা হা'মীম সাজদা: ৩৩]

কিন্তু আল্লাহর ইবাদতের সাথে সাথে এ ব্যক্তিকে অবশ্যই শিরক ত্যাগ করতে হবে। অন্যথা সে মুশরিক বলেই বিবেচিত হবে। চাই তার কাছে দাওয়াত পৌছানো হোক বা না হোক। দাওয়াত না পৌছার কারণে তাকে মুসলিম বলা যাবে না। যেমন আল্লাহ (সুবঃ) বলেন:

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থ: 'আর মুশরিকদের মধ্য থেকে কেউ যদি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থণা করে তাহলে তুমি তাকে আশ্রয় দাও। যাতে করে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পারে। অতঃপর তাকে নিরাপদ স্থানে পৌছে দাও। কারণ তারা অজ্ঞ'। [সূরা তাওবা: ৬]

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তাদেরকে তার কালাম শুনার পূর্বেই মুশরিক বলে ঘোষণা দিয়েছেন। অথচ তারা অজ্ঞ ছিল। আল্লাহ তার রাসূল (সাঃ) কে তাদের দাওয়াত প্রদানের এবং ভাল কথা শুনানোর আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু এ আদেশ সত্ত্বেও আল্লাহ তাদেরকে মুশরিক বলেছেন। যতক্ষণ তারা শিরককে আকড়ে ধরেছিল। কেননা শিরকে আকবার এমন যে, এই শিরককারীর অজ্ঞতার অজুহাত কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা মহান রাব্বুল আলামীন তার একত্বতার নিদর্শন সমগ্র সৃষ্টিতে রেখেছেন। তাদের মধ্য হতে উলামায়ে কিরাম কয়েকটির কথা উল্লেখ করেন।

এক. আল্লাহর এককত্বের উপর প্রকাশ্য জাগতিক প্রমাণ সমূহ।

আল্লাহ (সাঃ) এর রুবুবিয়্যাত তার ওয়াহদানিয়্যাতের উপর প্রমাণ বহন করে। কেননা যিনি সৃষ্টি করেছেন, রিযিক দিচ্ছেন, আকৃতি দিয়েছেন এবং সবকিছু পরিচালনা করছেন। তিনি এমন এক সত্তা যিনি একমাত্র ইবাদাত এবং বিধান দানের যোগ্য। আর এ ব্যাপারে কাউকে তার অংশীদার ও সমকক্ষ ভাবা শরীয়াত ও বিবেক উভয়েরই বিরুদ্ধ।

দুই. আল্লাহ (সুবঃ) যখন মানুষকে তাদের আদি পিতা আদম (আঃ) এর পিঠ থেকে বের করেছেন তখন তিনি তাদের থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন।

আল্লাহ (সুবঃ) বলেন:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

অর্থ: 'আর স্মরণ কর, যখন তোমার রব বনী-আদমের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের বংশধরকে বের করলেন এবং তাদেরকে তাদের নিজদের উপর সাক্ষী করলেন যে, 'আমি কি তোমাদের রব নই'? তারা বলল, 'হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিলাম।' যাতে কিয়ামতের দিন তোমরা বলতে না পার যে, নিশ্চয় আমরা এ বিষয়ে অনবহিত ছিলাম'। [সূরা আ'রাফ: ১৭২]

তাই স্পষ্ট শিরকের ক্ষেত্রে তাদের অসতর্কতা, অজ্ঞতা ও তাকলিদ (পূর্বসূরীদের অন্ধ অনুসরণ) অজুহাত হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা আল্লাহ (সুবঃ) পূর্বেই তাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন 'তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে রব হিসাবে গ্রহণ করবে না'।

তিন. আল্লাহ (সুবঃ) মনুষকে জন্মগত ভাবে যে স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তার দাবি হল, সৃষ্টিকর্তা একজন এবং তিনিই ইবাদতের উপযুক্ত ও বিধানদাতা। যেমন হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ [صحيح البخاري]

অর্থ: 'আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (সাঃ) বলেছেন, প্রত্যেক সন্তানই স্বভাবজাত (ইসলাম) ধর্মের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদী বানায় অথবা খৃষ্টান বানায় অথবা মূর্তিপূজক বানায়'। [সহীহুল বুখারী: ১৩৮৫] অপর এক বর্ণনায় এসছে "মুশরিক বানায়"। [সুনানে তিরমিযী:২১৩৮; সনদ:সহীহ]

এমনিভাবে মুসলিমে হাদীসে কুদসীতে এসেছে।

إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا

অর্থ: 'আমি আমার সকল বান্দাদেরকে একনিষ্ঠ অবস্থায় সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাদের নিকট শয়তান আসে এবং তাদেরকে দ্বীন থেকে সরিয়ে দেয় ও আমি তাদের জন্য যা হালাল করেছি তা সে হারাম করে। আর তাদেরকে আদেশ দেয়, যাতে তারা আমার সাথে এমন জিনিসের শিরক করে যার কোন প্রমাণ আমি অবতীর্ণ করিনি। [সহীহ মুসলিম: কিতাবুল জান্নাতি ওয়া নায়ীমিহা ওয়া আহলিহা :৬৩-(২৮৬৫)]

চার. আল্লাহ (সুবঃ) সকল নবী রাসূলকে এই মহান উদ্দেশ্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন।

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

অর্থ: 'নিশ্চয় আমি সকল জাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছি এই নির্দেশ দিয়ে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাগুতকে পরিহার কর'। [সূরা নাহাল: ৩৬]

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

অর্থ: 'এসকল রাসূল এমন যাদেরকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠানো হয়েছিল। যাতে রাসলগণের আগমনের পর আল্লাহর সামনে মানুষের কোন অজুহাত বাকি না থাকে'। [সূরা নিসা: ১৬৫]

আর যদি কোন ব্যক্তি পর্যন্ত রাসূল নাও পৌছে তথাপি সে অন্য কারো কাছ থেকে শুনে থাকবে। কেননা যদিও রাসূলদের শরীয়তের ভিন্নতা রয়েছে। কিন্তু তাওহীদ ও শিরকের ব্যাপারে তাদের আহ্বান এক ও অভিন্ন। আর আল্লাহ (সুবঃ) বলেছেন:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

অর্থ: 'আমি রাসূল পাঠানোর পূর্বে কাউকে শাস্তি দেই না'। [সূরা বনী ইসরাঈল : ১৫]

সুতরাং আল্লাহ (সুবঃ) সকল মানুষের নিকট তাঁর রাসূলদের প্রেরণ করেছেন। এবং মুহাম্মদ (সাঃ) এর মাধ্যমে সে ধারাটি পূর্ণতা লাভ করেছে। তাই তারপর আর কোন রসূল নেই।

পাঁচ. আল্লাহ ধারাবাহিকভাবে অনেক কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যা এই তাওহীদের দিকেই আহ্বান করে।

আর এই ধারাবাহিকতার সমাপ্তি ঘটিয়েছেন এমন এক কিতাব দিয়ে যা কখনো বিকৃত হবে না। আল্লাহ (সুবঃ) নিজেই কিয়ামত পর্যন্ত এর সংরক্ষণের জিম্মাদার হয়েছেন এবং এতে দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে মানুষদেরকে

সতর্ক করেছেন। এ সব বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তাওহীদ। আল্লাহ (সুবঃ) বলেন:

وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ

অর্থ: 'আমার প্রতি ওহীরূপে এই কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যাতে এর মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে সতর্ক করি এবং যাদের নিকট এ কুরআন পৌছবে তাদেরকে'। [সূরা আনআম: ১৯] তিনি আরও বলেন:

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

অর্থ: 'মুশরিকরা ও কিতাবীদের মধ্যে যারা কাফের ছিল, তারা ততক্ষণ পর্যন্ত নিবৃত হওয়ার ছিলনা, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসে'। [সূরা বায়্যিনাহ: ১] অতপর তিনি আয়াতে বর্ণিত প্রমাণের পরিচয় দিয়ে বলেন।

رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً

অর্থ: 'আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রাসূল, যে পবিত্র গ্রন্থ পাঠ করে শোনাবে'। [সূরা বায়্যিনাহ: ২]

সুতরাং যার নিকট এই কুরআন পৌছবে তার অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না। বিশেষ করে দ্বীনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাওহীদের ব্যাপারে, যার জন্য তিনি সকল নবী রাসূলদের পাঠিয়েছেন। কেননা আল্লাহ (সুবঃ) মুশরিকদের সম্পর্কে বলেছেন:

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ

অর্থ: 'তাদের কি হল যে, তারা উপদেশ বাণী থেকে বিমূখ'। [সূরা মুদ্দাছ্ছির: ৪৯]

রাসূল (সাঃ) এর জীবন থেকে জানা যায়, বিভিন্ন সম্প্রদায়ে তার দাওয়াতের নিয়ম ছিল, তিনি গোত্র প্রধানদের নিকট চিঠি পাঠাতেন। সাধারণ লোকদের নিকট কোন পয়গাম পাঠাতেন না। এবং দূতদের এই আদেশও দিতেন না যে, তারা যেন সকল জনগণের নিকট এই দাওয়াত পৌছায়। অতঃপর গোত্রপ্রধান যদি এই দাওয়াত কবুল না করত তাহলে তিনি তাদের সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতেন। সাহাবায়ে কিরামের দাওয়াতের পদ্ধতিও এই ছিল। তাহলে সেখানে তো সাধারণ লোকদের অজ্ঞতার অজুহাত গ্রহণযোগ্য হয়নি।

আর বর্তমান তাগুতরা এবং তাদের সাহায্যকারী সৈন্যরা মুশরিকদের দিকনির্দেশনা গ্রহণ করে, তাওহীদ সম্বলিত কুরআনের আয়াতের বিরুদ্ধাচারণ করে। আর তারা সত্য শ্রবণ করা থেকে পলায়ন করে। যেমন জঙ্গলী গাধা সিংহ দেখলে দৌড়ে পালায়। তারা কিতাবুল্লাহকে প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে এই অজ্ঞতা নিজেরাই গ্রহণ করেছে। অথচ স্পষ্ট প্রমাণ তাদের সামনে ছিল। তাদের এই অজ্ঞতা তাদের নিকট রিসালাত না পৌছার কারণে অথবা

নির্বুদ্ধিতা, পাগলামি ইত্যাদির কারণে নয়। উপরন্তু তারা শরীয়াত কায়েমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ও বাধা প্রদান করে। আর এটা নিশ্চিত বিষয়, যে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তার অজ্ঞতার অজুহাত কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু এই সমস্ত তর্ককারীরা দ্বীনের বিরুদ্ধাচারীদের পক্ষাবলম্বন করে বলে থাকে:- তারা (শাসকেরা) যেহেতু অজ্ঞ তাই তারা কাফের হবে না। অথচ আল্লাহ (সুবঃ) বলেন: قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ "(হে নবী! তাদেরকে) বল, এমন প্রমাণ তো আল্লাহরই আছে, যা (অন্তরে) পৌছে যায়। [সূরা আনআম: ১৪৯]
আর এ কারণেই নবী করীম (সাঃ) কে এক ব্যক্তি নিজ পিতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিঁনি বলেন, إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ "নিশ্চয় আমার ও তোমরা পিতা জাহান্নামী"। [সহীহ মুসলিম: কিতাবুল ঈমান :২০৩-(৩৪৭)]
অথচ তারা ছিল এমন সম্প্রদায় যাদের ব্যাপারে মহান রাব্বুল আলামীন বলেন,

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ

অর্থ: 'যাতে তুমি এমন এক কওমকে সতর্ক কর, যাদের পিতৃপুরুষদেরকে সতর্ক করা হয়নি, কাজেই তারা উদাসীন।' [সূরা ইয়াসীন: ৬]
এটা এ কারণে যে, মৌলিক তাওহীদ এবং শিরকে আকবার ও গাইরুল্লাহর ইবাদাত যে যুক্তিযুক্ত না আল্লাহ (সুবঃ) তার দলিল ও নিদর্শন বিভিন্নভাবে প্রদান করেছেন। (যেমনটি পূর্বে উল্লেখ হয়েছে)
এতদাসত্ত্বেও এমন কিছু লোক আছে যারা নামমাত্র মুসলমান এবং ইসলামকে প্রথা হিসেবে পালন করে। তারা স্পষ্ট শিরক ও তাওহীদের ব্যাপারে প্রমাণ তালাশ করে!
অথচ এই তাওহীদই হল বান্দার কাছে আল্লাহর প্রথম চাওয়া। যে কারণে তিনি সমস্ত রাসূলকে প্রেরণ করেছেন, আসমানী কিতাব সমূহ অবতীর্ন করেছেন, আরো অনেক প্রমাণ পেশ করেছেন।
তারা অধিকাংশ সময় একটি আয়াতের ভিত্তিতে শাসক ও সৈন্যদের পক্ষাবলম্বন করে থাকে যদিও আয়াতটি ভিন্ন বিষয়ে অবতীর্ন।

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

অর্থ: 'আমি রাসূল পাঠানোর পূর্বে কাউকে শাস্তি দেই না'। [সূরা বনী ইসরাঈল : ১৫]
এর প্রেক্ষিতে তারা বলে, অজ্ঞতা দূর হওয়ার পূর্বে তাকফীর করা যাবে না। অথচ এই আয়াতের উদ্দেশ্য এটা নয়। আল্লাহ (সুবঃ) এখানে বলেননি 'আমি তোমাদেরকে কাফের সাব্যস্ত করব না যতক্ষণ রাসূল প্রেরণ না করি'। বরং তিনি বলেছেন, مُعَذِّبِينَ "শাস্তি দিব না"। আর শাস্তি দ্বারা উদ্দেশ্য হল হয়তো পার্থিব শাস্তি। যেমন আল্লাহ (সুবঃ) বলেছেন:

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا

অর্থ: 'তোমার প্রতিপালক এমন নন যে, তিনি জনপদ সমূহকে ধ্বংস করে দিবেন যতক্ষণ না তিনি তার মূল ভূখণ্ডে রাসূল প্রেরণ করেন, যে তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে'। [সূরা কাসাস: ৫৯]

অথবা উদ্দেশ্য হবে আখেরাতের শাস্তি যেমন আল্লাহ (সুবঃ) বলেছেন:

{كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ (٨) قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ

অর্থ: 'যখনই তাতে (জাহান্নামে) কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তার প্রহরীরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, 'তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসেনি'? তারা বলবে, 'হ্যাঁ, আমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছিল'। [সূরা মূলক: ৮, ৯]

সুতরাং উক্ত আয়াত দ্বারা তাদেরকে শিরকে আকবার ও গাইরুল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে তাকফীর না করা উদ্দেশ্য না।

কেননা কাফের দুই ধরণের। (১) সে কুফরী করে একগুয়েমী ও অবাধ্যতাবশতঃঃ যেমন অভিশপ্ত ইয়াহুদীরা সত্যকে বুঝতে পারা সত্যেও অস্বীকার করেছে। (২) যে কুফরী করে অজ্ঞতা বশত: অন্যের দ্বারা পথভ্রষ্ট হয়ে। যেমন খ্রিষ্টানরা পথভ্রষ্ট হয়েছে তাদের আলেমদের ধর্ম-বিকৃতির কারণে।

এমনটা নয় যে, প্রত্যেক কাফের সত্যকে পরিপূর্ণ জেনে অস্বীকার করে। বরং তাদের অধিকাংশ এমন যারা অজ্ঞতা ও ভ্রান্তির শিকার। তথাপি কুফরের দরুন তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। কেননা তারা তাদের নেতা, শাসক ও পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণ করেছে। অথচ তাদের ধারণা ছিল তারা সৎপথে আছে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন শিরকে আকবার থেকে বেঁচে থাকার জন্য বাহ্যিক ভাবে অনেক প্রমাণ পেশ করেন। তাই এ ব্যাপারে অজ্ঞতার অজুহাত গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা তার এই অজ্ঞতা দ্বীন ও ইলম থেকে বিমুখ থাকার কারণে। একারণে নয় যে, তার সামনে কোন প্রমাণ নেই।

উদাহরণ স্বরূপ: যায়েদ বিন আমর বিন নুফাইল এর ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে, তিনি ছিলেন ইসলামের পূর্বের যামানার লোক যাদের ব্যাপারে আল্লাহ (সুবঃ) বলেছেন:

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ

অর্থ: 'যাতে তুমি এমন সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোন ওহী আসেনি'। [সূরা কাসাস: ৪৬]

বর্ণিত আছে নবী প্রেরিত না হওয়া সত্ত্বেও তিনি মুওয়াহ্হিদ ছিলেন। তিনি একনিষ্টভাবে ইব্রাহিম (আ:) এর মিল্লাতের উপর ছিলেন। স্বভাবগতভাবে

তিনি তাওহীদে বিশ্বাসী ছিলেন। স্বীয় গোত্রের তাগুতদের কে বর্জন করেছিলেন এবং তাদের সাহায্য ও উপাসনা থেকে নিজেকে পবিত্র রেখেছিলেন। আর এটা তার নাজাতের জন্য যথেষ্ট ছিল। রাসূল (সাঃ) বলেন: তাকে একাই এক উম্মত হিসাবে কিয়ামতের দিন উঠানো হবে। রাসূল (সাঃ) নবুওতের পূর্বে যখন তার সাথে সাক্ষাত করেন তখন তাঁর সামনে দস্তরখানে গোস্ত পেশ করা হল। তিনি তা খেতে অস্বীকৃত জানালেন। তখন যায়েদ বিন আমর বিন নুফাইল বললেন, তোমরা প্রতিমার নামে যে প্রাণী যবেহ কর তা আমি খাই না। আর তিনি কুরাইশদের প্রতিমার নামে যবেহ কে নিন্দা করতেন। বলতেন "আল্লাহ (সুবঃ) ছাগল সৃষ্টি করেছেন অতঃপর আসমান থেকে তার জন্য পানি বর্ষণ করেছেন এবং জমিন থেকে উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছেন। আর তোমরা এই বিষয়গুলো অস্বীকার করে গাইরুল্লাহর সম্মানার্থে এই প্রাণী যবেহ করছ? [সহীহ বুখারী: ৩৮২৬, ৫৪৯৯, কানযুল উম্মাল: ৩৭৮৬৩, জামেউল আহাদীস: ৩৫১৪৩]

ভেবে দেখুন! তাওহীদ কিভাবে স্বভাবের মধ্যেই নিহিত থাকে। আর শিরক হল একটি আকস্মিক বিষয়, যা মানুষই উদ্ভাবন করে এবং তার দিকে ধাবিত হয়। উল্লেখিত ব্যক্তির নিকট কোন রাসুলের আগমন ঘটেনি, তা সত্ত্বেও তিনি তাওহীদ বুঝেছেন এবং তার দাবি পূর্ণ করেছেন। তাই তিনি নাজাত পেয়েছেন। কিন্তু শরীয়তের অন্যান্য বিষয় ও ইবাদাত যা রাসুলের মাধ্যম ছাড়া বুঝা সম্ভব না সে বিষয়ে অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে।
যেমন ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে। তিনি বলতেন:

اللهم لو اعلم احب الوجوه إليك لعبدتك به ولكني لا أعلمه ثم يسجد على الارض براحته (فتح الباري لابن حجر (٢١/ ٢١٨)

অর্থ: 'হে আল্লাহ আমি যদি তোমার ইবাদতের অন্য কোন উত্তম নিয়ম জানতাম তাহলে আমি সেভাবেই তোমার ইবাদাত করতাম, কিন্তু আমি তা জানি না'। অতঃপর ইতমিনানের সাথে জমিনে সিজদা করতেন। [ফাতহুল বারী লি ইবনে হাজার: ২১/২১৮]
সুতরাং তিনি সালাত সিয়াম এধরণের শর'য়ী বিষয় যেগুলোকে রাসূলের মাধ্যম ছাড়া বুঝা সম্ভব নয় সেগুলোর ব্যাপারে অক্ষম বলে গণ্য হবেন। কিন্তু সে সময়কার অন্যান্য লোকেরা অক্ষম সাব্যস্ত হবে না। (এক সহীহ হাদীস অনুযায়ী নবীজির পিতাও) কেননা তারা তাওহীদের মৌলিক দাবি পূরণ করেনি। শিরক কুফর থেকে বেঁচে থাকেনি। (তাদের নিকট কোন ভীতি প্রদর্শনকারী না আসা সত্ত্বেও) যেমন আল্লাহ (সুবঃ) বলেন:

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ

অর্থ: 'যাতে তুমি এমন সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোন ভীতি প্রদর্শনকারী আসেনি'। [সূরা কাসাস: ৪৬]

বিষয়টি ভালভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন: কেননা এই বিষয়ে কেউ যদি কিছু নস (আয়াত ও হাদীস) গ্রহণ করে অপর কিছু নস ছেড়ে দেয় তাহলে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছতে পারবে না এবং বিষয়টি অনুধাবন করতে পারবে না।

আর এটাও জেনে রাখা প্রয়োজন, এই সমস্ত শাসক ও তাদের সাহায্যকারীদের কুফরী এ কারণে নয় যে, তারা রিসালাতের প্রমাণ সম্পর্কে অজ্ঞ। বরং তাদের নিকট পাঠানো হয়েছে সর্বশেষ রাসূল যার পর আর কোন রাসূল আসবেন না। আর তাদের কাছে আছে কিতাবুল্লাহ যার মধ্যে তাওহীদের বিষয়গুলো বিদ্যমান। যাতে কোন পরিবর্তন পরিবর্ধন করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেয়। তারা সত্যের অনুসন্ধান ও অনুসরণে বিমুখ। তাদের কুফরীও বিমুখতার কারণে। রিসালাতের প্রমাণ না পৌছার কারণে নয়।

খৃষ্টানরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পাদ্রী ও সন্যাসীদেরকে রব হিসাবে গ্রহণ করেছে। তাদের জানা ছিলনা বিধান প্রদানের ক্ষেত্রে গাইরুল্লাহর অনুসরণ তাদের ইবাদত ও শিরক। যেমনটি বর্ণিত হয়েছে আদি বিন হাতিমের হাদীসে।[১২] তিনি বলেছিলেন: إنهم لم يكونوا يعبدونهم "তারাতো (খৃষ্টানরা) তাদের (পাদ্রীদের) ইবাদাত করত না"।

তার এ উক্তি দ্বারা বুঝা যায় তাদের জানা ছিল না হালাল হারাম ও বিধানের ক্ষেত্রে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের কথা গ্রহণ করা ইবাদতেরই অন্তর্ভূক্ত। তথাপি তারা এই ক্ষমতা গাইরুল্লাহ কে প্রদানের কারণে কাফের হয়ে গিয়েছে এবং আল্লাহ (সুবঃ) এই সমস্ত ব্যক্তিদের ব্যাপারে বলেছেন:

---

[১২] সূরা তাওবার ৩১নং আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাছীর উল্লেখ করেন: ইমাম আহমদ, তিরমিযী, ইবনে জারীর বিভিন্ন সূত্রে আদী ইবনে হাতেম থেকে বর্ণনা করেন, যখন তার নিকট রাসুল (সা:) এর দাওয়াত পৌছল। .... অতঃপর তিনি রাসূল (সা:) এর সাথে সাক্ষাৎ করেন আর তার গলায় রূপার ক্রুশ ঝুলানো ছিল। রাসূল (সা:) এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন: 'তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পন্ডিতগণ ও সংসার-বিরাগীদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে' তখন তিনি বললেন: তারাতো তাদের ইবাদত করতো না। রাসূল (সা:) বললেন: তারা হালালকে হারাম আর হারামকে হালাল করত আর এরা তাদের অনুসরন করত। এটাই হলো তাদের ইবাদত। (সুনান আত তিরমিযী:৩০৯৫; সনদ:সহীহ)

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

অর্থ: 'তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পন্ডিতগণ ও সংসার-বিরাগীদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে'। [সূরা তাওবা: ৩১]

আর তাদেরকে এই অজ্ঞতার কারণে ক্ষমা করা হয়নি। কেননা বিষয়টি আল্লাহ প্রদত্ত স্বভাবের বিপরীত। যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, রিযিক প্রদান করছেন, আকৃতি দিয়েছেন, সুস্থ রেখেছেন। সুতরাং কোন ভাবেই সম্ভব না তিনি ব্যতীত অন্য কেউ বিধান দিবে, আইন প্রণয়ন করবে তার হালালকৃত জিনিসকে হারাম, আর হারামকৃত জিনিসকে হালাল সাব্যস্ত করবে।

সুতরাং এ অজুহাত কি কোন ভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে কেননা এই শাসক, সামরিক কর্মকর্তা, পুলিশ, সাংবাদিক, নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদেরকে এবং অন্যান্যদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমাদের ধর্ম কী? তারা বলবে ইসলাম, এবং আসমানি কিতাব হলো আল-কুরআন। তাদের অনেকেতো কুরআনও তেলাওয়াত করে। তাহলে কি একথা বলা যাবে যে, তারা অজ্ঞ, তাদের নিকট এখনো প্রমাণ পৌছেনি? অধিকন্তু তারা ইসলাম ও কুরআনকে অবমাননা করে। যে ব্যক্তি কুরআনের বিধান প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। মামলা দায়ের করে এবং তাকে কারাগারে বন্দি করে।

আর যে ব্যক্তি তাওহীদের দিকে আহ্বান করে; শিরক কুফর পরিত্যাগের দিকে আহবান করে; এ সকল তাগুতদের সমর্থকেরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। অন্য দিকে তারা তাগুতের বিধান এবং স্বরচিত আইন ও শিরকী প্রথাকে সাহায্য করে। তারা শর'য়ী বিধানকে অনুপযুক্ত মনে করে এবং একনিষ্ঠ মুসলিমদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে। তাদেরকে সহযোগিতা করে। আর এটা আল্লাহর দ্বীনের সম্পূর্ণ বিপরীত তা কোন মুসলমানের বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়।

এটা কি এমন কোন সূক্ষ্ম বা জটিল বিষয় যে, বলতে হবে তাদের নিকট তো এখনো প্রমাণ পৌছেনি? না! কোন ভাবেই না। আল্লাহর শপথ! বিষয়টি দ্বী-প্রহরের সূর্য্যের চেয়েও স্পষ্ট।

দুটি দলের মাঝে দন্দ্ব। একটি হল শিরকের অপরটি তাওহীদের। একটি পবিত্র শরীয়ার অপরটি মানব রচিত অপবিত্র বিধানের। আর এই লোকেরা হয়তো ভালবাসার টানে অথবা আখেরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়ে স্ব-ইচ্ছায়, স্ব-জ্ঞানে তাগুতদের কাতারে শামিল হয়েছে। তাই সে পথেই যুদ্ধ করে ও তাদেরকেই সাহায্য করে। আর মুওয়াহ্হিদদের কেউ যদি তাদের এই পথ ও মতকে অস্বীকার করে তাহলে তার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি ব্যয় করে।

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوت

অর্থ: 'যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, আর যারা কুফর অবলম্বন করেছে তারা যুদ্ধ করে তাগুতের পথে'। [সূরা নিসা: ৭৬]
অচিরেই কিয়ামতের দিন যখন এরা মুসলমানদের সফলতা ও তাগুতপন্থীদের ধ্বংস দেখতে পাবে তখন বলতে থাকবে:

رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا (٦٧) رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا

অর্থ: 'হে আমাদের রব, আমরা আমাদের নেতৃবর্গ ও বিশিষ্ট লোকদের আনুগত্য করেছিলাম, তখন তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের রব, আপনি তাদেরকে দ্বিগুণ আযাব দিন এবং তাদেরকে অভিশপ্ত বানান ঘোর অভিশপ্ত' ।[সূরা আহযাব: ৬৭, ৬৮]
তাদের এই উক্তিটি ভেবে দেখুন: فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا "তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে" কিন্তু নেতারা তাদের পথভ্রষ্ট করা সত্ত্বেও তাদের অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না।
আল্লাহ (সুবঃ) কাফেরদের ব্যাপারে অনেক আয়াতে বলেছেন:

এক وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا.

অর্থ: 'অথচ তারা মনে করে, তারা খুবই ভাল কাজ করছে'। [সূরা কাহাফ: ১০৪]

দুই وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ.

অর্থ: 'তারা মনে করে, তারা সঠিক পথেই আছে'। [সূরা যুখরুফ: ৩৭]

তিন. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ

অর্থ:'তারা মনে করে যে, তারা কোন কিছুর উপর আছে'। [সূরা আল-মুজাদালা: ১৮]

কিন্তু তাদের শিরক ও কুফর সম্পর্কে সু-ধারণা এবং তাওহীদ সম্পর্কে অজ্ঞতার অজুহাত কোন কাজে আসবে না। কেননা তারা ইসলামের একটি মৌলিক বিষয়কে আদায় করেনি। যার জন্য আল্লাহ অনেক প্রমাণ পেশ করেছেন, সকল রাসূলকে প্রেরণ করেছেন।
তবে যদি তাদের ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা কোন সংশয়পূর্ণ জটিল বিষয়ে হত আর তাদের নিকট ইসলামের প্রধান উৎসগুলো (কুরআন, হাদীস ইত্যাদি) বিদ্যমান না থাকতো তাহলে তাদের অজুহাত গ্রহণযোগ্য হওয়ার সম্ভবনা ছিল।

ষষ্ঠ সংশয়:

তারা তো বাধ্য, দরিদ্র ও অসহায়।

তারা বলে: এই সৈনিকদের অনেকেই তাগুতকে ভালবাসে না, বরং তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাগুতকে অস্বীকার করে এবং তাদের রচিত বিধান থেকে পৃথক থাকে। তাদের অন্তরে রয়েছে ওদের প্রতি বিদ্বেষ। কিন্তু তারা বেতন ও ভাতার কারণে অক্ষম। আর কারো কারো অবসর গ্রহনের অল্প কয়েক বছর অবশিষ্ট আছে। তারা তাদের দূর্বলতার কথা প্রকাশ করে। তাদের কতকের কাজে তো ইসলাম ও মুসলিমদের কল্যাণ নিহিত।

আমাদের জবাব: আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ্‌র নিকট ঈমান হল:

الاعتقاد باجنان والقول بالسان والعمل بالجوارح والاركان

অর্থ ঃ অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা, এবং অঙ্গ-প্রতঙ্গ দ্বারা আমল করা।

ঈমান শুধু মাত্র অন্তর দ্বারা বিশ্বাসের নাম নয়। তাই الكفربالطـــاغوت (তাগুতকে অস্বীকার) প্রকাশ্যে ও গোপনে উভয়ভাবে হওয়া আবশ্যক। এজন্য আমরা আমাদের শরিয়তে বাহ্যিক দিকেরই বিবেচনা করি। অদৃশ্য বিষয়ে বাড়াবাড়ি করি না। কেননা অদৃশ্য বিষয় আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না।

অতএব কোন মুনাফিক যদি তার অন্তরে কুফরের প্রতি ভালবাসা ও শরীয়তের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, প্রকাশ্যভাবে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে, তাগুতকে অস্বীকার করে ও ইসলামের বাহ্যিক বিধান সমূহকে আঁকড়ে ধরে। তাহলে আমরা তার বাহ্যিক দিকটাই গ্রহণ করি এবং তাকে মুসলিমদের মাঝে গন্য করি। কেননা অভ্যন্তরীণ বিষয়ে আমাদের সামান্যতম জানার অবকাশ নেই। (যদিও সে মুসলিম খলিফার ভয়ে ইসলাম প্রকাশ করে) এ কারণেই তাকে মুসলিমদের মধ্যে গণ্য করা হয় ও তার জান মাল সংরক্ষণ করা হয়। আর পরকালে তার বিচার আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উপরই ন্যাস্ত। মুনাফিকদের শাস্তির ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

অর্থ: "নিশ্চয় মুনাফিকরা জাহান্নামের অতল গহবরে পতিত হবে।"[সূরা নিসা: ১৪৫]

এমনি ভাবে যে ব্যক্তি অন্তরে আল্লাহকে বিশ্বাস করে এবং তাগুত কে ঘৃণা করে কিন্তু তার বাহ্যিক দিক হয় এর বিপরীত অর্থাৎ মুশরিককে সাহায্য করে, তাগুতের বাহিনীতে যোগ দেয়, তাদের দল ভারী করে, তাদের সংবিধানকে

সংরক্ষণ করে, তাদেরকে সাহায্য করে ও মুওয়াহ্হিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। এমতাবস্থায় আমরা বাহ্যিক দিক লক্ষ করে তার ব্যাপারে ফয়সালা দিব। কেননা আমরা তো কারো হৃদয় ও বুক ফাড়ার ব্যাপারে আদিষ্ট নই। আর এ কারণেই উমার (রাঃ) বলেছেন:

إِنَّ أُنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمْ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمِنَّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ اللَّهُ يُحَاسِبُهُ فِي سَرِيرَتِهِ وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ نَأْمَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقْهُ وَإِنْ قَالَ إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ

"নিশ্চয় রাসূলের (সাঃ) সময় মানুষদেরকে ওহীর মাধ্যমে চেনা হত। আর ওহী তো এখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সুতরাং এখন আমরা তোমাদেরকে গ্রহণ করবো তোমাদের কর্ম অনুযায়ী। যে ব্যক্তি আমাদের সামনে ভাল কাজ প্রকাশ করবে আমরা তার প্রতি বিশ্বাস রাখব এবং তাকে নিকটে করে নিব, তার অভ্যান্তরীন বিষয়ে আমাদের কোন দায়ীত্ব নেই। আল্লাহই তার অভ্যন্ত রীন হিসাব নিবেন। আর যে ব্যক্তি আমাদের সামনে মন্দ বিষয় প্রকাশ করবে আমরা তার প্রতি বিশ্বাস রাখব না এবং তাকে সত্যায়ন করব না যদিও সে বলে তার অভ্যন্তর সুন্দর।" [সহীহুল বুখারী: ২৬৪১]

বুখারীর একটি ঘটনাও এর উপর প্রমাণ বহন করে। যাতে বলা হয়েছে: "কিছু লোক কা'বায় আক্রমণ করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে ধসিয়ে দিবেন। অথচ তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও থাকবে, যে বাধ্য হয়ে তাদের সাথে বের হবে। কেননা উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) যখন রাসূল (সাঃ) কে ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, যারা বাধ্য হয়ে তাদের সাথে বের হবে। মুমিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা তাদের উদ্দেশ্য হবেনা। উত্তরে রাসূল (সাঃ) তাকে বলেছিলেন:

يهلكون مهلكًا واحدًا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم

"তারা একই সাথে ধ্বংস হবে। (কিয়ামতের দিন) বিভিন্ন স্থান থেকে তারা উঠবে। আল্লাহ তাদেরকে তাদের নিয়্যাত অনুযায়ী উঠাবেন।" [সহীহ মুসলিম: কিতাবুল ফিতান ওয়া আসরাতুস সাআ: ৮-(২৮৮৪)]

এই হাদীসের উপর ভিত্তি করে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা (রহঃ) যে সমস্ত ব্যক্তি তাতারীদের সংবিধান "ইয়াসিক" এর অনুসরণ করেছিল তাদের ব্যাপারে কুফুরীর ফাতোয়া দিয়েছিলেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা ঐ

বাহিনীকে হারাম শরীফ ও বাইতুল্লাহর অসম্মান করার দরুন ধসিয়ে দিবেন। অথচ তাদের মধ্যে কেউ কেউ সালাত আদায় করত, সিয়াম পালন করত, কিন্তু তারা এসেছিল বাধ্য হয়ে। তথাপিও আল্লাহ (সুবঃ) তাদের মাঝে পার্থক্য করবেননা। আর কিয়ামাতের দিন তাদের ফয়সালা হবে নিজ নিজ নিয়ত অনুযায়ী। তাহলে কারা বাধ্য আর কারা বাধ্য নয়, এই পার্থক্য করা কিভাবে মুজাহিদগণের উপর আবশ্যক হতে পারে? অথচ প্রকৃত অবস্থা তাদের জানা নেই।

আব্বাস (রাঃ) যখন বদরের যুদ্ধে কাফেরদের কাতারে আত্মগোপন করেন তখন তার সাথে রাসূল (সাঃ) এর আচরণ 'বাধ্যতা অজুহাত নয়' এর উপর প্রমাণ বহন করে। রাসূল (সাঃ) ধারণা করেছিলেন, তিনি হয়ত মনে মনে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আর বাধ্য হয়ে কাফেরদের সাথে এসেছেন তাই তাকে রাসূল (সাঃ) সম্বোধন করে বললেন, "আপনার অন্তরের বিষয় আল্লাহর দিকে ন্যস্ত, আর আমাদের কাছে ধর্তব্য হল আপনার বাহ্যিক দিক।"[১৩]

মূল ঘটনাটি বুখারীর ২৫৩৭ ও ৩০৪৮ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে একথাও উল্লেখ আছে, রাসূল (সাঃ) তাকে মুশরিকদের ন্যায় ফিদিয়া দিয়ে নিজেকে মুক্ত করার আদেশ দেন। সুতরাং রাসূল (সাঃ) তার সাথে সেই আচরণই করেছেন যা তিনি অন্যান্য মুশরিকদের সাথে করেছেন। আমরাও তো এই একই আচরণ আল্লাহর সাথে শিরককারী ও মানব রচিত আইনের সাহায্যকারী সৈনিকদের সাথে করে থাকি।

রাসূল (সাঃ) কাউকে তাকফীর (কাফের সাব্যস্ত) করা এবং কারো উপর কোন হুকুম প্রদান করা ও অন্যসব ক্ষেত্রে সকলের চেয়ে বেশী আল্লাহভীরু মুত্তাক্বী হওয়া সত্ত্বেও মানুষের বাহ্যিক দিক গ্রহণ করেছেন। তাহলে আমরা কেন তা করব না?

বাধ্য হয়ে কুফর প্রকাশের ব্যাপারে, উলামায়ে কেরাম সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তারা কিছুতেই ঐ সীমার আওতাভুক্ত নয়। যে ব্যক্তি তাদের অবস্থা অবলোকন করেছে, সে কোন ভাবেই তাদের কে বাধ্য ভাবতে পারে না। কেননা এরা তো কর্ম ও চাকরি নিয়ে গর্ব করে এবং এর পারিশ্রমিক ও বেতন গ্রহণ করে, তাহলে এটা কি ধরণের বাধ্যতা যে, তাদের কে বিনিময় দেয়া হচ্ছে এবং বিভিন্ন ধরণের সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে আর বছরের পর বছর ধরে শিরকের সাহায্য করে আসছে।

---

[১৩] ইমাম আহমদ থেকে বর্ণিত। (বিঃদ্রঃ আমাদের ক্ষুদ্র তালাশে হাদীসটি লেখকের বর্ণিত শব্দে পাইনি। তবে কিছুটা ভিন্ন শব্দে "বুস্তানুল আহবার মুখতাসারুন্ন নাইলিল আওতার" নামক গ্রন্থে পাওয়া গেছে।)

তাদের পূর্বেও একটি দল ওজর পেশ করেছে কিন্তু তাদের ওজর গ্রহণযোগ্য হয়নি। তারা ঐ সমস্ত ব্যক্তি যারা মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেছে কিন্তু মুশরিকদের কাতার ছেড়ে (মাদীনায় হিজরাতের মাধ্যমে) মুওয়াহ্হিদদের কাতারে শামীল হয়নি।

অতপর যখন বদরের দিন এল। মুশরিকরা তাদের যুদ্ধের প্রথম কাতারে আসতে বাধ্য করল। একটু ভেবে দেখুন তাদের অবস্থা কী ছিল? তারা তাদের সাথে সেচ্ছায় বের হয়নি। তাদের সেনাবাহিনীতে আগ্রহ নিয়ে ভর্তি হয়নি, যে তারা তাদেরকে বেতন ভাতা দিবে এটা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাদের বাধ্য হয়ে যুদ্ধে আসার অজুহাতকে গ্রাহ্য না করে স্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেছেন:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ

অর্থ: "নিশ্চয় যারা নিজদের প্রতি যুলমকারী, ফেরেশতারা তাদের জান কবজ করার সময় বলে, 'তোমরা কী অবস্থায় ছিলে'? [সূরা নিসা: ৯৭]

অর্থাৎ তোমরা কাদের কাতারে ছিলে? তাওহীদ ও শরীয়তের না শিরক ও কুফুরের? এর সত্য জবাব হল আমরা ছিলাম মুশরিকদের কাতারে। কিন্তু তারা যখন স্বচক্ষে মুশরিকদের ধ্বংস দেখতে পাবে তখন এই জবাব দিতে সাহস করবে না। বরং দূর্বলতা ও অক্ষমতার অজুহাত পেশ করবে। এই ধারণায় যে, এই অজুহাত তাদেরকে শিরক ও মুশরিক থেকে পৃথক করবে। ভেবে দেখুন তারা তাগুত থেকে নিজেদেরকে পৃথক করার কত চেষ্টাই করবে, এটা তাদের কোন উপকারেই আসবে না। কেননা তারাতো তাগুতের কাতারেই মৃত্যুবরণ করেছে। দুনিয়ায় তাদের থেকে পৃথক হয়নি। দেখুন তারা ফেরেস্তাদেরকে কী জবাব দেবে?

قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ

অর্থ ঃ "ফেরেস্তারা বলবে তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা বলবে দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম।"[সূরা নিসা :৯৭]

হুবহু এই বাক্যটি বর্তমান সময়ের শাসকদের সৈনিক, সাংবাদিক ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের ব্যাপারে ব্যবহার করা হয়ে থাকে ।

أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ "তারা কি একে অন্যকে এ বিষয়ে ওসিয়াত করেছে? বরং এরা সীমালংঘনকারী কওম।"[সূরা যারিয়াত: ৫৩]

আর যখন আমরা তাদেরকে তাওহীদের দিকে আহবান করি, শিরক থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা বলি তখন তারা আমাদেরকে এই জবাবই প্রদান করে। আর আল্লাহর দ্বীনে এ সমস্ত লোকদের বিধান যদি আমরা বর্ণনা করি তখন তাদের পক্ষে একদল লোক দাড়িয়ে যায় এবং বলতে থাকে তারাতো দূর্বল,

তাদের এই জবাব কি গ্রহণযোগ্য হবে। এবার ফেরেস্তাদের জবাব ও তাদের পরিণতির কথা শুনুন:

قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

অর্থ: "ফেরেশতারা বলে, 'আল্লাহর জমিন কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা তাতে হিজরত করতে'? সুতরাং ওরাই তারা যাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম। আর তা মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল।"[সূরা নিসা: ৯৭]

তাদের কী অন্য কোন রিযিকের ব্যবস্থা ছিল না যে তারা শিরক ছেড়ে সে রাস্তা গ্রহণ করবে। যে মহান রিযিকদাতা পিঁপড়া, মৌমাছি, পাখ-পাখালী, চতুষ্পদ জন্তু এবং কাফের মুশরিকদের কে রিযিক প্রদান করেন। তিনি বুঝি আল্লাহভীরু শিরক থেকে মুক্ত তাওহীদে বিশ্বাসীদের রিযিক প্রদান করবেন না? (তারা যা বলে তা থেকে আল্লাহ অনেক উর্ধ্বে)

তারা স্বেচ্ছায় কাফেরদের সঙ্গ না দেয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কত বড় ধমকি দিলেন। কিন্তু এর পরে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيل

فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا

অর্থ: "তবে যে দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা কোন উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোন রাস্তা খুঁজে পায় না। অতঃপর আশা করা যায় যে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।" [সূরা নিসা: ৯৮, ৯৯]

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা শুধুমাত্র ঐ ব্যক্তির অক্ষমতার অজুহাত গ্রহণ করবেন যে কাফেরদেরকে পরিত্যাগ করে আল্লাহর দিকে গমনের কোন সুযোগ না পায় যেমন সে আহত, বন্দি অথবা চলতে অক্ষম, অথবা যে ব্যক্তি হিজরত করে মুসলিমদের কাতারে মিলিত হওয়ার কোন পথ না পায়, যেমন মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ, বা দূর্বল।

অতপর আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে এই মুশরিকদের থেকে হিজরত করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং তাদের জন্যে উত্তম ও যথেষ্ট পরিমান রিযিকের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন:

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً

অর্থ: "আর যে আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করবে, সে জমিনে বহু আশ্রয়ের জায়গা ও সচ্ছলতা পাবে।"[সূরা নিসা: ১০০]

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা শিরক ও মুশরিকদের বর্জনের প্রতি আহবান করে বলেছেন:

وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

অর্থ: "আর যদি তোমরা দারিদ্রের আশংকা কর, তবে আল্লাহ চাইলে নিজ করুনায় তোমাদের অভাবমুক্ত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।"[সূরা তাওবা: ২৮]

অপর কিছু লোক তাদের এই বিক্রিত কাজকে 'মাসলাহাত' (কল্যাণ, কৌশল) এর দোহাই দিয়ে বৈধ করতে চায়, তারা দাবী করে তাদের এই পঁচা দূর্গন্ধযুক্ত বেতন দ্বারা দ্বীনের খেদমাত করে। বাস্তব অবস্থা হল তারা পেট ও পকেটের গোলাম।

সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) তার সাথীদেরকে উপদেশ দিতেন তারা যেন বাদশাদের সাক্ষাৎ এবং তাদের তোষামোদ থেকে বিরত থাকে। অথচ ঐ সমস্ত বাদশারা শরয়ী বিধান অনুযায়ী বিচার পরিচালনা করত। যদিও তাদের থেকে কিছু কিছু গোনাহ প্রকাশ পেত। তাহলে বর্তমানের কুফুর ও শিরককারী শাসকদের অবস্থা কিরূপ হবে?

একবার তিনি তার এক ছাত্র কে উপদেশ দিলেন:- তুমি শাসকদের নিকটবর্তী হওয়া থেকে অথবা যে কোন বিষয়ে তাদের সাথে মেলামেশা করা থেকে সাবধান থাকবে এবং তুমি প্রতারণায় পড়া থেকে সাবধান থকবে। হয়ত তোমাকে বলা হবে (তুমি শাসকদের সাথে সম্পর্ক রাখ) যাতে তাদের নিকট সুপারিশ করতে পার অথবা মাজলুমদের রক্ষা ও তাদের থেকে জুলুম প্রতিহত করতে সক্ষম হও। কেননা এগুলো হল ইবলিসের ধোঁকা। জ্ঞানপাপীরা এগুলোকে অজুহাত হিসাবে গ্রহণ করেছে।

আর সত্যই তারা যে জিনিস কে দাওয়াতের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছে তা শয়তানের ধোকা ছাড়া অন্য কিছুই না। কেননা তারা এর দ্বারা সর্বশ্রেষ্ঠ 'মাসলাহাত' তাওহীদকে ধ্বংস করছে এবং সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করছে।

সায়্যেদ কুতুব (রহ:) ঠিকই বলেছেন:- এই শাসকরা অনেক দাঈ'দের পদস্খলনের কারণ হয়েছে এবং মূর্তি সেজে বসে আছে ফলে এই দাঈ ব্যক্তি আল্লাহ কে ব্যতিরেকে তাদের উপাসনা করছে।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) কে একবার আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের একজন শায়েখের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল "এক ব্যক্তি এক ডাকাত দলের খবর জানতে পারল, যারা সবসময় কবীরা গুনাহে লিপ্ত থাকে। ডাকাতি, হত্যা ও অন্যান্য অশশ্লীল কাজ কর্ম করে। তিনি তাদেরকে পথ প্রদর্শনের ইচ্ছা করলেন, কিন্তু তার নিকট শুধু একটি পন্থা উপযোগী মনে হল। তিনি তাদের জন্য দুফ ও গায়কের ব্যবস্থা করলেন, যারা

দুফ বাজাবে এবং অশ্লীল নয় এমন গান গাবে। ফলে দেখা গেল তাদের কিছু মানুষ হেদায়াত পেল এবং যারা পূর্বে কবীরাহ গুনাহে লিপ্ত থাকত তারা সগীরা গুনাহ ও সন্দেহ যুক্ত কাজ থেকে বিরত থাকতে শুরু করল। শায়েখের এই কাজ কি বৈধ?

ইবনে তাইমিয়্যা (রহঃ) জবাবের সারমর্ম হলঃ এই পদ্ধতিটি "বেদআত" কেননা রাসূল (সাঃ) এর শরীয়াত অনুযায়ী গান হল শয়তানের পদ্ধতি। কেননা এর ফলাফল যদিও বাহ্যিক ভাবে ভাল, কিন্তু এর পরিণাম শুভ নয়। কেননা নাপাক দ্বারা যেমনি ভাবে নাপাক দূর হয়না। ঠিক তেমনি ভাবে পেশাবের দ্বারা পেশাবও পবিত্র হয় না। যেমনি ভাবে একজন দাঈ'র উদ্দেশ্য মহান ও পবিত্র তাই তার দাওয়াতের মাধ্যমও সর্বোত্তম হওয়া চাই।

জেনে রাখা ভালোঃ জগতের সবচেয়ে বড় 'মাসলাহাত' হল তাওহীদ, আর সবচেয়ে বড় অনিষ্ট হল শিরক। সুতরাং আর যত কল্যাণ তাওহীদের বিপরীতে আসবে সব প্রত্যাক্ষাত। আর শিরকের অনিষ্টতার সামনে অন্য সকল অনিষ্টতা মূল্যহীন। যে ব্যক্তি তাওহীদের মহত্ব ও শিরকের ভয়াবহতা বুঝেছে তার জন্য সম্ভবপর নয় যে, সে তাওহীদ ধ্বংসের কারণ হবে এবং শিরকের পাহারাদার হবে। আর তাওহীদের ক্ষেত্রে অন্য কোন 'মাসলাহাত' আর শিরকের ক্ষেত্রে অন্য কোন অনিষ্টতার অজুহাত পেশ করবে এবং তার জন্য এটাও সম্ভবর নয় যে, সে দ্বীনকে এমন ছাগলের ন্যায় বানাবে যাকে অন্যের কল্যাণে জবেহ করা হয়।

সপ্তম সংশয়ঃ

তাদেরকে তাকফীর করে কী লাভ?

তারা বলেঃ এই সৈনিক, সাংবাদিক ও তাগুতের অন্যান্য সাহায্যকারী কে তাকফীর করে কী লাভ?

আমাদের জবাবঃ এটা আল্লাহ (সুবঃ) এর বিধান। তাই কারণ ও উপকারিতা জানার চেয়ে বেশী প্রয়োজন, এই বিধান মেনে নেয়া।

তাকফীরের প্রয়োজনীয়তা অনেক। এই ছোট পরিসরে সব লেখা সম্ভব নয়। তাই এখানে বিশেষ কয়েকটি তুলে ধরা হলোঃ

এক. তাওহীদের একটি মৌলিক দাবি হল কাফের-মুশরিকদের সাথে এবং তাদের উপাস্যদের সাথে প্রকাশ্য শত্রুতা এবং সম্পর্কচ্ছেদ করা। যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ

অর্থ:- 'ইবরাহীম ও তার সাথে যারা ছিল তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। তারা যখন স্বীয় সম্প্রদায়কে বলছিল, 'তোমাদের সাথে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যা কিছুর উপাসনা কর তা হতে আমরা সম্পর্কমুক্ত। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি; এবং উদ্রেক হল আমাদের এবং তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আন' ।[সূরা মুমতাহিনা: ৪]

বুঝা গেল আল্লাহ (সুবঃ) আমাদেরকে এই উত্তম আদর্শ ও শ্রেষ্ঠ মিল্লাতের অনুসরণের আহ্বান জানিয়েছেন। যার একটি অত্যাবশ্যক দিক হল, মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা এবং তাদের সাথে শত্রুতা ঘোষণা করা। যে ব্যক্তি মুসলমান ও কাফেরদের মাঝে পার্থক্য করতে পারে না; সে কিভাবে এই বিধান পালন করবে? কার সাথে কিভাবে সম্পর্কচ্ছেদ করবে? আল্লাহ (সুবঃ) বলেন:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (٤) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

অর্থ:- "বল, হে কাফিররা, তোমরা যার ইবাদাত কর আমি তার ইবাদাত করি না। এবং আমি যার ইবাদাত করি তোমরা তার ইবাদাতকারী নও। আর তোমরা যার ইবাদাত করছ আমি তার ইবাদাতকারী হব না। আর আমি যার ইবাদাত করি তোমরা তার ইবাদাতকারী হবে না। তোমাদের জন্য তোমাদের দীন আর আমার জন্য আমার দীন।"[সূরা কাফিরুন: ১-৬]

দুই. ভাল-মন্দ পার্থক্যে সমর্থ হওয়া এবং ভ্রান্ত পথ চিহ্নিত করতে সক্ষম হওয়া। আল্লাহ (সুবঃ) বলেন:

وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ

অর্থ: "আর এভাবেই আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি। আর যাতে অপরাধীদের পথ স্পষ্ট হয়ে যায়।" [সূরা আনআম: ৫৫]

যে ব্যক্তি ইসলামকে কুফর থেকে এবং মুসলিমকে কাফের থেকে পৃথক করতে পারবে না সে কিভাবে কাফেরদের পথ চিনতে পারবে? মুমিনদের পথ

আকড়ে ধরবে? আল্লাহর জন্য ভলবাসা (মুমিনদের সাথে) এবং আল্লাহর জন্য দুশমনি (কাফেরদের সাথে) রাখবে? অথচ এটা ঈমানের প্রধান শর্ত, মুমিনের প্রথম কাজ। আল্লাহ (সুবঃ) বলেন:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

অর্থ: 'আর যারা কুফরী করে, তারা একে অপরের বন্ধু। যদি তোমরা তা না কর, {মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব ও কাফেরদের সাথে শক্রতা। (আইসারুত্ তাফাসীর)} তাহলে জমিনে ফিতনা ও বড় ফাসাদ হবে'। [সূরা আনফাল: ৭৩]

এই ভালবাসা ও শক্রতা বুঝা যাবে যদি কাজ-কর্মে তার আলামত ও চিহ্ন প্রকাশ পায়। আর যে এই দুই দলের মাঝে পার্থক্যই করবে না, সে কিভাবে এই রুকন পালন করবে?

বাস্তবতা হল এর মূল প্রমাণ। যে ব্যক্তি তাকফীর তথা কাফের ও মুসলমানদের মাঝে পার্থক্য করাকে অবহেলা ও তুচ্ছ ভাবে, সে জানেনা কাকে ভালবাসবে ও কার সাথে শক্রতা রাখবে? আপনি দেখতে পাবেন এসব অজ্ঞ লোকেরা অধিকাংশ সময় মুসলিম ও কাফেরদের সাথে এক আচরণ করে। অথচ আল্লাহ (সুব:) বলেন:

أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (٣٥) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

অর্থ: 'তবে কি আমি মুসলিমদেরকে অবাধ্যদের মতই গণ্য করব? তোমাদের কী হল, তোমরা কিভাবে ফয়সালা করছ?'[সূরা আল কলাম: ৩৫, ৩৬]

অপর স্থানে বলেছেন:

أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ

অর্থ: 'নাকি আমি মুত্তাকীদেরকে পাপাচারীদের সমতুল্য গণ্য করব? [সূরা সোয়াদ: ২৮]

তিন. আর যদি মুসলমান ও কাফেরদের মাঝে পার্থক্য করা না হয় তাহলে যে সমস্ত বিধি-বিধান এর উপর ভিত্তি করে আবশ্যক করা হয়েছে, সেগুলো কিভাবে পালন করা সম্ভব হবে?

যেমন: মিরাছ প্রদান, বৈবাহিক বন্ধন, যবেহকৃত প্রাণী ভক্ষণ, সালাম প্রদান সহ অন্যান্য আচার-আচরণ। এ ধরণের অনেক হুকুম যেগুলো শুধুমাত্র মুসলমানদের মাঝে সীমাবদ্ধ। কাফেরদের সাথে বৈধ নয়। এ কারণে আপনি কাফের ও মুশরিকদের সাথে মুওয়াহ্হিদদের আচরণ এবং যারা উক্ত বিষয়টি

বুঝেনা বরং অনর্থকভাবে, তাদের আচরণের মাঝে বিশাল ব্যবধান লক্ষ্য করবেন। তারা মূলত এ কারণেই এক আল্লাহয় বিশ্বাসীদের কে ঘৃণা করে এবং তাদের থেকে দূরে থাকে। আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ তো মুওয়াহ্হিদদের কে তাকফীর করে।

কারণ, মুওয়াহ্হিদরা নামধারি মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। আর এরা মুওয়াহ্হিদদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। তাদেরকে ঘৃণার চোখে দেখে, শত্রুতা করে, তাদের দাওয়াহ কে ভর্ৎসনা করে।

এরা তাওহীদ ও জাতীয়তাবাদের মাঝে পার্থক্য করে না। অথচ তাওহীদ মুসলিম ও কাফেরদের মাঝে পার্থক্য ও ব্যবধান সৃষ্টি করে, আর জাতীয়তাবাদ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে এক করে।

ফেরেস্তারা রাসূল (সাঃ) এর যে গুন বর্ণনা করেছিলেন এরা সে সম্পর্কে অজ্ঞ অথবা অজ্ঞতার ভান করে। ফেরেস্তারা বলেছিলেন:

مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ (صحيح البخاري)

অর্থ: "মুহাম্মদ (সাঃ) মানুষদেরকে ভাগ করে দিয়েছেন (মুসলমান ও কাফেরদের মাঝে)"। [সহীহ বুখারী: ৭২৮১]

আর তারা কুরআনকেও প্রত্যাখ্যান করছে। কেননা কুরআন মুশরিক ও মুমিনদের মাঝে পার্থক্য করেছে। যদিও তারা বংশগতভাবে এক হয়।

চার. মুসলমান ও কাফেরের মাঝে পার্থক্য জানা থাকলে সঠিক দাওয়াতের পদ্ধতি বুঝে আসে।

মুসলমানের দায়িত্ব হলো সে যেখানেই থাকুক সেখানে দাওয়াতের কাজ করবে। মুসলমান, মুশরিক, আহলে কিতাব ও মুরতাদ সকলকে দাওয়াতের-পদ্ধতি এক নয়। বরং দাওয়াতের জন্য রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি। তাই কেউ যদি মুসলিম ও কাফেরের মাঝে পার্থক্য করতে না পারে তাহলে সে দাওয়াত দিবে কিভাবে? রাসূল (সাঃ) মুওয়ায (রাযিঃ) ইয়েমেনে পাঠানোর সময় বলেছিলেন:

إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ [صحيح البخاري]

অর্থ: "তুমি খৃষ্টানদের একটি সম্প্রদায়ের নিকট গমন করছ। সর্বপ্রথম তুমি তাদেরকে আল্লাহর এককত্বের দিকে আহ্বান করবে। যদি তারা আল্লাহর এককত্বকে মেনে নেয় তাহলে তুমি তাদেরকে জানাবে যে, আল্লাহ (সুবঃ) তাদের উপর দৈনিক পাঁচবার সালাত ফরয করেছেন। [সহীহ বুখারী: ৭৩৭২]
লক্ষ্য করুন! প্রথমে রাসূল (সাঃ) মু'আজ (রাযিঃ) কে সে সম্প্রদায়ের অবস্থা অবহিত করলেন। তারপর শিখিয়ে দিলেন তাদের সাথে কিভাবে আচরণ করবে এবং কিভাবে তাদেরকে দাওয়াত দিবে।

শেষ কথা

যে সমস্ত ব্যক্তিরা আমাদের নামে অপবাদ রটায় যে, আমরা সকলকে ঢালাও ভাবে কাফের বলি। তারা যেন আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে। অথচ তারা আমাদের আলোচনাও শোনেনা। আমাদের লেখা বই গুলোও পড়ে না। একদিন তাদের সেই মহান রবের সামনে দাঁড়াতে হবে যার নিকট কোন কিছু গোপন নেই। এবং তাদের বলা কথাগুলো এমন এক কিতাবে সংরক্ষিত যাতে ছোট বড় কোন কিছুই ছাড়া হয় না। আল্লাহ (সুবঃ) বলেন:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا

অর্থ: "আর যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে তাদের কৃত কোন অন্যায় ছাড়াই কষ্ট দেয়, নিশ্চয় তারা বহন করবে অপবাদ ও সুস্পষ্ট পাপ।"[সূরা আহযাব: ৫৮]
রাসূল (সাঃ) বলেছেন:

مَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ

অর্থ: "যে ব্যক্তি কোন মুমিনের ব্যাপারে এমন কথা বলে যা তার মাঝে নেই। আল্লাহ (সুবঃ) জাহান্নামের পূজের মাঝে তাকে অবস্থান করাবে যতক্ষণ না সে তার কথা ফিরিয়ে নেয়।" [সুনানে আবু দাউদ: ৩৫৯৯]

আমাদের স্পষ্ট ঘোষণা

আমরা মুসলমানদের এমন গুনাহের কারণে কাফের বলিনা, যার কারণে সে কাফের হয় না। হ্যাঁ! তবে যদি সে এ গুনাহকে হালাল ভাবে সেটা ভিন্ন

جهاد النكاح

هو جهاد كفرة الحكام أفتاهم به الحاخام

বিবাহ-জিহাদ !!!

“বিবাহ-জিহাদে” কাফের শাসকেরাই লিপ্ত, যার বৈধতা দিয়েছে তাদের ধর্মগুরুরা!

আলোচনায়:

শাইখ আবু মুহাম্মদ আল মাকদিসী (আল্লাহ তাঁর মুক্তিকে ত্বরান্বিত করুন)

১৪৩৪ হিজরী / ২০১৩ ইংরেজি

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রশ্ন: কিছু মিডিয়া মুজাহিদদের ব্যাপারে অপপ্রচার চালাচ্ছে যে, মুজাহিদরা নাকি তথাকথিত "বিবাহ-জিহাদ"[১] এর বৈধতার ফাতওয়া দিয়েছে। এ ব্যাপারে আপনাদের বক্তব্য কি? আদৌ এই নামের কোনো ভিত্তি আছে কি? অথবা চলমান সালাফী জিহাদী আন্দোলনের নির্ভরযোগ্য কারো পক্ষ থেকে কি এই ধরনের ফাতওয়া প্রকাশিত হয়েছে?

উত্তর:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد

সকল প্রশংসা কেবল আল্লাহর জন্যে। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার, সাহাবায়ে কেরাম, ও তাঁকে যারা ভালবাসে তাদের সকলের প্রতি।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর সম্মানিত কিতাবে ইরশাদ করেন,

{وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ}

---

[১] প্রথমত, "জিহাদুন্ নিকাহ" (جهاد النكاح) এর অর্থ হলো "নিকাহ এর জিহাদ" বা সংক্ষেপে "নিকাহ-জিহাদ"। "নিকাহ" শব্দের অর্থ "বিবাহ"। সভ্য সমাজে "বিবাহ" শব্দের দ্বারা পুরুষ ও নারীর দাম্পত্য জীবনকে বৈধতা দেবার আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়াকে বুঝানো হয়ে থাকে, যার মাধ্যমে তারা সভ্য সমাজে বৈধ দম্পতি হিসেবে স্বীকৃতি পায়। বৈধ দম্পতির মাঝে যৌনসম্পর্ক থাকা পৃথিবীর অন্যতম স্বাভাবিক বিষয়, তবে তাই বলে স্বয়ং "বিবাহ" শব্দের দ্বারা সরাসরি "যৌনকর্ম" বা "যৌনতা"কে বুঝানো হয় না। এতদসত্ত্বেও বাংলাদেশের নোংরা মিডিয়াগুলো "জিহাদুন্ নিকাহ" এর বাংলা হিসেবে "যৌন-জিহাদ" শব্দটি প্রচার করেছে – যা এই মিডিয়াগুলোর ইসলামবিরোধী নোংরা মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ।

দ্বিতীয়ত, "জিহাদুন্ নিকাহ" বা "বিবাহ-জিহাদ" ইসলাম দ্বারা স্বীকৃত কোনো বিষয় নয়, বরং এটা হচ্ছে ইসলাম সম্পর্কে খারাপ ধারণা তৈরি করার লক্ষ্যে ইসলামের শত্রুদের একটা নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্র - যা শ্রদ্ধেয় শাইখ (আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন) তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেছেন।

আর কাফেররা বলে, "তোমরা এই কোরআন শ্রবণ করিও না এবং এটা তেলাওয়াতের সময় শোরগোল সৃষ্টি করো যাতে তোমরা জয়ী হতে পারো।[২]

এই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর দ্বীন ও শরীয়ত থেকে বাধা প্রদানে কাফেরদের পদ্ধতি বা অপকৌশল আমাদের সামনে উন্মোচন করে দিয়েছেন। আর তারা এটা এজন্য করে যেন দ্বীনের সাহায্যকারীদেরকে পরাজিত করা যায়। আর তা হলো, দ্বীন থেকে মানুষদেরকে বিরত রাখতে কুৎসা রটনা ও মিথ্যারোপ করার মাধ্যমে তারা আল্লাহর দ্বীনকে মানুষের চোখে নিন্দিত করে তুলে।

আল্লাহর দ্বীন ও শরীয়তের ব্যাপারে কাফেররা একেক সময় একেক রকম অশ্লীল বা বাজে কথা বলে থাকে। দ্বীন ও জিহাদের প্রতি নিন্দার ক্ষেত্রে প্রতিটি যমানায় তৎকালীন তাগুত, কাফেরদের নিন্দার ধরন ছিল বিভিন্ন ও পরিবর্ধিত।

এই ক্ষেত্রে তারা যা নতুন উদ্ভাবন করেছে তা হলো, মিথ্যা ও বিকৃত ফাতওয়াকে মুজাহিদদের বলে প্রচার করা। এবং এটাকে দ্বীনের সাহায্যকারীদের সাথে সম্পৃক্ত করা। এই মিথ্যা কৌশল অতীতেও ছিল, বর্তমানেও চলছে।

আহলে সুন্নাহর অনুসারীদের শত্রুরা প্রতিটি যুগে বিরতিহীনভাবে আকীদা, ফিকাহ এবং অন্যান্য ব্যাপারে তাঁদের দিকে নিকৃষ্ট অপবাদ ও বদনাম করে আসছে। যেন আহলে সুন্নাহর বিশুদ্ধ আকীদা থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখা যায়। আর এই বিষয়টি সকলেই অবগত রয়েছেন।

পরবর্তীতে আমরা জানতে পেরেছি যে, প্রশ্নকারী যে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন তা চলমান সালাফী জিহাদী আন্দোলনের দিকে, বিশেষভাবে সিরিয়ার মুজাহিদ ভাইদের দিকে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছে। যাকে জিহাদের দুশমনরা **(جهاد النكاح)** বা **"বিবাহ-জিহাদ"** নামে নামকরণ করেছে। এ নামটি নতুন আবিষ্কৃত, ইসলামে এর সাধারণভাবে কোনো ভিত্তি নেই, এবং বিশেষভাবে আহলে তাওহীদ ওয়াল জিহাদ এর ভাইদের নিকট তো এর কোনো ভিত্তিই নেই।

---

[২] সূরা হা-মীম-আস-সাজদা, আয়াত: ২৬

চলমান সালাফী জিহাদীদের অভিধানে কেবলমাত্র একটি প্রকারই রয়েছে, আর সেটা হলো দ্বীনের দুশমনদের গর্দান উড়িয়ে দেয়া।

আর এর অনুগামী, পরিপূরক ও সহায়ক হলো মুখের জিহাদ যা তলোয়ারের জিহাদের দিকে নিয়ে যায়।

আর তারা যে **"বিবাহ-জিহাদ"** নাম দিয়েছে, এই ধরনের নামের ব্যাপারে চলমান বরকতময় জিহাদের নির্ভরযোগ্য কোনো সূত্র বা শাইখ কোনো ফাতওয়া দেন নি। এই নামকরণটি পথভ্রষ্ট উলামায়ে ছু, দুনিয়ালোভী ফকীহ ও চাটুকার দরবারী আলেমদের দ্বারা উদ্ভাবিত হয়েছে। আর এগুলো প্রচার করার জন্য কতিপয় সংস্থা ও মিডিয়ার মুখপাত্র নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আর তারা এই ফাতওয়াকে মুজাহিদদের সাথে জড়িয়ে দিচ্ছে; যা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। আর না এই জাতীয় ফাতওয়ার কোনো অস্তিত্ব রয়েছে!

বরং বিষয়টি সম্পূর্ণ বিপরীত! ইতিপূর্বে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যুদ্ধের ময়দানে বিশেষকরে সিরিয়ায় মুজাহিদেরা তাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে নিজেদের সাথে রাখার বিষয়ে, যা আমরা কঠোরভাবে নিষেধ করে দিয়েছি। কেননা এতে মুসলমানদের নারীরা যুদ্ধরত শত্রুদের হাতে বন্দী হওয়া, তাদের সম্ভ্রমহানী ও যুলুমের শিকার হওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে।

সুতরাং যখন কিনা আমরা মুজাহিদদেরকে তাদের স্ত্রী ও শিশুদেরকেই যুদ্ধের ময়দানে নেয়ার অনুমতি দিচ্ছি না, সেখানে এ কথা কিভাবে কল্পনা ও চিন্তা করা যায় যে, বর্তমানের কোনো শাইখ বা মুজাহিদীন ফকীহ মুসলিম তরুণীদেরকে এমন এক অঞ্চলে (ময়দানে) যেতে অনুমতি দিবেন যেখানে মূল কাজটিই হলো তুমুল লড়াই! যেখানে বিভিন্ন ক্ষতির সমূহ সম্ভাবনা বিদ্যমান! তাও আবার মুহরিম ব্যতীত! অতঃপর অভিভাবক ছাড়া নিজে নিজেই যে কারো কাছে বিবাহ বসবে!...এটা কিভাবে সম্ভব!!!

মুসলিম (রহঃ) নিজ গ্রন্থ সহীহ মুসলিমে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

[لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ]

“আল্লাহ ও পরকালের উপর ঈমান আনয়নকারী কোনো নারীর জন্য মুহরিম ব্যতীত এক দিন পরিমান রাস্তা (দূরত্ব) সফর করা বৈধ নয়।”[৩]

ইবনে মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রয়েছে,

[لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا] [صحيح ، أخرجه ابن ماجه(1882) والدارقطني (384) والبيهقي (7 / 110)]

“কোনো নারী অপর কোনো নারীকে বিবাহ দিতে পারে না এবং কোনো নারী নিজে নিজেই অন্যের কাছে বিবাহে বসতে পারে না।”[৪]

আর বায়হাকীতে রয়েছে,

[لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ]

“ওলী বা অভিভাবক ও দুইজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষ্য ছাড়া বিবাহ বৈধ নয়।”

আর অকস্মাৎ নব আবিষ্কৃত এই ধরনের হীনকর্মগুলো সাধারণ মুসলমানদের থেকে সংঘঠিত হতে পারে না। বিশেষভাবে আল্লাহভীরু ও পবিত্র মুজাহিদদের ক্ষেত্রে তো কল্পনাই করা যায় না। এটা তো তার দাওয়াহ বিরোধী! **“বিবাহ-জিহাদ”** নামটি চরম মিথ্যা ও বাতিল। এই ধরনের ফাতওয়া তো কোনো সাধারণ মুসলমানও দিতে পারে না, আর একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যখন এটা এমন আলেমের সাথে সম্পৃক্ত করা হয় যিনি বরকতময় জিহাদী আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ কাজের সাথে জড়িত, যেজন্য তিনি জিহাদ করেন, শত্রুদের মারেন ও শহীদ হন, মুসলমানদের সন্মান রক্ষা করেন, তাদের সম্পদ সংরক্ষণ করেন, তাগুত ও তার দোসরদের খেল-তামাশার (ক্ষতি) নির্যাতন থেকে মুসলমানদের স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতিরক্ষা করেন (তখন কথাটা কোন পর্যায়ের মিথ্যা হতে পারে!)।

---

[৩] আহমদ-২/৪৯৩ হা-১০৪০৬, মুসলিম-২/৯৭৭ হা-১৩৩৯, আবু দাউদ-২/১৪০ হা-১৭২৩, ইবনে মাজাহ-২/৯৬৮ হা-২৮৯৯

[৪] ইবনে মাজাহ/১৮৮২, দারে কুতনী/৩৮৪, বায়হাকী-৭/১১০

আমরা এই নামের (বিবাহ-জিহাদ) সাথে আমাদের সম্পৃক্ত থাকার বিষয়টি অস্বীকার করছি এবং তা হতে আমরা মুক্ত। তাগুতী মিডিয়া মিথ্যা অপবাদ হিসেবে মুজাহিদদের দিকে যা সম্পর্কিত করছে তা আমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করছি।

আর আমরা এটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, এটা একটা নব আবিস্কার, যা তারা মুজাহিদদের এমন জিহাদের কুৎসা রটানোর জন্য উদ্ভাবন করেছে যা তাদের মেরুদন্ডকে ভেঙ্গে দিচ্ছে, তাদেরকে সন্ত্রস্ত করছে। তারা জিহাদের সীমা অতিক্রম করে তাদের সীমাতে যেতে ভয় পাচ্ছে। তাই তারা মানুষদেরকে জিহাদ থেকে বাধা দিতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মানুষের চোখে জিহাদকে নিন্দিত ও ঘৃণিত করতে তারা সকল নিকৃষ্ট ও হীন পন্থা বেছে নিয়েছে। যেমনটি প্রবাদে রয়েছে:

" وكل إناء بما فيه ينضح"

"প্রতিটি পাত্রে যা আছে তাই বের হয়।"

সুতরাং, এসকল তাগুত ও তাদের ফাসাদ মিডিয়াসমূহ খারাপ চরিত্র, যিনা-ব্যভিচার, নির্লজ্জতার উপর অভ্যস্ত। এসব তাগুতের সকাল-বিকাল অতিবাহিত হয় মদ-জুয়ার আড্ডাখানায়, নাইট ক্লাবে, পতিতালয়ে, উলঙ্গ সমুদ্র সৈকত এই ধরনের স্থানে।

এদেরকে আপনি দেখতে পাবেন, যখন এরা বিরোধীদের সাথে ঝগড়া করে তখন তারা প্রতিপক্ষকে সেই মিথ্যা অপবাদ দিয়ে আঘাত করে যেই রোগে তারা নিজেরাই আক্রান্ত, যে কর্মে তারা নিজেরাই লিপ্ত ও অভ্যস্ত।

যেমনটি কথিত আছে,

"رمتني بدائها وانسلت"

"সে তার রোগ আমার উপর নিক্ষেপ করে পালিয়ে গেছে।"

উপরে উল্লিখিত এই ধরনের হীন ও নিকৃষ্ট কর্মে তারা অভ্যস্ত যেগুলো তারা অনুমোদন করে আইন জারি করেছে। এদের আসল চরিত্র নিচের এই চমৎকার উপমার মধ্যে ফুটে উঠে:

*يقولون جاهد يا جميل بغزوة ** أقول وهل لي غيرهن جهاد*

হে সুদর্শন যুবক! ময়দানে যুদ্ধ করে যাও!

আমি বলি, সুন্দরীদের উপভোগ করা ছাড়া আমার কি আর কোনো যুদ্ধ আছে!

বরং উহার বৈধতার ফাতওয়া দিয়েছে তাদের নেতৃবৃন্দ, তাদের মাশায়েখ ও তাদের ধর্মগুরুরা। ইসরাঈলের পররাষ্ট্র মন্ত্রী 'তাসবি লাফনি' যখন "মুসাদ" এর গোয়েন্দা বিভাগে কর্মরত ছিল **তখন তারাই ফাতওয়া দিয়েছে যে, ইসরাঈলের স্বার্থে তুমি যথেচ্ছা ব্যভিচারে লিপ্ত হতে পারো!** যেমনটি তাদের ম্যাগাজিনে উল্লেখ করা হয়েছে!

সেখানে আরো উল্লেখ আছে যে, এই ফাতওয়াটিতে আরবের নেতৃবৃন্দ ও এজেন্টদের সমর্থন রয়েছে। এটাই তাগুত, তাদের সহযোগী ও তাদের দোসরদের নিকট **'বিবাহ-জিহাদ'** নামে পরিচিত। ওরাই ইহার ফাতওয়া প্রদানকারী। কেননা, এটা ওদের কাছে সাধারণ ব্যাপার (যাতে তারা নিজেরা অভ্যস্ত)। অথচ তারা ইহার অপবাদ দিতে লাগলো পুণ্যাত্মা ও মুত্তাকী মুজাহিদদেরকে।

আর তাদের সাথে এই বিদ্বেষের কারণ একটাই। আর তা হলো, তাদের পবিত্রতা এবং জিহাদ। তাদেরই মিত্র কওমে লুতরা কি লুত আলাইহিস সালাম ও তাঁর পরিবারদের প্রতি (তিরস্কার করে) একথা বলে নি যে,

{ أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون }

..."তোমরা তাঁদেরকে তোমাদের জনপদ থেকে বহিষ্কার করে দাও। কারণ, তাঁরা অতি পবিত্র মানুষ।"[৫]

তেমনিভাবে কওমে লুতের বর্তমান অনুসারীরা তাদের পূর্বসূরীদের পথই অনুসরণ করছে। পবিত্রতা ও তাকওয়াকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করছে! এটাই তাদের যুদ্ধের ঘৃণ্য রূপ ও আসল চেহারা।

---

[৫] সূরা আরাফ, আয়াত: ৮২

তারা শরীয়তের সাহায্যকারীদেরকে সকল মন্দ ও খারাপ অপবাদ দিচ্ছে। জিহাদ ও মুজাহিদদেরকে দোষারোপ করতেই তারা এমন হীন মিথ্যা অপবাদ ও নাম (বিবাহ-জিহাদ) আবিষ্কার করছে। অথচ তারাই (মুজাহিদরা) হলো উম্মাহর খাঁটি ও সম্ভ্রান্ত ব্যাক্তিবর্গ।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

{ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد }

মহাপরাক্রমশালী মহাপ্রশংসিত আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান আনার কারণেই তাদের সাথে এই শত্রুতা।[৬]

তারা (শত্রুরা) ভাল করেই জানে যে, এইরূপ (বিবাহ-জিহাদ) কোনো কিছু কোনো মুজাহিদের থেকে আদৌ প্রকাশ পায় নি। বরং তাঁরা তা থেকে পুতঃপবিত্র...।

{ والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون }

...আল্লাহ তাআলা নিজ কাজে প্রবল শক্তিধর, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।[৭]

আবু মুহাম্মদ আসিম আল মাকদিসী

উম্মুল লু’লু কারাগারে বন্দী, ১৪৩৪ হিজরী

(আল্লাহ তাআলা শাইখকে দ্রুত মুক্তি দিন)

---

[৬] সূরা বুরূজ, আয়াত: ৮

[৭] সূরা ইউসুফ, আয়াত: ২১